সুবোধ ঘোষের উপন্যাসসম্ভার

প্রথমা

সুবোধ ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ১৩৭১

রথযাত্রা ১৩৯১

প্রকাশক

উপমা সেনগুপ্ত

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা—৭

মুদ্রণ

অশোককুমার ঘোষ

নিউ শশী প্রেস

১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রথমা

সূচী ঃ

নাগলতা

না গ ল তা

একবার দেখলে অনেকবার মনে পড়বে; আর, একদিন দেখলে অনেকদিন মনে থাকবে—এ রকম একটি চেহারা।

চোখ দুটি বেশ টানা-টানা; কিন্তু দুই চোখেরই কোল দুটো বেশ কুঁচকে গিয়েছে, এবং বোধ হয় সেই জন্যেই মনে হয়, সব সময় হাসছে চোখ দুটো। তা ছাড়া, কাঁচা-পাকা একজোড়া গোঁফও একটু শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। তাই বোধ হয় মনে হয়, যেন ঠোঁটের উপর একটা হাসির ছায়া লুটিয়ে পড়েছে।

বারো মাস ওই একই সাজ; খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যাণ্ট আর খাকি মোজা। দু'পায়ে কালো চামড়ার একজোড়া ভারি বুট। আর মাথায় একটা হ্যাট।

হ্যাটটা শোলার, কিন্তু মাঝে মাঝে খেজুর পাতার হ্যাটও তাঁকে পরতে দেখা যায়। এ জিনিসটা তাঁর নিজেরই হাতের কারুকলার একটি কীর্তি। কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কারও কাছ থেকে দেখা-শেখা ব্যাপারও নয়। নিজেই ভেবে-চিন্তে, বার-বার পরীক্ষা করে, শুধু একটা পেন্সিল-কাটা ছুরির সাহায্যে তিনি খেজুর-পাতার হ্যাট তৈরি করে থাকেন।

একটা একনলা বন্দুক, সেটা কখনও পিঠের সঙ্গে আবার কখনও বা তাঁর সাইকেলের রডের সঙ্গে বাঁধা থাকে। ষাট বছর বয়স, তবু এই সেদিনও তিনি ষাট মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে সেই কুলডিহা থেকে এই শিউলিবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মাসটা ছিল আষাঢ়, সারা দিনে তিন পশলা জোর বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়মত, অর্থাৎ সন্ধ্যার জোনাকি জ্বলে উঠতেই বাড়ির দরজার কাছে এসে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক দিয়েছেন—আমি এসেছি নিরু।

লোকে জানে, প্রতিবেশীরাও শুনে আসছে, রোজই ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে ঠিক এইরকম একটি স্বস্তিময় স্বরে, ঠিক এইভাবেই ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক দিয়ে থাকেন এই ভদ্রলোক: আমি এসেছি নিরু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে আসেন নিরুপমা। মাঝে মাঝে নিরুপমাকেও কথা বলতে শোনা যায়। যেন একটু বেশি খুশি হয়ে আর হেসে কথা বলছেন নিরুপমা—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে, এখনও তো জোনাকি জ্বলেনি।

ভদ্রলোক হাসেন—আমি ঠিক সময়েই ফিরেছি। সন্ধ্যাটাই আসতে একটু দেরি করেছে।

সেই ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন আজও বেঁচে আছে; রামসিংহাসন জানে, বাঙালীবাবু আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে এসে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়েছেন, আর, বউকে নাম ধরে ডেকেছেন।

আজকাল অর্থাৎ এই পাঁচ বছর ধরে বাঙালীবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য একটা নাম ধরেও ডাকেন—আমি এসেছি নন্দু।

ঘরের ভিতর থেকে লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসে সুনন্দা। সুনন্দাকেও মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়—আজ কিন্তু একটু দেরি করেছ বাবা।

রামসিংহাসন শুনতে পায়, বাঙালীবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন—আমার দেরি হয়নি নন্দ, সন্ধ্যাটাই একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে গেছে!

রামসিংহাসনের বাড়িটা এমন কিছু দূরে নয়। বাঙালীবাবুর বাড়ি আর রাম-সিংহাসনের বাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা পেঁপেবাগানের ব্যবধান।

এই শিউলিবাড়ির কে না চেনে বিজনবাবুকে? কিন্তু বিজনবাবু নামটাকে কেউ জানে বলে মনে হয় না। জানে শুধু তারা, যারা আজকাল মাঝে মাঝে এখানে কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে আসে আর বিজনবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে।

বিজনবিহারী রায়, আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখানে আছেন। এই রেল-লাইন আর এই শিউলিবাড়ি স্টেশনও যখন হয়নি, তখন থেকে তিনি এখানে আছেন। আর্থ-কাটিং অর্থাৎ মাটি-কাটার ঠিকেদারী করেন ভদ্রলোক। পাব্লিক ওয়ার্কসের, রেলের আর জেলা বোর্ডের যত কণ্ট্রাক্টর, আর মাটিকাটা যত মজুর, সকলেই বিজন-বাবুকে যে-নামে চেনে আর ডাকে, সেটা একটা অন্য নাম—মাটিসাহেব। পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টরেরা বলে—মিট্টিসাব।

মাটিসাহেব বিজনবাবুর খাকি-সাজের রঙ; তা-ছাড়া মুখটার, হাঁটু দুটোর আর কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত দুটোরও রঙ, যদিও দেখতে মেটে-মেটে বলে মনে হবে, কিন্তু তাঁর কামিজের কলারটা একটু এলিয়ে পড়লেই দেখা যাবে, কী চমৎকার ফরসা একটা গায়ের রঙ খাকি কামিজের আড়ালে ধবধব করছে। কোন সন্দেহ নেই, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটানা মাটি-কাটা ঠিকেদারীর জীবন, যত পাহাড়ী ডাঙার ধুলো, শাল-জঙ্গলের হাওয়া, আর বারো মাসের রোদ-জল-হিম বিজনবাবুর পরিশ্রমের শরীরটার যেটুকু ছুঁতে পেরেছে, সেটুকু মাটি-রঙ করে ছেড়েছে।

তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এ-জায়গাটার কোন নামই ছিল না। পালামৌ জেলা বোর্ডের রাস্তাটা এখানে এসে রাঁচি যাবার সড়কটার সঙ্গে মিশেছে; তাই এখানে সড়কের পাশে শুধু একটা সরাই ছিল, একটা হালুয়াইয়ের দোকান ছিল, আর মহুয়া চোলাই করবার একটা ভাঁটি ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে রেল লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকেদারী নিয়ে বিজনবাবু এখানে এসে সেই সরাইয়ের একটা ঘরে ঠাঁই নিয়েছিলেন। সরাইয়ের পিছনে একটা মহুয়ার নিচে সারা রাত ধরে দুই নেকড়ের মারামারি আর ঝগড়ার শব্দও শুনেছিল সেদিনের যুবক বিজনবিহারী।

কিন্তু, সেজন্য জায়গাটার উপর একটুও রাগ করেনি বিজনবিহারী; কোন ভয় নয়, একটু বিরক্তিও নয়। বরং, ঠিক একটি বছর পরে, সড়ক থেকে একটু দূরে মাঠের উপর কাঁচা-ইটের দেওয়াল-দেওয়া একটি বাড়ি তৈরি করেছিল বিজনবিহারী। তারপর একদিন সেই বাড়িতে ঢুকে আর হেসে হেসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলেছিল নিরুপমা।

চারদিকে জঙ্গল, কাছে ও দূরে ছোট-বড় পাহাড়, সড়ক দিয়ে সারা দিনে একবার

মাত্র জোড়া উটের ডাকগাড়ি যায় আর আসে ; তাও সপ্তাহে তিন-চার দিন বাদ যায়। এহেন এক জগতে বাঙালী বিজনবিহারীর ওই কাঁচা-ইটের বাড়িটাই হল প্রথম গৃহস্থের বাড়ি ; যে-বাড়ির চারদিকে চারটে শিউলির চারাকে বিজনবিহারী নিজের হাতে রোপন করেছিল ; আর বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক যত্নও করেছিল।

নিরুপমা হেসে হেসে বলেছিল—বাংলাদেশের শিউলি, এই পাথুরে মাটিতে বেঁচে থাকতে পারবে কি ?

—খুব পারবে। আমি পারিয়ে ছাড়ব। বাংলাদেশের শিউলি বলে নয়, সেদিনের পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর কাছে সে শিউলির আরও একটা মায়া ছিল। সে-বড় অদ্ভুত মায়া।

কিছুদিন আগে সড়কের মোড়ে উটগাড়িটা চাকা ভেঙে আর বিকল হয়ে অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়েছিল; আর, একজন যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে বিজনবিহারীর সঙ্গে আলাপ করেছিল।—আমার নাম পীতাম্বর। বাড়ি কটক। সাসারামে সিংহবাবুদের বাড়িতে মালীর কাজ করি।

এই পীতাম্বরের সঙ্গের একটা ঝুড়িতে একগাদা চারা গাছ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বিজনবিহারী—ওগুলি কি ?

পীতাম্বর—শিউলির চারা। বাংলাদেশের শিউলি। নেবেন কয়েকটা ?

বিজনবিহারী—না।...আচ্ছা দাও।

নিরুপমাকেও বলতে ভুলে যায়নি বিজনবিহারী—হঠাৎ মনে হল, বাংলাদেশের শিউলি মানে তুমি। তাই নিলাম ! তা না হলে বাংলাদেশী জিনিস আমি ছুঁতামও না।

বিজনবিহারীর নিজের হাতে রোপা সেই শিউলিতে যেদিন ফুল ধরেছিল, সেদিন ভোজপুরী হালুয়াই রামসিংহাসন একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—কওন ফুল বা ?

—শিউলি।

—শিমুলি ?

—নেহি নেহি, শিউলি বোলিয়ে।

—শিউলি ! শিউলি ! রামসিংহাসন বেশ খুশি হয়ে হেসেছিল।

কাঁচা ইটের সেই বাড়ির সামনে একটা কুয়ো কাটিয়েছিল বিজনবিহারী। ডিনা-মাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে কুয়ো কাটা ! বিজনবিহারী সেদিন সেই জংলী নিভৃতের শান্ত বুকটার উপর যেন প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আট ক্রোশ দূর থেকে মুণ্ডা নরনারী আর ছেলে-মেয়ের দল সে দৃশ্য দেখতে এসেছিল, যদিও রাম-সিংহাসন ভয় পেয়ে আর ঝাঁপ নামিয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়ে তিন ক্রোশ দূরের একটা বুড়ো বটের কাছে গিয়ে বসেছিল।

বিজনবিহারীর কুয়োর জলের সুনাম চারদিকে রটে যেতে বোধ হয় এক মাসেরও বেশি সময় লাগেনি। যেমন মিঠা তেমনই ঠাণ্ডা চমৎকার জল। প্রথম সার্ভিস বাসের ড্রাইভার সড়কের মোড়ে বাস থামিয়েই খালাসীকে ডাক দিত—চল জী, শিউলি-

বাড়ির কুয়োর জল খেয়ে আসি।

কেউ চেষ্টা করে নামটাকে তৈরি করেনি ; যেন মানুষের ভাষা নিজেরই খুশিতে মুখর হয়ে বাঙালী বিজনবিহারীর কাঁচা-ইটের বাড়িটাকে শিউলিবাড়ি নাম দিয়ে ফেলেছিল !

ছুটো বছর যেতে না যেতেই বিজনবিহারী দেখেছিল, বাস-সার্ভিসের টিকিটে একটা নতুন জায়গার নাম ছাপা হয়েছে—শিউলিবাড়ি।

তারও তিনটে বছর পরে যখন রেল লাইন হল আর স্টেশনটা তৈরি হল, তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের উপর মস্তবড় কাঠের বোর্ডের উপর ইংরেজীতে স্টেশনের নামটা নতুন রঙে লেখা হয়ে ঝলমল করছে—শিউলিবাড়ি।

এই ইতিহাসটা জেলা গেজেটিয়ারে লেখা নেই, কিন্তু এটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য একটা ইতিহাস। শিউলিবাড়ি নামটা এক মাটি-কাটা ঠিকেদারের, বাঙালী বিজনবিহারীর, আজকের এই মাটি-সাহেবেরই জীবনের একটা ঘটনার দান। তা না হলে, চারিদিকের যত ডিহা-ডিহির মধ্যে একটা জায়গার নাম শিউলিবাড়ি হয়ে যেতে পারত না।

রাতের অন্ধকারে সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন কোন আদিবাসী ওঝা কিংবা মুখিয়ার সঙ্গে মুণ্ডারী ভাষায় গল্প করেন মাটিসাহেব, তখন কারও সন্দেহ করবারও সাধ্যি হয় না যে, বাঙালী বিজনবিহারী রায় কথা বলছেন। শুধু কথা নয়, মুণ্ডারী ভাষায় গানও গাইতে পারেন মাটিসাহেব! এই সেদিনও তাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়কের উপর গাছতলায় দাঁড়িয়ে মুণ্ডারী ভাষায় ছড়া কাটছেন, আর মাটি-কাটা মেয়ে-মজুরের দল হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

আজকের শিউলিবাড়ির চেহারা দেখে কারও কল্পনা করবার সাধ্যি নেই যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে শুধু শাল-জঙ্গলের ছায়ায় ঘেরা নিতান্ত দীনহীন একটা সড়কের মোড়ে ততোধিক দীনহীন তিনটে মাটির ঘর শুধু পড়ে ছিল। নেকড়ের উপদ্রবের জন্য দিনের বেলাতেও কোন গরুর গাড়ি এই পথে একলা যেতে সাহস পেত না। আজকের শিউলিবাড়িতে, স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এসে সর্দার সুচেত সিং-এর সেগুনের আসবাবের প্রকাণ্ড দোকানটা পার হলেই অন্তত চারটে বেশ ভাল চেহারার স্টেশনারি দোকান দেখতে পাওয়া যাবে। আর, তার পাশেই আছে পর পর তিনটে ফলের দোকান। চারদিকের যত কোলিয়ারির মালিক আর ম্যানেজারের গাড়ি, প্রতিদিন অন্তত আট-দশটা গাড়ি এখানেই আসে আর সওদা করে চলে যায়।

তাছাড়া, শিউলিবাড়ির দক্ষিণের গা ঘেঁষে চমৎকার চেহারার যত বাংলো গড়নের বাড়ি দেখা যায়, সেগুলির বেশির ভাগই বাঙালীর বাড়ি। অনেকদিন আগেই শিউলিবাড়ির জল-হাওয়ার সুনাম কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এমনিতেই নয়, এই মাটিসাহেবই রেল-বিভাগের অনেক বড়-বড় বাঙালী অফিসারকে বুঝিয়েছিলেন, আর তাঁদেরই দিয়ে শিউলিবাড়ির স্বাস্থ্যের গৌরব প্রচার করিয়েছিলেন। শীতের সময় এইসব বাড়ির কোনটাই খালি থাকে না। বাড়ির মালিকেরা নিজেরাও সপরিবারে

আসেন ; আবার চার-পাঁচ মাসের ভাড়াটে হয়েও অনেকে আসেন। সে-সময়ে এক-একদিন শিউলিবাড়ির শান্ত কুয়াশাভরা সন্ধ্যার বুকে যেন নতুন দীপালির আনন্দ মুখর হয়ে হেসে ওঠে। ছোট ছোট ছেলেরা একলব্য অভিনয় করে। আর, ত্রৈলোক্য অপেরা এসে সুভদ্রাহরণ গেয়ে চলে যায়।

হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে বাঙালীরা যাঁরা আসেন, শুধু তাঁরা নন, বদলি হয়ে স্টেশনের নতুন স্টাফ হয়ে বাঙালী কর্মচারী যাঁরা আসেন, তাঁরাও দেখে আশ্চর্য হয়ে থাকেন, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ কিনতে পাওয়া যায়। সে কইয়ের স্বাস্থ্যের তুলনায় যশোরের কইও রোগাটে। দামও অন্তত কলকাতার বাজারের চেয়ে কম গলা-কাটা। শিউলিবাড়ির চারদিকে ঝুমরা রাজ এস্টেটের যত ঝিল আছে, তার প্রায় সবগুলিই কইমাছে ভরে গিয়েছে।

আরও নানা বিস্ময়ের চেহারা শিউলিবাড়ির এই ছোট্ট বাজারেই দেখতে পাওয়া যাবে। হালুয়াই রামসিংহাসনের দোকানে সরপুরিয়া আর ক্ষীরমোহন পাওয়া যাবে। আদিবাসী মেয়েরাও ঝুড়ি-ভর্তি মুড়ির মোয়া নিয়ে বাজারের ভিতরে এক সারিতে বসে আছে। রাঁচির পাইকারের লোকজন চাঁপা কলার কাঁদি কেনবার জন্য এই শিউলিবাড়ির বাজারে এসে ভিড় করেছে; দশ বছর আগে ওরা শেওড়াফুলিতে যেত।

তিন দিকে পাহাড় আর প্রায় চারদিকেই জঙ্গল—বাংলাদেশ থেকে এত দূরের একটা নিরালার বুকের যত কাঁকর আর পাথরের উপর কে যেন আলাদীনের প্রদীপের সেই অদ্ভুতকর্মা দাস-দানবটির মত শক্তিধর হয়ে বাংলাদেশের মাটির যত সাধ তুলে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অনেকেই জানেন, এই সবই মাটিসাহেব বিজনবাবুর পঁয়ত্রিশ বছরের একটা একরোখা চেষ্টার কীর্তি। অনেকে শুনেছেন, ভদ্রলোক এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও এই শিউলিবাড়ি ছেড়ে থাকেননি। হালুয়াই রামসিংহাসনও ভেবে পায় না, মাটিসাহেব কেন এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও নিজের দেশে গেল না?

ফিকে সবুজ রঙের চেহারার যে শৌখিন বাড়িটার দরজায় বাঘছালের পর্দা ঝুলছে, সেই বাড়ির মালিক মিস্টার দস্তিদার একদিন মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায়কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আর বেশ খুশি হয়ে গল্প করেছিলেন।—আপনাকে দেখলেই আমার স্যার সেসিল রোডসের জীবনের যত ঘটনার গল্প মনে পড়ে যায়। জঙ্গলের যত জংলীপনাকে মেরে-কেটে সরিয়ে আপনিও যে একটা উপনিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন মশাই। শিউলিবাড়ি যে সত্যিই আপনার রোডেসিয়া। আপনি সত্যিই একজন ফার্স্টক্লাশ অ্যাডভেঞ্চারার।

মাটিসাহেব যেন লজ্জিত হয়ে আর মাথা হেঁট করে হেসেছিলেন। কোন কথা বলতে পারেননি।

মিস্টার দস্তিদার—শুনেছি, জ্গলা পাহাড়ের উত্তরের ওই জঙ্গলের ভেতরে বজবলা নদীর প্রপাতটা আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

মাটিসাহেব তাঁর পিঠের বন্দুকটাকে একবার কাঁধ ছুলিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিনীতভাবে হেসেছিলেন—আমিই ওই সাংঘাতিক ঝর্নাটাকে একদিন খুঁজে বের করেছিলাম। তাছাড়া, আপনাদের ওই দামোদরের উৎসটাকেও…

মিস্টার দস্তিদারের চোখ দুটো আরও খুশি হয়ে চমকে ওঠে—সেটাও কি আপনি খুঁজে বের করেছেন ?

মাটিসাহেবের চোখ দুটো ঝিকঝিক করে।—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন দিন ধরে একাই হেঁটে হেঁটে, আর শুধু পাকা বটফল খেয়ে…। বলতে বলতে যেন আরও লজ্জিত হয়ে, শেষে নীরব হয়ে যান মাটিসাহেব।

মিস্টার দস্তিদার কিন্তু ছাড়েন না।—বলুন বলুন, থামলেন কেন ?

মাটিসাহেব—সে জায়গাটার নাম হল চুল্‌হাপানি। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় ছোট্ট চুলোর মত একটা গর্তের উপর টুপ্‌টুপ্‌ করে একটা চোরা ঝর্নার জল ফাটা পাথরের ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে। এই তো…আপনার ওই মহাদেব ঢোড়া, বোদা পাহাড় আর ধওরা পাহাড় পার হয়ে, ল্যাটারাইটের খাদান ছাড়িয়ে যে পাহাড়টা, সেটারই প্রায় মাথার কাছে একটা বুড়ো পাকুড়ের পায়ের তলায় উৎসটা গুব্‌গুব্‌ করছে। ওদিকের দামোদরটার আমি একটা নামও দিয়েছিলাম স্যার।

—কি বললেন ?

—হ্যাঁ স্যার, আমি নাম দিয়েছিলাম দেবনদ। ওদিকের গাঁয়ের লোক আজও কিন্তু ওই নাম বলে থাকে স্যার, দামোদর বললে ওরা বুঝতে পারে না।

—খুব করেছেন! অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন! হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন মিস্টার দস্তিদার।

মাটিসাহেব—ডেপুটি কমিশনার হার্বার্ট সাহেব কিন্তু শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

—কি বললেন ?

—দামোদরের উৎসের খবরটা আর জায়গাটার একটা ম্যাপ এঁকে আমি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু চেয়ারম্যানের ভাইপো রঘুবাবু আমাকে এসে বললেন, সাবধান, দামোদরের উৎস ওই চুল্‌হাপানি চুল্‌হামে যায় ; আপনি এসব ব্যাপার নিয়ে কথ্‌খনো লেখালিখি করবেন না।

মিস্টার দস্তিদার আশ্চর্য হন—কেন ? এরকম ভয় দেখাবার মানে কি ?

মাটিসাহেব হাসেন—হার্বার্ট সাহেব চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিলেন, আমার ঠিক পনের দিন আগে তিনিই দামোদরের উৎসটা আবিষ্কার করেছিলেন।

মিস্টার দস্তিদারও হেসে ফেলেন।

আর-একবার, সে বছর এখানে হাওয়া বদলাতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন প্রফেসর বিনোদ দত্ত। তিনিও একদিন আশ্চর্য হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত বললেন—আপনাকে দেখলে আমার সত্যিই সেই পিলগ্রিম

ফাদারদের কথা মনে পড়ে। দুঃসাহসে আপনিও কম যান না মশাই। তাছাড়া, এ-তো আর অ্যাডভেঞ্চারারদের মত শুধু কাটাকাটি করবার দুঃসাহস নয়। আপনি সেই পিলগ্রিম ফাদারদেরই মত জঙ্গল সরিয়ে সেখানে দেশের যত ফুল ফুটিয়েছেন, ফল ফলিয়েছেন। আপনাকে হাজার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে মশাই।

মাটিসাহেব তাঁর সেই অদ্ভুত নম্রতার ভঙ্গিতে, লজ্জিত হয়ে আর মৃদুভাবে হেসে, মাথা হেঁট করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে বলেন, আপনি নাকি জঙ্গলের গাঁয়ে বাংলা ভাষা-টা যাও চালাতে চেষ্টা করেছেন।

—ভাষা নয় স্যার, একটা গান চালিয়েছিলাম।

—কিসের গান?

—বাংলা গান।

—কি গান?

—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল।

—বলেন কি? এ-গান এখানে চলেছে?

—হ্যাঁ স্যার। রাতু চিলোয়া আর মুরি পাহাড়ের মুণ্ডাদের আর ওরাওঁদের ছেলে-মেয়েরাও এ-গান গাইতে পারে।

প্রফেসর বিনোদ দত্ত যেন মুগ্ধ হয়ে মাটিসাহেব বিজনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।—আপনি একটা অলৌকিক কাণ্ড সম্ভব করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে, হাজার ধন্যবাদ।

কিন্তু আজ এই সাত দিন হল কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে এসেছেন যিনি, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার করালীবাবু, তিনি আজ মাটিসাহেব বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই নাক কাঁপিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছেন।

মাটিসাহেব বিজনবাবু কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ সেই লজ্জিত হাসিটাকেই আরও নরম করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি নতুন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে স্যার?

করালীবাবু—হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি, আর আপনার নামও শুনেছি। কিন্তু চিনতেও পেরেছি।

মাটিসাহেব—আজ্ঞে?

করালীবাবু হাসেন—আপনি তো একজন মিউটিনিয়ার।

মাটিসাহেব—আজ্ঞে?

করালীবাবু—বুঝলেন না?

মাটিসাহেব—আজ্ঞে না।

করালীবাবু—মিউটিনি···অর্থাৎ মস্ত একটা বিদ্রোহের কাণ্ড করেছেন, আর সেই জন্যে ইচ্ছে করে এখানে এসে একটা বনবাস খুঁজে নিয়েছেন। নয় কি?

মাটিসাহেবের লাজুক হাসির মুখটা সেই মুহূর্তে শোকার্তের মুখের মত করুণ বিষাদে ভরে যায়।

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাই-কেলের ঘন্টি বাজিয়েছেন যিনি, সেই মাটিসাহেব বিজনবিহারী রায় আজ সন্ধ্যা হতে ঘরে ফিরেও দরজার সামনে যেন হতভম্বের মত থমকে দাঁড়িয়েছেন, ঘন্টি বাজাতেই ভুলে গিয়েছেন। ঘন্টি বাজাবার শক্তিটাও যেন হঠাৎ অলস হয়ে হাতটাকে অলস করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে ডাকেন মাটিসাহেব—আমি এসেছি নিরু।

পেঁপেবাগানের ওদিকে নিজের ঘরের দাওয়ার উপর বসে বুড়ো রামসিংহাসনও শুনে আশ্চর্য হয়; এ কী রকমের উদাসীর মত ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে, যেন ক্লান্ত শ্রান্ত হতাশ মানুষের মত কুণ্ঠিতভাবে ডাক দিচ্ছেন মাটিসাহেব? মাটিসাহেব আজ কি একটা জ্বর-জ্বালা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন? এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে মাটিসাহেবকে একদিনের জন্যেও তো কোন অসুখে ভুগতে দেখেনি রামসিংহাসন।

লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এগিয়ে এসেই চমকে ওঠেন নিরুপমা। এ কি? চির-কেলে দুঃসাহসের মানুষটার মুখের উপর আজ এ কোন হতাশ সন্ধ্যার অন্ধকার থমথম করছে? সেই যে পঁচিশ বছর আগে এক মাঝরাতে থানার লোক বাঁশের ডুলিতে বয়ে নিয়ে বিজনবিহারীকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, তখনও তো বিজনবিহারীর মুখে একফোঁটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পাননি নিরুপমা। ভালুকটার ভয়ানক থাবার নখ বিজনবিহারীর পিঠটাকে তিন জায়গায় আঁচড়ে দিয়ে মাংস উপড়ে নিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত যন্ত্রণার মধ্যেও নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে পেরেছিল যে বিজনবিহারী, সে আজ এত বিষণ্ণ আর এত গম্ভীর কেন?

চেঁচিয়ে ওঠেন নিরুপমা—কি হল? ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন?

ছুটে আসে সুনন্দা—একি বাবা? কি হয়েছে? অসুখ করল নাকি?

বিজনবিহারী হাসতে চেষ্টা করেন—না, কিছু না।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু ক্লান্তভাবে বিড় বিড় করেন বিজনবিহারী—একটু একলা হয়ে কিছুক্ষণ বারান্দার উপর বসি। খাবার-টাবার একটু পরে দিস নন্দু, লণ্ঠনটাকে সরিয়ে নিয়ে যা।

॥ দুই ॥

একলা হয়ে বসে থাকলেই তো সব কথা মনে পড়ে যায়। আজ যেন ইচ্ছে করেই সে-সব কথা মনে করবার জন্যে একটু একলা হয়ে বসে থাকতে চেয়েছেন বিজনবিহারী।

মাকে একটুও মনে পড়ে না। কিন্তু বাবাকে খুবই ভাল করে মনে পড়ে। পনের বছর বয়সের ধাড়ি ছেলে হয়েও যে-ছেলে বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে লৌহভীমচূর্ণ খেলেছে, সে কি করে বাবার মুখের সেই আহ্লাদের হাসির ছবিটা ভুলে যেতে পারবে, সে-ছেলে যদিও আজ ষাট বছর বয়সের এক মাটিসাহেব?

বাবা শুধু যে নায়েবী করেই জীবন কাটিয়েছিলেন তা নয়; এককালে খুব ভাল কুস্তি লড়তেন। বাবার মাথাটা তাই সাদা হয়ে গেলেও বুকটা টান ছিল, আর হাত

দুটোর মাসল্‌ও কত মজবুত ছিল। প্রাণপণ জোরে বাবার হাতের গুলি টিপেও সেই শক্ত মাংসপেশীর গর্ব একটুও খর্ব করা যেত না, বিজন নিজেই হাঁপিয়ে পড়ত। বাবা হাসতেন—বৃথা চেষ্টা বিজু, তোর সাধ্যি নেই। জিমন্যাস্টিকের মাস্টার তোর ওই মেজমামাও যে হার মেনে যায়।

মামাদের বাড়িটাও কেষ্টনগর থেকে বেশি দূরে নয়। দিগ্‌নগর যেতে পথের উপরেই নোনা আতার আর কামরাঙার বাগান দিয়ে ঘেরা সেই মামাবাড়িতে যখন-তখন চলে যেতে আর থেকে আসতে কোন বাধা নেই। বাবাই বলেন—যা বিজু, লক্ষ্মীপুজোর দিনটা মামাবাড়িতে গিয়ে পেট ভরে নারকেল নাড়ু খেয়ে চলে আয়।

বিজুরও আপত্তি নেই। মামাবাড়িটা এত কাছে যে, এক দৌড়ে পৌঁছে গিয়েও হাঁপাতে হয় না। দেরিও করে না বিজু, লক্ষ্মীপুজোর আগের দিনেই বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে, আর ব্যস্তভাবে দুটো মুড়ি চিবিয়ে নিয়েই মামাবাড়ির দিকে দৌড় দেয়। আর, শুধু নারকেলের নাড়ু নয়, কাঁচা-পাকা কামরাঙাও পেট ভরে খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনে বাড়ি ফিরে আসে।

বাবা বলেন—দৌড়ে গিয়েছিলি, না হেঁটে হেঁটে?

বিজু—একদমে দৌড়ে গিয়েছিলাম।

বাবা—বহুৎ আচ্ছা। পেট ভরে কামরাঙা খেয়েছিস তো?

বিজু—খেয়েছি বাবা।

বাবা—বহুৎ আচ্ছা। হ্যাঁ···পরীক্ষাটা পার হয়ে যাক, তারপর দেখব, সাঁতার দিয়ে জলঙ্গী পার হতে তোর ক'মিনিট লাগে?

মেজমামা বড় কড়া মেজাজের মানুষ। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিজুকে গাছ উজাড় করে কামরাঙা খেতে দেখেও কিছু বলেননি, যদিও চোখ পাকিয়ে অনেকক্ষণ বিজুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সন্দেহ হয় বিজুর, মেজমামা বোধ হয় বাবার দু'হাতের মাস্‌ল্‌-এর চেহারাটা স্মরণ করে বিজুকে কোন কড়া কথা বলেন না। সন্দেহ কেন, মাঝে মাঝে বেশ বুঝতেও পারে বিজু, বাবাকে বেশ ভয় করেন মামারা। বিজুকে আদর করে দুটো কথা বলতে যেন বুক ফেটে যায় মামাদের; কিন্তু অনাদর করবারও সাহস পান না। মেজমামা একদিন অবশ্য বেশ সাহস করে আর রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এটাকে বারান্দায় আসন পেতে খাবার জায়গা করে দাও ছোট বউমা।

বিজুও চেঁচিয়ে ওঠে।—বারান্দায় কেন?

মেজমামা—হ্যাঁ।

বিজু—না, আমি রান্নাঘরের ভেতরেই বসে খাব।

তখুনি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিজু—আমাকে শিগগির ভাত দাও ছোটমামী।

এত কড়া রকমের রাগ করেও মেজমামার চড়া মেজাজ যেন ফস্‌ করে দমে গেল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, পনের বছরের ঢেঁকি হয়েও যে আদুরে ছেলে এখনও বাপের সঙ্গে এক থালায় ভাত খায়, সে ছেলেকে একেবারে ঘরের বাইরে একটা

বারান্দায় পাত পেড়ে ভাত খাওয়াবার সাহসটা ভাল সাহস নয়।

বড়দা আর মেজদার মেজাজ অনেকটা মামাদেরই মেজাজের মত। বড়দা থাকেন জলপাইগুড়িতে, আর মেজদা ডিব্রুগড়ে। দুজনেই সরকারী চাকরি করেন। বড়দা ডাক্তার, মেজদা অ্যাকাউন্টেন্ট। পুজোর ছুটিতে বড়দা আর মেজদা বাড়িতে এসে যে-কটা দিন থাকেন, সে-কটা দিন বিজুর মুখের দিকে দুজনেই যেন যখন-তখন গম্ভীর-ভাবে তাকান। দশমীর সন্ধ্যাতে বিজু যখন হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বড়দা আর মেজদাকে প্রণাম করে, তখনও কেমন যেন কাঠ-কাঠ একটা চেহারা ধরে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন দুই দাদা, একটা কথাও বলেন না। বিজুর মাথায় একবার হাতটাও রাখেন না।

ছোড়দা কিন্তু একেবারে উল্টো মেজাজের মানুষ। ছোড়দা অনেকবার ফেল করে এখনও বি-এ পড়ছেন, দিন-রাত পড়তে আর লিখতেই ভালবাসেন ছোড়দা। আর ভালবাসেন বিজুর সঙ্গে গল্প করতে। বিজুর জামা কবে ছিঁড়ে গেল, আর, দুটো নতুন প্যান্ট না হলে যে চলে না—এসব খবর ছোড়দাই রাখেন। ছোড়দা নিজেই বিজুকে সঙ্গে নিয়ে কাপড় কিনতে যান, দরজির দোকানে গিয়ে জামার ছাঁটের রকম-সকম দরজিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

প্রতি রবিবার ছোড়দা নিজের হাতে বিজুর গায়ে সাবান ঘষে ঘষে যেন বিজুর সাত দিনের মাটিমাখা দুরন্তপনার সব ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। বাড়ির ঠাকুরও হাসতে থাকে। এরকম একটা ধাড়ি বয়সের ভাইকে এত যত্ন করতে কোনও বাড়ির কোন দাদাকে দেখেনি ঠাকুর।

ছোড়দার সঙ্গে এক বিছানায় না শুতে পেলে বিজুরও ঘুম হয় না। যদি কোন দিন বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হয়েছে, বিজুর আত্মাটাই যেন হাই তুলে আর এপাশ-ওপাশ করে বিনা ঘুমে ছটফট করেছে। বাবা বলেন—যা, কমলের কাছে গিয়ে শুয়ে থাক্। কমলের গায়ের গন্ধ ছাড়া তোর ঘুম হবে না।

এক লাফে বাবার বিছানা ছেড়ে দিয়ে ছোড়দার বিছানায় উঠে, আর ছোড়দার পিঠের কাছে মুখটা গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ে বিজু। আঃ, সত্যিই কি চমৎকার আরামের ঘুম। চোখের পাতা জড়িয়ে ধরছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিকও ফুটে উঠছে, আর ঝড়ো বাতাসের শব্দটাও বেশ শনশনে। একটু শীত-শীতও করছে।

ছোড়দার প্রাণটাও যেন থার্মোমিটারের মত একটা যন্ত্র। চট্ করে বুঝে নিতে পারে, বিজুর গায়ের তাপ বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তা না হলে, তখুনি ধড়ফড় করে জেগে উঠে আর পায়ের কাছে রাখা চাদরটাকে টেনে বিজুর গায়ে জড়িয়ে দেবেন কেন?

বড়দি আছেন এলাহাবাদে। বড় জামাইবাবু নাকি মস্ত নামজাদা উকিল। কিন্তু বড়দিকে আজও চোখে দেখেনি বিজু। ছোড়দা বলেন, অনেকদিন আগে, তুই যখন খুব ছোট্ট, তখন বড়দি একদিনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এক রাত্রিও থাকেননি।

—কেন ছোড়দা ?

—বড় জামাইবাবু বড়দিকে থাকতে দেননি। বড়দি খুব কেঁদেছিলেন।

—কেন ছোড়দা ?

—বাবার উপর বড় জামাইবাবুর খুব রাগ ছিল।

বিজু বলে—আমি তখন যদি একটু বড় থাকতাম, তবে বড় জামাইবাবুকে বুঝিয়ে দিতাম।

ছোড়দা বলেন—চুপ কর।

বিজু বলে—বড়দা আর মেজদাও নাকি বাবার উপর রাগ করে বিয়ে করলেন না।

ছোড়দা—জানি না।

বিজু—তুমি নিশ্চয় বিয়ে করবে, ছোড়দা ?

ছোড়দা—নিশ্চয়।

মেজদির শ্বশুরবাড়িটা কিন্তু মন্দ নয়। কথা ছিল, এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার পর বিজু গিয়ে মেজদির বাড়িতে তিনটে মাস থেকে আসবে। কিন্তু ওপরের ক্লাসেই উঠতে পারা গেল না। এনট্রান্স পরীক্ষাটা কপালে আছে কিনা, তাও ভগবান জানেন। এত অপেক্ষা সহ্য হয় না। বিজু তাই এই এক বছরের মধ্যে তিনবার মেজদির শ্বশুরবাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে।

মামাবাড়ির মত মেজদির শ্বশুরবাড়িটা অবশ্য কেষ্টনগরের এত কাছে নয়, আবার বড়দির শ্বশুরবাড়ির মত অত দূরেও নয়। মানকর ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটা দিলেই মাণিকপুরের বাবুদের একটা কাছারিবাড়িতে পৌঁছনো যায়। জায়গাটার নাম শিব-পুকুর। সরকারমশাই বটুকবাবুও বেশ ভাল লোক। কিছুই বলতে কইতে হয় না, বটুকবাবু নিজেই একটা গো-গাড়ি ডেকে আনেন, আর, বিজু সেই গো-গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে, ঝিমোতে ঝিমোতে আর ঘুমোতে ঘুমোতে আট ক্রোশ দূরের মাণিকপুরে পৌঁছে যায়।

মেজ জামাইবাবু খুব বড় জমিদার। মেজদিদের বাড়িটাও বিরাট। ছাদটা এত বড় যে, ফুটবল খেলতে পারা যায়। কিন্তু খেলবার উপায় নেই। হাজার হাজার কবুতরের ভিড়ে ছাদটা সব সময় ছেয়ে আছে, আর তাদের কী অদ্ভুত বকম্-বকম আওয়াজের ঝড় !

মেজদি সাবধান করে দেন—ছাদে যাসনি বিজু। মাণিকপুরের পায়রা ভয়ানক হিংসুটে, নাক-চোখ ঠুকরে দেবে।

—ইস্, সাধ্যি কী ? ছোলাখেকো কবুতর আমাকে ঠুকরোবে ?

সিঁড়ি ধরে এক দৌড়ে ছাদে উঠে আর একটা বাখারি তুলিয়ে সারাটা বেলা কবুতরগুলিকে উত্যক্ত করে, ভয় দেখিয়ে, অতিষ্ঠ করে আর উড়িয়ে উড়িয়ে ক্লান্ত করে তোলে বিজু, তবু নিজে একটুও ক্লান্ত হয় না।

মেজদি বিজুর চেয়ে দশ বছরের আর ছোড়দার চেয়ে দু'বছরের বড়। প্রায় দশ বছর হল, মেজদির বিয়ে হয়েছে ; কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে মনে মনে দেখতে পায়

বিজু, ঘুমভরা চোখে চাঁদের দিকে তাকালে যে-রকমের ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে, যেন সেই রকমের একটা ছবি। মেজদির যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, তার পরের দিন ঝকঝকে বেনারসী শাড়িতে সেজে, টায়রাপরা কপালের উপর ঘোমটাটি টেনে দিয়ে আর হেসে হেসে শ্বশুরবাড়ি রওনা হবার জন্য মেজদি গাড়িটার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই কি-ভয়ানক ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। বিজুর গলা জড়িয়ে ধরে পুরো পাঁচটা মিনিট এক ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজদি। বিজুও মেজদির শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল।

কে জানে কেন, মেজদির সেই কান্না, আর বিজুর গলা জড়িয়ে-ধরা মায়ার কাণ্ডটা দেখেও মেজ জামাইবাবু যেন ঠোঁট চেপে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছিলেন। মেজমামা তো চোখ পাকিয়েই রেখেছিলেন। শুধু বাবা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মেজদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আর বিজুর একটা হাত ধরে বললেন—মেজদিকে যেতে দাও বিজু; তুমি আমার কাছে এস।

মাণিকপুরে মেজদির বাড়িতে যতবার এসেছে বিজু, ততবার বিজুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন মেজ জামাইবাবু—দেখে যাও রমা, তোমার অদ্ভুত ভাইটি এসেছে।

মেজ জামাইবাবুর এই চেঁচানো খুশির ভাষাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না বিজুর। একদিন মেজদিকেই আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসে—মেজ জামাইবাবু আমাকে তোমার অদ্ভুত ভাই বলেন কেন? কথাটার মানে কি?

মেজদির মুখটা হঠাৎ যেন করুণ হয়ে যায়।—ওটা একটা কথার কথা।

—বাংলাতে ফেল করলেও আমি বাংলা ভাষা একটু বুঝি মেজদি। অদ্ভুত মানে তো কুৎসিত।

মেজদি হেসে ফেলেন—তোমাকে কুৎসিত বলে মনে করবে, কার মনের এত সাধ্যি আছে? খুঁজে বের করুক দেখি তোমার জামাইবাবু, সারা মাণিকপুরে এরকম ফরসা রঙটি, এরকম টানা-টানা চোখ দুটি, এরকম ঢলঢলে সুন্দর মুখটি কোন্ ছেলের আছে?

বিজুও হেসে ফেলে—তবে ওকথা বলেন কেন জামাইবাবু?

—সেই জন্যেই বলেন। অদ্ভুত ভাইটি মানে সুন্দর ভাইটি!

॥ তিন ॥

মাণিকপুরে মেজদির বাড়িতে এই এক বছরের মধ্যে তিনবার বেড়াতে গিয়ে মাঝপথের আর-একটা বাড়িকেও খুব ভাল লেগে গিয়েছে। শিবপুকুরের সেই কাছারিবাড়ির সরকারমশাই বটুকবাবুর বাড়িটা।

সত্যিই একটা পুরনো শিবমন্দির আছে, আর সেই শিবমন্দিরের সামনে একটা পুকুরও আছে। পুরনো মন্দিরটার এক দিকে কাছারিবাড়ি, আর অন্য দিকে সরকারমশাই বটুকবাবুর বাড়ি।

নিতান্ত একটা মাটির বাড়ি। চালাটা টিনের। প্রথম যেবার মাণিকপুর যাবার সময় মানকর স্টেশন থেকে হাঁটা দিয়ে এই কাছারিবাড়িতে এসে উঠেছিল বিজু, সেবারই বটুকবাবুর বাড়ি থেকে এসে বিজুকে প্রথম অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যে, সে হল বটুকবাবুর মেয়ে, নাম কাজলী, বয়সটা দশ বছরের বেশি হবে না।

কাজলীর মা বেশ যত্ন করে বিজুকে কদমা ক্ষীর আর মুড়ি খাইয়েছিলেন। জলের গেলাসটা কাজলীই নিয়ে এসে বিজুর হাতে তুলে দিয়েছিল।

যতক্ষণ গো-গাড়ি আসেনি ততক্ষণ কাজলীর সঙ্গেই গল্প করেছিল বিজু।

বিজু বলে—কাজলী আবার কেমন নাম? কাজলী তো এক রকমের ধানের নাম। শুনতে একটুও ভাল লাগে না।

কাজলী বলে—ভাল না লাগে তো বলো না। আমার নাম ডাকতে তোমাকে বলছে কে?

এর পরেও তো আরও পাঁচবার শিবপুকুরের কাছারিবাড়িতে আসতে হয়েছে বিজুকে। মাণিকপুরে যাবার সময় দুবার, আর ফেরবার সময় তিনবার। দ্বিতীয়বার, তার মানে সেই প্রথমবারই মাণিকপুর থেকে ফেরবার পথে গো-গাড়িটা কাছারি-বাড়ির কাছে এসে পৌছতেই কাজলী ছুটে এসে বলে—আজ কিন্তু ভাত খেতে হবে।

—নিশ্চয় খাব। বিজুও গো-গাড়ি থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়েই হেসে ওঠে।

কাজলী বলে—কিন্তু রান্না শেষ হতে একটু দেরি হবে।

—হোক না। ভালই তো।

কাজলীদের বাড়ির সবই ভাল, বিজুর প্রাণটা যেন এরই মধ্যে টের পেয়ে গিয়েছে। কাজলীর বাবা আর মা, কাজলীদের বাড়ির কদমা ক্ষীর আর মুড়ি, সবই ভাল।

উঠোনের বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজু—এ বেলগুলো পাকে না?

কাজলী হাসে—পাকে বইকি! বোশেখ মাস পড়লেই পাকবে।

—এটা কি মাস?

—এটা তো ফাগুন।

চুপ করে কি-যেন ভাবে বিজু। কিন্তু কাজলীই যেন বিজুর সেই ভাবনাটাকে চমকে দেয়।—বোশেখ মাসে আসবে তো আবার?

—কি বললে?

—বোশেখ মাসে এলে কিন্তু পাকা বেল খেতে পাবে।

—আসব।

বোশেখ মাস আসতে দেরি করেনি। বিজুও মাণিকপুরে মেজদির বাড়িতে আর-একবার বেড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেরি করেনি।

কাজলীও দেখা হওয়া মাত্র বিজুকে বলে দিতে দেরি করেনি—অনেক বেল

পেকেছে।

—ছিঃ, সত্যিই কি পাকা বেল খাবার লোভে আমি এসেছি?

—তবে কেন এসেছ?

—এসেছি তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করতে।

—দেখা কর তাহলে।

—করবই তো। কিন্তু সেজন্য তুমি ছটফট করছ কেন? আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন দেখা করব।

—তবে এখন কি করবে?

—চল, তোমাদের হাঁসের ঘর আগে দেখে আসি।

শুধু হাঁসের ঘর দেখে নয়, কাজলীর সঙ্গে গল্প করে করে আর বেড়িয়ে আরও অনেক বিস্ময়ের জিনিস দেখে নেয় বিজু। মন্দিরের পিছনে একটা পুরনো চাঁপা গাছ আছে, একশো বছর বয়স। ওটার নাম গৌরীচাঁপা।

বিজু বলে—আশ্চর্য! মহাদেবের বউ গৌরী এই গাছটাকে পুঁতেছিল নাকি?

—কে জানে?

কুমোরের চাক ঘুরছে, আর নরম মাটির তাল চেপে ধরে দু-হাতের কায়দায় হাড়ি সরা আর কুঁজো গড়ছে কুমোরেরা, কাজলীর সঙ্গে কুমোর-পাড়াতে গিয়ে এই দৃশ্যও দেখে আসে বিজু।

কাজলী বলে—দেখলে তো! আর কখনও দেখেছ?

বিজু হাসে—কেষ্টনগরের ছেলেকে মাটির কারিগরীর গর্ব দেখাচ্ছ তুমি? মনে করেছ, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি? আমাদের কেষ্টনগরের কুমোরদের কাছে তোমাদের এই শিবপুকুরের কুমোরেরা যে আঁতুড়ে-শিশু।

মেজদি বলেছেন—অ্যান্যুয়াল পরীক্ষাটা এগিয়ে এসেছে, কাজেই এখন আর এত ঘন ঘন এখানে বেড়াতে আসিস না বিজু। মন দিয়ে পড়াশোনা কর্, পরীক্ষাটা দিয়ে নে, তারপর আবার আসিস।

ছোড়দাও বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে—বিজুকে আপনি যখন-তখন মাণিকপুরে যেতে দিচ্ছেন কেন? তিন মাসের মধ্যে দু-বার তো গেল। আবার যাব-যাব করছে।

বাবা বলেন—যাক না।

ছোড়দা—তা ছাড়া, এভাবে একা-একা ট্রেনে চেপে ছুটোছুটি করাও এই বয়সের ছেলের পক্ষে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পথে বিপদ-আপদ তো লেগেই আছে।

বাবা বলেন—এখন থেকেই ট্রেনিং নিক। একটু বিপদে-আপদে পড়তে অভ্যেস করুক।

ছোড়দা জানেন, বাবাকে আর বেশি বুঝিয়ে বললেও কোন লাভ হবে না। তিনি বুঝবেনই না। বাবা এই সেদিনও, বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরে পার হবার জন্য বিজুকে যে-ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, দেখে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন ছোড়দা। ভাগ্যি ভাল,

বাবা আর জেদ করেননি। বিজুও বোধ হয় মাণিকপুরে যাবার ব্যাকুলতায় বর্ষার জলঙ্গী সাঁতরাবার লোভটাকেও আপাতত ভুলে বসে আছে।

কিন্তু উপায় নেই, বিজুকে বলেও কোন লাভ হল না। আবার মাণিকপুরে চলে গেল বিজু। এবার ঘুড়ি-নাটাইও সঙ্গে নিয়ে গেল। বাবা নিজেই হেসে চেঁচিয়ে বিজুকে উপদেশ দিলেন—মাণিকপুরের সব ঘুড়ি এক এক গোঁত্তায় বো-কাট্টা করে ফিরে আসা চাই।

আবার শিবপুকুর। আবার কাজলী।

ঘুড়ি-নাটাই দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে কাজলী—ছিঃ, একেবারে ছেলে-মানুষের মত কাণ্ড!

—কি বললে?

—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারব না।

—ঘুরতে হবে।

—না। তুমি ঘুড়ি উড়োবে, তোমার সঙ্গে থেকে আমার লাভ কি?

—আমার তো লাভ আছে।

—ছাই লাভ।

—সত্যি বলছি, তুমি সঙ্গে থাকলে খুব ভাল লাগে।

—কেন?

—তুমি তো তোমার মার চেয়েও সুন্দর।

কাজলী ভ্রূকুটি করে তাকায়।—মাকে বলে দেব?

—যাও, এখনি গিয়ে বলে দাও। আচ্ছা, আমিই গিয়ে বলে দিচ্ছি। কেষ্ট-নগরের ছেলেকে তুমি ভয় দেখাতে এসেছ?

—আচ্ছা, আর বলব না।

—কি বলবে না?

—কারও কাছে কোন কথা বলব না।

—বাস্, তবে চুপটি করে এস আমার সঙ্গে।

—না।

—কেন?

—ভাল লাগছে না।

—তবে আমারও তোমাকে ভাল লাগছে না। ঘরে যাও তুমি।

বিজু একাই ঘুড়ি-নাটাই নিয়ে চলে যেতে থাকে। কাজলী বলে—রাগ করে চলে যাচ্ছ, কিন্তু মনে থাকে যেন…।

—কি মনে থাকবে?

—আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

বিজুর হুঙ্কার শোনবার অপেক্ষায় আর দাঁড়িয়ে থাকে না কাজলী। দৌড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়।

আর, বিজু চলে যায় ধানক্ষেতের দিকে। আলের উপর দাঁড়িয়ে ফুরফুরে হাওয়াতে ঘুড়ি ভাসিয়ে দিয়ে আর নাটাই দুলিয়ে সুতো ছাড়তে থাকে।

কিন্তু, বোধ হয় আধঘণ্টাও পার হয়নি, নাটাই গুটিয়ে নিয়ে, আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে, কাজলীদের বাড়ির কাছে এসে, কাটা তালগাছটার ধড়ের উপর চুপ করে বসে থাকে বিজু।

ছুটে আসে কাজলী—কি হল ?

—একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে গিয়েছিল। পা'টা বেশ মচকে গিয়েছে।

—খুব ব্যথা করছে ?

—সে আর বলতে ?

—তাহলে ? কি করব বল ?

—একটু বাটা হলুদ গরম করে আর একটু চুন নিয়ে চলে এস। কিন্তু খুব সাবধান, মাসীমা যেন টের না পান।

—মা টের পেলেই তো ভাল। তাড়াতাড়ি চুন-হলুদ গরম করে··· ।

—না, কখখনো না। মাসীমা তাহলে আমাকে খুব অপছন্দ করে ফেলবেন।

কাজলীও সত্যিই চুপি চুপি একটা সরাতে গরম চুন-হলুদ নিয়ে ফিরে আসে ! পায়ের পাতার উপর আর গিঁটের চারদিকে চুন-হলুদ লাগিয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে কাজলীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই বিজুর পনের বছর বয়সের দুরন্ত চোখ দুটো যেন চমকে ওঠে। জীবনে এই যেন প্রথম একটা বিস্ময়কে দু'চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছে বিজু। কাজলীর চোখ দুটো ছলছল করছে।

—কি হল ?

—বলেছিলাম না, আমি ছাড়া তোমার কোন গতি নেই। কে চুন-হলুদ এনে দিল ?

গল্পটা মেজদিকে না শুনিয়ে থাকতে পারে না বিজু। কদমা আর ক্ষীর থেকে শুরু করে হাঁসের ঘর, বোশেখী বেল আর গৌরীচাঁপা পর্যন্ত গল্পের সব কথা শুনে নিয়ে মেজদি বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন—কি বলেছে কাজলী ?

—কাজলী বলেছে, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

—বেশ করেছে। কিন্তু তুমি, লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি কাজলীর সঙ্গে আর কথা-টথা বলো না।

বিজু আশ্চর্য হয়—কেন মেজদি ?

—কাজলী আজ ভাল কথা বলছে, কিন্তু একদিন-হয়তো খুব শক্ত একটা কথা শুনিয়ে দেবে।

মেজদিও এবার নতুন রকমের একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। মাণিকপুর থেকে যে গো-গাড়িটা বিজুকে নিয়ে যাবে, সেটা আর শিবপুকুর কাছারিবাড়িতে থামবে না। সোজা চলে যাবে মানকর।

গো-গাড়িটা ঠিক যখন শিবপুকুরের কাছারিবাড়িটা পার হয়ে চলে গেল, তখন

সন্ধ্যার জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। কাজলীদের বাড়িটাকে আর চোখে দেখতেও পায় না বিজু। কে জানে কেন, গাড়ি থেকে নামবার জন্য বিজুর মনটা একবার ছট-ফট করে উঠেই শান্ত হয়ে গেল।

॥ চার ॥

বাইরের ঘরে বসে বাবা ডাকছেন —বিজু! বিজু কি মাণিকপুর থেকে ফিরেছে?

ছোড়দা ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তর দেন—হ্যাঁ।

—বিজুকে এখানে একবার পাঠিয়ে দে।

—কেন?

—কেন আবার কি? আসুক না একবার।

—বিজুকে পড়তে বসিয়েছি।

—এখন আবার কি পড়ছে বিজু?

—বাংলা ব্যাকরণ।

—বাংলা ব্যাকরণ থাকুক এখন।

—বেশ তো, এখন তাহলে ভূগোল পড়ুক।

—আরে না না। বিজু এখানে একবার আসুক, আমার সঙ্গে একটু পাঞ্জা-টাঞ্জা লড়ুক। তারপর না হয়…।

আর বেশি বলতে হয় না, বিজু নিজেই একটা লাফ দিয়ে, যেন এতক্ষণের ব্যাকরণ-ভীরু প্রাণটাকে নাচিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

বাবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বিজু। বাবা বলেন—মন্দ নয়। এই এক বছরে তোর কব্জির জোর বেশ বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বিজু বলে—কিন্তু তোমার হাতটা গরম কেন বাবা?

বাবা হাসেন—জ্বর হলে গা তো গরম হবেই।

—জ্বর? তোমার জ্বর?

বিজুর পাঞ্জার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বাবা আবার হাসেন। —হ্যাঁ রে বিজু।

তারপরেই কেমন-যেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে কথা বলেন বাবা—আচ্ছা, তুই এখন যা। কমলকে একবার পাঠিয়ে দে।

বাবারও জ্বর হয়, বাবাও হাঁপায়? বিজুর বিশ্বাসের জগৎটা যেন ভয়ানক একটা বিস্ময়ের প্রশ্নে আহত হয়ে মনমরা হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। চোখের উপরে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, রোজই বাবাকে দেখবার জন্য ডাক্তার আসছেন আর ছোড়দা ওষুধ আনবার জন্য ছুটোছুটি করছেন।

বাবাও এমন নিশ্চল হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকতে পারেন? এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়? কেষ্টনগরের কে না জানে, রাজনগরের নায়েব রুদ্রবাবু একবার নবদ্বীপ-ঘাটের ফেরি লঞ্চের উপর রাগ করে গঙ্গা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠেছিলেন, আর

সময়মত আদালতে হাজির হয়েছিলেন। কারণ, যে-লঞ্চের সকাল আটটায় ছাড়বার কথা, আটটা বিশ মিনিট হয়ে গেলেও সে-লঞ্চ তখনও কুমড়ো-বোঝাই হবার জন্য পাইকারের নৌকোর অপেক্ষায় অলস হয়ে ভাসছিল।

কিন্তু বাবা যে মরতেও পারেন। সেদিন ডাক্তার চলে যাবার পরেই ছোড়দা যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন, তখন হতভম্ব বিজুর বুকটা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে কেঁদে ওঠে। বিজুও এত চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে? বাবা দেখতে পেলে যে লজ্জা পেয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে ফেলতেন···ছিঃ বিজু, তুইও যে চেঁচিয়ে কাঁদছিস!

রাত্রিবেলা যখন ছোড়দার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকতে হয়, শুধু তখন বিজুর বুকের ভিতরের ছটফটে কান্নাটা যেন শান্ত হয়ে যায়।

বিজুর দু'চোখের ছলছলে ভাবটাও শান্ত হয়ে শুকিয়ে আসতে থাকে। বড়দা এসেছেন, মেজদা এসেছেন, আর মেজমামা তো সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত হয়েই আছেন। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য বেশ জাঁকাল-রকমের একটা আয়োজনের পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, ঠিক শ্রাদ্ধের দিনেই, ষোল বছর বয়সের দুরন্ত যে বিজুর চোখ দুটো কান্না ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে, সেই শান্ত চোখ দুটো যেন ভয়ানক একটা সন্দেহের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা এত আপত্তি করছেন কেন? বিজুর মাথা কামাবার দরকার নেই কেন? বড়দা মেজদা আর ছোড়দা, তিনজনই যদি মাথা কামাবে, তবে বিজুই বা বাদ যাবে কেন?

ছোড়দা জেদ ধরলেন—না, সেটা হবে না। হতে পারে না। বিজুও মাথা কামাবে।

বড়দা মেজদা আর মেজমামা নিতান্ত একটা অনিচ্ছার সঙ্গে কোনমতে আপস করে শেষে রাজি হলেন। বিজুও মাথা কামালো। কিন্তু, বিজুর প্রাণটা যে কোন মতেই মনের সেই ভয়ানক সন্দেহটার সঙ্গে আপস করতে পারে না। কেন? কিসের জন্য? বড়দা মেজদা আর মেজমামা কোন্ সাহসে এমন কথা বলে?

ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করলে ছোড়দা বারে বারে ওই একই জবাব দিয়ে সরে পড়েন—ওদের কথা ছেড়ে দে। ওদের মাথা খারাপ।

শ্রাদ্ধ তো মিটে গেল। বড়দা আর মেজদাও চলে গেলেন। কিন্তু মেজমামা তবু ব্যস্ত। নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন যেন এ-বাড়ির অদৃষ্টের গার্জেন সেজে বসেছেন। রোজই একগাদা কাগজপত্র নিয়ে উকিলবাড়িতে যান আর আসেন। মেজমামা কি সাপুড়ে জাদুকরের মত সংসারের আরও বড় কোন রহস্যের ডালা তুলে ফেলবেন, আর, আরও ভয়ানক কোন বিস্ময়ের সাপ হিস্ হিস্ করে ফণা তুলে বের হয়ে আসবে?

ঠিকই, তাই হল। সন্ধ্যেবেলা আদালত থেকে ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজ-

মামা।—সব ব্যবস্থা হয়ে গেল রে কমল।

—কি হল?

মেজমামা—সম্পত্তির পার্টিশন হয়ে গেল। তোর ভাগে পড়ল এই বাড়িটা। রাজনগরের বাড়িটা ধীরেন আর নরেনের সমান দুই ভাগে, আর পলাশীর জমিদারীটা তোদের তিন ভাইয়ের সমান তিন ভাগে।

বিজু বলে ওঠে—তবে আমার ভাগে কি পড়ল?

মেজমামা বলেন—কিছু নয়। তুমি চুপ কর।

বিজু চেঁচিয়ে ওঠে—কেন চুপ করব? বাবার সম্পত্তি শুধু তিন ভাই পাবে কেন? আমি কি মরে গেছি?

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বলেন—তুমি মরেই ছিলে। তোমার থাকা আর না-থাকা দুই-ই সমান। দেখছিস কমল, এইটুকু ছেলের কিরকম টনটনে সম্পত্তিজ্ঞান?

বিজু বলে—আমি এখনই উকিলবাড়ি যাব। দেখি, কে আমাকে কোন্ সাহসে ঠকাতে পারে?

ছোড়দা বিজুর হাত ধরে বলেন—আয়, আমার সঙ্গে আয়, একটা কথা বলব, শুনে যা। আয় বিজু।

বিজুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আর গাছপাকা পেয়ারার গন্ধে ভরা উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে, যেন নিবিড় একটা প্রতিজ্ঞার আশ্বাস ঢেলে দিয়ে কথা বলেন ছোড়দা—আমি থাকতে তোর আবার সম্পত্তির চিন্তা কেন বিজু? আমার ভাগের সম্পত্তি তোরও সম্পত্তি।

—কিন্তু মেজমামা তো সে-কথা বলছেন না। উকিলবাবুও সে-রকম ব্যবস্থা করেননি।

—ও ছাই দলিলে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, আর আইনে যা খুশি বলুক না কেন, তুই তো আমাদেরই ভাই।

চমকে ওঠে বিজু—আইনে আমি বুঝি তোমাদের ভাই নই?

বিজুর মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ছোড়দা হাসেন—না রে ভাই, কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

—না, আমি তোমার বাজে কথার মানে বুঝতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দাও ছোড়দা। আমি আজই জানব—উকিলবাবুকে, বিধুবাবুকে, সাবিত্রীমাসীমাকে সবাইকে জিজ্ঞেস করব। আমি এখনই বের হয়ে গিয়ে জেনে আসব, আমি তবে কে?

ছোড়দা—ছিঃ, কোন দরকার নেই। আমি আমার সম্পত্তির একটা ভাগ তোর নামে দলিল করে দেব বিজু। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।

ছোড়দার সেই ব্যাকুল আদরের হাত দুটো যেন দমবন্ধ করবার দুটো ফাঁসির দড়ি। কিংবা, একটা মিথ্যে মায়ার মিথ্যে তোষামোদ। সহ্য করতে পারা যায় না। ছোড়দার হাত দুটোকে দুরন্ত একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই ছুটে চলে যায় বিজু।

অনেক রাত, মাঝরাতও বোধ হয় তখন পার হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে ফিরে

এসেই দেখতে পায় বিজু, একটা নেবানো লণ্ঠন আঁকড়ে ধরে আর জুতো পায়েই বিছানার উপর যেন দুর্ঘটনায় মরা একটা মানুষের মত এলোমেলো হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন ছোড়দা। বুঝতে পারা যায়, বিজুকে খুঁজতে বের হয়ে আর অনেক হয়রান হয়ে ফিরে এসেছেন ছোড়দা। এখন বোধ হয় স্বপ্ন দেখছেন, বিজু ফিরে এসেছে, কিংবা খোঁজ করলেই বিজুকে পাওয়া যাবে।

না, অসম্ভব। বৃথা স্বপ্ন দেখছেন ছোড়দা। বিজু এ-জীবনে আর এ-বাড়িতে আসবে না।

ছোড়দার মাথার বালিশের কাছে চিঠিটা রেখে দেয় বিজু—সবই জেনেছি ছোড়দা। আমি বাবার ছেলে বটে, কিন্তু তোমাদের ভাই নই। আমি বাবার রাজ-নগরের বাড়ির এক ঝিয়ের ছেলে। আমার সে ঝি-মা মরে যাবার পর বাবা আমাকে এ-বাড়িতে এনে আর আদর করে পুষেছিলেন। বাস্, আমার আর কিছু বলবার নেই। যাই ছোড়দা।

কেষ্টনগরের আকাশের তারা ঝিকঝিক করে। জলঙ্গীর জল ছলছল করে। একটা নিশাচর একলা নৌকোর বৈঠা ঝুপঝাপ করে। মুচিপাড়ার কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে না, শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

তারপরেই খোলামেলা ধানক্ষেতের বাতাস ফুরফুর করে। বুঝতে পারে বিজু, কেষ্টনগর নামে একটা শ্মশানের সীমা ছাড়িয়ে প্রাণটা অনেক দূরে চলে এসেছে। এ রাত্রি ভোর হবার আগে আরও অনেক দূরে চলে যেতে পারা যাবে।

।। পাঁচ ।।

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, সে নদীর আক্ষেপ হল হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ। হারিয়ে যেতে চায়নি সে নদী। কিন্তু ষোল বছর বয়সের বিজনবিহারীর জীবনের নদীটা যেন ইচ্ছে করেই ধারা হারাতে চায়। বাংলাদেশের মাটির ছোঁয়া থেকে পলা-তক একটা প্রাণ সত্যিই সুদূরের এক মরুপথে এসে তার ধারা হারিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

একেবারে রাজস্থান, যার সঙ্গে বাংলাদেশের মাটি নদী আর গাছপালার কোন মিল দেখা যায় না। চিতোরের এক উটওয়ালার কাছে চাকর হয়ে খেটে খেটে বিজনবিহারীর জীবনের পুরো একটা বছর কেটে গিয়েছে।

কিন্তু একটুও কি ভয় পেয়েছে বিজনবিহারী? একটুও না। প্রথম দিনটা উটের গায়ের সেই বীভৎস গন্ধে গলা থেকে এক ঝলক বমি উথলে পড়েছিল। কিন্তু তার-পর আর নয়। তারপর নিজের হাতেই উটের পুরীষের ঘুঁটে পুড়িয়ে, জওয়ারের চাপাটি সেঁকে, আর সেই চাপাটি কাঁচা গাজরের সঙ্গে চিবিয়ে খেতে একটুও খারাপ লাগেনি। দড়ির মত করে পাকানো লাল শালুর মস্ত বড় একটা মুড়েঠা মাথায় বেঁধে, তুলোর মেরজাই গায়ে চড়িয়ে, আর কাঁচা চামড়ার নাগরা পায়ে দিয়ে চিতোরগড়ের ডাঙার কাঁটাজঙ্গল থেকে মাদার পাতার বোঝা মাথায় বয়ে নিয়ে বাজারের উটের

আস্তানায় ফিরে আসবার সময় পশ্চিমের আকাশে যে সূর্যাস্ত দেখতে পায় বিজনবিহারী, সে সূর্যাস্তের চেহারার সঙ্গে কেষ্টনগরের সূর্যাস্তের মিল নেই ; মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কিন্তু দেখতে ভাল লাগে। এ আকাশে সূর্যাস্তের রঙ ছলছল করে না, যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে।

মিল নেই বলেই ভাল লাগে। চিতোরগড়ের রাতের নীরবতার মধ্যেও মাঝে মাঝে, বিশেষ করে যে রাতে জ্যোৎস্না থাকে, ময়ূরের ঝাঁক ডেকে ডেকে উড়ে বেড়ায়। বিজনবিহারীর প্রাণটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ময়ূরের ডাকের যত প্রতিধ্বনির উৎসবের মধ্যে ডুবে যায়। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। যদি এখানেও বাংলাদেশের মত বউ-কথা-কও কখনও ডেকে ওঠে, তবে বোধ হয় সেই মুহূর্তে চিতোর ছেড়ে দিয়ে একেবারে জয়সলমীরের দিকে চলে যাবে বিজন।

চিতোরের উটওয়ালা মালিক মাইনে বাবদ একটা পয়সাও দেয় না বলেই কাজটা ছেড়ে দিতে হল। তারপর ঝান্সি। মেওয়াওয়ালা মদনলালের দোকানে পুরো দু'টি বছর চাকরি করতে হয়েছে। মাইনে দিতে কিপটেমি করেনি মদনলাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইনের লোভ ছেড়ে দিতেই হল।

দোকানঘরের পিছনের একটা অন্ধ কুঠুরি, সেই কুঠুরির ভিতরে একটা তয়খানা, যেন রসাতলে যাবার একটা সুড়ঙ্গঘর। এই তয়খানার ভিতরে পচা মেওয়া চোলাই করে মিঠা মদ আর খুশবুদার মদ তৈরি করে মদনলাল, বহিসোঁকে দিল বহ্লানেকে লিয়ে।

দোকানঘরের কাজ তেমন কিছু নয়। আসল কাজটা, এই তয়খানার ভিতরে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে জেগে কাঠের গামলায় পচা মেওয়া চটকাতে হয়। বিজনবিহারীর দুহাতের মাংসের পেশীগুলি এরই মধ্যে পচা মেওয়া চটকাতে গিয়ে কত মজবুত হয়ে ফুলে উঠেছে।

কিন্তু কাজটা কপালে সইলো না। পালিয়ে যেতে হল। যে রাতে মেওয়াওয়ালা মদনলালের দোকানের উপর হানা দিল আবগারী পুলিশ, সে রাতেই, সেই মুহূর্তে, তয়খানা থেকে বের হয়ে, পিছনের আঙিনার একটা গাছ বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে, আর ওপাশের শেখ সাহেবের আস্তাবলের চালার উপর লাফিয়ে পড়ে, তারপর যেন একেবারে অশরীরী হয়ে উধাও হয়ে যায় বিজন।

ঢোলপুরে রেলের এক সাহেবের বাড়িতে বেয়ারা হয়ে আরও একটা বছর। শেষরাতের আবছায়ার মধ্যে চম্বলের বালিয়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে হরিণ শিকার করতে ভালবাসেন ডি টি এস মিস্টার ব্রাইট। দোনলা হল্যাণ্ড আণ্ড হল্যাণ্ডটা মিস্টার ব্রাইটের হাতে থাকে, আর বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতে থাকে একটা একনলা মার্টিন হেনরি। ভীরু চিতল হরিণ নয়, একদিন সাংঘাতিক গাঁট্টাসোট্টা একটা লেপার্ড পিছনের একটা ফনিমনসার ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে মিস্টার ব্রাইটের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সাহেবের গায়ে একটা আঁচড়ও দেগে দিতে পারেনি লেপার্ডটা, চামড়ার জার্কিনের কলারটাকে শুধু এক কামড়ে ছিঁড়ে

দিতে পেরেছিল। আর, বেয়ারা বিজনবিহারীর হাতের বন্দুকের এক গুলিতে সে লেপার্ডের বুকও সেই মুহূর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।

তারপর জব্বলপুর। লাইনম্যান বিজনবিহারী। দেশে চলে যাবার আগে মিস্টার ব্রাইটই সুপারিশ করে বিজনবিহারীকে এই কাজে বহাল করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

লোকে বলে, স্টেশনের ইয়ার্ড। বিজনবিহারী জানে, লোহার পাঁজরা দিয়ে ছাওয়া এই ইয়ার্ডই তার জীবনের জগৎ। বাইরের সংসারের যত ভিড় এসে এখানে উপচে পড়ে আর মিলিয়ে যায়। কখনও লাল আর কখনও সবুজ, আলো আর নিশানের অফুরান সঙ্কেত যেন এখানে নীড় বেঁধে বসে আছে। ট্রেন-বোঝাই হয়ে বাইরের পৃথিবীর যত হর্ষ আর কলরবের ভার এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিজনবিহারীও যেন তাদের সবারই যাওয়ার পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়। শাবল দিয়ে ছোট্ট একটি আদুরে আঘাত, ঠুং করে একটি শব্দ শিউরে ওঠে, আর লাইনের লোহার ফাঁক গায়ে গায়ে জোড়া লেগে যায়। মনে হয়, লোহার শিব যেন বুক পেতে দিল। তার পরেই হু হু করে ছুটে আসে থ্রি আপ কিংবা ফোর ডাউন। সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শব্দের এলোকেশীর নাচন সেই লোহার বুক মাড়িয়ে ছুটে চলে গেল।

ট্রেনবোঝাই এই সব হর্ষ আর কলরব নিশ্চয় নিজের দেশে যায়। ওদের দেশ আছে, ঘরও আছে। সবাই হয়তো নিজের দেশের দিকে যাচ্ছে না; কেউ কেউ দেশের দিক থেকে এসে কোন অদেশের দিকে চলে যাচ্ছে। যেখানেই যাক, শেষ পর্যন্ত একটা আশার ঘরে গিয়েই তো ওরা জিরোবে আর ঘুমোবে।

কিন্তু ডিউটি শেষ হলে যে-ঘরে গিয়ে জিরোতে আর ঘুমোতে পারে বিজন, সেটা আশার ঘর নয়, জি ব্লকের একটি কুঠরী। একটা বেঁটে দরজা, আর ঘুলঘুলির মত ছোট্ট একটা জানলা। জানলার কাছেই দেওয়াল-ঘেঁষা ড্রেনের মধ্যে কাদামাখা শূয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পাশেই এইচ ব্লকের যত কুঠরীর সারি, সবচেয়ে নিচের ক্লাসের যত মিনিয়াল আর ধাঙ্গড়দের ঘর। জানলাটা একবেলা খোলা থাকলে কয়লার ধোঁয়া ঘরে ঢুকে দড়িতে টাঙানো জামা-কাপড়ের গায়ে লম্বা লম্বা ঝুল ধরিয়ে দেয়, কালো-কালো সাপের খোলসের মত ঝুল।

যেন জীবনের যত আশার একটা কয়েদঘর। এ চাকরির মেয়াদ ফুরোলে তবেই বোধ হয় এই জি কুঠরির আশ্রয় থেকে সরে গিয়ে আবার ভাবতে হবে, আবার কোথায় যাওয়া যায়। কোন না কোন দিকে চলে যাওয়া যাবে নিশ্চয়; কিন্তু বাংলাদেশের দিকে নিশ্চয় নয়, ভুলেও নয়।

নীলরঙা কামিজ আর নীলরঙা বেঁটে প্যাণ্টালুনে জড়ানো একটা চেহারা হয়ে, লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে রাতের ইয়ার্ডের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও মন্দ লাগে না। বেশ ভালই লাগে, যখন শাণ্টিং-এর ইঞ্জিনগুলি এক-একটা চিৎকারের রাক্ষসের মত ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটি করে।

—এ বিজাওন! লোকো শেডের গেটম্যান টহলদার সিং যখন চেঁচিয়ে ডাক দেয়, তখন বিজনও খুশির স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে—রাম রাম চাচা! বোলিয়ে

কেয়া খবর!

—খবর কুছ নেহি, এক বাত পুছনা হ্যায়।

—বোলিয়ে।

—সাদি-উদি করোগে কি নেহি?

—সাদি কি অ্যায়সি-ত্যায়সি! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজন।

টহলদার সিং চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়—জওয়ানি বরবাদ করোগে, কেয়া?

—জওয়ানি নর্মদামে বহা দেঙ্গে। হেসে হেসে জবাব দেয় বিজন।

চাচাজী টহলদার সিং-এর চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটু মুচকে হেসেই কুঁচকে যায়।—তব্ দের কেঁও? বঙ্গাল মুলকসে এক ছোটি-মোটি নাজুকবদন নর্মদাকো উঠা লে কর্ চলে আও।

চাচাজী টহলদার সিং আর একবার মুচকে হেসে নিয়ে চলে যায়। শুধু আজ নয়, আরও কতবার এই ধরনের হাসির কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে চাচাজী। চাচাজীর এইসব মুচকি হাসির ভাষা যেন বিজনবিহারীকে বার বার এই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, জীবনের আরও দুটো বছর এই জব্বলপুরে পার হয়ে গিয়েছে। বয়সটা বাইশের কোঠাও পার হয়েছে। ইস, কত তাড়াতাড়ি বয়সটার হাত থেকে খেলার ঘুড়ি-নাটাই খসে পড়ে গেল, আর হাতে উঠে এল একটা কাজের লোহার শাবল।

কি আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে এখনও যে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের একটা ধানক্ষেতের হাওয়া ফুরফুর করে, আর সেই ফুরফুরে হাওয়াতে বিজনবিহারীর প্রাণের একটা রঙিন খুশির ঘুড়ি আকাশে ভেসে ভেসে দুলতে থাকে। দুলতে থাকে শিবপুকুর, গৌরীচাঁপা, বোশেখী বেল আর···আর কাজলী।

ছিঃ, স্লেটের সব অঙ্কের দাগ এত ভাল করে মুছে দেবার পরেও একটা দাগ কেন আবার ফুটে ওঠে? ফুটে ওঠেই বা কেমন করে? কাজলীও তো আর সেই কাজলী নেই। ছোট নয়, বোকাও নয়। বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, আর ঘেন্না করতেও শিখেছে।

কাজলীরও কি আর কিছু বুঝতে বাকি আছে? মাণিকপুরের বউঠাকরুণের অদ্ভুত ভাইটা যে একটা বে-আইনী প্রাণ, একথা কি আজ কাজলীরও অজানা আছে? কাজলী বোধ হয় এখন স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, বিজনবিহারী নামে একটা অস্পৃশ্য ছায়া ওর কাছে জল খেতে চাইছে। বোধ হয় ঘুমের মধ্যেই ঘেন্না করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজলী—সাবধান, তুমি আর এখানে এস না।

সত্যিই কি তাই? নাইট ডিউটি শেষ হবার পর হাতের লণ্ঠন আর শাবল নামিয়ে রেখে ইয়ার্ড-মাস্টারের অফিস ঘরের কাছে পাথরের বেঞ্চিটার উপর চুপ করে বসে যখন হাঁপ ছাড়ে বিজন, তখন শিশির-ভেজা চাঁদটা ঘোলাটে হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডুবছে। রাতের আকাশটাকে ছেড়ে যাবার দুঃখে চাঁদটা যেন নিজের চোখের জলে মুখটাকে ভিজিয়ে দিয়ে ঘোলা হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, জি কুঠুরির কালি-

ঝুলিময় বুকটা সত্যিই একটা শান্তির কয়েদঘর।

নিজেরই নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনতে পায় বিজন, আর লজ্জাও পায়। নিঃশ্বাসের শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল লোভের শব্দও বেজে চলেছে। মানকর স্টেশনের সেই বুড়ো নিমকিওয়ালাকে আর একবার দেখবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে? তখনই তো তার বয়স ছিল আশীর কাছাকাছি।

লোভটা বোধ হয় খুব লাজুক, নয়তো চালাক, নয়তো ভণ্ড, নয়তো ভীরু; বুড়ো নিমকিওয়ালার জন্য দরদ দেখাবার ছুতো করে মানকর স্টেশনে দাঁড়িয়ে শিবপুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

যে প্রতিজ্ঞাটা কেষ্টনগরকে এক কথায় ঘেন্না করে আর তুচ্ছ করে চলে আসতে পেরেছে, সে প্রতিজ্ঞার সব জোর শিবপুকুরের কাছে হার মানতে চায় কেন? মনটা সত্যিই যে চোরের মত উঁকিঝুঁকি দিয়ে যখন-তখন কাজলীর মুখটা দেখতে চায়।

চাচাজী টহলদার সিং আবার যেদিন দেখা হতেই চোখ টিপে টিপে হাসে, সেদিন সকাল বেলায় ফোর ডাউন যেন বাংলা ভাষার একটা ঝংকার তুলে প্ল্যাটফর্মের গায়ে এসে লাগলো। ট্রেনের অন্তত দশটা কামরা বাঙালীতে ভর্তি। বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, ছেলে-মেয়ে, সব বয়সের মানুষ কলকল করে হাসছে আর কথা বলছে। তার মধ্যে কাজলীর বয়সের মেয়েও আছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, একজনও কাজলীর মত সুন্দর নয়।

আকাশের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বিজন, শরৎকালের ডাক এসেছে। বাংলাদেশের আকাশের রঙ এখন নীলমণি গলানো রঙ। হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—সেকেণ্ড পণ্ডিত গুরুদয়ালবাবুর হুংকার শুনেও আর অনেক চেষ্টা করেও এর পরের লাইনটা মুখস্থ করতে পারেনি বিজনবিহারী। তবু বুঝতে অসুবিধে নেই, শরৎকাল এসেছে, তাই বাঙালীর দল বঙ্গদেশে চলেছেন, কে জানে কোন্ ছাই বিবিধ রতন দেখবার জন্য।

ওরা ছুটি পেয়েছে, পুজোর ছুটি। ফোর ডাউন আবার বাংলা ভাষার ঝংকার তুলে চলে গেল।

চাচাজী ডাকে—এ বিজাওন।

—বলুন।

—তোমারও তো ছুটি পাওনা আছে।

—আছে।

—ছুটি নাও তবে।

—কি দরকার?

—আরে বুদ্ধু, ছুটিই যে একটা দরকার।

জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে কি-যেন ভাবে বিজনবিহারী।

চাচাজী বলে—ছুটি পাওনা হলেও যে ছুটি নেয় না, সে বুদ্ধু আওরভি কিছু

আছে ; সে বুদ্ধু পাগল আছে।

বিজনবিহারীর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। চাচাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনার মত বিড়বিড় করে বিজন—ছুটি নেব তবে?

চাচাজীও স্নেহকোমল স্বরে উপদেশ দেয়—লেও বেটা। ছুটি নিলে মেজাজ ভাল হয়, আর কাজেও আবার নতুন ফুর্তি পাওয়া যায়।—ইনসানকা জান ধোবিকা কুত্তা নেহি হ্যায়, বিজাওন।

চমকে ওঠে বিজনবিহারীর বাইশ বছর বয়সের বুকটা। না ঘাটকা না ঘরকা, সত্যিই কি ধোবিকা কুত্তা হয়ে গেল বিজনবিহারীর জীবন?

॥ ছয় ॥

ভোরের চা-ওয়ালা হাঁক দেয়—মানকর।

ট্রেনটা থেমেছে। আর ট্রেনের একটা কামরার ভিতরে ঘুমন্ত বিজনবিহারীর স্বপ্নটাও যেন ডাক দিয়ে ফেলেছে—মানকর। আর দুচোখে যেন সেই স্বপ্নেরই আবেশ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজনবিহারী।

বুড়ো নিমকিওয়ালাকে দেখতে পাওয়া গেল না ; কিন্তু কি আশ্চর্য, প্ল্যাটফর্মের সেই কাঞ্চন গাছটা আছে, যেটাতে টুকটুকে লাল ফুলের হাসি আলো হয়ে ফুটে থাকত। মানকর স্টেশনের চেহারা এই ছয় বছরের মধ্যে একটুও বদলে যায়নি।

কিন্তু একটানা হেঁটে শিবপুকুর পৌঁছে গিয়ে একটা মাটির বাড়ির আঙিনার উপর এসে যখন দাঁড়ায় বিজন, তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না, শিবপুকুরের সব আলো-ছায়া বদলে গিয়েছে।

বটুকবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি?

কাজলীর মা চমকে ওঠেন—তুমি?

সত্যিই কি বিজনকে দেখে ভয় পেলেন কাজলীর বাবা আর মা? বিজনকে কদমা ক্ষীর আর মুড়ি খেতে দিতে কোন ইচ্ছে নেই?

তাইতো মনে হয়। তা না হলে আর একটাও কথা না বলে দুজনেই ঘরের ভিতরে চলে যাবেন কেন? দাওয়ার উপর রাখা ওই মোড়াটার উপর বিজনকে বসতে বলতেও দুজনেই ভুলে যাবেন কেন?

আঙিনার উপর মস্ত একটা আলপনার দাগ একটু ময়লা হয়ে গিয়েও এখনও হাসছে। ওটা কি তবে কাজলীর জীবনের একটা উৎসবের স্মৃতির দাগ? কাজলী আর এ-বাড়িতে নেই? কোন আশার ঘরে চলে গিয়েছে কাজলী?

তাইতো সন্দেহ করতে হচ্ছে। এ-শিবপুকুরে বোধ হয় আজকাল আর গৌরী-চাঁপা ফোটে না। পুরনো মন্দিরের পাচিলের গায়ের কাছে সে গাছটাকেও যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনতে পায় বিজন, ঘরের ভিতরে বটুকবাবু যেন চেঁচিয়ে উঠলেন—যাস নি কাজলী। সাবধান!

কাজলীর মা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—যাস নি, যাস নি কাজলী।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে যেন চাঁপাফুলের একটা স্তবক ছুটে বের হয়ে এসে আর বিজনবিহারীর চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে ওঠে—চিনতে পার?

সত্যিই কাজলী। গৌরীচাঁপাও দেখতে বোধ হয় এই রকমের। কাজলীর সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, পায়ে আলতা, আর খোঁপাতে রুপোর প্রজাপতি।

কাজলী বলে—আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর পনের দিন আগে এলে বিয়েটা দেখতে পেতে, আর পেট ভরে লুচি-সন্দেশও খেতে পেতে।

বিজন হাসে—বড় ভুল হয়েছে।

—কিসের ভুল?

—সময়মত এলে বিয়ের নেমন্তন্নটা খেতে পেতাম।

—সময়মত আসতে পারনি কেন? মনেই পড়েনি নিশ্চয়?

—মনে পড়েছিল।

—ছাই মনে পড়েছিল।

বিজন আবার হাসতে চেষ্টা করে—বিশ্বাস কর।

একটুও বিশ্বাস করি না। মনে পড়লে ছ'টা বছর এভাবে পালিয়ে থাকতে পারতে না। আগেই আসতে। তাহলে আজ আর···।

—কি বলছ?

—আজ আর বলে কোন লাভ নেই।

কি আশ্চর্য, কাজলীর চোখের পাতাগুলি যে ভিজে গিয়েছে। ঠোঁট দুটোও যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইছে।

—আমি কেন চলে গেছি, সেটা তুমি বোধ হয় জান না।

—খুব জানি। সবই জানি। সব শুনেছি।

—তবে আর একথা বলছ কেন? আমি আগে এলেই বা কি হত?

—সব হত।

চমকে ওঠে বিজন—কি বললে?

কাজলী—খুব স্পষ্ট করেই তো বলছি। তুমি হ্যাঁ বললে আমি না বলতাম না। কখখনো না। আমি যে সত্যিই ভেবেছিলাম, তুমি ঠিক সময়মত এসে পড়বে।· না এসে পারবে না।

বটুকবাবু চেঁচিয়ে ডাক দেন—গো-গাড়ি তৈরি হয়েই আছে বিজন। বেলাবেলি মানিকপুরে পৌছে যাওয়াই ভাল।

বিজন বলে—গো-গাড়ির দরকার নেই মেসোমশাই, আমি মানিকপুর যাব না।

—তবে কোথায় যাবে?

—কোথাও না। বলতে বলতে পিছু ফিরে দাঁড়ায় বিজন, তার পরেই যেন একটা একরোখা ঝড়ের বাতাসের মত ছুটে চলে যায়।

মানকর স্টেশনের কাঞ্চন গাছটা তবু হাসছে। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সে ট্রেন কোথায় যাবে, কোন্ দিকে যাবে খোঁজ নিতেও ভুলে যায় বিজন। যেন ফেরারী আসামীর মত একটা উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি; ছুটে গিয়ে একটা কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ে।

হাত তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে মনে হয়, কপালটা বুঝি রক্তে ভিজে গিয়েছে। ভয়ানক একটা ঠাট্টার ভূত হেসে হেসে কপালের উপর কাঁটাভরা হাতের একটা চাপড় ঠুকে দিয়ে সরে পড়েছে। বাংলাদেশের আকাশ দেখবার লোভটা হোঁচট খেয়ে কাদার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে। খুব হয়েছে। শিবপুকুর কোন গাঁয়ের নাম নয়। শিবপুকুর একটা গলাধাক্কা শাস্তির নাম। বিজনবিহারীর দুরাশার প্রায়শ্চিত্তের নাম। চোর ফিরে এসে দেখেছে, তার চুরি-করা সোনার ঘড়া চুরি হয়ে গিয়েছে।

ভালই হয়েছে। জব্বলপুরের ইয়ার্ড-মাস্টারের অফিস-ঘরের কাছে বেঞ্চির উপর বসে নাইট ডিউটির লাইনম্যানকে আর মাঝরাতের চাঁদের চেহারা দেখবার জন্য চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতে হবে না। কালিঝুলি মাখা জি কুঠরীর ঘুমটাও আর স্বপ্ন দেখবার সাহস করবে না। একটা বদ্ধ পাগল না হয়ে গেলে এরপর আর কাজলীর মুখটা মনে করবার দরকার হবে না।

এটা কোন্ স্টেশন? রাতই বা কত হল? যাত্রীতে ঠাসা এই কামরাটার এই বেঞ্চির এই কোণে একটা বাসি লাশের মত অসাড় হয়ে পড়ে থেকে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বিজন?

কিন্তু সত্যিই যে একটা স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, দুহাতে চোখ দুটো ঘষলেও যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের এক কোণে কাঞ্চন গাছটা হাসছে; অথচ স্টেশনটা মানকর নয়, মানকর হতেই পারে না।

গোমো জংশন। এবং এই গোমোর এই প্ল্যাটফর্মের কোনদিকে কোন কাঞ্চন গাছ নেই। হেসে ফেলে বিজন। আর বুঝতেও পারে, বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাস যেন হাসছে। ভাবতে খুবই ভুল করেছিল বিজন। শাস্তি পেয়ে নয়, হেরে গিয়ে নয়, বিজনের প্রাণটা যে জয়ীর মত একটা তৃপ্তির উপহার নিয়ে, গৌরীচাঁপার মত মায়া-ফুলের মস্ত বড় একটা মালা গলায় দুলিয়ে চলে যাচ্ছে। কাজলী যে স্বপ্নের মধ্যেও এসে কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে গেল—আসতে দেরি করলে কেন?

কোন্ সাহসে এমন কথা বলতে পারে কাজলী? অথচ কাকে বলছে, তাও সে জানে। যার প্রাণটা পৃথিবীর কোন দাদা-দিদির ভাই নয়, বাপ-মায়ের ছেলে নয়। যার ছায়ার কাছেও কোন ভাল-মানুষের মেয়ে আসতে চাইবে না, আইন যাকে একটা মিথ্যেমানুষ বলে মনে করে, তাকেই আশা করেছিল কাজলী? কাজলী যেন সংসারের যত নিয়মের শাসন তুচ্ছ করে, একটুও ভয় না পেয়ে জানিয়ে দিয়েছে, বিজবিহারীর প্রাণের জন্ম একটা অনিয়মের রহস্য হলেও তাকে ঘেন্না করতে, ঠাট্টা করতে আর দয়া করতে চায় নি কাজলী, ভালবাসতে চেয়েছিল।

ভালবেসেছিল বোধ হয়। তা না হলে ওকথা অত স্পষ্ট করে বলবে কেন কাজলী?

তবে আর কিসের আক্ষেপ? কিছুই না। চাচাজীকে বরং হেসে হেসে শুনিয়ে দিতে পারা যাবে, তুমি যা বলেছিলে তার চেয়েও অনেক সুন্দর একটি নর্মদাকে আমি পেয়ে গেছি চাচাজী, যদিও তাকে তুমি কোনদিন আমার ঘরে দেখতে পাবে না। তা ছাড়া, আমার যে কোনদিনই ঘর হবে না। ঘর করবার অধিকারও যে আমার নেই। কোথাও ঘর যদি বাঁধি, তবে লোকে সেই ঘরের দিকেও তাকিয়ে ঠাট্টার হাসি হাসবে, যেনো নদীর চরের গর্তে ক্ষেপা শেয়ালের ঘর দেখে মাচানের চাষী যেমন হাসে। ঠাট্টাটা যদি খুব ভদ্র হয়, তবে হয়তো দয়া করে বলবে, অদ্ভুত ঘর। মেজ জামাইবাবু যেমন মেজদিকে বলেন, তোমার সেই অদ্ভুত ভাই। মেজ জামাইবাবু মানুষটা তো অভদ্র নয়।

সুতরাং বিজনবিহারী পরোয়া করে না, চাচাজী। সে ঘর চায় না। ঘরকে সে ঘেন্না করে। তোমাদের নিয়মের দুনিয়াতে যত ঘর আছে, সব, সব ঘরকেই যত প্রেতের ঘর বলে মনে করে বিজনবিহারী।

॥ সাত ॥

আর জব্বলপুরে নয়।

নতুন রেল লাইন পাতবার জন্যে যে সার্ভে পার্টি উড়িষ্যার জঙ্গল পার হয়ে আর তাঁবু ফেলে ফেলে পালামৌয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পার্টির সঙ্গে চেনম্যান হয়ে কাজ করে দুটি বছর ফুরিয়ে যায়, তবু বিজনবিহারীর মনে এতটুকু আক্ষেপ নেই যে, জীবনটা যাযাবর হয়ে গেল। তাঁবুই ভাল। কোন জায়গায় এক মাসের বেশি ঠাঁই নিতে হয় না। জংলী হাতী তাড়াবার ডিউটিটা আরও ভাল লাগে। সারা রাত মশাল জেলে জেগে থাকা, আর টিন পেটানো। যে সাহস কেউ করতে পারে না, সে সাহস করবার জন্য বিজনহিারী যেন খুশি হয়ে এগিয়ে যায়। বাঁশের জঙ্গলের ভিতরে মটমট্ হুটোপুটির শব্দ শোনা মাত্র ক্যাম্প থেকে বের হয়ে একশো গজ দূরের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবার ডিউটিটা বিজনবিহারী ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে। চীফ সার্ভেয়ার সাহেব খুশি হয়ে বিজনবিহারীকে প্রত্যেকটি হাতী তাড়ানো সাহসের জন্য পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে থাকেন।

আরও একটি বছর। সার্ভে পার্টির তাঁবু যেদিন কোয়েল নদীর এপারে এসে পৌছল, সেদিন চীফ সাহেব বললেন—হাম অব হোম চলেগা, মেম সাহেব বহুৎ কড়া চিঠি ছোড়া হ্যায়।

অদ্ভুত ব্যাপার। হোমপ্রিয় চীফ সাহেব এত লোকের মধ্যে বেছে বেছে চেনম্যান বিজনবিহারীকেই বললেন—ব্রেভ চেনম্যান, তুম্‌ভি অব ঘর যাও।

—ঘর নেহি হ্যায় সাহেব।

—ঘর বনাও।

চম্‌কে ওঠেন বিজনবিহারী।

চীফ সাহেব—তুম আর্থ-কাটিংকা কণ্ট্রাক্টর বন্‌ যাও। হাম বন্দোবস্ত কর দেগা।

হোম যাবার আগে চীফ সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাটা ভুলে যাননি। চীফ সাহেব হোম চলে যাবার পরে দুটো মাসও পার হয়নি, গোমোর রেল অফিস থেকে একটি চিঠি পেয়ে বুঝতে পারে বিজনবিহারী, নতুন লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকাদারী যদি করতে হয়, তবে ওই সিংহানী পাহাড়ের দক্ষিণে এক অজানা-অচেনা জঙ্গলের বুকের ভিতর ঢুকে কোন মুণ্ডা কিংবা ওরাওঁ গাঁয়ের গাছতলায় খেজুরপাতার ছাউনি দেওয়া একটা ঠাঁই তৈরি করে নিতে হবে।

দেখে খুশি হয় বিজনবিহারী, না, খেজুর পাতার ছাউনি তৈরি করতে হবে না। উটগাড়ি থেকে নেমে, আর সড়কের মোড়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকের জঙ্গলটার দিকে তাকিয়েও খুশি হয়। যেন বাইরের হৈ-হৈ সভ্য-ভব্যতার থেকে ফেরার হয়ে একটা শান্ত নিরালা এখানে এসে শালের হাওয়াতে খুশি হয়ে পড়ে আছে। একটা হালুয়াইয়ের দোকান, একটা সরাই-ঘর আর একটা মহুয়া-চোলাই ভাঁটি। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালা দিয়ে তৈরি তিনটে ক্ষুদে চেহারার বাড়িতে শুধু তিনটি মানুষ বাস করে,—হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলু মিঁয়া।

এই সরাই-ঘরে আর কতদিন থাকা যাবে? মাঝে মাঝে গরুর পিঠে শুকনো লঙ্কার বস্তা চাপিয়ে করনপুরার বেনিয়ারা যখন হাজির হয়, তখন সরাই-ঘরে আর লোক ধরে না। নেকড়ের ভয়ে গরু আর লঙ্কার বস্তা নিয়ে বেনিয়ারা সারা রাত ঘরের ভিতরেই গাদাগাদি করে পড়ে থাকে আর ঘুমোয়। লঙ্কার ঝাঁঝে ঘরের বন্ধ বাতাস ঝাল হয়ে যায়। বিজনবিহারীর নাক জ্বলে। হেঁচে হেঁচে সেই নাক-জ্বালাও শান্ত করে দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে বিজনবিহারী।

রামসিংহাসন বলে—যতদিন না একটা ডেরা বানিয়ে নিতে পারেন, ততদিন আমার দোকানের পিছনের ঘরটায় থাকতে পারেন।

বিজনবিহারী বলে—বহুৎ আচ্ছা।

রোগা শালের খুঁটি, এবড়ো-খেবড়ো মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালা, দরজায় কাঠের কপাট নয়—খেজুর পাতার একটা ঝাঁপ। ঘরটাকে দেখিয়ে দিয়ে রামসিংহাসন বলে—এর মধ্যে থাকতে যদিও আপনার বেশ কষ্ট হবে…।

বিজন বলে—বলেন কি? আমার পক্ষে এটা যে একটা কেল্লা-ঘর, রামসিংহাসন-দাদা!

কিন্তু একবার যে কলকাতা যেতে হবে। কোঁদাল গাঁইতি আর শাবলের জন্য রেল-কোম্পানির সাপ্লাই এজেন্ট ভুরামল ব্রাদার্সকে ধরতে হবে, যেন অন্তত এক বছরের মেয়াদে মালটা ধারে দিতে রাজি হন।

কলকাতা যাবার পথে, রাতের মানকর স্টেশনটার দিকে ইচ্ছে করেই তাকায়নি

বিজনবিহারী। সে কাঞ্চন গাছটা ফুলে-ফুলে লাল হয়ে আছে কি-না কে জানে? না থাকতেও পারে। তিনটে বছরও তো কম দিনের ব্যাপার নয়।

কিন্তু ফেরবার পথে ভোরের মানকর স্টেশনকে দেখতে সত্যই যে ভোরের স্বপ্নের মত মায়াময় বলে মনে হল। পঁচিশ বছর বয়সের বিজনবিহারীর চোখের আশাও যে আবার উতলা হয়ে উঠতে চাইল। কাজলীকে দেখতে ইচ্ছে করে। শুধু একবার দেখা দিয়েই চলে আসা।

কাজলী কি এখন শিবপুকুরে আছে? থাকতেও পারে। কিন্তু থাকলেই বা কি?

কিছু নয়। কাজলী যদি সেদিনের মত কালো চোখের তারা তুটোকে আবার হাসিয়ে-কাঁদিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকায়, তবে একথা বলে দিতে পারবে বিজন, না কাজলী, আমার মনে একটুও তুঃখ নেই। এই তিন বছর ধরে, একটি দিনও বাদ যায়নি, যেদিন তোমার কথা না ভেবে থাকতে পেরেছি। শুধু তুঃখ এই যে, জংলী হাতী তাড়াবার সময় ক্যাম্পের কশন বেড়া পার হয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরাতে গিয়ে জংলা হাতীর কাছে যদি প্রাণটা হারাতে হয়, তবু কাজলী কোনদিন জানতে পাবে না যে, মানুষটা মরবার আগে কাজলীরই কথা ভেবেছিল।

ট্রেন থেকে নেমে পড়ে বিজন। আর, ট্রেন ছেড়ে যাবার পর বুঝতে পারে, চোখের আশা আবার পাগল হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে একটা অলক্ষুণে শূন্যতাও চমকে উঠেছে। সেই কাঞ্চন গাছটা নেই।

শিবপুকুরের কাছারিবাড়ির নতুন সরকারমশাই ত্রিলোচনবাবুও একটু চমকে উঠেই বললেন—না, বটুক আর নেই। বটুকের স্ত্রীও নেই। তু'জনেই মারা গিয়েছে।

—বটুকবাবুর মেয়ে?

—সে অবিশ্যি আছে। কিন্তু থেকেও নেই।

—কোথায় আছে?

—তার শ্বশুরবাড়িতে আছে। মেয়েটি এই এক বছর হল বিধবা হয়েছে।

—কেন?

—এ তো বড় আশ্চর্য প্রশ্ন। কেন মানে কি? একটা ক্ষয়রোগী মানুষের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হয়, সে মেয়ে কতদিন সধবা থাকতে পারে?

—বটুকবাবুর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

—গাঁয়ের নাম বেনুগ্রাম, তুবরাজপুর স্টেশনে নামতে হয়।

—শ্বশুরের নাম?

—তা জানি না। তবে শুনেছি, বটুকের বেয়াই হলেন নামকরা দৈবজ্ঞী। বলেছিলেন বেয়াই, তুমি নাতির বিয়ে দেখে যাবে বটুকবাবু, হুঁঃ!

—আচ্ছা, আমি যাই, নমস্কার।

—তুমি কে বট?

—আমি কেউ না।

কাজলীকে দেখবার জন্য চোখের আশা পাগল হয়েছিল, এইবার যেন চোখের

জ্বালাটা পাগল হয়ে ওঠে। তুমি এ কেমন ঘর পেলে কাজলী? এমন ঘরের জীবন যে আমার ঘরছাড়া জীবনের চেয়েও শূন্য জীবন। ভাগ্য আর আইন না হয় আমার জন্মের ভুল ধরে আমাকে অমানুষ বলে দাগী করে দিয়েছে, কিন্তু আইনের আর ভাগ্যের ভগবানেরা তোমাকে অমানুষ করে দিল কেন?

দুবরাজপুরের কাছেই বেনুগ্রাম, মাঝে শুধু তাঁতীদের একটা গাঁ পার হতে হয়। দৈবজ্ঞীবাড়িটা খুঁজে নিতে দেরি হয় না। বাড়ির কর্তা হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে আর চোখ বড় করে তাকান—কাজলী আবার কে?

বিজন বলে—শিবপুকুরের বটুকবাবুর মেয়ে।

কাশির বেগ চেপে কথা বলেন কর্তা—বল না কেন, নিরুপমা! যাই হোক… তুমি কে?

—আমি শিবপুকুর থেকে আসছি।

—বউমার দেশের লোক? বেশ কথা। কিন্তু তুমি এখানে এই দোর-গোড়াতেই দাঁড়াও বাপু। আমি বউমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কাজলী এসেই হাসতে থাকে।—কাজলী কাজলী করছিলে কেন? ও নামটা কি এখন আর আমাকে সাজে? না, তোমারও এই বয়সের মুখে সাজে? আমার নামটা যে নিরুপমা, সেটুকুও কোনদিন বোধ হয় জানতে চেষ্টা করনি?

বিজন হাসে—না, করিনি।

—ভালই করেছিলে, জেনেই বা লাভ কি?

—কেমন আছ?

—ভালই আছি। বিশজন মানুষের জন্য দুবেলা ভাত রাঁধি আর বাসন মাজি।

—আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একটিও বাজে কথা বলতে পারব না। শুধু জানতে চাই…।

—চুপ কর। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।

—তোমার অভিশাপের বাড়ি।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।

—না বলে উপায় নেই। তুমিই না একদিন বলেছিলে…।

—কি বলেছিলাম?

—বলেছিলে, তুমি ছাড়া আমার নাকি গতি নেই।

—একটা একরত্তি মেয়ের মুখের সেই কথাটা এখনও মনে করে রেখেছ?

—মনে করে রেখেছি, আর সেই জন্যেই বলতে এসেছি।

—বল।

—আমি ছাড়াও তোমার গতি নেই!

—তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে এত ভয় দেখিয়ো না।

—ভয়?

—এত লোভ দেখিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি।

—আমি তোমার কোন আপত্তি শুনব না।

সাদা থানে জড়ানো নিরুপমার রিক্ত মূর্তিটা থরথর করে কাঁপে।

—কি বলতে চাইছ, বল।

—আমার সঙ্গে চল।

—মাপ কর।

—না।

—তবে ভাবতে দাও।

—না। তোমাকে আমি চুরি করতেই এসেছি।

—ভাবতেও যে বুক কাঁপছে।

—কেন?

—ভয়ে।

—কার ভয়ে? কিসের ভয়ে? ওই কেষ্টনগর আর বেনুগ্রামের ভয়ে? আমি যাদের চোখে একটা অমানুষ, আর তুমি যাদের চোখে একটা দাসী, তাদের ভয়ে? না, এখনি চল।

চোরের মত নয়, ডাকাতের মত কথা বলছে বিজনবিহারী। নিরুপমার সেই ভীরু চোখ দুটোও দেখে আশ্চর্য হয়, ডাকাতের চোখের জ্বালা জলে ভরে গিয়ে ছলছল করছে।

কিন্তু তখনই নয়। মাঝ রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটা ছায়াদস্যু যেন বেনুগ্রামের দেউলের কাছে অজগরের মাথার মাণিক লুট করবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। নিরুপমা আসে। নিরুপমার মাথাটা দুহাতে জড়িয়ে, নিরুপমার জলভরা ভীরু চোখ দুটোকে বুকের কাছে একবার চেপে ধরে শান্ত করে দিয়েই বিজনবিহারী বলে—চল, কোন ভয় নেই নিরু।

॥ আট ॥

শুধু বাঙালীবাবুর যত দুঃসাহসের কাণ্ড দেখে নয়, বাঙালীবাবুর এই জেনানারও সাহসের রকম-সকম দেখে আশ্চর্য হয় রামসিংহাসন। নতুন রেল-লাইনের জন্য মাটি কাটবার ঠিকে পেয়েছে নিতান্ত ছোকরা বয়সের এই বাঙালীবাবু, কিছু টাকা লাভ রাখে ঠিকই, আর কাজের দায়ে দশ বিশ ত্রিশ মাইল দূরেও চলে যেতে হয়। কিন্তু সেজন্য কি ভুলে গেলে চলে যে, সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরে আসা উচিত? এই জঙ্গলের রাজ্যে সন্ধ্যাটাই যে সবচেয়ে ভয়ানক একটা লগ্নকাল; ভুখা জানোয়ার যখন শিকার ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে।

কিন্তু বাঙালীবাবু সন্ধ্যা না হবার আগে ঘরে ফেরে না। বাঙালীবাবুর জেনানা, অল্পবয়সের ওই মেয়েটা, সারাটা দিন একা-একা ঘরের ভিতরে থেকে শুধু খুট-খাট ঠুং-ঠাং ধুপ-ধাপ কাজ করে। কাদা মাটি দিয়ে দেওয়ালের ফাটল জোড়া দেয়, গোবর দিয়ে আঙিনা নিকোয়, কাঠের মুগুর দিয়ে ধানের তুষ ভাঙে আর কাটারি

দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাঠ চেলা করে। আর, ঘর তো ওই একটা নড়বড়ে ঘর, যার দরজায় কাঠের কপাটও নেই, শুধু খেজুরপাতার একটা ঝাঁপ।

সন্ধ্যা হতেই দোকানঘরের টিনের ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে, আর কেরোসিনের কুপির কাছে বসে, জীর্ণ তুলসী-রামায়ণটা হাতে তুলে নিয়ে এক-একদিন চমকেও ওঠে রামসিংহাসন। একটা নেকড়ে ঘরের চারদিকে খ্যাক-খ্যাক করে ছুটছে। অথচ বাঙালীবাবু এখনও ঘরে ফেরেনি। বউটা একা-একা ঘরের ভিতরে বসে রান্না করছে।

—রাম রাম! ডরো মত্ দিদি। হাঁক দেয় রামসিংহাসন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, বাঙালীবাবুর বউ একটুও ভয় না পেয়ে, উনুন থেকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ তুলে নিয়ে অন্ধকারের ভিতরে লুকানো ওই খ্যাক খ্যাক শব্দটার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছে।

যেমন এই বাঙালীবাবু তেমনই তাঁর বউ, দুজনেই কি ভয়ানক বেপরোয়া হয়ে খাটতেও পারে! সড়কের ওপারে, একটু দূরে, কাঁচা-ইটের দেওয়াল তুলে বাড়িটা তৈরি করবার সময় বাঙালীবাবু তার মুণ্ডা মজুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমানে কাজ করেছে। নিজেই ইটের ছাঁচ তৈরি করে নিয়েছে। নিজেও দুহাতে কাদা ঘেঁটে ইট গড়েছে। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শালের রোলা কেটেছে। সাত দিনের মধ্যে খুঁটো পুঁতে আর বাঁশ পেতে ঘরের ছাউনির ঠাট তৈরি করে ফেলেছে। ছাউনির উপর বসে খাপরা চেলেছে বাঙালীবাবু; বউটাও শক্ত করে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, আর একটা চঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীবাবুর হাতের কাছে খাপরা যোগান দিয়েছে।

নতুন ঘরে ঢুকে যেদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে নিরুপমা, সেদিন নিরুপমার আলো-মাখানো মুখের হাসিটার দিকে তাকিয়ে বিজনবিহারীর হৃৎপিণ্ডেরই একটা তৃপ্তি যেন হেসে ওঠে।

সন্ধ্যাটাকে সন্ধ্যা বলে মনে হয় না। বিজনবিহারীর নতুন অদৃষ্টের ঘরে যেন ভোরের আলো উঁকি দিয়েছে। এই তো সবে মাত্র শুরু হল। যা চাই, যা না হলে চলে না, তার সবই পেতে হবে। কারও কাছে ভিক্ষে করে নয়, বিজনবিহারী তার এই গায়ের আর এই প্রাণের জোরে সব আদায় করে ছাড়বে।

নিরুপমার হাত ধরে নতুন ঘরের দাওয়ার উপর বসে যখন গল্প করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী, তখন সেই জংলী নিরালার বুকটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকে। চৈত্র মাসের শালের কচি পাতাও নতুন বাতাসের ছোঁয়ায় ঝিরঝির করে নতুন হাসির শব্দ ছড়াতে থাকে।

ফেরারী আসামীর ভীরু হাসি নয়, ফেরারী অভিমানীর করুণ হাসিও নয়, যেন এক ফেরারী বিদ্রোহীর অনাহত প্রতিজ্ঞার হাসি। পুরনো ভাগ্যটা যা-কিছু কেড়ে নিয়েছে, নতুন ভাগ্যটা তার সবই কেড়ে আদায় করে ছাড়বে। দেখি, কার সাধ্যি আছে, বিজনবিহারীর এই ঘরের দিকে তাকিয়ে আর ঠাট্টার হাসি হেসে বলতে পারে, এটা একটা অদ্ভুত ঘর?

রামসিংহাসন তো এরই মধ্যে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে তিনবার বলেছে, বাঙালীবাবুর

ঘরনীর মত ঘরনী তো কাঁহুভি না দেখি। বনবাসিন সীতাজি যৈসন পতিপূজন লাগু... ।

নিরুপমার সান্ধ্যপ্রদীপের আলোটা এই জংলী নিরালার বুকে সত্যিই একটা নির্ভয়ের আলোর সঞ্চার। তা না হলে হালুয়াই রামসিংহাসন, সরাইওয়ালা হীরারাম আর ভাঁটিদার গুলু মিয়াঁ, তিনজনেই তিনটে মাস যেতে না যেতে দেশের বাড়ি থেকে বউ আনিয়ে ফেলতে সাহস পেত না। এখানে ঘর-সংসার করা যায়, এই বিশ্বাস যে এই বাঙালীবাবুর ঘরের আলোটাই ফুটিয়ে তুলেছে।

ক'বছরের মধ্যে যে অনেক কিছু পেয়ে গেল বিজনবিহারী। ঘরের গা ঘেঁষে চারটে শিউলি ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। ঘরটাও যে একটা নাম পেয়ে গেল—শিউলি-বাড়ি। স্টেশনটারও নাম শিউলিবাড়ি। পাঁচ মাইল দূরে যে কোলিয়ারিটা প্রথম দেখা দিল, সেটারও নাম শিউলিবাড়ি কোলিয়ারি। মুণ্ডারা বলে, সিলুয়াডি কলি-য়ারি। বিজনবিহারীর পুরনো নামটাকেও মাটি করে দিল একটা নতুন নাম—মাটি-সাহেব। বেশ নাম। বিজনবিহারীর প্রাণের সেই প্রতিজ্ঞার স্বপ্নটা যে পাহাড় আর শালবনে ঘেরা এই চমৎকার এক টুকরো জগৎটার মাটি দিয়ে সুখের ঘর তৈরি করে নিতে পেরেছে। এই মাটি বিজনবিহারীর স্বপ্নের বন্ধু; বিজনবিহারীও এই মাটির স্বপ্নের বন্ধু।

যেমন শিউলিবাড়ির সড়কের দুপাশে, তেমনই স্টেশনের আশেপাশে কত নতুন ঘর উঠছে, নতুন দোকান বসছে। ঝুমরা রাজ এস্টেটের তশীলদার যুলনবাবুও এসে একটি কাছারি বসিয়েছেন। মাটিসাহেব সবারই দরকারের বন্ধু। সবাই মাটি-সাহেবের ইচ্ছা উপদেশ আর পরামর্শের বন্ধু।

ধর্মশালা কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। সরাইওয়ালা হীরারাম স্টেশনে পানিপাঁড়ের কাজ নেবার পর সরাইটা বিনা যত্নের দুঃখে একেবারে ভেঙে গলে একটা ঢিবি হয়ে পড়েছিল। নতুন দোকানীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ইট কেনা হল, আর কাঠ কেনবার সব খরচ দিল বিজনবিহারী। পুরনো সরাইয়ের যত ধ্বংসের জঞ্জাল সরিয়ে নতুন ধর্মশালা তৈরি হতে শুরু হল যেদিন, সেদিনও রামসিংহাসন দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়, বাঙালীবাবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে আর একটা করাত হাতে নিয়ে শাল কাঠের পাটা চিরছে। কারণ, দেওয়াল গাঁথবার জন্য ভারা বাঁধতে হবে, অথচ তক্তা নেই, আর কাঠুরে মিস্তিরিটাও আসেনি।

শিউলিবাড়ি রাস্তা কমিটিরও প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। স্টেশন থেকে শুরু করে সড়কের মোড় পর্যন্ত প্রায় আধ মাইল লম্বা যে রাস্তাটার দুপাশে নতুন নতুন বস্তি, গোলা, দোকান আর আড়ত গড়ে উঠেছে, সে রাস্তাটা রাস্তাই নয়। বড় বড় গর্তে ভরা সে রাস্তায় চলতে গিয়ে গরুরগাড়ির ধড় মচকে যায়, চাকা ছিটকে পড়ে। শিউলিবাড়ির সব মানুষের কাছ থেকে মাসিক এক আনা চাঁদা নিয়ে রাস্তাটার উপর খোয়া বিছাই করতে হবে। তা ছাড়া অন্তত চারটে ল্যাম্প পোস্টও বসাতে হবে।

শিউলিবাড়ি রক্ষা সমিতির প্রথম সেক্রেটারি মাটিসাহেব, সভাপতি তশীলদার

ফুলনবাবু। কাগজ-কলম হাতে নিয়ে নয়, পুরো তিনটে মাস রোজ রাতে লম্বা একটা বল্লম হাতে নিয়ে সেক্রেটারির কাজ করেছে বিজনবিহারী! খবর পাওয়া গিয়েছে, বিরসা মুণ্ডার দল আবার ক্ষেপেছে। একটা দল নাকি এদিকে এসে তশীল কাছারি লুট করবে আর পোড়াবে। দোকানীরাও ভয় পেয়েছে, হামলা যদি হয়, তবে ওরাও কি রেহাই পাবে? স্টেশনটার উপরেও হামলা হতে পারে। ক্যাশব্যাগ বগলদাবা করে স্টেশনমাস্টার চৌধুরীবাবু রোজ রাতে এক ভিখিরী বুড়োর কুঁড়ে ঘরের ভিতরে বসে-শুয়ে আর জেগে-ঘুমিয়ে রাত পার করে দেন। তশীলদার ফুলনবাবুও আতঙ্কিত হয়ে আবেদন করেন—একটা কিছু করুন মাটিসাহেব। আপনি না করলে করবে কে?

পঁচিশ জন লোক, পঁচিশটা লাঠি আর পাঁচটা মশাল—আগে আগে মাটিসাহেব বিজনবিহারীর বল্লমের ফলক মশালের আগুনের আভা লেগে চিকচিক করে। সারা-রাত টহল দিয়ে বেড়ায় রক্ষা সমিতির পাহারা-পার্টি। অমাবস্যার মাঝরাতে তশীল-কাছারির উপর এক ঝাঁক তীরও ছুটে এসে পড়েছিল। কিন্তু বিজনবিহারীর দলের হাল্লা অমাবস্যার অন্ধকার কাঁপিয়ে দিতেই তীর-ছোঁড়া আক্রোশটা যেন আড়াল দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

এক মাস পরে, দশ মাইল দূরের থানাতে গিয়ে ডি এস পি'র হাত থেকে একটি উপহার নিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী, সেদিনটা শিউলিবাড়ির জীবনে যেন একটা মহোৎসবের দিন। পঞ্চাশ জন খুশি মানুষের একটা মিছিল, তার মধ্যে রামসিংহাসন আছে, গুলু মিয়াঁ আর হীরারামও আছে, দশ মাইল পথ বিজন-বিহারীর পালকির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে থানাতে গেল আর ফিরে এল। তশীলদার ফুলন-বাবু নিজের হাতে পালকিটাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। রাম-সিংহাসন নিজের হাতে একটা মালা বিজনবিহারীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

শিউলিবাড়ি রক্ষা-সমিতির সেক্রেটারি বিজনবিহারীকে একটা একনলা বন্দুক উপহার দিয়েছেন সরকার। সেই জন্যেই সারা শিউলিবাড়ির বুকে এই আহ্লাদের উৎসব।

মিছিলটা যখন ফিরে এসে বিজনবিহারীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি হাঁকে—মাটিসাহেব কি জয়, তখন শিউলিবাড়ির রাতের আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। যেন জ্যোৎস্নামাখা শিউলিবাড়ির অন্তরাত্মা জয়ধ্বনি হাঁকছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিরুপমার চোখদুটোও যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে হাসতে থাকে। ওই মানুষটা, নিরু-পমার হাতে নিজের হাতে শাঁখা পরিয়ে দিয়েছে যে, তাকে যে সত্যিই মানুষের রাজা বলে মনে হয়। এই তো, মাত্র পাঁচটা বছর পার হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে কেষ্টনগরের ভাগ্যহারানো ছেলে সত্যিই যে নিজের হাতে একটা সম্মানের রাজ্য তৈরি করে নিল।

মাটিসাহেব সেলাম! মাটিসাহেব আদাব! বন্দেগী মাটিসাহেব! সাইকেল চেপে আর বন্দুকটা পিঠে বেঁধে যখন সড়ক ধরে এগিয়ে যায় ত্রিশ বছর বয়সের বিজন-বিহারী, তখন বুড়ো বুড়ো দোকানীও হাত তুলে অভিবাদন জানায়। স্টেশনমাস্টার

চৌধুরীবাবুও বলেন—আপনি না থাকলে আমি এখান থেকে কবেই ট্রান্সফার নিতাম মাটিসাহেব। ক্ষেপা জংলীর তীরের ভয় মাথায় করে এখানে চাকরি করা আমার বুড়ো হাড়ে পোষাতো না!

—না, আর ভয়টয় নেই। আপনি এখানে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।

—কিন্তু ইয়েতেও যে পোষাচ্ছে না মাটিসাহেব। এই একরত্তি একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন, শুধু কয়লাগাড়ি যায় আর আসে। কি ইনকাম হবে বলুন?

—হবে হবে। শিউলিবাড়ির এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। হেসে হেসে চৌধুরীবাবুকে যেন একটা আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বিজনবিহারী।

চৌধুরীবাবু যদিও বাংলা কথা বলেন, কিন্তু বাঙালী নন, তিনি হলেন মুঙ্গেরী চৌধুরী। তা না হলে বিজনবিহারী এই চৌধুরীবাবুর সঙ্গে এরকম হেসে হেসে কথা বলতেন না। কথা বলতেনই কিনা সন্দেহ। অনেকদিন রাণীগঞ্জে ছিলেন চৌধুরীবাবু, বেচারা টাকা-পয়সার হিসাবে কি-যেন একটা গোলমেলে কাণ্ড করে আর ধরা পড়ে এই জঙ্গলের ফ্ল্যাগ স্টেশনে শাস্তির বদলি নিয়ে এসেছেন। কে জানে কেন, বিজনবিহারীও বুঝতে পারে না, এই দুর্নামের চৌধুরীবাবুর সঙ্গে যেন একটু মায়া করে কথা বলতে ভাল লাগে।

নিরুপমা বলে—সকলকেই তো ভরসার কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছ, শুধু আমার বেলায় ফাঁকি।

বিজনবিহারীর হাতটা নিরুপমার কাঁধের উপরে পড়ে আছে, চোখের সামনে শিউলিগাছটা দুলছে, আকাশ ভরে তারা গিজগিজ করছে। কথাটা বলে ফেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে নিরুপমা।

তারার আলোতে জোর না থাকুক, কিন্তু বিজনবিহারীর এই চোখের আলোতে বেশ জোর আছে! দেখতেও পায় বিজনবিহারী, নিরুপমা যেন আঁচল চাপা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার হাসি লুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

—ফাঁকি? তোমাকে? বিজনবিহারীর গলার স্বরে যেন একটা নিরীহ বিস্ময় চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—বলেই ফেল, কিসের ফাঁকি?

উত্তর দেয় না নিরুপমা। শুধু চোখ তুলে বিজনবিহারীর মুখটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে।

—বল। আবার জানতে চায় বিজনবিহারী।

নিরুপমা হেসে ওঠে—যাঁতা যাঁতা। কতবার বললাম, ছোট্ট একটা পাথরের চাক্কি যোগাড় করে দাও, নইলে ডাল ভাঙতে আর পারছি না। বড় যাঁতাটায় ডাল গুঁড়ো হয়ে যায়।

বিজনবিহারী—তাই বল। আমি মনে করলাম আজ সকালে রামসিংহাসনের বউ এসে যে ফাঁকির কথাটা বলে গেল…।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এই অন্ধকারের মধ্যেই বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটাকে দেখতে পায় নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার মাথাটা যেন অলস হয়ে আর হেঁট হয়ে বিজনবিহারীর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

ঠিক কথা, আজই সকালে এসেছিল রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী। বোধ হয় মনে করেছিল, বাঙালীবাবু বাড়িতে নেই, তাই রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে একেবারে মুখ খুলে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছিল বিন্ধ্যাচলী।—পাঁচ বছর ধরে তুমি কি শুধু ভাত খাচ্ছ দিদি? আর কিছু খাও না?

—কি বললে?

বিন্ধ্যাচলী—আমার তো এই পাঁচ বছরে তিনটে হয়ে গেল। তুমি করছ কি?

—চুপ কর।

বিন্ধ্যাচলী—না দিদি, একটুও ভাল লাগে না। বাঙালীবাবুকে তুমি বড় ফাঁকি দিচ্ছ দিদি।

নিরুপমা—চুপ কর। জান না, বোঝ না, শুধু যত বাজে কথা…।

বিন্ধ্যাচলী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে—তুমি কাজে দেখাবে, তবে তো আমি বাজে কথা বলব না। আহা, কেমন সুন্দর হত, যদি তোমার কোলে একটি ফুলফুলুয়া ভুলভুলুয়া টুপুল-টুপুল গোলগাল…।

—ছিঃ, চেঁচিয়ো না বিন্ধ্যাচলী।

সবই শুনেছিল বিজনবিহারী। নিরুপমার হেঁটমাথাটা তুলে ধরে আবার একটা ধূর্ত হাসি হাসে বিজনবিহারী—কিন্তু রামসিংহাসনের বউ তো বলে গেল, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

সেই মুহূর্তে বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ওঠে, করুণ হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে নিরুপমা। দুচোখ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ে বিজনবিহারীর গেঞ্জির বুক ভিজিয়ে দিয়েছে।

—কি হল, নিরু? এর মানে কি?

—সত্যিই তোমাকে ফাঁকি দিলাম মনে হচ্ছে।

—তার মানে?

—তোমার ঘরে শুধু আমিই পড়ে থাকব, আর কেউ আসবে না।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী—পাগল কোথাকার? এমন বাজে কথা ভেবেও মানুষ মাথা খারাপ করে?

—না, একটুও বাজে কথা নয়। তুমি আমাকে ঘর দিলে, আর আমি তোমাকে ঘরের আনন্দ এনে দিতে পারলাম না; আমার যে একটুও ভাল লাগছে না।

—ছিঃ, এসব কি বলছ? তুমি কি মরে গেছ, না, মরে যেতে বসেছ যে, এত হতাশ হয়ে কথা বলছ?

—সেই তো ভয়। যদি হঠাৎ মরে যাই, আর তোমার ঘরে কাউকে রেখে না যেতে পারি, তবে তুমি থাকবে কি নিয়ে? আমি যে হেসে হেসে মরতেও পারব না।

চৌধুরীবাবুও বলেন—আপনি না থাকলে আমি এখান থেকে কবেই ট্রান্সফার নিতাম মাটিসাহেব। ক্ষেপা জংলীর তীরের ভয় মাথায় করে এখানে চাকরি করা আমার বুড়ো হাড়ে পোষাতো না!

—না, আর ভয়টয় নেই। আপনি এখানে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।

—কিন্তু ইয়েতেও যে পোষাচ্ছে না মাটিসাহেব। এই একরত্তি একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন, শুধু কয়লাগাড়ি যায় আর আসে। কি ইনকাম হবে বলুন?

—হবে হবে। শিউলিবাড়ির এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। হেসে হেসে চৌধুরীবাবুকে যেন একটা আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বিজনবিহারী।

চৌধুরীবাবু যদিও বাংলা কথা বলেন, কিন্তু বাঙালী নন, তিনি হলেন মুঙ্গেরী চৌধুরী। তা না হলে বিজনবিহারী এই চৌধুরীবাবুর সঙ্গে এরকম হেসে হেসে কথা বলতেন না। কথা বলতেনই কিনা সন্দেহ। অনেকদিন রাণীগঞ্জে ছিলেন চৌধুরীবাবু, বেচারা টাকা-পয়সার হিসাবে কি-যেন একটা গোলমেলে কাণ্ড করে আর ধরা পড়ে এই জঙ্গলের ফ্ল্যাগ স্টেশনে শাস্তির বদলি নিয়ে এসেছেন। কে জানে কেন, বিজন-বিহারীও বুঝতে পারে না, এই দুর্নামের চৌধুরীবাবুর সঙ্গে যেন একটু মায়া করে কথা বলতে ভাল লাগে।

নিরুপমা বলে—সকলকেই তো ভরসার কথা শুনিয়ে বেড়াচ্ছ, শুধু আমার বেলায় ফাঁকি।

বিজনবিহারীর হাতটা নিরুপমার কাঁধের উপরে পড়ে আছে, চোখের সামনে শিউলিগাছটা দুলছে, আকাশ ভরে তারা গিজগিজ করছে। কথাটা বলে ফেলেই আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে নিরুপমা।

তারার আলোতে জোর না থাকুক, কিন্তু বিজনবিহারীর এই চোখের আলোতে বেশ জোর আছে! দেখতেও পায় বিজনবিহারী, নিরুপমা যেন আঁচল চাপা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার হাসি লুকিয়ে ফেলতে চাইছে।

—ফাঁকি? তোমাকে? বিজনবিহারীর গলার স্বরে যেন একটা নিরীহ বিস্ময় চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—বলেই ফেল, কিসের ফাঁকি?

উত্তর দেয় না নিরুপমা। শুধু চোখ তুলে বিজনবিহারীর মুখটাকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে।

—বল। আবার জানতে চায় বিজনবিহারী।

নিরুপমা হেসে ওঠে—যাঁতা যাঁতা। কতবার বললাম, ছোট্ট একটা পাথরের চাক্কি যোগাড় করে দাও, নইলে ডাল ভাঙতে আর পারছি না। বড় যাঁতাটায় ডাল গুঁড়ো হয়ে যায়।

বিজনবিহারী—তাই বল। আমি মনে করলাম আজ সকালে রামসিংহাসনের বউ এসে যে ফাঁকির কথাটা বলে গেল···।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এই অন্ধকারের মধ্যেই বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটাকে দেখতে পায় নিরুপমা। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার মাথাটা যেন অলস হয়ে আর হেঁট হয়ে বিজনবিহারীর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

ঠিক কথা, আজই সকালে এসেছিল রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী। বোধ হয় মনে করেছিল, বাঙালীবাবু বাড়িতে নেই, তাই রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে একেবারে মুখ খুলে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছিল বিন্ধ্যাচলী।—পাঁচ বছর ধরে তুমি কি শুধু ভাত খাচ্ছ দিদি? আর কিছু খাও না?

—কি বললে?

বিন্ধ্যাচলী—আমার তো এই পাঁচ বছরে তিনটে হয়ে গেল। তুমি করছ কি?

—চুপ কর।

বিন্ধ্যাচলী—না দিদি, একটুও ভাল লাগে না। বাঙালীবাবুকে তুমি বড় ফাঁকি দিচ্ছ দিদি।

নিরুপমা—চুপ কর। জান না, বোঝ না, শুধু যত বাজে কথা···।

বিন্ধ্যাচলী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে—তুমি কাজে দেখাবে, তবে তো আমি বাজে কথা বলব না। আহা, কেমন সুন্দর হত, যদি তোমার কোলে একটি ফুলফুলুয়া ভুলভুলুয়া টুপুল-টুপুল গোলগাল···।

—ছিঃ, চেঁচিয়ো না বিন্ধ্যাচলী।

সবই শুনেছিল বিজনবিহারী। নিরুপমার হেঁটমাথাটা তুলে ধরে আবার একটা ধূর্ত হাসি হাসে বিজনবিহারী—কিন্তু রামসিংহাসনের বউ তো বলে গেল, তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

সেই মুহূর্তে বিজনবিহারীর চোখের ধূর্ত হাসিটা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ওঠে, করুণ হয়ে যায়। কেঁদে ফেলেছে নিরুপমা। দুচোখ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ে বিজনবিহারীর গেঞ্জির বুক ভিজিয়ে দিয়েছে।

—কি হল, নিরু? এর মানে কি?

—সত্যিই তোমাকে ফাঁকি দিলাম মনে হচ্ছে।

—তার মানে?

—তোমার ঘরে শুধু আমিই পড়ে থাকব, আর কেউ আসবে না।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী—পাগল কোথাকার? এমন বাজে কথা ভেবেও মানুষ মাথা খারাপ করে?

—না, একটুও বাজে কথা নয়। তুমি আমাকে ঘর দিলে, আর আমি তোমাকে ঘরের আনন্দ এনে দিতে পারলাম না; আমার যে একটুও ভাল লাগছে না।

—ছিঃ, এসব কি বলছ? তুমি কি মরে গেছ, না, মরে যেতে বসেছ যে, এত হতাশ হয়ে কথা বলছ?

—সেই তো ভয়। যদি হঠাৎ মরে যাই, আর তোমার ঘরে কাউকে রেখে না যেতে পারি, তবে তুমি থাকবে কি নিয়ে? আমি যে হেসে হেসে মরতেও পারব না।

বিজনবিহারী—আমি বলছি নিরু, এসব নিতান্ত মিথ্যে ভয়।

নিরুপমা—আমার মাথা ছুঁয়ে বল, তুমি বললেই আমার সব ভয় মিথ্যে হয়ে যাবে।

সত্যিই নিরুপমার মাথাটা ছুঁতে হয়, তা না হলে বোধ হয় আশ্বস্ত হবে না নিরুপমা।—আমি বলছি নিরু, কোন ভয় নেই।

—যাই হোক···। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে, গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে, বুক টান করে আর হাত দুটোকে ঝাঁকুনি দিয়ে এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে, তখনি যেন একেবারে অন্যরকমের একটা মানুষ হয়ে গিয়ে হেসে ফেলে বিজনবিহারী।

নিরুপমাও জানে, এটা বিজনবিহারীর একটা কাজমাতাল চেহারা। সময় অসময়ের ধার ধারে না। ঘুম বিরাম ক্লান্তি, কিছুই মানে না। কাজ করবার জন্য প্রাণটা যখন ছটফটিয়ে ওঠে, তখন ঠিক এই রকমের মূর্তি ধরে বিজনবিহারী।

—যাই হোক, তার আগে তোমার যাঁতাটা তো চাই। লণ্ঠনটা একবার নিয়ে এস নিরু।

নিরুপমা—না, কথ্খনো না। এখন কোন কাজ নয়। তুমি এখন ঘুমোও গে।

দাওয়া থেকে নেমে, শিউলিতলায় জড়ো করা একগাদা ছোট বড় পাথরের চাঙ্গড় থেকে ছোট্ট একটা চাঙ্গড় তুলে নিয়ে এসে ব্যস্তভাবে বলে বিজনবিহারী—ছেনিটা আর হাতুড়িটা দাও।

না, আর বাধা দেবার কোন মানে হয় না। বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। বিজনবিহারীর দু'হাতের পেশী ও শিরা এখন রাত জেগে শুধু কাজ করবে, কোন বাধা মানবে না।

ঠুক-ঠাক ঠুন-ঠান, ছেনি চালিয়ে আর হাতুড়ি ঠুকে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটার চাকলা তুলতে থাকে বিজনবিহারী। আহত পাথরের কুচি জলন্ত ফুলকি হয়ে ছিটকে পড়তে থাকে। বিজনবিহারীর পাশে বসে হাতপাখা দোলায় নিরুপমা।

আকাশে আধখানা চাঁদ যখন দেখা দিয়েছে, শিউলির মাথা থেকে রাতের শিশির টুপ-টাপ করে ঝরতে শুরু করেছে, তখন কথা বলে বিজনবিহারী—এই নাও তোমার যাঁতা। কাল সকালে শুধু ফিনিস দিয়ে ছেড়ে দেব। তারপর যত ইচ্ছে ডাল ভেঙো।

শুধু এই পাথুরে যাঁতাটা কেন, ঘরের ভিতরে কাঁঠাল কাঠের ওই খাট দুটোও যে বিজনবিহারীর নিজের হাতের কারিগরীর সৃষ্টি। করাত কাটারি ছেনি হাতুড়ি রেতি রঁ্যাদা তুরপুন প্যাচকস—রাংতা-ঝাল, শিরীষ আঠা, সোহাগা—একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক যে বিজনবিহারীর কারিগরী কাজের যত সরঞ্জামে আর হাতিয়ারে ভরে আছে। আলনাটাকেও একদিনের মেহনতে তৈরি করেছিল বিজনবিহারী। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এতগুলি মোড়া আর এই ডিজাইনের মোড়াও বিজনবিহারী নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। তালের পাতা কেটে হাতপাখা তৈরি করতে নিরুপমাও জানে। কিন্তু খেজুর পাতার হ্যাট? এটা বিজনবিহারীর একটা শখের সাধনার সৃষ্টি। একগাদা খেজুর পাতা আর ছোট একটা ছুরি হাতে নিয়ে, আর ঘণ্টার পর

ঘণ্টা যেন ধ্যানীর মত মন নিয়ে ভেবেছে বিজনবিহারী। এক মাসের চেষ্টার পর স্বপ্ন সফল হয়েছে। বাঁধনছাঁদন নেই, একটা গিঁটও দিতে হয় না, শুধু গুনে গুনে পাতা সাজাবার আর ভাঁজ করবার কায়দার জোরে চমৎকার হালকা একটা হ্যাট তৈরি হয়ে যায়।

—এ হ্যাট তোমাকেও চমৎকার মানাবে নিরু। কৃতার্থতার খুশিতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল বিজনবিহারীর চিৎকারটা। নিরুপমা বলেছিল—তুমি পরিয়ে দিলে মানাবে বইকি।

নিরুপমার মাথায় হ্যাট পরিয়ে দেবার সুযোগ অবশ্য পায়নি বিজনবিহারী। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল নিরুপমা।

॥ নয় ॥

দামোদরের উৎসটা খুঁজে বের করতেই হবে, আবার এক অদ্ভুত শখের প্রতিজ্ঞার কথা নিরুপমাকে শুনিয়ে দিয়ে যেদিন শিউলিবাড়ির এই ঘরের দরজা পার হয়ে চলে গেল বিজনবিহারী, খাকি কামিজ আর প্যাণ্ট, পিঠের উপর বাঁধা বন্দুকটা, মাথায় খেজুর পাতার হ্যাট—একটা কর্মঠ সুন্দরতা, একটা সুপুরুষ দুঃসাহস হেসে-হেসে সাইকেল চালিয়ে যখন সড়কের দু-পাশের যত গাছের ছায়ার ভিড়ের ভিতরে উধাও হয়ে গেল, তখন নিরুপমার বুকের ভিতরে একটা আক্ষেপ যেন ছটফটিয়ে মাথা কুটতে থাকে। ভুল হল, ভুল হল। বলে দেওয়াই ভাল ছিল। যেতে না দিলেই ভাল হত।

দামোদরের উৎসটা দূরের ওই মেঘ-মেঘ রঙের পাহাড়গুলোর কাছে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে, কে জানে কোন্ পাহাড়ের গায়ে? পায়ের কাছে, না বুকের কাছে, না মাথার কাছে, তাই বা কে জানে? ফুলনবাবু বলেছেন, ডেপুটি কমিশনার হার্বার্ট সাহেব একবার ক্যামেরা হাতে নিয়ে আর ঝুমরা রাজের হাতীর পিঠের উপর বসে ত্রিশ মাইল দূরের ওই পাহাড়গুলোর একটা ফটো তুলেই খুশি হয়ে গিয়েছিল—বাস্, হো গিয়া! দামোদরকা পোছিকা পাত্তা মিল গিয়া।

এই গল্প শোনবার পর থেকে বিজনবিহারীর মাথায় যেন একটা দুরন্ত শখের জেদ ভর করেছে, উৎসটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বয়সটা তিরিশ পার হয়ে গেলই বা, বিজনবিহারীর এই জেদ যেন ছেলেমানুষের ঘুড়ি ওড়াবার জেদের চেয়েও দুরন্ত। বাধা দিলে কোন ফল হবে না।

বাধা দেওয়া উচিত নয়। কথাটা না বলে ভালই করেছে নিরুপমা। মানুষটা সংসারের কারও স্বার্থের গায়ে একটা আঁচড়ও না দিয়ে, কাঙালের মত কারও দয়া-মায়াকে বিরক্ত না করে, শুধু নিজে শূন্য হয়ে আর রিক্ত ভাগ্যটাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে নিজের তৈরি একটা আনন্দের জগতে ইচ্ছামত খেলছে আর ছুটোছুটি করছে। তাকে বাধা দেওয়া নিরুপমার জীবনের কাজ নয়, তাকে বরং একটু যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়াই যে নিরুপমার জীবনের সাধ।

নিরুপমার গায়ে হঠাৎ জ্বর এসেছে, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, নিঃশ্বাসটা যেন

পুড়ছে, কিন্তু নিরুপমার চোখে-মুখে সেই জরজ্বালার এক ছিটে ছায়াও ফুটে উঠতে দেয়নি নিরুপমা। জরের জ্বালাটাকে জোর করে মনের মধ্যেই চেপে দিয়ে সারা সকালটা হেসে-হেসে আর ছুটোছুটি করে কাজ করেছে, উনুন ধরিয়েছে, রুটি তৈরি করেছে, আলু ভেজেছে। বিজনবিহারীর দু-বেলার ক্ষিদের খোরাক শালপাতায় মুড়ে নিয়ে নিজেরই হাতে সাইকেলের কেরিয়ারে বেঁধে দিয়েছে নিরুপমা।

সে সন্ধ্যায় নয়, মাঝ রাতেও নয়, দরজার কাছে শেষ রাতেও কোন সাইকেলের ঘণ্টি আর বেজে উঠল না। 'আমি এসেছি নিরু' বলে কেউ ডাকও দিল না।

জরের জ্বালার চেয়েও দুঃসহ একটা দুঃস্বপ্নের জ্বালায় ছটফট করে নিরুপমা। অভিশাপের সাপটা বুঝি লখিন্দরের মাথায় এইবার ছোবল দিয়ে ফেলেছে।

না না না। কখখনো না। কোন অভিশাপের সাধ্যি নেই, কাজলীর ভালবাসার বিজুকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।—ও বিন্ধ্যাচলী। এ রামসিংহাসনজী! ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যখন উতলা আর্তনাদের মত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা, তখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছে।

দুটো দিন পার হয়ে যায়।

ফুলনবাবু চারজন লোক আর একটা টাট্টু ঘোড়া দিলেন, রামসিংহাসন আর গুলু মিঁয়া এই দলবল সঙ্গে নিয়ে ঝুমরা পর্যন্ত গিয়ে আর বিজনবিহারীর কোন খোঁজ না পেয়ে যে সন্ধ্যায় শিউলিবাড়ি ফিরে আসে, ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই থানার চৌকি-দারের সঙ্গে আর চারজন জংলীর কাঁধে কাঁচা বাঁশের ডুলিতে বসে দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে এল বিজনবিহারী।

বিজনবিহারীর খাকি কামিজটার গায়ে ছোপ-ছোপ রক্ত শুকিয়ে আছে, কিন্তু মুখটা হাসছে।—এ দুটো দিন শুধু পাকা বটফল আর জল খেয়েছি, কিন্তু দামোদরের উৎসটাকে খুঁজে বের করে ছেড়েছি নিরু।

বিজনবিহারীর গায়ের কামিজ দুহাতে খিমচে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে নিরুপমা—এ কি দশা করে ফিরে এসেছ?

বিজনবিহারী—ভালুকটা হঠাৎ পেছন থেকে এসে···কিছুই করতে পারেনি, পিঠ-টাকে একটু জখম করে দিয়েছে। ভালুকটাকে অবিশ্যি এক গুলিতে সাবড়ে দিয়েছি। ···কিন্তু এ কি?

নিরুপমার কপালে গালে আর গলায় হাত রেখে রেখে আর চমকে চমকে প্রশ্ন করতে থাকে বিজনবিহারী—জর? সত্যিই কি জর? তোমার আবার জর কেন হবে নিরু?

—তুমি আগে কামিজ খোল। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা।

বিজনবিহারী যেন বিরক্ত হয়ে কামিজের পকেট থেকে, কে জানে কোন্ গাছের শিকড়ের একগাদা শুকনো ঝুরি বের করে নিয়ে বলে—আমার চিকিৎসা আমি জানি। কিন্তু তোমার···তোমার কি হল, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই বুঝতে পারেনি, কল্পনাও করতে পারেনি বিজনবিহারী। একদিন দুদিন,

এক মাস দু'মাস, এক বছর দু'বছর—পুরো দুটো বছরও পার হয়ে যাবে, তবু বুঝতে পারা যাবে না, নিরুপমার কেন জর হল ? কোন্ অদৃষ্টের জর ? কোন্ অভিশাপের জর ?

জরে ভুগতে ভুগতে তিনটে মাসের মধ্যে নিরুপমার শরীরটা শুকিয়ে পাকিয়ে কতটুকু হয়ে গেল !

কিন্তু বিজনবিহারীর চোখে যেন কোন আতঙ্ক নেই, উদ্বেগ নেই, এক ছিটে ভয়ের ছায়াও নেই। দু'চোখে যেন একটা জেদের আগুন শুধু দপ্‌দপ্ করে জ্বলে আর কাঁপে। বিজনবিহারীর আত্মাটা যেন অসুর হয়ে খাটছে আর ছুটছে। জল গরম করে নিরুপমার জরের শরীরটাকে ভাপস্নান করিয়ে আর ঠাণ্ডা জলে মাথাটাকে ধুয়ে দিয়েই বের হয়ে যায় বিজনবিহারী। ষোল মাইল দূরের মুণ্ডা গাঁয়ের ওঝার কাছ থেকে শিকড-বাকড় নিয়ে আসে। আসবার পথে মাইল তিনেক ওদিকে জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে মাটি-কাটার কাজটাও দেখে আসে।

রামসিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলী যখন এক থালা ভাত আর এক বাটি কচুর তরকারি নিয়ে এসে নিরুপমার নীরব রান্নাঘরের দরজার কাছে রাখে, তখন দেখতেও পায় বিন্ধ্যাচলী, বাঙালীবাবু এরই মধ্যে সাগু জ্বাল দিয়ে ফেলেছে, সাগুর বাটি দু'-হাতে তুলে নিয়ে নিরুপমার মুখের কাছে ধরে রেখেছে।

কি আশ্চর্য, বাঙালীবাবুর বউয়ের প্রাণটা যেন রান্নাঘরের এই দরজারই কাছে পড়ে আছে। শুনতে পায় বিন্ধ্যাচলী, দুর্বল পাখির বাচ্চার ডাকের মত চিঁ-চিঁ করে বিন্ধ্যাচলীকে একটা অনুরোধের কথা বলছে নিরুপমা।—বাবুর তরকারিতে হিং-টিং দিয়ো না বিন্ধ্যাচলী। কেমন ?

—দিব না।

চলে যায় বিন্ধ্যাচলী।

বিজনবিহারী বলে—ঝুমরা রাজ আমার একটা কথা রেখেছেন।

—কি ?

—শিউলিবাড়িকে একটু বাড়িয়ে তুলতে হবে।

—কি বললে ?

—স্টেশনের পুব দিকের শালজঙ্গল সরিয়ে যদি বাড়ি তৈরির মত ছোট বড় দু'-চারশো প্লট করা যায়, তবে বাইরে থেকে অনেক ভাল লোক এখানে এসে বাড়ি করবে বলে মনে হয়। এরকম ভাল জলহাওয়া তো যেখানে-সেখানে আর সহজে মেলে না।

—কি বললেন ঝুমরা রাজ ?

—রাজি হয়েছেন। শিউলিবাড়ি কোলিয়ারির বাবুরা এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বাড়ি তৈরির জমি চাইছেন।

—ভাল কথা।

—আমিও ঠিক করেছি নিরু, তুমি সেরে উঠলেই, এ-ঘরের লাগাও দক্ষিণে পাকা ইটের দুটো নতুন ঘর তৈরি করব।

নিরুপমার শুকনো সাদা ঠোঁটে একটা করুণ হাসির শীর্ণ ছায়া সিরসির করে।—এখনই শুরু করে দাও, আমার অসুখ কবে সারবে কে জানে? সারবে কি সারবে না, তাই বা কে জানে?

বিজন বলে—সারবে না মানে? তুমি বাজে কথা বলবে না নিরু।

নিরুপমা তবু হাসে—তার মানে, তুমি আমাকে সারিয়ে ছাড়বে?

—নিশ্চয়।

॥ দশ ॥

এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে ফেলেছে বিজনবিহারী। দক্ষিণের ঘর দুটোর নকশাও এঁকে ফেলেছে। ওদিকে, স্টেশনের পুব দিকের শালজঙ্গলও অনেকখানি সাফ হয়ে এসেছে। একশো ছত্তিশগড়ি কুলি আনিয়ে জঙ্গল কাটতে শুরু করে দিয়েছেন ঝুমরা রাজের তশীলদার ফুলনবাবু। মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করছে মাটিসাহেবের মুণ্ডা মজুরের দল।

এরই মধ্যে আরও কত কাজ সেরে ফেলতে পেরেছে বিজনবিহারী। ঝুমরা রাজের সঙ্গে গাঁয়ের মুণ্ডাদের ঝগড়াটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে চলেছিল। মুণ্ডা চাষীরা জমিতে পাকা রায়তী স্বত্ব চায়। খাজনার রেট কমাতে চায়। সালিয়ানা দিতে না পারলেও এক কথায় মুণ্ডা চাষীর হালিয়তী জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না।

দুই পক্ষই শেষে মাটিসাহেবকে সালিশ মেনেছে। মাঝামাঝি একটা রফা করে দিয়েছে বিজনবিহারী। না, হালিয়তী জমিকেও রায়তী জমি বলে মেনে নেবেন ঝুমরা রাজ। নগদ টাকার সালিয়ানা দিতে পারবে না যে, সে শুধু জঙ্গল কাটবার কাজে কিছুদিন খেটে দিলেই সালিয়ানা শোধ হয়ে যাবে। ঝুমরা রাজ চেয়েছিলেন, জঙ্গল কাটবার মজুরী হবে এক আনা, মুণ্ডারা চেয়েছিল চার আনা। বিজনবিহারী রফা করে দিয়েছে—দুই আনা।

রাঁচির দুজন বিদ্বান ভদ্রলোক জানতে পেরেছেন, শিউলিবাড়িতে মাটিসাহেব নামে সাহসী এক ভদ্রলোক থাকেন। একগাদা নানা-রকমের পাথরের নমুনা নিয়ে আর একটা চিঠি নিয়ে রাঁচি থেকে পি এন বসুর লোক বিজনবিহারীর কাছে এসেছিল। শিউলিবাড়ির উত্তরের জঙ্গলটার আট মাইল ভিতরে ঢুকে আর দুধিয়া নামে নদীটার দু'পাশে যত অদ্ভুত-অদ্ভুত পাথরের টুকরো একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রাঁচি পাঠিয়ে দিয়েছে বিজনবিহারী। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন পি এন বসু; লিখেছেন, এরকম পাথরের আরও কিছু নমুনা পাঠাবেন।

রায়বাহাদুর শরৎ রায়ের চিঠি নিয়েও লোক এসেছিল।—মুণ্ডাদের গাঁয়ে একটু খোঁজ করে দেখবেন, আর মাটি কাটাবার সময়েও একটু লক্ষ্য রাখবেন, পাথরের তৈরি কোন কুড়ুল বা টাঙ্গি বা যে-কোন রকমের হাতিয়ার পাওয়া যায় কিনা।

ঠিকই, সিলুয়াডির মুণ্ডা গাঁয়ের কাছে, আম্বিকেলে একটা মশান পাথরের কাছে তেঁতুলগাছের নিচে তিনটে পাথুরে কুড়ুল দেখতে পেয়েছিল বিজনবিহারী। লক্ষ বছর আগের পাথুরে কুড়ুল বোধহয়। সেই পাথুরে কুড়ুল পেয়ে রায়বাহাদুর শরৎ

রায় ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন—অনুগ্রহ করে আরও খোঁজ করবেন।

ঘরের বাইরে এত ধন্যবাদ ; কিন্তু ঘরের ভিতর নিরুপমার চোখ দুটো যেন নিবু নিবু দুটো দীপশিখা ; বিছানার উপর পড়ে আছে শোলার পুতুলের মত হালকা একটা করুণ শরীর। এক বছরের জরটা এখনও যেন নিরুপমার পাঁজরের আড়ালে ধুকপুক করছে। তা ছাড়া, আর-একটা শত্রু, আমাশা। নিরুপমাকে রক্তহীন করে যেন হাড়মাংসের এক মুঠো সাদা ছোবড়া করে বিছানার উপর ফেলে রেখে দিয়েছে।

বিজনবিহারী যখন থানকুনি পাতার ঝোলের বাটিটা নিরুপমার মুখের কাছে তুলে ধরে, তখন নয়, যখন নিরুপমাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে থাকে বিজনবিহারী, তখন নিরুপমার সেই নিবু-নিবু চোখ দুটো যেন বড় হয়ে হেসে ওঠে।

বিন্ধ্যাচলীও কতবার বাড়ির ভিতরের বারান্দায় এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে। আর, কোন শব্দ না করে শুধু চোখ মুছতে মুছতে বারান্দা থেকেই ফিরে চলে গিয়েছে। দেখেছে বিন্ধ্যাচলী, নিরুদিদিকে কোলে করে তুলে নিয়ে ওদিকের ছোট ঘরের ভিতরে চলে গেল বাঙালীবাবু। উপায় তো নেই, নিরুদিদির যে আর নড়ে বসবারও সাধ্যি নেই।

বিকেল হলে, বাঙালীবাবু যখন বাড়িতে থাকে না, তখনও এসে দেখতে পায় বিন্ধ্যাচলী, চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে নিরুপমা। বাঙালীবাবু কিন্তু এত কাজের মধ্যেও একটা কাজ ভুলে যায় নি, নিরুপমার মাথার রুক্ষ চুলের বোঝাটাকে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আর ঢিলে করে একটা খোঁপা বেঁধে দিয়ে, সিঁথিতে টাটকা সিঁদুর বুলিয়ে দিয়ে, তবে বাইরের কাজে বের হয়ে গিয়েছে বাঙালীবাবু।

তশীলদার যুগলবাবু একবার বলেছিলেন, মাটিসাহেবের স্ত্রীকে রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে ভাল হত। কিন্তু আক্ষেপও করেছিলেন, এখন আর সেটা সম্ভব নয়। রামসিংহাসন যা বলছে, তাতে তো মনে হয় যে মোটরবাসের একটি ঝাঁকুনিতেই মহিলার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর, মোটরবাসেরও যা চেহারা আর যা মতিগতি ! আধমাইল যেয়েই হয়তো চাকাভাঙা হয়ে তিন ঠ্যাং-এর উপর দাঁড়িয়ে থাকবে ; পাঁচ-সাত-দশ ঘণ্টার মধ্যেও আর নড়বে না। তা ছাড়া, ষাট মাইলের পর দারু-চটিতে বাস বদলও আছে। সারা রাতটা সেখানে পার করে দিয়ে পরের দিন সকাল আটটায় রাঁচির বাস ধরতে হয়। সে বাসও রোজ সকাল আটটায় ছাড়ে না। মুচি আসে, ফাটা টায়ার তালি দিয়ে সেলাই করে হাওয়া ভরতে হয়তো আরও দুটো ঘণ্টা। তারপর রওনা হয় বাস, যদি স্টার্ট নিতে ইঞ্জিন আর দেরি না করে। এই অবস্থায়...না, মাটিসাহেবের স্ত্রীকে এখন রাঁচি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়।

বিজনবিহারী জানে, শুধু এখন কেন, তখনও নিরাপদ ছিল না, যখন নিরুপমার জরের শরীরটা কাহিল হয়েও উঠতে বসতে আর একটু হাঁটাহাঁটিও করতে পারত। শিউলিবাড়ির বাইরের পৃথিবীটা যে বড়দা আর মেজদার সম্পত্তি ; বেন্দুগ্রামের

দৈবজ্ঞীর শাস্ত্র ; মেজমামা আর উকীলবাবুর আদালত। ঠাট্টা ঘেন্না আর অপমানের জগৎ। নিরুপমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বিজনবিহারী, এক মুহূর্তের জন্যেও না। হাসপাতালের খাতা প্রশ্ন করবে, কে আপনি ? পিতার নাম কি ? উনি কি আপনার স্ত্রী ? কতদিন বিবাহিত ? কতগুলো গিধ আর শকুন যেন বিজন-বিহারীর প্রাণটাকে ঠুকরে ঠুকরে প্রশ্ন করবে। হয়তো ডাক্তারটা চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে বসবে, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ? কিংবা, নিরু-পমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নার্স বলে বসবে, বেন্নগ্রামে আমার এক মামী ছিলেন, ঠিক আপনার মত দেখতে ! না, ও জগতের ধারে-কাছেও আর নয়।

শিউলিবাড়ির আলো-বাতাসেরও প্রাণের সব জোর কি ফুরিয়ে গেছে, নিরুপমার কাহিল প্রাণটাকে টেনে তুলতে পারবে না ? গরীব ওঝার বিশ্বাসের ঝুলির যত শিকড়-বাকড় সবই মিথ্যা, সত্য শুধু ওই ওদের হাসপাতালের ওষুধ ?

না, বিশ্বাস করে না বিজনবিহারী। নিরুপমা আজ এখনই যদি···না, তবুও বিশ্বাস করবে না বিজনবিহারী।

সেদিন অনেক রাতে শালের জঙ্গলের ঝড়টা শান্ত হয়ে যেতেই শিউলিবাড়ির অন্ধকার যেন সব ঝিঁঝির ডাক চুপ করিয়ে দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিউলি-তলায় একটা শুকনো পাতাও উসখুস করে না।

নিরুপমার শিয়রের কাছে বাতিটাকে একটু উসকে দিয়ে আর দুই চোখ অপলক করে নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী। হিক্কাটা আস্তে আস্তে যেন মৃদু হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার একটু পর থেকে শুরু হয়েছে নিরুপমার ওই হিক্কার শব্দটা। কী-হিংস্র একটা ঠাট্টার শব্দ ! একটা জলন্ত ডাকাতের হাতের মশালের মত শাস্তির গর্ব যেন বিজনবিহারীর বুকে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে হাসছে আর কথা বলছে ; শিউলিচোর ! শিউলিচোর ! একটা অমানুষ হয়েও বাংলাদেশের শিউলি চুরি করে নিয়ে এসে এই জঙ্গলের ভেতরে সুখের ঘর করবে ? খুব যে আশা করেছিলে আর সাহস দেখিয়েছিলে বিজনবিহারী ?

বিজনবিহারীর দুঃসাহসের বুকটাকে ঘিরে আর চোখ পাকিয়ে কথা বলছে কেষ্ট-নগর আর বেন্নগ্রামের অভিশাপ। এ-ঘর আর ও-ঘর, কখনও বা একেবারে ঘরের বাইরে বারান্দায়, ছুটোছুটি করে ঘুরতে থাকে বিজনবিহারী। চোখ দুটো যেন মাথার ভিতরের একগাদা পাগল রক্তের চাপ সহ্য করতে না পেরে লাল হয়ে ফুটতে থাকে।

ওই তো বন্দুকটা পড়ে আছে। টোটার মালাটাও কাছেই আছে। নিরুপমার কানের কাছে ফিসফিস করে এখনি বলে দিতে পারা যায়, কোন ভয় নেই নিরু, তুমি হেসে হেসে আমার হাতেই মরে যাও; অভিশাপটার হাতে মরো না। ও অভিশাপের হাতে তোমাকে মরতে দেব না। আমি এখুনি···।

হঠাৎ চোখ মেলে আর কি-অদ্ভুত একটা জলজলে অথচ ছটফটে একটা দৃষ্টি তুলে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। নিরুপমার একটা হাতের উপর

হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকে বিজনবিহারী—কি নিরু ?

—না, তোমাকে একা রেখে, তোমার ঘর খালি রেখে আমি মরতে পারব না। চেঁচিয়ে ওঠে নিরুপমা। নিরুপমার ধুকপুকে বুকের ভিতর থেকে যেন সমস্ত শক্তি নিয়ে একটা দুর্বার পিপাসা চেঁচিয়ে উঠেছে।

বিজনবিহারীর প্রাণটা যেন চিৎকার করে ওঠে।—না, কখ্খনো না, তুমি মরতে পারবে না, নিরু।

নিরুপমা বলে—ভগবান আমাকে বাঁচাতে চায় না। ভগবান আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তুমি পারবে—তুমি আমাকে বাঁচাও, লক্ষীটি !

—নিশ্চয় বাঁচাবো।

—একটু কাছে এস।

নিরুপমার কপালের উপর মুখটাকে উপুড় করে পেতে দিয়ে, যেন একটা ধীর স্থির ও শান্ত স্বপ্নের স্নেহ হয়ে থাকে বিজনবিহারী।—ঘুমোও নিরু ! নিরুপমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায় বিজনবিহারী। ওঝা বলেছে, ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে মাথাটাকে ডান থেকে বাঁয়ে শুধু একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুলিয়ে দিলে জাদু তাড়াতাড়ি জাগে।

খুব ঘুমিয়েছে নিরুপমা। তিন ঘণ্টার মধ্যে একবারও জাগেনি। কপালটাও ঘামে ভিজে গিয়েছে। ভোরের পাখিও ডেকে উঠেছে। নিরুপমার কপালের ঘাম মুছে দিয়ে পাখার বাতাস দিতে থাকে বিজনবিহারী।

চোখ মেলে তাকায় নিরুপমা, আর, শালের কচিপাতার উপর ভোরের আভার মত একটা লালচে হাসির আভা যেন নিরুপমার সাদা ঠোঁটের উপর ফুটে ওঠে।—শুনছ ?

—কি নিরু ?

—মাথার জালাটা সত্যিই যে নেই বলে মনে হচ্ছে।

পূজা পূজা পূজা ! সকালবেলাতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রামসিংহাসনকে তাগিদ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে বিন্ধ্যাচলী। বাঙালীবাবুর বউয়ের উপর পিশাচের যে নজর পড়েছিল, সে নজর ছুট গইল বা। মিছরি বেল আর জবা ফুল নিয়ে রামসিংহাসনকে এখনই রওনা হতে হবে, দশ মাইল দূরে দামোদরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

।। এগার ।।

একটা সিমেন্টের কারখানা নাকি শিগগিরই চালু হবে। সিংভূমের রাখা মাইনস্ থেকে দুজন সাহেব এসেছিলেন। মাটিসাহেবের ডাক পড়েছিল। ঢুধিয়া নদীর দু' পাশের পাথুরে ডাঙায় এদিকে-ওদিকে সাহেবদের সঙ্গে তিনটে দিন সারাবেলা ঘুরে বেড়িয়েছে বিজনবিহারী। কৃতজ্ঞ সাহেবরা যাবার সময় বিজনবিহারীকে একটা জিনিস উপহারও দিয়ে গেলেন—একটা গ্রামোফোন, আর এক ডজন রেকর্ড—এক ডজন বিলিতী বাজনা আর বিলিতী গান। বাংলা গানের রেকর্ড হলে বোধহয় এই

উপহার ছুঁতেও চাইত না—ছুঁতে পারতোও না বিজনবিহারী।

শিউলিবাড়ির ইতিহাসেও এটা একটা রেকর্ড, প্রথম কলের গান বাজল। এই বিস্ময়ের গান শোনবার জন্য বিজনবিহারীর বাড়ির বারান্দার কাছে একটা ভিড়ও জমে উঠেছিল। এমন কি, গুল্ মিয়াঁর বউ, যে মানুষটা ঘরের বাইরে একটা গাছের দিকেও উঁকি দিতে চায় না, সে-মানুষও ছেলে কোলে নিয়ে আর নিরুপমার কাছে বসে কলের গান শুনে চলে গিয়েছে।

তশীলদার যুগলবাবুও একদিন জানিয়েছেন, দেড়শো প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

—কিনলে কারা?

—কিছু প্লট বাঁচির মাড়োয়ারীরা কিনেছে। কিছু কিনেছে গোমোর ফিরিঙ্গী সাহেবরা। ঝুমরা রাজের রাজপুত কুটুমেরাও কিছু কিছু কিনেছে।

—খুব ভাল হয়েছে। যেন একটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী। কোন বাঙালী যে একটাও প্লট কেনেনি, এটা যেন বিজনবিহারীর জীবনের কাছে একটা আশ্বাসের সংবাদ।

তিনটে বছরের মধ্যে শিউলিবাড়ির বাজারটাও বেড়েছে। কোথা থেকে অচেনা-অজানা এক শিখ সর্দার একদিন শিউলিবাড়িতে এসে মাটিসাহেবেরই সঙ্গে রোজ-গারের উপায় আলোচনা করেছিল, পরামর্শও চেয়েছিল। সর্দার সুচেত সিং। ঝুমরা রাজের একটা জঙ্গলকে লীজ পাইয়ে দেবার জন্য সুচেত সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিজন-বিহারী তিনদিন ঝুমরা রাজের বড় কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিল। লীজ পেয়েছিল সুচেত সিং। সুচেত সিংএর কাঠের গোলাটা এখন লম্বায় প্রায় আধ মাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নানা নতুনের আবির্ভাবে ভরে উঠেছে ছোট্ট শিউলিবাড়ি। স্টেশনমাস্টার চৌধুরীবাবুর মুখেও একটা নতুন হাসির আবির্ভাব দেখা যায়—একটা সুখবর আছে মাটিসাহেব। এ লাইনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন নাকি চালু হবে।

—তাহলে আপনার একজন অ্যাসিস্টেন্টও হবে নিশ্চয়।

—ওটাই তো ভাবনার কথা মাটিসাহেব। যদি ভাল লোক হয়, তবে ইনকামের শেয়ার নিয়ে হয়তো তেমন কিছু খিটিমিটি বাধাবে না। কিন্তু যদি না হয়, তবে?

আর, নিরুপমার মুখের দিকে তাকালে যে সবচেয়ে সুন্দর নতুনের আবির্ভাবের হাসিটাকে দেখতে পাওয়া যায়! নিরুপমার মুখের উপর যেন রাঙা জবার আলো ফুটে উঠেছে। শরীরটাও কী সুন্দর স্বাস্থ্যে ভরে গিয়েছে। রামসিংহাসনের বউ হিসেব করে দিন গুনছে।

—ছি ছি, এ কি করছ? এখনই এসব কেন? বিন্ধ্যাচলী দেখতে পেলে যে তোমার নামেও যা-তা বলে ঠাট্টা করবে। নিরুপমা দু'বার এসে বাধা দিয়েছে আর হেসেও ফেলেছে।

সেগুনের একটা পাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে, আর করাত হাতুড়ি রঁ্যাদা নিয়ে দুদিন ধরে যে কাণ্ডটা করে চলেছে বিজনবিহারী, সেটা বিন্ধ্যাচলী এখনও

দেখতে পায় নি। দেখে থাকলেও বুঝতে পারেনি। একটা দোলনা তৈরি করছে বিজনবিহারী।

বিজনবিহারী বলে—যা-তা আর কি বলবে রামসিংহাসনের বউ? বড় জোর বলবে, ভুখা বাঙালী।

—কথাটা তাহলে সত্যি?

—নিশ্চয়।

ভুখ, ঠিক কথা, একটা স্বপ্নের ভুখ যেন এতদিনে একটা আশার আশ্বাসে বিভোর হয়ে বিজনবিহারীর চোখ দুটোকেও নিবিড় করে তুলেছে।

সেই সন্ধ্যাতেই, যখন বারান্দায় কেরোসিনের আলোর কাছে বসে বুরুশ চালিয়ে দোলনার ফ্রেমে গালা বার্নিশ লেপতে শুরু করেছে বিজনবিহারী, তখন ঘরের ভিতর থেকে উতলা হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে থাকে নিরুপমা—বিন্ধ্যাচলীকে এখনই ডেকে দাও।

—বিন্ধ্যাচলীকে কেন?

—একলা হয়ে পড়ে থাকতে যে বড় ভয় করছে। শিগগির ডেকে দাও।

—কোন ভয় নেই, আমি আছি। রামসিংহাসনের বউকে ডাকবার কোন দরকার নেই।

তিন ক্রোশ দূরে কাট্‌কি জঙ্গলের বস্তিতে যে চামারিন বুড়িটা থাকে, সিধো চামারের মা, তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। বুড়িটা রামসিংহাসনের বাড়িতেও দুবার ধাইয়ের কাজ করেছে। কিন্তু এক মাস ধরে কাট্‌কিতে বাঘের হাম্‌লা চলছে। তাই বোধ হয় আসতে পারেনি বুড়িটা।

কিন্তু বিজনবিহারীর মনটা সেজন্য একটুও দুশ্চিন্তিত নয়। বিজনবিহারীর হাত দুটো আজ যেন ইচ্ছে করে এক পরম কারিগরীর কাজ করে ধন্য হতে চায়। একটা শিউলি-কুঁড়িকে শুধু দু' হাত পেতে তুলে নেওয়া, আর নাড়ি কেটে ধোওয়া-মোছা করে নিরুপমার বুকের কাছে শুইয়ে দেওয়া।

বড় শান্ত আর বড় স্নিগ্ধ রাত্রি। এক ঘণ্টাও সময় লাগেনি, নিরুপমার শরীরটা যখন সব যন্ত্রণার ভার থেকে মুক্ত হয়ে একটা স্নিগ্ধ তন্দ্রার ঘোরে শান্ত হয়ে পড়ে থাকে, তখন নিরুপমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় বিজনবিহারী, যেন একটা স্নিগ্ধ জয়রব—এই দেখ নিরু, তোমার মেয়ে। আর, নিরুপমার চোখদুটোও তাকাতে গিয়ে যেন এই নতুন বিস্ময়েরই সুখে হাসতে থাকে।

যখন দূরের খেজুর গাছের কাছে একটা ল্যাম্পের আলো দপ্‌দপ করে জ্বলে, আর শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে বিজনবিহারী, তখন বাঙালীবাবুর বাড়িতে নতুন আবির্ভাবের কান্নার স্বর শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে বিন্ধ্যাচলী।

—বেটি ভইল বা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুশির হাসি ছড়িয়ে চলে যায় বিন্ধ্যাচলী, আর বিজনবিহারীও ফিরে এসে হাত ধুয়ে নিয়ে শিউলিতলার পাথরটার উপর শান্ত হয়ে বসে। রামসিংহাসনের বাড়িতে তখন ঢোলক বাজতে শুরু করেছে।

কে বাজাচ্ছে? রামসিংহাসন? না, রামসিংহাসনের বড় ছেলেটা?

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কান পেতে থাকলে ঢোলকের শব্দটাকে বড় অদ্ভুত শোনায়। যেন আকাশে ঢোলক বাজছে। প্রয়াগের ধর্মশালার সেই সাধুটা ধুনীর আগুনের কাছে বসে গল্প করতে করতে বলেছিল, যখন পৃথিবীতে কোন পুনীত প্রাণ জন্ম নেয়, তখন আকাশমে দুন্দুভিনাদ হোতা হ্যায়।

ঢোলকটা বাজছে বিজনবিহারীর বুকের আকাশে। সত্যিই যে মনে হচ্ছে, মস্ত একটা পুণ্যির প্রাণ জন্ম নিয়েছে। এই তো ওখানে, ওই ঘরে, নিরুপমার বুকের কাছে ঘুমিয়ে আছে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে।

চোখ মেলে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকায় বিজনবিহারী। কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকে। যেন হাত বুলিয়ে ভাগ্যেরই একটা বিস্ময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছে বিজনবিহারী।

মনটাই বা হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেল কেন? এ-মনে এক ছিটেও রাগ নেই, আর প্রাণটাও যেন কারও উপর রাগ পুষে রাখতে চাইছে না, পারছেও না।

জেদটার সব ঝাল মিটে গিয়েছে। আর জেদটাও যেন একটু লজ্জা পেয়েছে। তাই বোধ হয় বুকের ভিতরে একটা গর্বের সুখ লাজুক তারার মত মিটিমিটি হাসছে।

কিন্তু সেজন্যে এত শান্ত হয়ে যাবে কেন মনটা? না, সেজন্যে নয়। মনে হয়, অভিশাপ নয়, মস্ত বড় একটা আশীর্বাদ যেন হাত তুলে একটা লগ্নের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। বিজনবিহারীর কপালটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে আজ সেই আশীর্বাদের হাত। তা না হলে, বাংলাদেশের শিউলিতে এরকম একটি কুঁড়ি ফুটবে কেন? বিজনবিহারীর আশার ঘর এমন একটা উপহার পেয়ে যাবে কেন?

নিরুপমা যে বাংলাদেশেরই একটা গোপন দান। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে একটা ফেরারী আসামীর গা-ঢাকা জীবন বলে মনে করবার কোন মানে হয় না। বিজনবিহারী যেন মিথ্যে রাগ করে নিজেরই বিরুদ্ধে একটা মিথ্যে অভিযোগের মামলা দায়ের করেছিল। বাংলাদেশের শিউলি চুরি করেনি বিজনবিহারী। কেষ্টনগর শিবপুকুর আর বেহুগ্রাম, যেন তিনটি ভীরু-মায়ার প্রাণ, শুধু একটা চক্ষুলজ্জার ভয় ছিল বলেই খিড়কির দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে বিজনবিহারীর হাতে একটা মায়ার দান ঢেলে দিয়েছিল। ছিঃ, এতদিন ধরে ভুল করে কার উপর রাগ পুষে এসেছে বিজনবিহারী?

॥ বার ॥

—কি ব্যাপার? মাটিসাহেব যে একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেল দেখছি। কথাটা বলেই মুখ টিপে হাসতে থাকে নিরুপমা।

নিরুপমার এই মুখ-টেপা হাসিটা একটা মিষ্টি বিস্ময়ের হাসি নিশ্চয়, কিন্তু একটা মিষ্টি চিমটির হাসিও বটে।

সূর্য উঠতে না উঠতে যে মানুষটা তড়বড় করে দুটো রুটি চিবিয়ে আর জল খেয়ে

সাইকেলটাকে আঁকড়ে ধরে, আর হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে যায়, সে মানুষটা এখনও যায়নি, যদিও সূর্য ওঠবার পর তিনটি ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে।

মাটিসাহেবের কাজের জীবনের সেই তাড়াহুড়োর নিয়মটা যেন একটু বিপদে পড়েছে। শেষ রাতে উঠে উনুন জেলে রুটি তরকারি তৈরি করে দিতে নিরুপমার যেটুকু সময় লাগে, সেটুকু সময়ের অপেক্ষা সহ্য করবার মত ধৈর্যও বিজনবিহারীর ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজের ধড়াচূড়া গায়ে চড়িয়ে—শোলার হ্যাট, খাকি কামিজ, খাকি হাফ-প্যান্ট আর বুট পরে, বন্দুকটাও পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিল্ডে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যেত বিজনবিহারী। মাটি-কাটার জায়গাটা, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরের ফিল্ডটা বিজনবিহারীর কাছে সত্যিই যেন যুদ্ধের ফিল্ড। তা না হলে সাজটাও এরকম জঙ্গী হয়ে যাবে কেন? দুপুরের খাওয়ার রসদ হিসাবে এক দিস্তা রুটি, দু' মুঠো আলুর তরকারি আর গুড়ের একটা ডেলা শালপাতায় মুড়ে নিয়ে এত ব্যস্তভাবে ছুটে যাবার অভ্যাসই বা হবে কেন? ঝড়-বাদলের দিনেও বিজনবিহারীর অভ্যাসের এই রীতিটার নড়-চড় হতে দেখা যায়নি। কিন্তু আজকাল, বিশেষ করে আজ, এ কি কাণ্ড করে বসে আছে বিজনবিহারী? সকালের রোদ ঝলমল করছে, তবু বিজন-বিহারী এখনও কাজে বের হয়ে যেতে পারেনি। মুখ টিপে না হেসে থাকতে পারবেই বা কেন নিরুপমা?

মেয়েকে বুকের উপর বসিয়ে শিউলিতলার ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী। সাইকেলটাও একপাশে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। শোলার হ্যাটটা আর বন্দুকটাও। বিজনবিহারীর খাকি কামিজের বুকের উপর একগাদা টাটকা শিউলি। মেয়েটা সেই শিউলির গাদা দু'হাতে ঘেঁটে ঘেঁটে খেলা করছে। আর দু'চোখ বন্ধ করে যেন একটা তৃপ্তির ভারে অলস হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বিজনবিহারী।

—শুনছ? আবার ডাক দেয় নিরুপমা।

—কি হল? চমকে উঠে প্রশ্ন করে বিজনবিহারী।

—ফিল্ডে যাবে না? আবার মুখ টিপে হাসে নিরুপমা।

—তুমি মেয়েটাকে ধরবে তবে তো যাব।

—মেয়ে তো ঘুমিয়েছিল। তুমি ওকে তুলে নিয়ে এলে কেন?

—এ সব কথার কোন মানে হয় না, নিরু। আমার কাজে বের হবার সময় খিটি-মিটি করে দেরি করিয়ে দিয়ো না।

বিজনবিহারীর মেয়ে, বয়স দু' বছর, নাম সুনন্দা। নিরুপমা আর বিজনবিহারী ডাকে নন্দু। বিন্ধ্যাচলী বলে—নন্দুয়া। মাটিসাহেবের বেটি নন্দুয়ার মুখটা কী সুন্দর! কৈসন ফুটলকা কমল বা!

রামসিংহাসনের বড় মেয়েটা, রাজমোহিনী, ছ' বছর বয়স, দৌড়ে এসে নন্দুকে কোলে তুলে নেয়। নিরুপমা জানে, এখন অন্তত একটি ঘণ্টা নন্দুকে কোলে নিয়ে আর কাঁকাল বেঁকিয়ে ট্যাং-ট্যাং করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে রামসিংহাসনের

এই মেয়েটা, ছ'বছর বয়সের এই রাজমোহিনী।

সাইকেল চালিয়ে বেশি দূর যায়নি বিজনবিহারী। কিন্তু যেন একটা বাধা পেয়ে আচমকা ব্রেক কষে থেমে পড়েছে বিজনবিহারী। অথচ পথের উপর কোন বড় পাথর-টাথরও নেই, কোন নালা খানা গর্ত-টর্তও নেই।

আকাশের দিকে অমন করে তাকিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে বিজনবিহারী? আশ্বিনের সকালের আকাশ, ঝলমলে রোদ, কালো মেঘের ছিটে-ফোঁটাও তো কোথাও নেই।

সাইকেলটাকে হাতে ঠেলে আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে আসে বিজনবিহারী।

—কি হল? বিজনবিহারীর গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে নিরুপমার গলার স্বর যেন একটা চাপা ভয়ের গুঞ্জনের মত বেজে ওঠে।

হ্যাট আর বন্দুক নামিয়ে রেখে, পা থেকে বুট-জোড়াও খুলে সরিয়ে দিয়ে, যেন আরও হাল্কা হবার জন্য জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে বিজনবিহারী।

মুখটা গম্ভীর, কিন্তু চোখ দুটো চিক-চিক করছে। মাঝে মাঝে মাথা হেঁট করেও কি যেন ভাবছে। বিজনবিহারীরও যে এরকম একটা করুণ রকমের অশান্ত চেহারা থাকতে পারে, চোখে না দেখলে ধারণা করতে পারত না নিরুপমা। তা ছাড়া, কোনদিনও বিজনবিহারীর চোখ দুটোকে এভাবে চিকচিক করে কাঁপতে দেখেনি নিরুপমা। যেন একটা ভক্ত মানুষের চোখ, কাউকে পুজো করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে।

—ফিরে এলে কেন? নিরুপমার গলার স্বর আবার ভীরু হয়ে কেঁপে ওঠে।

—ছিঃ, আজকেও সাত-সকালে জানোয়ারের মত রুটি চিবোতে হল। জঙ্গলে এসে অভ্যেসটাই জংলী হয়ে গিয়েছে।

কাকে ধিক্কার দিয়ে আক্ষেপ করছে বিজনবিহারী? নিজেকে? কেন?

—এতদিন ধরে রাগের মাথায় কি-ভয়ানক একটা বিশ্রী ভুল করে এসেছি, নিরু! রাগই হল ভূত, একবার ঘাড়ে ভর করলে সব ভুল করিয়ে দেয়।

—ভুল? আশ্চর্য হয়ে তাকায় নিরুপমা।

—হ্যাঁ। আজ হল ছাব্বিশে আশ্বিন। বাবার মৃত্যুদিন। আজ আমার উপোস করা উচিত ছিল, বাবার বাৎসরিক কাজটাও করা উচিত।

নিরুপমার চোখ ফেটে বোধ হয় একটা করুণ বিস্ময়ের ফোয়ারা উথলে উঠবে, বুক-টাও ফুঁপিয়ে উঠবে। সরে গিয়ে বিজনবিহারীর পিছনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিরুপমা।

—যাই হোক, তবু আজ আর আমি কিছু খাব না নিরু। হ্যাঁ, এখনই তাহলে বেরিয়ে যাই, ছোট নদীটায় স্নান করে আসি। এক মুঠো তিল দাও তো নিরু।

শিউলিবাড়ির ছোট নদী, ওই ডাঙার উপর দিয়ে আধ মাইল এগিয়ে গেলে বালু ছড়ানো নদীটার বুকের মাঝখানে ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া স্রোতটা দেখা যায়। নদীর ধারে একটা বট আছে, বটের পায়ের কাছে সিঁদুরমাখা একটা পাথর আছে, আর

সাতটা পাথরের ধাপ নিয়ে একটা ঘাটও আছে।

স্নান সেরে, এক মুঠো তিল স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে, আর ভিজে ধুতির খুঁটে গা জড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসে বিজনবিহারী, তখন বিজনবিহারীর তৃপ্তি-ভরা স্নিগ্ধ মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সরে যায় নিরুপমা। ভিতরের ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে কান্না চাপে আর চোখ মোছে।

বিজনবিহারী ডাক দিয়ে বলে—কোথায় গেলে? শুনছ? এ বছর ভুল-টুল যা হল তা তো হল, কিন্তু আসছে বছর কাজটা এভাবে সারলে চলবে না। শাস্তরে যা বলে, যেটা নিয়ম, সেভাবে করতে হবে।

নিরুপমা সাড়া দেয়—হ্যাঁ, করবে বইকি।

—কিন্তু সেজন্যে যে পুরুত চাই।

—চাই বইকি।

—ঝুমরা রাজের পুরুত শর্মাজীকে দিয়ে কাজ চলতে পারে, কিন্তু···কিন্তু বাঙালী পুরুত হলেই ভাল হয়। কি বল?

নিরুপমা বলে—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তো করছ, কিন্তু কোথায় তুমি?

এবার আর নিরুপমার সাড়া পায় না বিজনবিহারী। কিন্তু চমকে উঠতে হয়। যেন ওঘরের ভিতর থেকে একটা ডুকরে ওঠা নিঃশ্বাসের শব্দ সাড়া দিয়েছে।

—এ কি হচ্ছে নিরু? দেখে আশ্চর্য হয় বিজনবিহারী, আঁচল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে মেঝের উপর নিথর হয়ে বসে আছে নিরুপমা। কেন? আজ আবার কোন্ ভয়ের ছায়া দেখতে পেল নিরুপমার উজ্জ্বল হাসির চোখ দুটো?

বিজনবিহারী ডাকে—কি হল?

—কিছু না। তুমি কিছু ভেব না।

—ভাবিয়ে দিয়ে ভেব-না বললে চলে না। আজ তুমি হঠাৎ কি ভেবে··· ।

—জানতে চেয়ো না। বলতে পারব না।

হঠাৎ চোখ ঘষে আর মুখের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে শান্ত ও সুস্থির হয়ে বসে জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিরুপমা। চোখ দুটোও শান্ত শুকনো খট্‌খটে। নিরুপমার এরকমের মূর্তি একটু অদ্ভুত বটে। তাই বোধ হয় একটা শালিক বার বার জানলার কাছে এসে বসছে, আর ঘরের ভিতরের দিকে একবার তাকিয়েই উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

বিজনবিহারীর কানেও বোধ হয় নিরুপমার কথার শব্দটা নতুন বিস্ময়ের আঘাতের মত বেজেছে। জানতে চেয়ো না! কি-অদ্ভুত শুকনো স্বরে কথাটা বলেছে নিরুপমা। কথাগুলি যেন এক মুঠো ঠাণ্ডা আর বাসি ছাই, হঠাৎ জ্বালার ছোঁয়া পেয়ে তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজনবিহারীর জীবনের কোন আগ্রহের জিজ্ঞাসাকে এভাবে চুপ করিয়ে দিতে চাইবে নিরুপমা, এটা যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না বিজনবিহারী।

কি-এমন নতুন আর অদ্ভুত কিছু দেখতে পেল নিরুপমা, যেজন্যে নিরুপমার ভিজে চোখ দুটো এত শুকনো হয়ে যেতে পারে, আর গলার স্বরে এত শুকনো ছাই ঝরাতে পারে নিরুপমা ? আজ ছাব্বিশে আশ্বিন, বাবার বাৎসরিক স্মৃতির তর্পণের জন্য স্রোতের জলে শুধু একমুঠো তিল ভাসিয়েছে বিজনবিহারী, কিন্তু সেজন্য নিরুপমার প্রাণটা ভীরু হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলবে কেন ? আবার কান্নার চোখ দুটোকে এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলবেই বা কেন ? দেখতে পেয়েছে বিজনবিহারী, নিরুপমার হাতটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে চোখ দুটোকে একটা হতাশ অভিমানের আঘাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষছে।

বিজনবিহারী বলে—জানতে চাইব না কেন ?

—না , জেনে তোমার কোন লাভ হবে না।

—আমাকে না জানিয়ে কি তোমার কোন লাভ হবে ?

—তুমি সুখী হবে।

—তার মানে ?

—তুমি শাস্তর আনবে, নিয়ম আনবে, বাঙালী পুরুত ঠাকুর আনবে , তবে আর আমাকে কেন ?

—তার মানে ?

—আমাকে বাদ দাও।

—এর মানেই বা কি ?

—আমাকে চলে যেতে দাও।

—কোথায় যাবে ?

—শিউলিবাড়িতে কি শ্মশান নেই ?

—আছে বইকি। কিন্তু যাবে কেন ?

—যেখানে শাস্তর আসবে, নিয়ম আসবে, মন্তর আসবে, সেখানে আমি থাকব কি করে ? বাঁচব কি করে ? নিরুপমার শুকনো চোখের তারা দুটো যেন ছটফটিয়ে পুড়তে থাকে।

—কি বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

—বলছি তো ! শাস্তর নিয়ম আর মন্তর এসে তো একদিন আমাকে তাড়িয়েই ছাড়বে। তার চেয়ে ভাল, তার আগে তুমিই তাড়িয়ে দাও। তোমার হাতের আগুন মুখে নিয়ে ছাই হয়ে যাই। শাস্তর এসে পড়লে তো আর তোমার হাতে এ সাহসটুকুও থাকবে না।

নিরুপমার প্রাণও এমন বিদ্রোহ করতে জানে ? আর বিদ্রোহটাও এমন ভাষায় কথা বলতে পারে ? আর, ভাষাটাও বিজনবিহারীকে এত ভীরু বলে গাল দিতে পারে ?

কি-যেন বলতে চায় বিজনবিহারী। কিন্তু নিরুপমার মাথাটা বিজনবিহারীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছে। আর, যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছে সেই বিদ্রোহেরই

একটা ভীরু অন্তরাত্মা।—শেষে তুমিও ভয় পেলে। আমি তবে আর কোন্ সাহসে…।

বর্ষার জলঙ্গী সাঁতার দিয়ে পার হতে ভয় পায়নি যে ষোল বছর বয়সের বিজু, চম্বলের বালিয়াড়িতে আগুন-চোখো লেপার্ডের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলতে হাত কাঁপেনি যে কুড়ি বছর বয়সের বিজনবিহারীর, আজ আটত্রিশ বছর বয়সের সে বিজনবিহারী ভয় পেয়েছে? নিরুপমাকে বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে শান্তর বুকে তুলে নিতে চাইছে?

শান্তর আসছে; যেন হুটোপুটি করে জংলী হাতী আসছে, নিরুপমার জীবনের সুখ আশা আর তৃপ্তির ছোট্ট তাঁবুটাকে উপড়ে ফেলে দেবার জন্য। এই ভেবে ভয় পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু ভুল করছে নিরুপমার দুর্বল বিশ্বাসের বুকটা। বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে নিরুপমা, এই বিজনবিহারী জংলী হাতীর চোখের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিতে জানে, পারে, তার বুক একটুও কাঁপে না।

মেঝের উপর থেকে নিরুপমার লুটিয়ে পড়া শরীরটাকে দু' হাতে তুলে নিয়ে আর দাঁড় করিয়ে বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রাখে বিজনবিহারী।—তুমি আগে, না শান্তর আগে?

নিরুপমা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।—বুঝতে পারছি না।

—তোমাকে আগে নিয়ে এসেছি, না শান্তর আগে নিয়ে আসতে চেয়েছি?

—সবই তো জানি। কিন্তু…।

—কিন্তু আবার কিসের?

—শুনে যে বড় ভয় করছে।

—কোন ভয় নেই। কোন ভয় আর থাকতেই পারে না।

চিরকাল যে ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে এই নির্ভয়ের মানুষটা, আজও সেই ভাষায় নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে কথা বলছে। এই আশ্বাসের কাছে লুটিয়ে পড়ে শান্ত না হয়ে পারবে কেন নিরুপমা?

দু' চোখ বন্ধ করে, শান্ত আর স্নিগ্ধ একটা মুখ নিয়ে, আর মাথার ভারটাকে একেবারে অলস করে বিজনবিহারীর বুকের উপর রেখে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলে—আজ আর আমরা কাকে ভয় করব বল? কার সাধ্যি আছে যে, আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ করবে? কার সাহস আছে যে ঠাট্টা করবে? কার এমন মাথা খারাপ হবে যে, ঘেন্না করবে? ফুলনবাবু সেদিন কি বলেছিলেন, জান?

হেসে ওঠে বিজনবিহারী। যেন উৎফুল্ল এক পৌরুষের শান্ত গর্বের কণ্ঠস্বর হেসে উঠেছে—ফুলনবাবু বলছিলেন, মাটিসাহেবের বাড়িটা যেন হিমালয়জীকা সংসার।

—তার মানে?

—তার মানে আমি হিমালয়, তুমি মেনকা আর নন্দু হল উমা।

নিরুপমার চোখ দুটো অদ্ভুত একটা অনুভবের আবেশে নিবিড় হয়ে বিজন-বিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থম্‌থম্ করে, যেন একটা স্বপ্নের কোলে বসে আছে নিরুপমার প্রাণটা। ফুলনবাবুর কথা নয়, যেন একগাদা ফুলচন্দনের কথা দু কান দিয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছে নিরুপমা।—হিমালয়জীকা সংসার।

—সব ভয় পার করে দিয়েছি, নিরু। তবু তুমি ভুল করে একটা পূর্বজন্মের মত বাজে ছায়া-টায়া দেখে···।

হেসে ফেলে নিরুপমা।—না, আর ভয় করি না।

—তুমি না সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলে···।

—কি?

—শিউলিবাড়ির রাজার নাম মাটিসাহেব।

—বলেছিলুম, কিন্তু ঠাট্টা করিনি।

—তবে?

বিজনবিহারীর শেষ কথাটা যেন এতক্ষণের একটা মিথ্যে আতঙ্কের লজ্জাকে প্রশ্ন করে হাসিয়ে দেয়। নিরুপমা বলে—বাঙালী পুরুত ঠাকুর কি শুধু বাবার বাৎসরিক কাজের জন্যই আসবেন?

—না, তা কেন হবে? এখানকার সব কাজই করবেন। পুজো-পার্বণ, সত্য-নারায়ণের ব্রতট্রত, কিংবা তোমার কোন মানত-টানতের পুজো থাকলেও কাজ করবেন। মোট কথা···।

নিরুপমার দুই চোখ হেসে হেসে ঝিকঝিক করে।—কি?

—মোট কথা, আর জংলী হয়ে থাকা চলবে না। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে বিজন-বিহারী।

শালিকটা আবার এসে জানলার কাছে বসেছে, ঘরের ভিতরের দিকে তাকি-য়েছে। কিন্তু তখুনি আবার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল না শালিকটা। এবার আর ভয় পেয়ে নয়, শালিকটা বোধ হয় বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে চাইছে।

বিজনবিহারী বলে—তা ছাডা, মিছিমিছি কারও ওপর আর রাগ পুষে রাখার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া···।

হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়ে, আর জানলার বাইরে আশ্বিনের আকাশটারই দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে থাকে বিজনবিহারী। তার পরেই, গলার স্বর একেবারে মৃদু করে দিয়ে বলতে থাকে—হবে, একে একে সবই হবে, সবই করে নিতে হবে, ছেড়ে দেবই বা কেন?

ভাষাটা হেঁয়ালী, কিন্তু গলার স্বরটা যেন একটা নতুন মানতের প্রতিধ্বনি। কিংবা আশ্বিনের আকাশের বুকে একটা ক্ষমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে একটা খুশি অভিমান। নয় তো একটা পুরনো মায়ার হাতছানির দিকে তাকিয়ে কথা

বলছে ব্যাকুল একটা পিপাসা। যেন দেউলবাড়িতে ভোগের ঘন্টা বাজছে, খালের এ পারে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছে আর ছটফট করছে ছোট্ট বিজুর দুরন্ত লোভ।

॥ তের ॥

—মাটিসাহেবের মতলবটা এবার বুঝতে পারা গেল। মুখ টিপে হাসতে থাকে নিরুপমা।

তিন বছর আগেও একবার ঠিক এইভাবে মুখ টিপে হেসে বুকভরা খুশির ভার সামলাতে চেষ্টা করেছিল নিরুপমা। কিন্তু সামলাতে পারেনি। আজও নিরুপমার সারা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। শিউলিবাড়ির ভাগ্যটা যে সত্যিই ভোরের আলোর মত রাঙা হয়ে হাসছে।

সাইকেলের চাকার ধুলো মুছতে ব্যস্ত বিজনবিহারী নিতান্ত অব্যস্ত স্বরে কথা বলতে গিয়েও নিরুপমার মুখের দিকে তাকায়।—মাটিসাহেবের মতলব?

—হ্যাঁ।

—কি মতলব?

—শিউলিবাড়িকে একেবারে কেষ্টনগর করে তুলতে চাইছেন মাটিসাহেব।

বিজনবিহারী হাসে—বাঃ, খুব চমৎকার সন্দেহ করতে শিখেছ দেখছি।

মাটিসাহেবের কাঁচা ইটের সেই বাড়ির ঘরগুলি এখন ধান অড়হর আর মকাইয়ের ভাণ্ডার। সেই শিউলি যেখানে-যেখানে ছিল, সেখানে-সেখানে এখন নতুন শিউলির ভিড়। নতুন বাগানের মাদারের বেড়ার সঙ্গে কৃষ্ণকলির ঝাড় এলিয়ে এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। বছরে দু'বার ফুল ফোটায় কৃষ্ণকলির ঝাড়—লাল হলদে বেগুনী আর হলদে-লাল। পুরনো বাড়ির সামনে দুটো পাকা ইটের ঘর, বারান্দাটা বেশ চওড়া। বারান্দায় চার-পাঁচটা চেয়ার আর একটা টেবিল।

দিল্লিতে করোনেশন দরবার। শিউলিবাড়ি স্টেশনের মাথার উপরে উঁচু বাঁশের ডগায় পুরো একটি মাস ধরে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। সেই চৌধুরীবাবু বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন। বদলি হয়ে এসেছেন গাঙ্গুলীবাবু আর বোসবাবু—এস-এম আর এ-এস-এম। দেখে আরও খুশি হয়েছে বিজনবিহারী, দুই ভদ্রলোকই সপরিবারে এসেছেন।

গাঙ্গুলীবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কোলেরটার বয়স চার মাস। অথচ গরুর দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। রামসিংহাসন শুধু মোষের দুধ বিক্রি করে। খুবই চিন্তায় পড়েছেন গাঙ্গুলীবাবু।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাবুকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বিজনবিহারী তার বাড়ির গরুর দুধের আধ সের মাত্র সুনন্দার জন্য রেখে দিয়ে বাকি সবটাই গাঙ্গুলী-বাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।—আমি থাকতে শিউলিবাড়িতে এসে কোন বাঙালী কষ্ট পাবে, এটা তো ভাল দেখায় না, নিরু।

ছোট নদীর ধারে এক বিঘে জমি করেছিল বিজনবিহারী। সে জমিতে পুরনো

বটগাছের কাছে নতুন কালীবাড়ি হয়েছে। কালীবাড়ি তৈরির সব ইট বিজনবিহারীই দিয়েছে। পুরোহিত চক্রবর্তী মশাইও সপরিবারে—স্ত্রী আর দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। কি করে দিন চলবে? যজমান কোথায়? আর পুজোর ভিড়ও কতটুকু?

কালীপূজা কমিটি তৈরি করে চক্রবর্তীকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে বিজনবিহারী। বছরে চার আনা চাঁদা আর একটা সিধা—ধান চাল চিঁড়ে কিংবা কলাই। এরই মধ্যে শিউলিবাড়ির ষাট-সত্তরজনকে কমিটির সদস্য করে ফেলেছে বিজনবিহারী। কিন্তু তবু চিন্তা করতে হচ্ছে, চক্রবর্তীর জন্য আর কি ব্যবস্থা করা যায়। তা না হলে সত্যিই যে ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টে পড়বে চক্রবর্তী।

কবিরাজ সেনবাবুর জন্যে এতটা চিন্তা করতে হয়নি। তাঁর জন্য শুধু এক বিঘা বসত জমির ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। ঝুমরা রাজ আর তাঁর রাজপুত কুটুমদের বাড়ি থেকে সেনবাবুর ঘন ঘন ডাক আসে। তা ছাড়া শিউলিবাড়ির এতগুলি ঘর তো আছেই। এরই মধ্যে মন্দ রোজগার করছেন না সেনবাবু। সেনবাবুর স্ত্রী একদিন এসে নিরুপমাকে নতুন সোনার বালা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেনবাবুর মেয়ে দুটি বড় শান্ত। সুনন্দার সঙ্গে খেলা করতে এসে এ-বাড়িতেই ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দেখতে পায় বিজনবিহারী, লুকোচুরি খেলার জন্যে তৈরি হয়েছে সুনন্দা, রাম-সিংহাসনের তিন ছেলেমেয়ে, সেনবাবুর দুই মেয়ে আর নতুন বস্তির লালাদের যত ছেলেমেয়ে।

সাইকেল নিয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার থমকে দাঁড়ায় বিজনবিহারী। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাদের দল, মাঝখানে সুনন্দা। বাচ্চাদের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর ছড়া কেটে ছুট আর ফুট গুনছে সুনন্দা—আডাং বাডাং তিতা তোর, বীর বার শং!

সাইকেলটা ঝপাং করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ব্যস্তভরে এগিয়ে আসে বিজন-বিহারী।—আর একটা ছড়া আছে নন্দু, খুব ভাল ছড়া।

—শিখিয়ে দাও।

—শেখ, সবাই শেখ।…উচ্ছে পটল চচ্চড়ি, তাতে দিলাম ফুলবড়ি—ফুল-বড়িটা গলে গেল, সবাই মিলে এক পা তোল।

বিজনবিহারী এক পা তুলে দাঁড়ায়, বাচ্চার দলও এক পা তুলে দাঁড়ায়। সব শেষে যার পা পড়ে, সে ছুট হয়ে সরে দাঁড়ায়।

বিজনবিহারী বলে—বল আবার বল; উচ্ছে পটল চচ্চড়ি… ।

হল্লা শুনে নিরুপমা বের হয়ে আসে—এটা আবার কী শুরু করলে?

সাইকেলটাকে তুলে নিয়ে বিজনবিহারী বলে—একটা বাংলা স্কুল চালু না করে উপায় নেই নিরু। তোমার নন্দুর ভাষা আডাং বাডাং করতে শুরু করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, বাংলা স্কুলটা চালু করতে একটা বছরের বেশি সময় লাগেনি। একটা প্রাইমারি স্কুল। স্কুল কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী। সেনবাবুর দুই মেয়ে,

চক্রবর্তী মশাইয়ের তিন ছেলে আর স্টেশনের দুই বাঙালী পরিবারে চারটি ছেলে-মেয়ে। তাছাড়া বাঙালী নয় যারা, তাদেরও বাড়ির পঁচিশটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে শিউলিবাড়ির প্রথম স্কুলের প্রতিষ্ঠার উৎসব যেদিন হয়ে গেল, সেদিন আবার রাতের আকাশটার দিকে তাকিয়ে চিকচিক করেছিল বিজনবিহারীর চোখ।

নিরুপমা বলে—স্কুলের কি নাম হল?

—রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারি স্কুল।

চমকে ওঠে নিরুপমা। এখন আর বুঝতে অসুবিধে নেই, কেন চিকচিক করছে বিজনবিহারীর চোখ দুটো।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী।—কেন যেন মেজদির নামটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই স্কুলটাকে ওই নামটা দিয়ে দিলাম। মেজদির বাড়ির দানাদার সন্দেশের স্বাদ আজও তো ভুলতে পারিনি, নিরু।

নিরুপমার চোখ দুটো যেন আবার ছলছল না করে ওঠে, তাই বোধ হয় আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে থাকে বিজনবিহারী।—চক্রবর্তী মশাইয়েরও একটা সুবিধে হয়ে গেল। বাঙালী বাচ্চাদের বাংলা পড়াবেন, হিন্দী বাচ্চাদের অঙ্ক। বুড়ো লালাবাবু হিন্দী পড়াবেন। দুই মাস্টারের মাইনের জন্য স্কুল কমিটি দেবে দশ টাকা, আর জেলা বোর্ড দেবে দশ টাকা।

কবিরাজ সেনবাবুকে আর কালীবাড়ির পুরোহিত চক্রবর্তীকে শিউলিবাড়িতে আনতে গিয়ে পুরো একটা বছর কী চেষ্টা আর কত চিন্তাই না করতে হয়েছে। বিজনবিহারীর কাছ থেকে নানা অনুরোধের আর অঙ্গীকারের চিঠি নিয়ে রাম-সিংহাসন বার বার ছুটেছে বর্ধমানে আর রাণীগঞ্জে। মাটিসাহেব নামে শিউলিবাড়ির সবচেয়ে সম্মানের আর দাপটের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনেক ভরসার পাকা কথা পেয়ে আর রেল-খরচ পেয়ে তবে তাঁরা এসেছেন। নিরুপমার কাছে আগেই বলে রেখেছিল বিজনবিহারী—আমি ওদের আনিয়ে ছাড়ব, নিরু।

নিরুপমাও দেখে আশ্চর্য হয়েছে, বয়সটা চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও মাটি-সাহেবের সেই জেদের মাটি একটুও নরম হয়ে যায়নি।

কার্তিক মাসের হিমেল কুয়াশায় ভরা শিউলিবাড়ির অমাবস্যায় শীতাতুর মাঝ-রাত যখন একেবারে নিস্তব্ধ, কালীবাড়িতে শ্যামাপূজার ঘণ্টাধ্বনি যখন বাজতে শুরু করে, সিধো চামার যখন ঢাক বাজায়, তখন কমিটির প্রেসিডেণ্ট এই মাটিসাহেব যেন রাতজাগা দুরন্ত ছেলের উৎসাহ নিয়ে আর চঞ্চল হয়ে কালীবাড়ির আঙিনায় ছুটোছুটি করে। লোক পাঠিয়ে ফুলনবাবুকে খবর দেয়, নতুন বস্তির লালাদেরও ডেকে পাঠায়, শিগগির চলে এস সবাই, ভোগ হয়ে যেতে আর দেরি নেই। সবাইকে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে।

রেলওয়ের এক বাঙালী অফিসার এসেছিলেন। স্টেশনে রেস্টরুমে একটা দিন ছিলেন। পদস্থ অফিসার, তাঁর খাওয়া-দাওয়ার অভিরুচিও বেশ পদস্থ। গাঙ্গুলীবাবু একটু চিন্তায় পড়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাঙ্গুলীবাবুকে একটুও ব্যস্ত হতে হয়নি।

শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবই অফিসারকে খাওয়াবার সব দায় খুশি হয়ে নিজের উপর টেনে নিয়েছেন। নিজের হাতে পোলাও আর মাংস রান্না করেছে বিজনবিহারী, নিরুপমা রেঁধেছে বড়ি দিয়ে আড় মাছের ঝোল, কাঁচা পেঁপের সুক্ত, লাউয়ের ঘণ্ট আর পায়েস। অফিসার ভদ্রলোক বিজনবিহারীকে বলেছেন, আপনি মশাই এখানে না থাকলে ছাতুটাতু খেয়ে আমার বোধ হয় একদিনেই পাঁচ পাউণ্ড ওজন হারাতে হত।

অফিসারকে নিজের বাগানের এক ঝুড়ি পেঁপে উপহার দিয়ে বিজনবিহারী দুটো কাজের কথাও বলে নিয়েছে।—স্টেশনের নামটা শুধু ইংরেজী হরফে লেখা আছে স্যার, আপনি কাইণ্ডলি একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে বাংলা হরফেও নামটা লেখা হয়।

—তা হয়ে যাবে। একটা অর্ডার করিয়ে দিতে পারব।

—তা ছাড়া, এই ম্যাপটা একবার দেখুন স্যার, কত সস্তায় কত ভাল ভাল প্লট বিক্রি হচ্ছে। শিউলিবাড়ির চমৎকার জল-হাওয়ার কথাটা আপনারও জানা আছে নিশ্চয়। সুতরাং যদি একটু প্রচার করে দেন যে··· ।

—কিসের প্রচার ?

—আমার ইচ্ছে, বাঙালীরা এখানে এসে যেন জমি কেনেন আর বাড়ি করেন।

—ভাল কথা বলেছেন। আমার মনে হয়···হ্যাঁ···রামরাজাতলার যশোদাবাবুকে জানালে কাজ হতে পারে। ভদ্রলোক রটনা করতে খুব পোক্ত।···দিন আপনার ম্যাপটা।

মাটিসাহেবের মাটি-কাটা ঠিকেদারীর কাজও বেড়েছে। কারণ সিলুয়াডিতে আরও দুটো নতুন কোলিয়ারী চালু হয়েছে। নতুন নতুন আরও রাস্তা খুলতে হবে। সিলুয়াডি রোডের আট মাইলের পোস্ট থেকে এদিকে উনিশ মাইলের পোস্ট পর্যন্ত নতুন কাঁকর আর মাটি ফেলতে হবে। রাস্তাটা চওড়া না করলে কয়লা-বোঝাই মোটর ট্রাক চলতে পারবে না।

দুধিয়া সিমেণ্ট কারখানার জন্যও জঙ্গলের ভিতরে তিনটে ছোট-বড় সড়ক খুলতে হচ্ছে। মাটি কাটাবার ঠিকে পেয়েছেন মাটিসাহেব। একটা সড়ক চালু হয়ে গিয়েছে। দিন-রাত চুণাপাথরে বোঝাই হয়ে মোটর-ট্রাক নতুন সড়কে ছুটতে শুরু করেছে।

মাটিকাটার কাজটাকে হাসিতে খুশিতে, গানেতে আর ছড়াতে ভরে দিয়েছেন মাটিসাহেব। আগে শুধু নিজেই মুণ্ডারি ভাষায় গান গেয়ে মাটি-কাটা কুলির দলের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িকে হাসাতেন। আজকাল একটা নতুন কাণ্ড করছেন। বাংলা গান গেয়ে মুণ্ডা আর ওরাওঁ কুলির দলকে খুশি করছেন। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল—মাটিসাহেবের গানটা বার বার শুনে শুনে কুলির দলও গানটাকে যেন গলায় গেঁথে নিয়েছে। এক একদিন, শালবনের মাথায় যখন বিকেলের রোদ একটু ম্লান হয়ে আসে, তখন মাটিসাহেবের গান শুনতে পেয়ে যত হোরো টিগ্গা আর কুজুর হাতের কোদাল নামিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে ছুটে আসে। মাটিসাহেবের সেই 'হরি দিন

তো গেল'র সঙ্গে গলা মিলিয়ে একজন হোরো আর দু'জন টিপ্‌গা গান গায়, আর একজন কুজ্জুর হয়তো মাদল বাজাতে শুরু করে।

মাটিসাহেবের বাগানটা যেন চাঁপাকলার জঙ্গল। চুঁচড়োর সরকারী কৃষির অফিসে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে পাঁচশো চাঁপা কলার চারা আনিয়েছিলেন মাটি-সাহেব। কিছু বিলিয়েছেন মুণ্ডাদের গাঁয়ে গাঁয়ে, কিছু শিউলিবাড়িতে, আর বাকিটা নিজের বাগানে পুঁতেছেন। মাটিসাহেবের বাগানের প্রথম পাকা কলার কাঁদি কালী-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাটিসাহেব, তার পরের মাসেই প্রায় পঞ্চাশ কাঁদি কলা বেচে আর দশ কাঁদি কলা শিউলিবাড়ির ঘরে ঘরে বিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মাটি-সাহেব—আসছে বছরেই দেখতে পাবে নিরু, রাঁচির পাইকারেরা আর শেওড়াফুলি যাবে না, ওরা এই শিউলিবাড়ির বাজারে চাঁপাকলা কিনতে ছুটে আসবে।

নিরুপমা হাসে—তোমার কইমাছের অবস্থা কি দাঁড়াল?

—খুব ভাল অবস্থা। শিগগির দেখতে পাবে, শিউলিবাড়ির বাজারে কইমাছ উঠেছে।

বছর দুই আগে লালগোলা থেকে একদল জেলে আর দশ হাজার কইমাছের চারা আনিয়ে ঝুমরা রাজের চারটে ঝিলের জলে ছেড়েছিল বিজনবিহারী। কিছু কালবোশের চারাও ছাড়া হয়েছিল। দেখে এসেছে বিজনবিহারী, সে কই এখন বেশ বড় হয়েছে, শালুকের ডাঁটা ছিঁড়ে তছনচ কাণ্ড করছে কইয়ের ঝাঁক। ঘাই মারছে ডাগর কালবোশ।

প্রায় তিনটে মাস ধরে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারারাত পর্যন্ত হাত চালিয়ে একটা জাল বুনেছে বিজনবিহারী, কইধরা জাল। সকালবেলায় জালটাকে হরি-তকীর কষে চুবিয়ে চুবিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেয় বিজনবিহারী—নিরু তুমি কোথায়?

—এই তো।

—তুমিও তো এসব কাজ কিছু-কিছু করতে পার, নিরু।

—আমি?

—হ্যাঁ।

—আমি কইমাছ ধরব?

—আরে না; এসব কাজ মানে একটু-আধটু শখের কাজ। তার মানে শিউলি-বাড়ির মেয়েগুলোকে অন্তত আলপনা আঁকবার কায়দাটা শিখিয়ে দিতে পার তো।

নিরুপমার ঠাট্টার চোখ দুটো করুণ হয়ে যায়। মানুষটা যে-কাজের কথা বলছে, সে কাজ যে মানুষটার আত্মার একটা ব্রত হয়ে উঠেছে। এই মাটি-কাটা খাটুনির মধ্যেও সর্বক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছে, একটা হারানো জগতের যত ফুল ফল কইমাছকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে আর খাটছে। এই তো, সেদিন বিন্ধ্যাচলী এসে বলে গেল বলেই জানতে পেরেছে নিরুপমা, বাঙালীবাবু আজকাল রোজ একবার গিয়ে রাজ-মোহিনীর বাপকে ক্ষীরমোহন আর সরপুরিয়া তৈরি করা শেখাচ্ছে! হাঁ দিদি,

বাঙ্গালী মিঠাইভি তোহর ঐসন মিঠি বা!

বলতে ইচ্ছে করেছিল, কিন্তু বলতে পারেনি নিরুপমা, আমি একটুও মিষ্টি নই বিন্ধ্যাচলী, মিষ্টি তোমাদের ওই বাঙালীবাবু, ওর স্বপ্নটাও মিষ্টি। শিউলিবাড়ির পাথুরে মাটিকে মিষ্টি করে দেবার জন্য ও শুধু একাই খাটছে। আমি একটা অপদার্থ। আমার কোন গুণ নেই যে ওকে সাহায্য করতে পারি।

বিজনবিহারীর হাতের জালটার দিকে তাকিয়ে নিরুপমা বলে—তুমি এখন ওটা রেখে দাও লক্ষ্মী, একটু জিরোও।

—জিরোলে চলবে কেন?

—আমাকে বলে দাও কি করতে হবে, সব করে দিচ্ছি।

—কিন্তু আমি যে কথাটা বললাম···।

—শুনেছি। রাজমোহিনীর বিয়েতে আমি নিজেই গিয়ে আলপনা এঁকে দিয়ে আসব।

—আঁা? রাজমোহিনীর বিয়ে? কত বয়স হল রাজমোহিনীর?

—তা মন্দ কি? ষোল-সতর হবে। ওদের মতে একটু বেশি বয়স হয়ে গেছে।

—তাহলে আমাদের নন্দুর কত বয়স হল?

—তের পার করেছে নন্দু।

—তা হলে তো নন্দুর বিয়ের কথাটা এখন থেকেই ভাবতে হয়।

—ভাবা তো উচিত। বলতে গিয়ে নিরুপমার চোখের পাতা যেন চমকে কেঁপে ওঠে, আর মুখটাও গম্ভীর হয়ে যায়।

—নিশ্চয় উচিত। বলতে বলতে হাত ধুয়ে নিয়ে আর হেসে হেসে বাগান দেখতে চলে যায় বিজনবিহারী।

বোধ হয় বলতে চেয়েছে বিজনবিহারী, ভাবা উচিত নিশ্চয়, কিন্তু ভাবনা করা নিশ্চয় উচিত নয়। সুনন্দার বিয়ে দিতে হবে—কল্পনাটা যেন নিজেরই খুশিতে হেসে উঠেছে। বিজনবিহারীর চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বরে অদ্ভুত এক স্নেহাক্ত আনন্দ উথলে উঠেছে। তাই স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বাগানের কাজে ব্যস্ত হবার জন্য চলে গেল বিজনবিহারী।

না, নিরুপমাও আর ভাবনা করে মনের ভার বাড়াতে চায় না। ভাবনা করবার কোন দরকার হয় না। ওই মানুষটা যে ভাবনা জয় করবার যোদ্ধা, আর ভরসা তৈরি করবার কারিগর। অনেকবার এমন হয়েছে, সুনন্দার মুখটাকে নিজের হাতে সাবান দিয়ে ধুয়ে, চোখে কাজল বুলিয়ে, কপালের উপর ছোট্ট একটা কুমকুমের তারা এঁকে দিতে গিয়ে হঠাৎ নিরুপমার চোখের হাসি গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। যেন আচমকা একটা কালো-ছায়াকে দেখতে পেয়েছে নিরুপমা। কিন্তু···না, ভুল দেখেছে নিরুপমা। বিজনবিহারীর মুখের অবাধ হাসিটা যেন ফটিকজলের হাসি, নিরুপমার চোখের সব গম্ভীরতা ধুয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

না, ওই কালোছায়াটা কালো বটে, ছায়াও বটে। কিন্তু অন্ধকারের কালো নয়।

ওটা শিবপুকুরের ডাঙায় বুকের সেই তালবনের ছায়ার মত একটা কাজলমায়ার কালো। চড়কের মেলা দেখতে যারা দূর গাঁয়ে যায়, তাদের মাঝপথের আর মাঝ-বেলার শান্তি হল ওই তালবনের কালোছায়া।

॥ চোদ্দ ॥

রাজমোহিনীর বিয়েতে আলপনা এঁকেছে নিরুপমা। কিন্তু এই একটি আলপনা দেখে শিউলিবাড়ির যেন চোখ ভরেনি। লালাদের বাড়ির বউ আর মেয়েরা বার বার এসেছে, নিরুপমার কাছে আলপনা আঁকা শিখেছে।

—ওরা মোচা রাঁধতে জানে না নিরু, মোচাগুলোকে জঞ্জাল মনে করে ফেলে দেয়। তুমি যদি ওদের একটু শিখিয়ে দাও, তবে ভাল হয়। বিজনবিহারীর ইচ্ছের কথাটা যেদিন শুনতে পেল নিরুপমা, তারপর বোধহয় তিনটে মাসও পার হয়নি, ভাত খেতে বসে এক বাটি মোচার ঘণ্টের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে বিজনবিহারী —ঘণ্টর চেহারা খুব খুলেছে দেখছি।

নিরুপমা হাসে—মুখে দিয়ে নিয়ে বল, কেমন হয়েছে ?

মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে বিজনবিহারী আরও খুশি হয়।—চমৎকার।

—কিন্তু আমি রাঁধি নি।

—অ্যাঁ ? কে রেঁধেছে ?

—ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতী রেঁধে পাঠিয়েছে।

—কি আশ্চর্য ! কিন্তু···মনে হচ্ছে, কেউ যেন পার্বতীকে শিখিয়ে দিয়েছে।

—তা তো বটেই।

—কে শেখাল ?

—তুমি যাকে বলেছিলে, সেই শিখিয়েছে।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা পরম কৃতার্থতার আনন্দে চোখ বড় করে হাসতে থাকে বিজনবিহারী—তাই বল।

—শত্রুঘন্ বাবুর মেয়েও এসেছিল।

—কেন ?

—বাঙালী রান্না শিখতে চায়।

—শিখিয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—কি শেখালে ?

—ফোড়ন দিয়ে চালতের অম্বল।

—খুব ভাল করেছ। ফোড়নের রান্না ওরা একেবারেই জানে না। তা ছাড়া চালতে যে খাওয়া যায়, তাও জানতো না।

—নন্দুও একটা কাণ্ড করেছে।

—কি করল নন্দু ?

—লালাদের বাড়ির বুড়িদের অবশ্য রাজি করাতে পারেনি নন্দু, কিন্তু বউ-গুলোকে আর মেয়েগুলোকে বাঙালী ধরনে শাড়িপরা ধরিয়েছে।

—বল কি? চেঁচিয়ে ওঠে বিজনবিহারী।

—এমন কি বিন্ধ্যাচলীকেও একদিন…। হেসে ফেলে নিরুপমা।

ও কি? বিন্ধ্যাচলীই যে কথা বলছে। যেন একটা হাসির ঝংকার লুটোপুটি করে এগিয়ে আসছে—অব তো আমি নন্দুয়ার শাশুড়িকে সাথ বাংলা বোলি বলতে পারবে।

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় বিন্ধ্যাচলী। দু' ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরা আর আঁচল দোলানো একটা মূর্তি। কিন্তু বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়েই জিভ কেটে লজ্জিত আতঙ্কের মত ছুটে পালিয়ে যায়।

কাঁথা সেলাই করছিল নিরুপমা। পালতোলা নৌকো নদীর জলে ভাসছে—নকশাটার নদীর জলের ঢেউগুলো নীল সুতোর, নৌকোটা লাল সুতোর। বাকি সবটা সাদা সুতো দিয়ে পিঁপড়ে-সারি ফোঁড়ের সেলাই। মাটিসাহেবের বাড়ির কাঁথা দেখে হরি রাজপুতের মা আশ্চর্য হয়—আহা! কী সুন্দর জিনিস! কেমন করে বানালে, এ নন্দুকে মাঈ?

নিরুপমা—শিখবেন?

—শিখিয়ে দেবে তবে তো শিখব।

একটা বছর ধরে নিরুপমার ঘরে সারাটা দুপুর বসে বসে, একা হরি রাজপুতের মা নয়, ফুলনবাবুর ছেলের বউ আর লালাদের মেয়েরাও কাঁথা সেলাই করেছে। নিরুপমা, বলতে গেলে, একরকম হাতে ধরে সবাইকে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছে।

আর একটা বছর পার হতেই শিউলিবাড়ির জীবনে আরও একটা উৎসবের মত কাণ্ড করে ফেলল যে, সে হল খেজুর রসের পায়েস। বিজনবিহারীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়ে স্কুল কমিটির সবাই যেদিন খেজুর রসের পায়েস খেল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই উৎসবটা শুরু হয়েছিল। শীতের পুরো তিনটে মাস ধরে, যেমন রামসিংহাসনের বাড়িতে তেমনই ফুলনবাবুর আর লালাদের বাড়িতে খেজুর রসের পায়েস রাঁধবার ধুম পড়ে গেল। বুঝিয়ে দিয়েছিল বিজনবিহারী—আগে বেশ ঘন করে রস জ্বাল দিয়ে নেবেন, তারপর ভিন্ন করে দুধে চাল ছেড়ে দিয়ে চাল দেবেন। বেশ একটু ক্ষীর-ক্ষীর হলে তাতে রস ঢেলে দিয়ে, শেষে এলাচ গুঁড়ো ফেলে দিয়ে…।

রমাসুন্দরী বেঙ্গলী প্রাইমারি স্কুলের নামটারও উন্নতি হয়েছে। ওটা এখন রমা-সুন্দরী বেঙ্গলী মাইনর স্কুল। মাইনর স্কুলে শুধু ছেলেরা পড়ে, কাজেই নতুন করে একটা প্রাইমারি স্কুল করতে হয়েছে—শিউলিবাড়ি প্রাইমারি স্কুল, প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ফুলনবাবু।

মাইনর স্কুলের ছাত্রের সংখ্যা দু'শোরও বেশি। তার মানে এই সাত বছর ধরে প্রায় পঁচিশ জন করে ছাত্র বেড়েছে। ছ'জন নতুন টিচার এসেছে। শুধু এক হিন্দী

টিচার ছাড়া আর সবাই বাঙালী। প্রেসিডেন্ট বিজনবিহারী বাঙালী টিচারদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনারা ফ্যামিলি নিয়ে আসুন। বাসা ভাড়ার জন্য মাসে তিন টাকার বেশি লাগবে না। লালাদের পাড়াতে পাঁচ-ছ'টা বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি বলে দিলে সস্তায় ভাড়া দিতে রাজি হয়ে যাবে লালারা।

ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন টিচারেরা। থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের কাণ্ড দেখে খুব খুশি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। মাইনে পঁচিশ টাকা, বয়সেও ছেলেমানুষ বললেই চলে, সংসারের দায় বলতে কি বোঝায় আর ঝুঁকি কত, তা'ও বোধ হয় জানে না; তবু অন্ধ বিধবা মা, একটা বোন আর তিনটে ভাইকে দেশ থেকে আনিয়েছে পুষ্কর। হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবু কিন্তু এরই মধ্যে তিন কাঠা জমি কিনে ছুটো ঘর তুলে ফেলেছেন।

কিন্তু ওদিকে, স্টেশনের পুব দিকের সৌখিন জমির প্লট ছাপিয়ে পঞ্চাশটারও বেশি বাড়ি উঠেছে, আরও উঠছে। কলকাতার তিন ব্যারিস্টারের বাড়ি, বর্ধমানের এক জমিদারের বাড়ি, হুগলীর ছুই ডাক্তারের বাড়ি। কোলিয়ারির বাঙালী স্টাফেরাও অনেকে বাড়ি করে ফেলেছেন। রাঁচির মাড়োয়ারীরা যে-সব বাড়ি তৈরি করেছেন, সেগুলির বেশির ভাগই ভাড়া খাটে। আর ভাড়াটেদের বেশির ভাগই বাঙালী। পুজোর সময় আর শীতের সময় হাওয়া-বদলের জন্য বাঙালীরা সবচেয়ে বেশি ভিড় করে। কোন বাড়ি আর খালি থাকে না।

শিউলিবাড়ির এই সৌখিন উপনিবেশ, যার নাম ঝুমরা কলোনি, তার কলরবের মধ্যেও মাটিসাহেবের নামটা প্রায় সব সময় বেজেই চলেছে। মাটিসাহেব কি বললেন? মাটিসাহেব কি ধোপা যোগাড় করে দিতে পারলেন? মাটিসাহেবকে বললেই তো হয়, বাসক পাতা আনিয়ে দিতে পারবেন। ঝুনুর জন্যে একজন টিউটর দরকার ছিল, কই, মাটিসাহেব কি ব্যবস্থা করলেন বুঝতে পারছি না। এবার কিন্তু মাটিসাহেব সত্যিই খুব বিশ্বাসী একটা চাকর যোগাড় করে দিয়েছেন। শুনলাম, আজ বিধুবাবুর বাড়িতে ধুমুরী পাঠিয়েছিলেন মাটিসাহেব। আমি অপেক্ষায় আছি, মাটিসাহেবের বাড়িতে হরিণের মাংসের ফীস্ট খেয়ে তারপর কলকাতা রওনা হব। পিসিমার দাঁতের ব্যথার একটা চমৎকার জংলী ওষুধ এনে দিয়েছেন মাটিসাহেব। মিনতির হারের লকেটটার একটা পাথর খুলে গেছে, কে জানে মশাই কে সেট করবে? মাটিসাহেব তো বললেন, ভাল স্যাকরা আছে। যাই হোক, শুনতে পেলাম, মাটিসাহেব এবার উঠে-পড়ে লেগেছেন, ক্লাবটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

শিউলিবাড়ি ক্লাব। একটা ঘরে ছুটো আলমারিতে বাংলা বই ঠাসা, আর একটা ঘরে তাস দাবা আর ক্যারম। বারান্দার সামনে ছোট এক টুকরো মাঠের উপর ব্যাডমিন্টন। শুধু এক শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাটিসাহেবের জীবনের যে পুরো পাঁচটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, আর বয়সটা পঞ্চাশ পার হয়ে আরও পাঁচ বছর এগিয়ে গিয়েছে, এই হুঁসও বোধ হয় মাটিসাহেবের নেই।

ক্লাবের সেক্রেটারি হয়েছে যে সে হল-ব্যাডমিন্টনে কলেজ চ্যাম্পিয়ন মোহিত-

ঘোষ। মাটিসাহেবের প্রায় অর্ধেক বয়সের এমন একটি কাজের মানুষ থাকতেও ক্লাবের বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে সতরঞ্চি কেনা পর্যন্ত সব দরকারের খোরাক যোগাড় করতে গিয়ে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মাটিসাহেবকেই একটা রসিদ বই পকেটে নিয়ে ছুটতে হয়েছে, কখনও সিলুয়াডি কোলিয়ারীর সাহেবের কাছে, কখনও বা ঢুধিয়া সিমেন্ট কারখানার আগরওয়ালার কাছে। সিলুয়াডির সাহেব আর ঢুধিয়ার আগরওয়ালা যদিও তিন টাকা আর তিন টাকা মোট ছ' টাকা দান করেছিলেন, আর নতুন বাঙালী আগন্তুকেরা দান করেছিলেন মোট ছাপান্ন টাকা চার আনা, কিন্তু মাটি-সাহেবকে সেজন্য একটুও বিচলিত বা চিন্তিত হতে দেখা যায়নি। রসিদ বইটা পকেটেই থাকে। পথে যেতে যার সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছেই চেয়ে বসেন, দু-আনা চার-আনা যা-ই হোক, শিউলিবাড়ির ক্লাব ফণ্ডে প্লীজ ডোনেট স্যার, কিছু দান করুন মশাই, কুছ দিজিয়ে লালাজী, দেহা হো মাহাতো, এয়াম কে তিয়াঁ যে!

এষ্টিমেট বলছে আটশো টাকা চাই, কিন্তু এত চেষ্টা করেও যোগাড় হয়েছে শুধু দুশো ষোল টাকা এগার আনা। বিজনবিহারী হেসেছিলেন—ক্লাবটা বেশ ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে।

নিরুপমা আশ্চর্য হয়েছিলেন—কোথায় ক্লাব?

বিজনবিহারী—কোথাও নেই। সেইজন্যেই তো বলছি, ক্লাবের বাড়ি তৈরির জন্য মাত্র দুশো ষোল টাকা এগার আনা চাঁদা উঠেই, বাস, একেবারে থেমে গিয়েছে। অথচ আরও প্রায় ছ'শো টাকা চাই।

নিরুপমা—ভাল হয়েছে।

—কি বললে?

—ওসব এখন থেমে যেতে দাও।

—তুমি তো এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিলে। কিন্তু এতদূর এগিয়ে গিয়ে কি থেমে গেলে চলে?

—না থেমে উপায় কি? এত টাকা তুমি পাবে কোথায়?

বিজনবিহারী হাসেন—পাওয়ার সুবিধে আছে বলেই ভাবছি। ফুলনবাবু হ্যাণ্ড-নোটে তিনশো টাকা দিতে রাজি আছেন। আর···আর ধর এ-বছরের সব অড়হর আর মকাই বেচে আরও দেড়শো টাকা হবে। বাকি রইল দেড়শো টাকা। সে টাকা তো তোমার কাছ থেকেই ধার পেতে পারি।

নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছেন বিজনবিহারী, শিউলি-বাড়ির মাটিসাহেব, যে-মানুষটার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। আর, গত বছরের ধানবেচা টাকা থেকে; মাত্র ওই দেড়শো টাকা বাঁচিয়ে স্ত্রীর কাছে জমা রেখেছেন, মেয়ের গলার একটা সোনার হারের জন্য।

একটি কথাও না বলে ঘরের ভিতরে গিয়ে আর বাক্স খুলে দেড়শো টাকার ছোট্ট পুঁটুলিটাকে বিজনবিহারীর হাতের কাছে ফেলে দিয়ে চলে যান নিরুপমা।

।। পনর ।।

এ তো প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু পাঁচ বছরেও নিরুপমার কাছে সেই দেড়শো টাকা দেনার একটা টাকাও শোধ করতে পারেননি বিজনবিহারী। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সেই টাকার কথা নিয়ে একটিও কথা বলেননি নিরুপমা। বিজনবিহারী অবশ্য প্রতি মাসে অন্তত দুবার করে বলেছেন—মনে আছে, মনে আছে নিরু। তোমার টাকা আমি পাই-পাই শোধ করে দেব।

শোধ করতে পারতেন বোধহয় বিজনবিহারী, যদি একটু জিরোতে জানতেন কিংবা থামতে পারতেন। শেষ জানা নেই, যেন এইরকম একটি পথে মাটিসাহেবের যত ইচ্ছার চেষ্টার আর কল্পনার প্রাণটা এগিয়ে চলেছে। মাথার অনেকখানি সাদা হয়ে গিয়েছে, বড়-বড় একজোড়া গোঁফ যেন ঠোঁটের ফাঁকে শান্ত হাসিটাকে অদ্ভুত একটা ছায়া দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। মাথায় শোলার হ্যাট, পিঠে বন্দুক, পায়ে বুট, গায়ে খাকি কামিজ আর প্যাণ্ট, মাটিসাহেব তাঁর ছুটোছুটির জীবনের চিরকেলে সহচর সেই সাইকেলের সঙ্গে আজও যেন ছুটেই চলেছেন। এ সড়কের শেষ মাইল-পোস্ট আর কতদূর? কিংবা সত্যিই কোন শেষ আছে কি না, প্রশ্নটা যেন মাটি-সাহেবের জীবনের কোন প্রশ্নই নয়।

মাটি-কাটা ঠিকেদারীর বিলের টাকা, ধানবেচা টাকা, কলাবেচা পেঁপেবেচা টাকা —এই পাঁচ বছরে টাকা তো বার বার এসেছে। কিন্তু নিরুপমার টাকা মিটিয়ে দেবার সুযোগ পেলেন কোথায় বিজনবিহারী?

ক্লাবের বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার পর, ক্লাব চালু হবার পর, আর সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে দাবার হল্লা হৈ-হৈ করে ওঠবারও পর, পাঁচটা বছর ধরে যেন আর-একটা মানত পালন করবার জন্যে ছুটোছুটি করেছেন আর টাকা খরচ করেছেন বিজনবিহারী।

রুদ্রকিশোর হকি শীল্ড। টুর্নামেণ্ট খেলতে টিম পাঠাবে সিলুয়াডি কোলিয়ারি, দুধিয়া সিমেণ্ট ওয়ার্কস, হুটপা লুথেরিয়ান মিশন। তা ছাড়া আছে শিউলিবাড়ি ইলেভেন। আছে গ্র্যাণ্ড হিরোজ, অর্থাৎ মাটিসাহেবের মুণ্ডা কুলিদের দল থেকে বাছাই করা ছোকরাদের একটা টিম। শীল্ড কিনতে হয়েছে, মস্ত বড় একটা সামিয়ানা কিনতে হয়েছে, পঞ্চাশটা চেয়ার তৈরি করাতে হয়েছে, দুটো টিমের ইউনিফর্ম কিনতে হয়েছে। সব খরচ মাটিসাহেবের।

ফুলনবাবুর কাছে গল্প করেছে রামসিংহাসন—মাটিসাহেবের হিরদয়! কেয়া কহেঁ তসীলদারজী। যেন বাপের কোলঘেঁষা একটা বাচ্চার হৃদয়।

ফুলনবাবু—রুদ্রকিশোর কি মাটিসাহেবের পিতাজীর নাম?

রামসিংহাসন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। কবে সেই ছেলেবেলায় বাপ মরে গেছেন, আজ ছেলের মাথার চুলও সাদা হয়ে গিয়েছে, তবু দেখুন, কী হিরদয়, বাপের নামটিকেই যেন পুজো করছেন মাটিসাহেব।

ফাইনাল খেলার দিন এস-ডি-ও এসেছিলেন। সিলুয়াডি কোলিয়ারীকে হারিয়ে দিয়ে শীল্ড পেল শিউলিবাড়ি ইলেভেন। এস-ডি-ও'র হাত থেকে শীল্ড উপহার নিয়ে

যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

—তারপর আর কিছু হল না। ফুলনবাবুর বউ নন্দুয়ার কাছে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু…।

—নন্দুয়া কি বললে?

—নন্দুয়া বলেছে,—না।

বিন্ধ্যাচলী মাথা নাড়ে—তবে তো মনে হয়, ওহি, ওহি বা!

—কওন? কওন?

—মোহিত।

রামসিংহাসন একটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ।

॥ ষোল ॥

যে সত্য শুধু রামসিংহাসনের চোখে নয়, শিউলিবাড়ির আরও অনেকের চোখে ধরা পড়েছে, সেটা কি মাটিসাহেবের চোখে ধরা পড়েনি? যদিও মাটিসাহেবের বয়সটা ষাট বছর হতে চলেছে, মাথাটা সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো তো এখনও আলো-মাখানো নীল আকাশের মত হাসে। সন্ধ্যার জঙ্গলের পথে সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতে এখনও যার চোখে কোন অন্ধকার ঠেকে না, এমনই যাঁর চোখের তেজ, সে মানুষ কি এখনও দেখতে পায়নি যে, মোহিতের হাত থেকে বই নেবার জন্য একটা আশার প্রতীক্ষায় কেমন ব্যাকুল হয়ে শিউলির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় সুনন্দা? আর সে-সময় সুনন্দার চোখের চাউনিটাও কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠে?

নিরুপমার মনেও একটা দুঃসহ বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা ছটফট করে। এখনও কি চোখে পড়ল না মানুষটার, মেয়ের গলাটা যে শূন্য? মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনা করবার সময় কি এখনও আসেনি? যেন শিউলিবাড়ির আকাশটার ইচ্ছার কাছে সব আশা সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছেন মেয়ের বাপ। মেয়ের অদৃষ্টের কি হবে, কি হতে পারে, আর কি হতে চলেছে, এসব যেন মানুষটার কাছে কোন প্রশ্নই নয়।

মেয়ের গলার জন্যে সোনার হার গড়াবার জন্য জমিয়ে রাখা সেই দেড়শো টাকার পুঁটুলিটাকে যে এখনও নিরুপমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেননি, সেজন্যেও কি বিজনবিহারীর মনে কোন আক্ষেপ আছে? একটুও না। তাই আজও হেসে হেসে অনায়াসে বলে দিতে পারলেন, মনে আছে নিরু। সামনে একটা খরচের ধাক্কা আছে, সেটা সামলে নিতে পারলেই তোমার দেনা শোধ করে দেব।

বলতে ইচ্ছা করে নিরুপমার—ওটা আমার কাছে তোমার দেনা নয়, ওটা তোমার অদৃষ্টের কাছে তোমার দেনা। কিন্তু বুকের ভিতরে মুখর হয়ে ওঠা এই দুরন্ত প্রতিবাদের শব্দটাকে যেন মুখ চেপে নীরব করে রেখে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী তো আকাশের ইচ্ছার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটোছুটি করেন, কিন্তু নিরুপমার চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে চমকে ওঠে, আর,

একটা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিথর হয়ে যায়। সন্দেহ না করে পারেন না নিরুপমা, আর সন্দেহ করতেও বুক কাঁপে, বিজনবিহারীর এই নিশ্চিন্ততা যেন একটা অসহায়তার অলস ঘুম। একটা অক্ষমতার দুঃখ জোর করে ফাঁকির হাসি হাসছে। মেয়ের বিয়ে দিতে কোন চেষ্টাই করতে পারছেন না এই দুঃসাহসিক মাটিসাহেব, তাই মিথ্যে নির্ভাবনার কথা দিয়ে ভয় চাপা দিতে চেষ্টা করছেন।

নিরুপমার অভিযোগ যতই বোবা হয়ে থাকুক না কেন, সে অভিযোগের রূপটাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে পেরেছেন নিরুপমা। তবু বিজনবিহারী দেখতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। নিরুপমার হাতে শুধু একজোড়া শাঁখা ছাড়া আর কিছুই নেই। দুলজোড়া খুলে নিয়ে মেয়ের কানে পরিয়ে দিয়েছেন। নিরুপমার ছ'গাছি সোনার চুড়ি, সেগুলোও সুনন্দারই হাতে উঠেছে।

হেসে ফেলেছিল সুনন্দা।—তুমি নিশ্চয় বাবার ওপর রাগ করে এসব কাণ্ড করছ মা।

নিরুপমা হাসতে চেষ্টা করেন।—ছিঃ, রাগ করব কেন? আমার আর এসব জঞ্জাল গায়ে রাখতে ভাল লাগে না, লজ্জাও করে।

সুনন্দা আবার হাসে—বেশ কথা বললে! যদি জঞ্জালই মনে কর, তবে আমার গায়ে চাপাও কেন? আমিও কি একটা জঞ্জাল?

কেঁদে ফেলেন নিরুপমা। দু' হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন—ছি ছি, এমন সর্বনেশে শক্ত কথা বলিসনি নন্দ, বলতে নেই।

সুনন্দা বলে—কিন্তু তুমি আমার বিয়ের কথা নিয়ে বাবাকে ব্যস্ত করে তুলবে না মা।

—কেন?

—কি দরকার!

—তার মানে কি? তোর বিয়ে হবে না?

—হবে বইকি।

—এর মানেই বা কি?

—এর মানে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

সুনন্দার মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। কি আশ্চর্য, মেয়েও যে ঠিক বাপের মত মনের জোরের গর্ব দেখিয়ে আর একেবারে ভাবনাহীন হয়ে কথা বলছে! কিন্তু কেন?

সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়িতে ফিরে আসেন বিজনবিহারী, আর, সুনন্দার গাল টিপে যত আবোল-তাবোল আদরের বোল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তখন ডাক দেন নিরুপমা,—শুনছ?

—হ্যাঁ।

—শুনে যাও।

—কি ব্যাপার?

—নন্দু এসব কি কথা বলছে ?

—কি কথা ?

—বলছে, বিয়ে হবে, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

—বলেছে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তবে ঠিকই বলছে।

—তার মানে ?

—তার মানে, মোহিত নন্দুকে বিয়ে করতে চায়।

বিজনবিহারীর স্নিগ্ধ চোখে নতুন এক সূর্যোদয়ের আভা হাসছে। আর, মুখের উপর জয়গর্বের প্রসন্নতা। যেন জানাই ছিল বিজনবিহারীর, অলক্ষ্য একটা আশীর্বাদের হাত নন্দুর মাথায় ধানদূর্বা ছড়িয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। ভাবনা করবার কিছু নেই। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মনপ্রাণ আর শরীরটাকে একমুহূর্তের জন্যও জিরোতে না দিয়ে, যত সাধ স্বপ্ন আর আশার মাটি ফেলে ফেলে শিউলিবাড়ি নামে যে মায়ার দেশ নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন মাটিসাহেব, সে দেশের সব আলো-ছায়ার কাছে মাটিসাহেব যে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার মেয়েকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবার মত মানুষ আছে। এখানেই আছে। এখানে শাস্তর আর মন্তরকেও যে ডেকে এনে বিজনবিহারী তাঁর গায়ের জোরে জায়গা করে দিয়েছেন। সুনন্দার বিয়ে ঠিক হয়েছে জানতে পেলে চক্রবর্তী যে এখনই পাঁজি হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে। সেনবাবুর মেয়েরা বোধ হয় এখনই শাঁখ বাজাতে শুরু করে দেবে। সুচেত সিং এখনি একঝুড়ি ফল পাঠিয়ে দেবে। হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী উলু দিয়ে ফেলবে, আর রামসিংহাসনের বউ গলা খুলে গান গেয়ে উঠবে—কেকর ঘর চলি সীয়া, কেকর ঘর চলি ! আর, থার্ড টিচার পুষ্করও বোধহয় ছুটে এসে খোঁজ নেবে, বিয়ের কাজে খাটতে চাইবে। ব্যাণ্ডপার্টি যদি আনবার দরকার হয়, তবে বলামাত্র রাঁচি চলে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে পুষ্কর।

নিরুপমা হাসেন—বিন্ধ্যাচলী সেদিন একটা অদ্ভুত কথা বলছিল।

বিজনবিহারী—কি ?

—হরচন্দ রায়ের ভাগ্নে কুবের নাকি নন্দুকে বিয়ে করবার জন্য··· ।

—না না, কখখনো না। কি ভেবেছে হরচন্দ রায়, বাংলাদেশে কি মানুষ নেই ?

—সে কথা চুকে গিয়েছে। ফুলনবাবুর বউ একদিন নন্দুকে কথাটা বলেছিল।

—তারপর ?

—নন্দু জবাব দিয়েছে, না।

বিজনবিহারীর মুখের হাসিতে সেই জয়গর্বের প্রসন্নতা যেন আরও নিবিড় হয়ে টলমল করে।—ওরা বুঝতে খুব ভুল করেছে। আমি যে একটা খাঁটি বাঙালী, আর নন্দু যে মনেপ্রাণে একটা বাঙালী মেয়ে, এটা বোধহয় ওরা ঠিক ধরতে পারেনি। যাই হোক··· ।

কি-যেন ভাবতে থাকেন বিজনবিহারী, আর চোখ-মুখের প্রসন্নতা আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে—আজকাল আমার কি মনে হয় জান নিরু ?

—কি ?

—আমাকে আর তোমাকে কেউ যেন ক্ষমা করে আর খুশি হয়ে নতুন একটা আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।

—কি বললে ? কে পাঠিয়েছে ? নিরুপমার চোখ দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—ছোড়দা পাঠিয়েছে।

নিরুপমার চোখে যেন একটা অবুঝ শূন্যতা শুধু ফ্যালফ্যাল করে। কিছুই বুঝতে পারছেন না নিরুপমা, কি বলতে চাইছেন বিজনবিহারী। শিউলিবাড়ির এই জীবনে, এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ছোড়দার কথাটা বিজনবিহারীর মুখে হঠাৎ ডুকরে উঠেছে।

নিরুপমা বলে—আজ হঠাৎ ছোড়দা কেন…।

এক হাতে সাদা মাথাটা, আর এক হাতে ধবধবে ফর্সা বুকটাকে চেপে ধরে ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব হঠাৎ ছোট ছেলের মত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।—ছোড়দা আর নেই, নিরু। খবর পেলাম, কেষ্টনগরের কমলকিশোরবাবু আজ পাঁচ বছর হল মারা গেছেন।

নিরুপমা দু হাত দিয়ে চোখ মুখের উপর আঁচলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে করুণ গুঞ্জনের মত মৃদু একটা কান্নার স্বর চেপে রাখতে চেষ্টা করেন।

আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসে সুনন্দা। বিজনবিহারীর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে—কি হল বাবা ? শিগ্‌গির বল, কি হল ?

বিজনবিহারী তখনই শান্ত হয়ে, আর ফুঁপিয়ে ওঠা বুকের কষ্টটাকে নিজেই হাত বুলিয়ে যেন ভুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকেন—কে চলে গেছে, কিছুই বুঝতে পারলি না নন্দু।

—কে বাবা ?

—তোর জেঠু রে নন্দু।

এ কেমন জেঠু ? এত বড় মায়ার এক জেঠু পৃথিবীতে কোথাও ছিল, এ সত্য তো কোনদিন শুনতে পায়নি সুনন্দা।

শুনতে পায়নি, জানতে পায়নি, কেউ বলেনি, ভালই ছিল। আজও না শুনতে পেলে ভালই হত। সুনন্দাকে তা হলে আজ দু' চোখ ভরে এত করুণ একটা বিস্ময়ের বেদনা নিয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকাতে হত না। বিজনবিহারীকেও একটা করুণ বিস্ময় বলে মনে হত না। আজ নয়, সেই আট বছর বয়সের একটি দিনে, যেদিন চক্রবর্তীঠাকুরের মেয়ে অঞ্জলির জন্য দেশের বাড়ি থেকে আমসত্ত্বের ছোট্ট একটা পার্সেল এসেছিল, সেদিন নিরুপমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে যে সত্য জেনেছিল সুনন্দা, সেটা হল একটা অদ্ভুত দুঃখের সত্য। দেশ থাকতেও দেশ নেই, আপনজন বলতে কেউ নেই।—না রে নন্দু, তোর বাবার বাড়িতেও কেউ নেই, মামাবাড়িতেও

কেউ নেই যে তোকে আদর করে আমসত্ত্ব পাঠাবে।

সুনন্দা যেন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে।—আমার কেমন জেঠু, বাবা?

নিরুপমাও যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন—তোর আপন জেঠু।

—কিন্তু…।

—কিন্তু একটা খুব দুঃখের ঝগড়ার জন্য ভাইয়ে-ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তাই তোর বাবার মুখে কোনদিন জেঠুর কথা শুনতে পাসনি।

সুনন্দা চলে যায়। খাটের উপর উঠে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন বিজনবিহারী। হাত-পা গুটিয়ে, মাথাটাকে কেমন-যেন অলসভাবে একপাশে এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন। মাটিসাহেবের এই শক্ত পোক্ত চেহারাটা কি-অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষী চেহারা!

নিরুপমা বলেন—আঃ, এ কি রকমের শোওয়া? হাত-পা মেলে একটু টান হয়ে শোও, আমি বাতাস দিই।

চোখ দুটোকে যেন ছলছলিয়ে হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। ষাট বছর বয়সের সাদা মাথাটাও অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকে।—ইচ্ছে করছে, ছোড়দার পিঠের কাছে মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে থাকি।

পাখাটা হাতে তুলে নিয়ে জোরে-জোরে বিজনবিহারীর সেই চোখের উপর বাতাস দিতে থাকেন নিরুপমা। চোখ বন্ধ করে আর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকেন বিজনবিহারী।

কিন্তু কতক্ষণ? বড়জোর এক মিনিট। নিরুপমা জানেন, বিজনবিহারীর এই এক মিনিটের নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা স্তব্ধতা যে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠারই লক্ষণ। বিজনবিহারীর দুরন্ত আত্মাটা যেন স্বপ্নের একটা ছবিকে চকিত চোখে একবার দেখে নেবার জন্য এক মিনিটের জন্য শান্ত হয়, তারপরেই ব্যস্তভাবে কাজ খোঁজে।

কাজ হল সেই সব কাজ। শিউলিবাড়ি ক্লাবের লাইব্রেরি ঘরে বিবেকানন্দের একটা ছবি দরকার। একবার দেখে আসা দরকার, মিসরাতু আর কুলডিহার মেয়েগুলো মুড়ি ভাজতে পারল কি না? ভুলাই ঝিলের কালবোশ কত বড় হল? স্টেশনের গাঙ্গুলীবাবু খবর দিয়েছেন, কাটোয়া থেকে একজন বাউল এসেছে, চমৎকার গান গায় আর নাচে। বললে কি রাজি হবে না কাটোয়ার বাউল, শিউলিবাড়িতেই একটা আখড়া করে থেকে যেতে?

তা ছাড়া আরও একটা কাজ আছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেন বিজনবিহারী। নিরুপমা বলেন,—কি হল? উঠে পড়লে কেন?

—এখনি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—এই ওখানে। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান কৈলাসবাবু আজ ফুলনবাবুর বাড়িতে এসেছেন।

নিরুপমা আর কোন প্রশ্ন করেন না। প্রশ্ন করে লাভ নেই। জিরোতে জানে

না, থামতে জানে না, ঝিমোতে পারে না, এই রকম একটি স্বভাবের মানুষকে আর বেশি প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।

প্রশ্ন না করলেও জানতে বেশি দেরি হয়নি নিরুপমার। মাত্র আর সাতটা দিন পরে, বাড়ি ফিরেই যেন একটা কৃতার্থ খুশির উল্লাসের মত হেসে-চেঁচিয়ে হাঁক-ডাক করতে থাকেন বিজনবিহারী।—শুনছ? তুমি কোথায় নিরু? নন্দ্ আছিস নাকি?

—কি হল?

—পুকুরটার নাম কমলসাগর হয়ে গেল।

—কি বললে?

হেসে হেসে চিকচিক করে বিজনবিহারীর চোখ।—পানীয় জলের জন্য যে পুকুরটা কাটিয়েছে জেলা বোর্ড, তার ঘাট তৈরির সব খরচ আমি দিয়েছি। কাজেই কৈলাসবাবু আমার কথা রেখেছেন। আমার পছন্দমত নামটাকেই মেনে নিয়েছেন। তুই বুঝলি কিছু নন্দ?

—বুঝেছি।

—কি বুঝেছিস? কমলসাগরের কমল মানে কি? পদ্মফুল?

সুনন্দা হাসে—না, মানে হল জেঠুর নাম।

॥ সতর ॥

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে ছোট্ট একটি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। তার পাশেই তুটো কল্‌কে ফুলের গাছ। গাছের ছায়ার উপর লুটিয়ে পড়ে আছে বাসী ফুল। আর গাছের সেই ছায়ার কাছে আরও তুটো ছায়া। যাদের ছায়া, তাদের চোখে আকাশ ছাপিয়ে উথলে পড়া পূর্ণচাঁদের আলোর মত খুশির আলো ঝলমল করে। মোহিত আর সুনন্দা।

একটা বাসী কল্‌কে ফুলকে জুতো দিয়ে চেপে আর চটকে দিয়ে মোহিত বলে—এগুলোই বোধ হয় হলদে করবী।

সুনন্দা বলে—হবে। আমি তো এগুলোকে কাণ্ডিল ফুল বলে জানতাম।

মোহিত হাসে—এখন নতুন করে জানলে তো?

—হ্যাঁ।

—কি?

—তুমি যা জানিয়ে দিলে।

—কি জানালাম?

হেসে ওঠে সুনন্দা—হলদে করবী।

মোহিতও খুশি হয়ে বলে—সত্যিই শিউলিবাড়ির অশিক্ষার মধ্যে থেকে থেকে তোমার ভাষাও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দার চোখে যেন বিচিত্র এক কৃতজ্ঞতার হর্ষ চমকে ওঠে।—তুমিই তো শুধরে দিয়েছ।

মোহিতের অভিযোগের কথা আর সুনন্দার কৃতজ্ঞতার কথা, দুইই বর্ণে বর্ণে সত্য। মোহিত যদি শিউলিবাড়িতে না আসত, আর মাটিসাহেবের এই মেয়েকে এত ভালবেসে না ফেলত, তবে সুনন্দা আজ এই কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের কানের কাছে এমন ভাষায় কখনই কথা বলে দিতে পারত না,—আমি তো একটা মরচে-পড়া লোহা হয়ে এখানে পড়েছিলাম, মোহিত ; তুমি পরশমণির মত ছুঁয়ে দিয়ে আমাকে সোনা করে দিয়েছ। আমার প্রাণটা যে তোমার কাছে চিরকালের ঋণী হয়ে গেছে।

শিউলিবাড়িতে এসেছে মোহিত, যদিও চিরকাল শিউলিবাড়িতে থাকবার জন্যে আসেনি। তবু এই সত্য আবিষ্কার করেছে মোহিত, চিরকালের আপন করে নেবার মত একটা রূপের ছবি যেন এই শিউলিবাড়িতে আছে। বছরের পর বছর তো শুধু অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতার নিঃশ্বাস চেপে আর দূর থেকে সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়েছে মোহিত। তারপর একটা বছর ধরে শুধু চিঠি লিখে যেন একটা স্বপ্নের কাছে আবেদন করেছে।—আমার ভালবাসাকে অপমান কর না সুনন্দা ; যা হোক কিছু একটা উত্তর দিও।

শেষে উত্তর দিয়েছিল সুনন্দা—আপনি দয়া করে আমাকে আর চিঠি লিখবেন না। আমার বড় ভয় করে।

সুনন্দার সেই ভয়ের চিঠিই যেন ভালবাসার পথের ভয়টাকে দূরে সরিয়ে দিল। ক্লাবের সেক্রেটারি মোহিত ঘোষ প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এসে, প্রেসিডেন্টের মেয়ের হাতে একগাদা বই তুলে দিয়ে চলে গেল। সেদিন বুকের সব নিঃশ্বাসের ভার মৃদু করে দিয়ে, সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে একটা কথাও বলে দিতে পেরেছিল মোহিত—আমাকে ভয় করবার কোন মানে হয় না সুনন্দা।

ঝুমরা কলোনিতে একটি বাংলো বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকে মোহিত ঘোষ। ক্লাবটার উন্নতির জন্য অনেক চিন্তা করেছে এবং আজও করে। মোহিতের মন যেমন রুচিও তেমন, আর জীবনের ভঙ্গিটাও তেমনই পরিচ্ছন্ন। ক্লাবের জন্য যেটুকু কাজ করে, সেটাও একটা পরিচ্ছন্ন কাজ। মাঝে মাঝে সভা-সম্মেলন ডাকে মোহিত। সভায় একমাত্র বক্তাও মোহিত। সেনবাবু আর গাঙ্গুলীবাবু আসেন। চক্রবর্তী আসেন। হেডমাস্টার দীনবন্ধু আর অন্য সব টিচারেরাও আসেন। আসে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত। ফুলনবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। এমন কি রামসিংহাসনও কয়েকবার এসেছে।

—আমাদের এই শিউলিবাড়ির সবই ভাল। সবই আছে এখানে। অভাব শুধু একটি ;—শিক্ষার অভাব।

মোহিতের বক্তৃতা শুনে ফুলনবাবু মাথা নেড়ে সায় দেন।—ঠিক কথা।

গাঙ্গুলীবাবু বলেন—খুব ঠিক কথা।

—সমস্যা এই যে, শিউলিবাড়ির মন এখনও এক যুগ পিছনে পড়ে আছে। আজকের দিনের চিন্তা ইচ্ছা রুচির কোন খবর রাখে না শিউলিবাড়ি।

একথাটাও বর্ণে বর্ণে সত্য। সভা শেষ হলে দীনবন্ধুবাবু আর সেনবাবু আলোচনা করেন, শিউলিবাড়ি যদি পিছিয়েই না থাকবে, তবে এখানে ওই এক মোহিতের মত একটি ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় এমন একটি ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাবে না কেন, যে-ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি আর চরিত্র দেখে গর্ব করতে পারে আর অনেক কিছু শিখতে পারে শিউলিবাড়ি?

চক্রবর্তী একটু চাপা-গলায় ফিসফিস করে গাঙ্গুলীবাবুর কাছে কি-যেন বললেন। গাঙ্গুলীবাবু হেসে ফেলেন—সেটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা সমস্যা কি জানেন, পুষ্কর তো ঠিক এরকম শিক্ষিত ছেলে নয়. অন্য যতই গুণ থাকুক না কেন, শিউলিবাড়ির বাঙালীদের মান বাড়াবে, এমন যোগ্যতা পুষ্করের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

গাঙ্গুলীবাবু নিজের চোখে দেখেছেন, মোহিতের ঘরে একটি আলমারি ভর্তি কি-রকমের আর কত রকমের বই আছে।—দেখে আশ্চর্য হয়েছি দীনবন্ধুবাবু, এই বয়সের ছেলে যে এত বিদ্যে ভালবাসে এমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি মশাই। হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে, আমাদের রামপুরহাটের চাটুজ্জেমশাইকে। ঘরভর্তি বইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পেনসনী প্রফেসর, মোহিতের মত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একটা মানুষ তো নয়।

—মোহিত বোধহয় এম-এ।

—হ্যাঁ।

—চাকরিটাও তো বেশ ভাল মাইনের চাকরি।

—না, ঠিক চাকরি নয়। হিসেব অডিট করার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে মোহিত। ধরুন, শুধু এক সিলুয়াডি কোলিয়ারির হিসেব অডিট করে বছরে দেড় হাজার টাকা পায়। তা ছাড়া ছুধিয়া সিমেন্ট আছে, সিংহানি কোলিয়ারি আছে। সবারই কিছু না কিছু কাজ করে দেয় মোহিত। সব নিয়ে বেশ ভাল আয় হয়।

—বাঃ, চমৎকার ভাগ্যবান ছেলে।

—কৃতী ছেলে।

—কিন্তু···।

—কি?

—একা-একা ওভাবে পড়ে আছে কেন? বাপ-মা নেই?

—তা জানি না।

—কথা হল, মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে সত্যিই কি···।

—তাও জানি না মশাই।

কিন্তু না জানবার আর কি যুক্তি আছে? কে না দেখেছে, সুনন্দা আর মোহিত কমলসাগরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় আর গল্প করে? কে না দেখেছে, মাটি-সাহেবের বাড়ির বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আছে মোহিত, আর সুনন্দা ভিতর থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বের হয়ে এসে মোহিতের কাছে দাঁড়িয়েছে?

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্রের রোদ আর গুমোট যখন দেখা দিল, আর সারা শিউলি-বাড়ির ঘরে ঘরে একটা জ্বরের উৎপাতও দুরন্ত হয়ে উঠল, তখন ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রীও একদিন নিজের চোখে দেখতে পেলেন, মাটিসাহেবের মেয়ে একাই হেঁটে হেঁটে সেই বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকল, যেটা হল মোহিত অডিটারের বাংলো, যেটার বাইরের ঘরটা হল অফিস ঘর, আর ভেতরের ঘরটা···কে জানে কি দেখেছেন বিরাজ মাসিমা···যে জন্যে ঘরটাকে একেবারে বাসরঘরের মত একটা সাজানো ঘর বলে তাঁর চোখে ঠেকেছে।

বিরাজ মাসিমার কাছ থেকেই জানতে পেলেন প্রণববাবুর স্ত্রী, মোহিতের জ্বর হয়েছে, তাই মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা বার বার মোহিতকে দেখতে আসছে।

—কেন?

—কি করে বলব বল? সুনন্দার হাতে অবশ্য মস্ত বড় একটা কাচের বাটি দেখলাম। বোধ হয় সাগু, কিংবা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দিল।

—কিন্তু এরকম সেবা-টেবার একটা মানে আছে তো?

—আছে বইকি। থাকলেই ভাল। বিরাজ মাসিমা তাঁর নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে আবার ব্যস্তভাবে চলে যান।

কিন্তু ভাদ্রের গুমোট ভেঙে দিয়ে আশ্বিনের আকাশ যখন হেসে উঠেছে, শিউলি-বাড়ির কোন ঘরে যখন জ্বর-জ্বালা নেই, আর মোহিত অডিটারকেও যখন দেখা যায় ব্যাডমিন্টনের ব্যাট হাতে নিয়ে ক্লাবের দিক থেকে ব্যস্তভাবে হেঁটে নিজের বাংলোতে চলে যাচ্ছে, তখন তো কারও বাড়িতে সাগু বা পথ্যি-টথ্যি পৌঁছে দেবার দরকার নেই। তবে কেন মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক মোহিতের বাংলোর দিকে যাবার রাস্তাটি ধরে একমনে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

বিরাজ মাসিমা বলেন—সবই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

প্রণববাবুর স্ত্রী বলেন—আমিও তো সব বুঝেছি, কিন্তু বিয়েটা কবে?

বিরাজ মাসিমা—সে-সব কথা তো এখনও কিছুই শুনতে পাইনি।

মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন প্রণববাবুর স্ত্রী, কথা বলেছেন বিরাজ মাসিমা, কিন্তু দুজনেই দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কি-ভয়ানক ভীরু আর লাজুক এই মেয়ে, যার বয়স তো অন্তত কুড়ি-পঁচিশ হবে। যে কাণ্ডটাকে চোখের উপর দেখছেন, সে কাণ্ডটাকে দেখতে একটুও ভাল লাগে না, পছন্দ করেন না, কিন্তু মেয়েটাকে ভাল লাগে। বিরাজ মাসিমা নিজেও বলেছেন, কি আশ্চর্য, মেয়েটার ওপর আমার কিন্তু একটুও রাগ হয় না।

আজও আবার দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, তবু মাটি-সাহেবের মেয়ে এতক্ষণ ওখানেই ছিল নিশ্চয়, তা না হলে ওদিক থেকে আসবে কেন?

প্রণববাবুর স্ত্রী হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করেন—লাহাবাবুদের বাড়িতে ঠাকুরের আরতি দেখতে গিয়েছিলে নিশ্চয়। দেখে কেমন লাগল সুনন্দা?

চমকে ওঠে সুনন্দা—আজ্ঞে না, আমি তো ঠাকুরের আরতি দেখতে যাইনি।

বিরাজ মাসিমা বলেন—না না, সুনন্দা গিয়েছিল নিশিবাবুর ছেলের বউ মালতীর সঙ্গে গল্প করতে।

—না, মালতীকে আমি তো চিনি না।

প্রণববাবুর স্ত্রী—তবে কোথায় গিয়েছিলে?

—মোহিতবাবুর বাড়িতে।

বিরাজ মাসিমা—মোহিতের মা এসেছেন বুঝি?

—না। বলতে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা যেন হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়তে চায়। দু' চোখে একটা ভীরু লজ্জার ভার টলমল করে, আর সারা মুখ লালচে হয়ে ওঠে।

প্রণববাবুর স্ত্রী যেন খুশি হয়ে হাসেন—তা বেশ। কিন্তু তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন?

বিরাজ মাসিমা—ভালই তো।

প্রণববাবুর স্ত্রী আবার হাসেন—বিয়েটা কবে হবে, তাই বল! ওঁর ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই যদি বিয়েটা হয়, তবে তোমার বিয়েতে উলু দিয়ে তারপর কলকাতা ফিরব।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

বিরাজ মাসিমা বলেন—আঃ, মেয়েটাকে আর লজ্জা দিও না হারুর মা, দিন ঠিক হলে জানতেই পারা যাবে। মাটিসাহেবের মেয়ের বিয়েতে কি শিউলিবাড়ির কারও নেমন্তন্ন বাদ যাবে?

॥ আঠার ॥

ঝুমরা কলোনির প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার জিজ্ঞাসার কাছে আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি সুনন্দা। লাজুক মুখটাকে লুকোতে গিয়ে মাথাটা ঝুঁকে গিয়েছিল। মাথা পেতে যে ভাগ্যটাকে বরণ করে নিতে হবে, যেন তারই একটা শুভ সঙ্কেত জানিয়ে দিতে পেরেছে সুনন্দা, যদিও একটিও কথা বলতে হয়নি। লোকের চোখের কাছে সুনন্দার এই প্রথম স্বীকৃতি। প্রণববাবুর স্ত্রী আর বিরাজ মাসিমার ধারণার উল্লাসটাকেও মাথা পেতে বরণ করে নিয়েছে সুনন্দা।

আশ্বিনের আকাশে অনেক তারা হাসছে। ঝুমরা কলোনির বাতাসে হাসনু-হানার গন্ধ মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠছে। দস্তিদার সাহেবের বাড়ির ফটকের আলোর কাছে মাধবীলতার ফুলগুলি যেন ফুটন্ত লালমাণিকের থোকা হয়ে জ্বলছে। কাঁকরের রাস্তাটা ফুরিয়ে যায়, তবু মনে হয় সুনন্দার, ঝুমরা কলোনির হাসনুহানার গন্ধ যেন এখনও নিঃশ্বাসের বাতাসে ছুটোছুটি করছে।

মোহিতের ভালবাসার কাছে মাথা পেতে দিতে হয়েছে। যেমন আজ, তেমনি সেদিনও, সেই প্রথম, সাগুর বাটি হাতে নিয়ে মোহিতের বিছানার কাছে যেদিন দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। তিন দিনের জ্বরে কি-ভয়ানক ঘোলা হয়ে গিয়েছিল মোহিতের সেই কালো-কালো বড়-বড় চোখ। কিন্তু মোহিতের সেই জ্বরের চোখে কি-অদ্ভুত

পিপাসা ছটফট করে উঠেছিল। কত শক্ত করে হাতটা চেপে ধরল মোহিত, আর অবুঝের মত কত কথাই না বলল। সত্যি, ভালবাসা একটা অবুঝ পিপাসাই বটে, হাসনুহানার পাগল গন্ধের চেয়েও উতলা। তা না হলে সাগুর বাটির দিকে না তাকিয়ে সুনন্দার সেই ভীরু মুখের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেবে কেন মোহিত? আর সুনন্দাই বা কেন হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবে না?

সুনন্দাকে সরে যেতে দেয়নি মোহিত, সুনন্দাও সরে যায়নি। ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল সুনন্দার। মনে হয়েছিল একটা সর্বনাশের উৎসব যেন সুনন্দার প্রাণটাকে মোহিতের বিছানার উপর লুটিয়ে দিয়ে স্তব্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু মোহিত যখন হেসে-হেসে নিজেরই হাতে সুনন্দার চোখের জল মুছে দিল, তখন সুনন্দার ভিজে চোখও হেসে উঠেছিল। মোহিতের মুখটা যে সান্ত্বনাময় একটা অঙ্গীকারের ফুল, মাধবীলতার ফুলের চেয়েও রঙিন হয়ে আর লালমাণিকের আভা ছড়িয়ে হাসছে।—আমাকে ভয় করলে কিংবা লজ্জা করলে যে আমার ভালবাসাকে অপমান করা হয়, সুনন্দা।

ঠিকই, সুনন্দার মনের অবুঝ ভয় আর শরীরের অবুঝ লজ্জাটা বুঝতে পেরেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। যার ঘরে চিরকালের ঠাঁই নিতে হবে, তার ঘরে এসে প্রাণটা যদি একটু অসাবধান হয়ে যায়, তবে যাক না; ক্ষতি কি?

স্টেশন রোডের আলোগুলিও যেন আজ বড় বেশি ঝলমল করছে। এগিয়ে যেতে থাকে সুনন্দা। কিন্তু এ কি? কি সুন্দর সুরের একটা বাংলা গানের ভাষা বাতাসে ভেসে আসছে। আশ্বিনের আকাশটাও কি আজ গান গাইতে শুরু করেছে? কে গাইছে? কলের গান বোধ হয়।

মোড় ঘুরে স্টেশন রোড ছেড়ে দিয়ে ধর্মশালা যাবার ছোট রাস্তাটার দিকে এগিয়ে যেত সুনন্দা, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। মোড়ের উপরে সড়কের পাশের একটি ঘরে ফুল আলো আমপাতা আর চাঁদমালায় সাজানো একটা উৎসব যেন গান গাইছে। ছোট্ট একটা দোকান ঘর। কিসের দোকান?

গ্রামোফোন আর রেকর্ডের একটি দোকান। দুটো আলমারি আর একটা টেবিল। চারটি চেয়ার, এক গুচ্ছ ধূপকাঠিও পুড়ে পুড়ে সুগন্ধের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। টেবিলের উপর একটা ঝকঝকে গ্রামোফোন গলা খুলে গান গাইছে।

—আসুন না?

অদ্ভুত স্বরের একটা আহ্বানের ভাষা যেন হঠাৎ বেজে উঠছে। চমকে ওঠে সুনন্দা।

সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে রমাসুন্দরী বেঙ্গলী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচার পুষ্কর দত্ত।—আজ দোকান প্রতিষ্ঠা হল। এই তো কিছুক্ষণ আগে পুজো শেষ করে চক্রবর্তীঠাকুর চলে গেলেন।

সুনন্দাও হাসতে চেষ্টা করে—গানের রেকর্ডের দোকান বোধ হয়।

পুষ্কর—হ্যাঁ। বাংলা হিন্দী, এমন কি ইংরেজি রেকর্ডও আছে। তিনটে রেকর্ড

কোম্পানির এজেন্সি পেয়েছি। শিলুয়াড়ির সাহেবরা আজই প্রায় তিনশো টাকার রেকর্ডের অর্ডার দিয়েছেন।

—আপনি কি তবে স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে…।

—না না, স্কুলের কাজ তো আছেই। আমার দুটি ভাই আছে, ওরা সকাল-বিকেল দোকান দেখবে, আমি শুধু সন্ধ্যেবেলা এসে ওদের ছুটি দেব। দেখা যাক্, কি হয়?

—আচ্ছা, আমি চলি।

—দোকানটা একটু দেখবেন না?

—না।

ব্যস্তভাবে চলে যায় সুনন্দা। কিন্তু রাস্তাটা কি বিশ্রী অন্ধকারে ভরে রয়েছে! পুষ্করের দোকানের আলোর দিকে এতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকাই ভুল হয়েছে। তা না হলে চোখ দুটো এত ধাঁধিয়ে যেত না, আর চোখের সামনে এই রাস্তাটাকে এত অন্ধকারে ঢাকা একটা শূন্যতা বলেও মনে হত না।

বাড়ি ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে, তারপর আনমনার মত ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে, যখন জানলাটার কাছে এগিয়ে এসে, আর অদ্ভুত একটা ক্লান্তির আবেশে অলস হয়ে যাওয়া হাত দুটোকে কোনমতে তুলে নিয়ে খোঁপা খুলতে থাকে সুনন্দা, তখন বাইরের বারান্দাতে একটা চকিত উল্লাসের শব্দ হো-হো করে হেসে ওঠে। যেন একটা খুশির আবেশে গলে গিয়ে হাসছেন আর কথা বলছেন বিজনবিহারী। সুনন্দার আনমনা চোখের দৃষ্টিতে দুঃসহ আর বিশ্রী একটা সন্দেহও চমকে ওঠে। পুষ্কর দত্ত এসেছে বোধহয়।

যে এসেছিল সে এইবার চলে গেল বোধহয়। তাই ঘরের ভিতরে ঢুকলেন বিজন-বিহারী, আর সুনন্দার দিকে তাকিয়ে যেন বুকভরা একটা খুশির হাসি উথলে দিলেন—পুষ্কর আমাকে উপহার দিয়ে গেল নন্দু। রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড।

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে থাকেন বিজনবিহারী—ওঃ, পুষ্কর আমার খুব উপকার করল। এতদিন ধরে রাগ করে শুধু ইংরেজি গানের যত হালালালা শুনেছি, কান পচে গিয়েছে।

তখনি গ্রামোফোনটার কাছে বসে রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড বাজাতে শুরু করেন বিজনবিহারী।—আঃ, বলিহারী, কী মিষ্টি গান! এইবার পেটভরে বাংলা গান শোনা যাবে।

রামপ্রসাদী গান কখন থেমেছে, বোধহয় বুঝতে পারেনি সুনন্দা। কতক্ষণ ধরে চুপ করে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আশ্বিনের আকাশের তারা দেখেছে, তাও জানে না। একগাদা জোনাকি যখন সুনন্দার গায়ের উপর পড়ে ছুটোপুটি শুরু করে, তখন সেই আনমনা আবেশ হঠাৎ চমকে উঠে ভেঙে যায়। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবা খেতে বসেছেন, আর মার সঙ্গে গল্প করছেন।

শুনতে একটুও ভাল লাগে না যে গল্প, সেই গল্পই শুরু করেছেন বাবা। পুষ্কর

দত্তের যত কীর্তির আর বাহাদুরীর গল্প।—বেশ জেদ আছে ছেলেটার, চেষ্টাও আছে, তেমনি খাটতেও পারে। এ ছেলে একদিন উন্নতি করবে।

জোরে একটা ঢেঁকুর তুলেছেন বিজনবিহারী। বুঝতে পারে সুনন্দা, বাবার খাওয়া শেষ হল। কিন্তু, কি আশ্চর্য, গল্প শেষ করছেন না বাবা।

বিজনবিহারী বলেন—গত বছর কালীপুজোর সময় চমৎকার একটা কাণ্ড করে বসেছিল পুষ্কর। কোন মুণ্ডা গাঁয়ের একটাও মানুষ যেন কালীপুজো দেখতে না আসে, সে-জন্যে মিশনের ছোট ফাদার ভয়ানক জবর একটা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুষ্কর নিজে গিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে পাঁচশ মুণ্ডা ছেলে-মেয়ের একটা মিছিল নিয়ে এসে কালীবাড়ির আঙিনায় হাজির করেছিল। পুষ্করের উপর মারধোরেরও একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ঘাবড়ায়নি পুষ্কর।

এই পুষ্করী রামায়ণ এখন থামলে হয়। সুনন্দার চোখে একটা অস্বস্তির ভ্রূকুটি ছটফটিয়ে ওঠে। বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, তাহলে এই গল্পের কোন শব্দ আর কানের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

কি আশ্চর্য, মা'ও যে হেসে হেসে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন—পুষ্করের স্বভাবটা দেখছি প্রায় তোমারই মত।

আর শুনতে ইচ্ছে করে না। নিরুপমার মৃদু হাসির শব্দটাও যেন মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের প্রশস্তির গুঞ্জন। বাবা আর মা দুজনের কেউই একটু বুঝে দেখছেন না যে, আজ এভাবে পুষ্কর দত্তের নামে এত গৌরবের কথা বললে যে ওদিকের একটা মানুষকে অপমান করা হয়। ভয় করে সুনন্দার, বারান্দায় গিয়ে বসে থাকলেও কোন লাভ হবে না। হয়ত শিউলিগুলোও পুষ্করের নামে জয়ধ্বনি করে সুনন্দার অস্বস্তির জ্বালাটাকে আরও দুঃসহ করে দেবে।

।। উনিশ ।।

কমলসাগরের নতুন ঘাটের কাছে হলদে করবীর ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে যেন একটা অস্বস্তির হাত এসে সুনন্দার মুখ চেপে ধরে আর ভাষা ভুল করিয়ে দেয়। না, এখানে আর নয়। জল নেবার জন্য যেখানে মানুষের ভিড়ের আনাগোনা লেগেই আছে, সেখানে ভালবাসার মন মুখ খুলে কথা বলতে বাধা পায়, বলতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য, এই দু'মাসের মধ্যে কতবার কমলসাগরের ঘাটের এই হলদে করবীর কাছে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে গল্প করেছে সুনন্দা, কিন্তু কই, এরকম একটা অস্বস্তির কাঁটা তো সুনন্দার মনে বেঁধেনি? ভাবতে একটা রহস্য বলেই মনে হয়। কিসের অস্বস্তি কোথা থেকে আসছে?

ঘাটের পথে যারা আনাগোনা করে, তারাও কি কিছু জানে না? আর দেখেও কি কিছু বুঝতে পারে না? হতেই পারে না! আজ শিউলিবাড়ির কে না জানে যে, মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে মোহিত অডিটারের ভাব হয়েছে? খবরটা যে শিউলি-

বাড়ির সব আলোছায়াকে খুশির হাসিতে মুখর করে দেবার মত খবর। কিন্তু শিউলিবাড়ি যেন প্রচণ্ড একটা ধৈর্য ধরে খুশির হাসি চেপে রেখেছে। ঘাটের পথের লোকজন শুধু একবার তাকিয়ে দেখে আর চলে যায়। হলদে করবীর ছায়ার কাছে যেন কোন ঘটনাই নেই। খবরটা শুনে যার আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবার কথা, সেই চাচিজী বিন্ধ্যাচলীও তো খবরটা জেনেছে। কিন্তু কই, চাচিজী তো একদিনও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল না। নন্দুয়া বেটির গলা জড়িয়ে ধরে গান গেয়ে উঠল না। সন্দেহ হয়, মাটিসাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের খবর শুনে খুশি না হয়ে, বরং যেন একটা হিংসের জ্বালা চাপা দেবার জন্য গম্ভীর হয়ে রয়েছে শিউলিবাড়ি।

সুনন্দা হাসে—চল, এখানে আর ভালো লাগে না।

—কেন?

—মনে হচ্ছে আমাদের দু'জনকে দেখতে ওদেরও ভাল লাগছে না।

মোহিতও হাসে—তাতে আমাদের কোন্ স্বর্গের বাতি নিবে যাবে?

—তা তো বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

—কি?

—আমাকে কেউ হিংসে করছে, না তোমার ওপর কেউ রাগ করছে?

—তোমাকে হিংসে করবার একটা মানে হয়, কিন্তু আমার ওপর রাগ করবার তো কোন মানে হয় না।

—কেন?

—আমি কি তোমাদের শিউলিবাড়ির কারও চেয়ে ছোট?

—ছিঃ, তুমি আবার কেন রাগ করে কথা বলছ? কে না জানে যে, বাবা তো নিজের মুখে তিনবার বলেছেন, তুমি হলে শিউলিবাড়ির গর্ব।

—আমার কি মনে হয় জান? সবাই একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছে; যাকে বলে, একটু হতভম্ব হয়ে গেছে।

—তাই তো মনে হয়।

মোহিতের চোখ জ্বলজ্বল করে হাসে—কিন্তু তুমি কি বল, সেটা তো জানতে পেলাম না।

সুনন্দার চোখ দুটো যেন একটা কৃতজ্ঞ মায়ার ভার সামলাতে না পেরে ছলছল করে।—আমাকে আর কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছ? কলকাতার মেয়ের মত লেখাপড়া জানলে হয়ত বলে দিতে পারতাম; কিন্তু বলতে জানি না বলেই বলতে পারছি না। তুমিও জান না, আমাকে ভালবেসে তুমি আমাকে কত বড় মান দিয়েছ!

হেঁটে হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে সুনন্দা আর মোহিত। এখান থেকে কমলসাগরের ঘাটের কাছের হলদে করবীটা দেখা যায় না, স্টেশন রোডের কোন দোকানের কলরবও শোনা যায় না। দু'পাশে শাল সেগুন আর দেওদারের বীথিকা, মাঝখানে ছায়াভরা রাঁচি রোড এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঘুরে-ফিরে উধাও হয়ে গিয়েছে। যেন নিরিবিলি জগতের একটা ছায়াপথ পড়ে আছে এখানে। ভাল-

বাসার দুটো হাত যদি এখানে, এই বিকেলের আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তবু উঁকি দিয়ে দেখবার মতও কোন বাধা এখানে নেই। সুনন্দাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মোহিত।

সুনন্দা হাসে—তবু কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি কেমন করে আমাকে এত ভালবাসতে পারলে?

—এক কথায় বলে দিতে পারি।

—বল!

—তুমি শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে।

—শিউলিবাড়ির সেরা মেয়ে আমি নই, কিন্তু তোমার তাই মনে হয়েছে।

—হ্যাঁ। একই কথা হল। এবার তুমি বল তো, শুনি।

—কি?

—আমাকে তুমি ভালবাসলে কেন?

—এক কথায় বলে দিতে পারি।

—বল।

—আমারও মনে হয়েছে।

—কি মনে হয়েছে?

সুনন্দার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন একটা স্মিত অনুভবের আনন্দ উতলা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।—তুমি বাংলাদেশের সেরা ছেলে।

॥ কুড়ি ॥

ভাবতে পারেনি সুনন্দা, সেই অস্বস্তিটা শুধু একবার এসে আর রামপ্রসাদী গানের পাঁচটা রেকর্ড বাবাকে উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যাবে, আর কখনও আসবে না। বরং দুটো দিন ধরে সন্দেহময় একটা আতঙ্কে ভুগতে হয়েছিল। রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড একটা চমৎকার ছুতো। সেই ছুতো ধরে এবার থেকে হয়ত রোজই আসবে পুষ্কর দত্ত। হয়তো শিউলির ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো মাটিসাহেবের মেয়ের মুখ দেখবার জন্য পিপাসিতের মত জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আসেনি পুষ্কর। সুনন্দার উদ্বিগ্ন মনটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। আতঙ্কের কথাটা মনে পড়তেই মনটা যেন একটা লজ্জাও পেয়েছে। আকাশে মেঘ নেই, তবু বজ্রপাতের ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছিল সুনন্দার প্রাণ। এত বড় অস্বস্তিটা যে একটা চমৎকার ঠাট্টা।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, স্বস্তিটাও যেন একটা চমৎকার শূন্যতা। চমকে ওঠে সুনন্দা। ভাবনাটার বেহায়াপনা দেখে নিজেরই উপর রাগ করে ছটফটিয়ে ওঠে সুনন্দার একটা নিঃশ্বাসের বাতাস। কুৎসিত ভাবনাটা যেন মোহিতের ভালবাসাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠকাচ্ছে। চোর যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষের মাথার কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি নিয়ে সরে যায়।

—মা শুনছ? হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দিতে গিয়েই গলার স্বরের আক্রোশটাকে সামলে নিয়ে, একটা লজ্জাতুর ব্যাকুলতার গুঞ্জনের মত মৃদুস্বরে ডাক দেয় সুনন্দা।

নিরুপমা সাড়া দেন—কি হল?

—কই, তোমরা যে কিছু বলছ না।

—কি?

—মোহিতবাবুকে কি তোমরা কেউ কিছু বলবে না?

নিরুপমা হাসেন; সুনন্দার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—নিশ্চয় বলা হবে। তোর বাবারও ইচ্ছে, বিয়েটা এই অঘ্রাণে চুকে যাক।

বাইরের বারান্দাতে একটা চেয়ার যেন ব্যস্তভাবে শব্দ করে ছটফটিয়ে উঠল। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে একটা উচ্ছল খুশির কণ্ঠস্বর।—হ্যাঁ, অঘ্রাণ মাসই সবচেয়ে ভাল মাস, নিরু। নলেন গুড় না পাওয়া যাক, খেজুরের নতুন রস তো পাওয়া যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।

হেসে হেসে চলে যাচ্ছিলেন নিরুপমা। সুনন্দা বাধা দেয়—তুমি আজ আবার রান্নাঘরে ঢুকছ কেন? তোমার না কাশি বেড়েছে?

—তাতে কি হয়েছে?

—না, তুমি চুপটি করে বসে থাক।

—তুই রাঁধবি?

—হ্যাঁ।

—না। আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে, মেয়ে আমার হাঁড়ি ঠেলতে চাইছেন। তা হবে না।

চেঁচিয়ে উঠলেন বিজনবিহারী—কখ্খনো না, নিরু। নন্দুকে এখন আর ওসব পাগলামি করতে দিয়ো না। উনুনের আঁচ ভয়ানক বিশ্রী জিনিস, মুখের রঙ একেবারে কালচে করে দেয়।

বাইরের বারান্দাতে যেন একটা কলরবের ঝড় উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। একগাদা ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের কলরব। কলরবের ভাষাটা যেন একটা অভিযোগের ভাষা। কিংবা একগাদা অভিমানের কাকলী।

চমকে ওঠে সুনন্দা। কলরবের মধ্যে সেই দুঃসহ অস্বস্তির নামটাই বার বার বেজে উঠছে—পুষ্করদা! পুষ্করদা!

কি হয়েছে? কারা এসেছে? ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুনন্দা। দেখতে পায়, যারা এসেছে তারা বয়সে ও চেহারায় শিউলিবাড়ির ভোরের পাখির মত একগাদা কলরবের প্রাণ। সাত-আট-নয়-দশ বছরের বেশি বয়স কারও নয়; নতুন বস্তির, স্টেশন রোডের, আর কালীতলার যত ছেলে আর মেয়ে। চক্রবর্তী ঠাকুরের ছোটমেয়ে জয়ন্তী আছে, হেডমাস্টার দীনবন্ধুবাবুর মেয়ে মনোরমাও আছে। এমন কি লালাদের বাড়ির তিন-চারটে মেয়েও আছে।

শিউলিবাড়ি ক্লাবের প্রেসিডেন্টের কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছে ওরা।

জয়ন্তী বলে—মোহিতবাবু বললেন, ক্লাবে আমাদের থিয়েটার করা চলবে না।

বিজনবিহারী—কিসের থিয়েটার?

মনোরমা বলে—পুষ্করদা আমাদের জন্যে একটা নাটক লিখে দিয়েছেন।

—অ্যাঁ? চমকে উঠেই হেসে ফেলেন বিজনবিহারী।—ভালই তো।

—কিছু ভাল হল না। মোহিতবাবু বারণ করে দিয়েছেন।

—বুঝলাম না।

—এবার পুজোতে আমরা ক্লাব-বাড়িতে থিয়েটার করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু মোহিতবাবু বললেন, না, হবে না।

বিজনবিহারী—হবে হবে। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। তোমরা এখন বাড়ি যাও জয়ন্তী, আমি সব ঠিক করে দেব।

বিষণ্ণ অভিযোগের কলরব সেই মুহূর্তে খুশির কলরব হয়ে ছুটে চলে গেল। আর, ঘরের ভিতরে ঢুকে, জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে এইবার সুনন্দাও বুঝতে পারে, সুনন্দার সৌভাগ্যের সব কলরব স্তব্ধ করে দেবার জন্য একটা চক্রান্ত জেগে উঠেছে, তার নাম পুষ্কর দত্ত। রমাসুন্দরী মাইনর স্কুলের থার্ড টিচারের ফুসফুসে বেশ তো সাহস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মোহিতের বিদ্যাবুদ্ধির উপর হিংসে করে একটা নাটকই লিখে ফেলেছে। ভুল করেছে, ভয়ানক ভুল করেছে পুষ্কর দত্ত। আঁকশি দিয়ে খুঁচিয়ে আকাশের চাঁদকে মাটির ধুলোতে নামিয়ে দেবে, এটা পাগলের কল্পনার আশা।

চক্রান্তের চেষ্টাটার রকম দেখে হেসে ফেলতেও ইচ্ছে করে। বোকা ছেলের লোভ যেমন নাগালের বাইরে একটা গাছের ফল ধরবার জন্য ভাঙা নড়বড়ে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আর হাত বাড়িয়ে আঁকুপাকু করে, এ-যেন তেমনই একটা করুণ লোভের চেষ্টা। এ চেষ্টাকে হেসে তুচ্ছ করাই উচিত।

সত্যিই, মুখটাকে হঠাৎ হাসিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে এই বদ্ধতার ভেতর থেকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বের হয়ে যায় সুনন্দা। কালীতলা পার হয়ে ছোট নদীর কিনারায় এসে বটের ছায়ার কাছে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। নুড়ি আর বালুর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা রোগাটে স্রোত। স্রোতের জলের সঙ্গে একটা একলা জবা ফুল তরতর করে ভেসে চলে যাচ্ছে। সুনন্দারও প্রাণটা যেন একটা একলা স্বপ্নের মত কোন নিরিবিলি ঘুমের জগতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। আর ভাবতে ভাল লাগে না। সব ভাবনার উৎপাত থেকে ছাড়া পেতে চায় সুনন্দার ক্লান্ত প্রাণ। সুনন্দার মুখের এই হাসিটাও যেন হাঁপিয়ে পড়া একটা ক্লান্তির করুণ হাসি।

বাড়িতে ফিরে এসেই কিন্তু চমকে উঠতে হয়। সুনন্দার এই ক্লান্ত হাসির মুখটাও বিরক্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। বুকের ভিতরে সেই অস্বস্তিটা আবার চিৎকার করে উঠতে চায়। কারণ, বিজনবিহারীর একটা উৎফুল্ল হাসির শব্দ যেন চিৎকার করে উঠেছে—পুষ্কর এসেছিল।

সুনন্দা—কেন?

—পুষ্কর খুব লজ্জিত।

—কেন ?

—ক্লাব বাড়িতে থিয়েটার করবার জন্য পুষ্কর কাউকে পরামর্শ দেয়নি। জয়ন্তী আর মনোরমা, দুষ্ট দুটো নিজেরাই মতলব করে মোহিতকে গিয়ে ধরেছিল।

—কিন্তু নাটকটা তো পুষ্করবাবু লিখে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, সেজন্যে পুষ্কর বেচারা আরও লজ্জিত।

—কেন ?

—পুষ্করের লেখা নাটক পড়ে মোহিত হেসেছে।

—তা, হাসবার মত ব্যাপার হলে মানুষ না হেসে পারবে কেন ?

—হ্যাঁ, পুষ্করও সেটা বোঝে, সেজন্যেই জয়ন্তীকে বার বার বলে দিয়েছিল পুষ্কর, ওরা যেন পুষ্করের লেখা নাটক-ফাটক নিয়ে গিয়ে মোহিতকে বিরক্ত না করে।...এ কি ? তোর চোখ-মুখ এ রকম ছলছল করছে কেন ? খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—গরম জলে চান করবি।

নিরুপমা তাঁর রান্নার ব্যস্ততা ছেড়ে দিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন। সুনন্দার কপালে হাত রাখেন—ঠিকই তো, মেয়ের কপাল যে ছমছম করছে। জ্বর বলেই তো মনে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন—ঠিক আছে, আমি তো এখনই বের হব, যাবার পথে সেন-বাবুকে একটা খবর দিয়ে যাব, যেন এখনই এসে একবার দেখে যান।

ঠাণ্ডা লেগেছে ঠিকই, আর জ্বরও হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু শুধু সেইজন্যেই কি সুনন্দার চোখ-মুখ ছলছল করছে ? গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানার উপর নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেও, প্রশ্নটা যেন ধূর্ত একটা ঠাট্টার মত সুনন্দার কানের কাছে ফিসফিস করছে। ছি ছি, পুষ্কর দত্তের চক্রান্তটা যে সুনন্দার একটা মিথ্যে রাগের মিথ্যে কল্পনা। পুষ্কর দত্ত যে নিছক একটা চেষ্টাহীন নিরীহতা। একটা অলস অসার ছায়া মাত্র। ম্যাটি-সাহেবের মেয়ের সৌভাগ্যের পথে কাঁটা পেতে রাখবার কোন গরজ ওর নেই।

মাটিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাবার কোন গরজও কি কোনদিন ওর চোখে দেখা দিয়েছিল ? কোনদিনও না। বছরের বারো মাসের মধ্যে অন্তত একশো বার মাটিসাহেবের মেয়ের সঙ্গে থার্ড টিচার পুষ্কর দত্তের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, সুনন্দার মুখটাকে একটু ভাল করে দেখবার জন্যও তার চোখে কোন লোভের চেষ্টা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সেদিনও রুদ্রকিশোর শীল্ড বুকে জড়িয়ে ধরে মিছিলের আগে আগে হেঁটে চলে গিয়েছে ক্যাপ্টেন পুষ্কর দত্ত, তখনও তো দেখতে পায়নি সুনন্দা, সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুনন্দার মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছে পুষ্কর দত্ত। এমন মানুষকে সন্দেহ করাও যে চোরের রাগের মত একটা বেহায়াপনা। রাগ করে নিজের মনটাকেই ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। আর জোর করে এই ঘেন্নাটাকেও ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। বিছানা ছেড়ে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুনন্দা। গরম জল হয়ে গিয়ে থাকলে এখনই স্নান করে

নিতে হবে।

সেনবাবু এসে বললেন—না না, কিচ্ছু ভাববার নেই, সামান্য সর্দি-জ্বর।

দশটা বড়ি দিয়ে চলে গেলেন সেনবাবু। কিন্তু দশটা দিন পার হয়ে গেলেও, আর সুনন্দার চোখ-মুখের ছলছলে ভাব কেটে গিয়ে বেশ খোলা-মেলা একটা খুশির ভাব হেসে উঠলেও, সর্দি-জ্বরের ভাবটা যেন সুনন্দার গা থেকে ছেড়ে যেতে চায় না।

এই দশদিনের মধ্যে তিনবার এসেছে মোহিত। চাদর গায়ে জড়িয়ে আর বাইরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে সুনন্দা। মোহিতকে চা এনে দিতেও ভুলে যায়নি সুনন্দা।

এসেছে মোহিত। সুনন্দাও আশা করেছিল, আজও নিশ্চয় আসবে মোহিত।

মোহিতের দু'চোখের ব্যাকুলতা যেন বিস্মিত হয়ে বার বার সুনন্দার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায় আর হাসতে থাকে।···কি আশ্চর্য সুনন্দা! জ্বরটা যে তোমাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

সুনন্দা হাসে—তাহলে জ্বরটা আরও দশটা দিন থাকুক, আরও সুন্দর হয়ে উঠি।

মোহিত বলে—না না, তা নয়। তোমাকে দেখতে সত্যিই অদ্ভুত লাগছে, একেবারে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে, তাই মনের কথাটা বলেই দিলাম।

সুনন্দার মুখটা হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। যেন একটা দুরন্ত নিঃশ্বাসের আবেগ চেপে চেপে কথা বলে সুনন্দা—বাবার কাছে তুমি এখনও কথাটা বলছ না কেন?

সুনন্দার কথাটার মধ্যে যেন একটা অধীরতার ঝাঁজ লুকিয়ে আছে। বোধহয় সেটা মোহিতের কানেও ঠেকেছে। আর, তাই বোধহয় মোহিতের মুখটা একটু করুণ হয়ে যায়।—তুমি যেদিন বলতে বলবে, সেদিনই বলে দেব।

—তাহলে আজই বল।

—বেশ।

চুলগুলি রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। চোখ দুটো বেশ চকচকে হয়েছে। কাজল পরেনি, তবু চোখের কোল জুড়ে একটা কাজলা ছায়ার কালিমা, মুখটা একটু বেশি ভরাট, চোখের চাহনিটা ভার ভার, আর ঠোঁট দুটো বড় বেশি লালচে। আজ আয়নার দিকে তাকাতে গিয়ে সুনন্দার নিজেরই চোখে মুখটাকে খুবই নতুন-নতুন ঠেকেছে। আর, ছোট্ট একটা বিস্ময়ের নিঃশ্বাসও বুকের ভিতরে ঠেকেছে। না, জ্বরের জন্য নয়। কোন সন্দেহ নেই, শরীরটারই একটা রহস্যের ভয়ে সুনন্দার মুখটা ভীরু হয়েছে বলেই মুখটাকে এরকম সুন্দর দেখাচ্ছে।

মোহিত যখন চলে যায় তখন দূরের সিংহানী পাহাড়ের গায়ে ক্লান্ত বিকালের রোদ লালচে হয়ে গলে পড়েছে। জ্বরের শরীর চাদরে জড়িয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে সুনন্দা, সেটা সুনন্দার চোখও যেন বুঝতে পারছে না।

—কি ভাবছ নন্দু বহিন? যেন কলকলিয়ে হেসে কথা বলছে একটা খুশির ঝর্না।

চমকে ওঠে সুনন্দা—তুমি কবে এলে রাজুদি?

রাজমোহিনী হাসে—আজ এসেছি। কিন্তু এ কি শুনছি নন্দু? ঠিক তো?

—ঠিক।

রাজমোহিনী আরও খুশি হয়ে হাসে।—কিন্তু এরই মধ্যে মুখটা এত সুন্দর করে ফেললে কেমন করে? দেখলে যে মহাদেবও পাগল হয়ে যাবে।

—কি বললে?

রাজমোহিনী ফিসফিস করে হাসে—বলছি, বিয়ের আগে তো মুখ এমন সুন্দর হয় না, বিয়ের পরে হয়।

চমকে ওঠে সুনন্দা—কি বললে?

—বলছি, বরের কথা ভেবেই যদি এত রূপ খুলে যায়, তবে বরের গা ছোঁয়ার পর কী রূপই না খুলবে।

সুনন্দার চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে রাজমোহিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাজমোহিনীর খুশির মুখরতা থামতে চায় না—রাগ করিস না নন্দু বহিন। সত্যি তোকে কোনদিন দেখতে এত সুন্দর লাগেনি।

চলে যায় রাজমোহিনী। বিকালের আলো সরে গিয়ে চোখের সামনে যে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে উঠছে, সেটাও বোধহয় সুনন্দার চোখে পড়ছে না।

নিরুপমা ডাকলেন—ভেতরে আয় নন্দু।

॥ একুশ ॥

ঘরের ভিতরে গিয়ে আলোর সামনে একটা মোড়ার উপর বসে থেকেও যেন আলোটাকে দেখতে পাচ্ছে না সুনন্দার উদাস দুটো কালো চোখ। নিরুপমা তিনবার এসে তিনবার কপালে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। সেই তিনটে স্নিগ্ধ ছোঁয়ার স্বাদও বোধ হয় অনুভব করতে পারেনি সুনন্দার তপ্ত কপালটা। কিন্তু কান দুটো হঠাৎ চমকে উঠেছে। বাইরের বারান্দায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন বিজনবিহারী, আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে হেসে উঠছেন।

বুঝতে আর ভুল হবে কেন? পুষ্কর দত্ত এসেছে। পুষ্কর দত্ত তার একলা জীবনের যত শখ সাহস আর চেষ্টার গল্প বলছে। এসব গল্পের সঙ্গে সুনন্দার অদৃষ্টের কোন সম্পর্ক নেই। এসব গল্প শোনবার জন্য সুনন্দার মনে এক ছিটে কৌতূহলও নেই। সেদিন রামপ্রসাদী গানের রেকর্ড এনেছিল, আজ হয়তো মীরাবাঈয়ের গানের রেকর্ড নিয়ে এসেছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টকে খুশি করছে স্কুলের থার্ড টিচার। মুরুব্বীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ঘুস দিয়ে খুশি করছে একটা উন্নতির মতলব। মাটিসাহেবের মেয়ের জীবনের আনন্দকে বিরক্ত করবার কোন মতলব নয়।

বাইরে বারান্দাটা যখন নীরব হয়ে যায়, তারপর বোধহয় একটা মিনিটও পার হয় না, ঘরের ভিতরে ঢুকে খুশির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন বিজনবিহারী—একটা সুখবর আছে, নিরু।

—বল।

—পুষ্কর ঠিক আমার মতই একটা কাণ্ড করেছে।

—কিসের কাণ্ড ?

—বর্ধমান থেকে এক বন্ধু ডাক্তারকে আনিয়ে শিউলিবাড়িতে বসিয়েছে পুষ্কর।

—ডাক্তার ?

—হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। নতুন বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে ওষুধের একটা দোকানও করে ফেলেছে রাজীব ডাক্তার। পুষ্কর খুব সাহায্য করেছে। আজ, এই সন্ধ্যাতে রাজীব ডাক্তারের ওষুধের দোকান-প্রতিষ্ঠার পুজো হয়ে গেল।

—ভাল হল। রাজীব ডাক্তারের উন্নতি হোক।

—আরও ভাল কথা, পুষ্কর দুটো ওষুধ দিয়ে গেল। একটা ওষুধ সকালবেলার জন্যে, একটা সন্ধ্যাবেলার জন্যে।

—কিসের জন্যে ?

—সুনন্দার জন্যে। রাজীব ডাক্তার বলেছে, দুদিনের মধ্যে সর্দি-জ্বর ভাল করে দেবে এই ওষুধ।

বিজনবিহারীর হাতে সত্যিই দুটো শিশি। আলো পড়ে ছোট্ট কাচের শিশি দুটোও যেন ঝিকঝিকিয়ে হাসছে। কিন্তু সুনন্দার আতঙ্কিত চোখ দুটো শুধু কেঁপে কেঁপে দুটো নির্মম বিদ্রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতরে অস্বস্তির জ্বালাটা বোধহয় আগুনের শিখা হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। না, অসম্ভব। পুষ্কর দত্তের চোরা উপকারের ওই ওষুধ মুখে দিতে পারবে না সুনন্দা। ওষুধের শিশি দুটোকে এই মুহূর্তে জানলার বাইরে ওই শক্ত অন্ধকারের গায়ে আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে দিতে আর গুঁড়ো করে দিতে হবে।

সুনন্দার মুখের প্রশ্নটাও যন্ত্রণাক্তের মত ছটফটিয়ে ওঠে।—তুমি কি পুষ্করবাবুকে ওষুধ দিয়ে যাবার জন্য বলেছিলে ?

বিজনবিহারী—না, আমি তো কিছু বলিনি। আমি বলবই বা কেন ?

দেয়ালের তাকের উপরে ওষুধের শিশি দুটোকে রেখে দিয়ে চলে যান বিজন-বিহারী। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমাও চলে যান। আর, সুনন্দার হঠাৎ-ক্ষুব্ধ আত্মাটা যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। একটা মিথ্যে ভয়ের সঙ্গে কোন্দল করবার লজ্জা। মাথাটা যেন নিজের ইচ্ছায় হেঁট হয়ে যেতে চাইছে। দু'হাত তুলে কপালটাকে ঠেকিয়ে রেখে এই অলস মাথাটার সব ভার ধরে রাখতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

কোন সন্দেহ নেই, আবার ভাবতে ভুল করেছে সুনন্দার মন। পুষ্কর দত্তের প্রাণ আড়াল থেকে কারও মুখের ছবিকে ধ্যান করছে না। চেষ্টা করে নয়, খোঁজ করে নয়, উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও নয়, ভদ্রলোক বোধহয় হঠাৎ জয়ন্তী কিংবা মনোরমার মুখের কথা থেকে জানতে পেরে গিয়েছে, সুনন্দাদির জ্বর হয়েছে। তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফুলনবাবুর ছেলের বউ পার্বতীর মুখ থেকেই একদিন গল্পটা শুনেছিল সুনন্দা।

যেদিন সিলুয়াড়ি কোলিয়ারী টিমকে হারিয়ে দিয়ে রুদ্রকিশোর হকি শীল্ড পেল শিউলি-বাড়ি ইলেভেন, সেদিন পার্বতীর শ্বশুর ফুলনবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শিউলি-বাড়ি ইলেভেনের ক্যাপ্টেন পুষ্করবাবুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন —জওয়ান-ই-বঙ্গাল! জিতা রহো পুষ্কর!

সর্দর স্থচেত সিং পুষ্করের হাত ধরে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কৈসর-ই-শিউলিবাড়ি। খুশ রহো পুষ্কর।

আজ আবার এ ছাই গল্পটাকে বার বার মনে পড়ে কেন? মনে পড়িয়ে লাভই বা কি? গল্পটা যে আসতে অনেক দেরি করেছে। যদি আর একটা বছর আগে গল্পটা আসতে পারত, তবে বোধ হয়…।

আবার ভাবতে ভুল করছে স্থনন্দা। একটা বছর আগে পুষ্করের মুখের দিকে তাকালেই বা কি লাভ হত? কিছু না। স্থনন্দার কপালের উপর কোন ফুলের পরাগ ঝরে পড়ত না। পুষ্কর দত্ত তো কোন আশা নিয়ে মাটিসাহেবের মেয়ের মুখের দিকে তাকাত না।

বুঝতে আর কোন অস্থবিধাও নেই। বাংলাদেশের জোয়ান হয়ে আর শিউলি-বাড়ির কৈসর হয়ে মানুষের উপকারের কাজে খেটে বেড়ায় যে মানুষটা, সেই মানুষটা মাটিসাহেবের মেয়ের সর্দি-জরের ওষুধ এনে দিয়েছে। এই মাত্র। এ ওষুধের মধ্যে অদৃশ্য কোন শর্ত নেই, গোপন কোন দাবিও নেই। এর মধ্যে রাগ করবারই বা কি আছে? আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? পুষ্কর দত্ত যদি আবার আসে, তবে বরং খুশি হয়ে আর হেসে হেসে বলে দেওয়াই উচিত, খুব ধন্যবাদ পুষ্করবাবু, খুব উপকার করলেন, আপনার ওষুধ খেয়েছি, জরও সেরে গেছে।

জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে স্থনন্দা, মুখটাও হাসতে শুরু করে দেয়। আর চোখ দুটোও যেন নিরাতঙ্ক স্বস্তির স্থখে সিক্ত হয়ে হাসতে থাকে।

—বাঃ, এ তো বেশ মজার চোখ! স্থনন্দার ঠোঁটের ফাঁকে স্বস্তির হাসিটাও হঠাৎ বিড়-বিড় করে ওঠে। হাত তুলে চোখ দুটোকে ব্যস্তভাবে মুছে দিয়েই দেওয়ালের তাকের কাছে এগিয়ে যায় স্থনন্দা। সন্ধ্যাবেলায় খেতে হবে কোন্ ওষুধটা?

ওষুধের শিশির গায়ে কথাটা লেখাই আছে। ওষুধ খায় স্থনন্দা।

চমকে ওঠে স্থনন্দা। কি-যেন ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, আজকের মনটা কি-ভয়ানক ভুল করে এই কিছুক্ষণ আগে কত রূঢ় ভাষায় মোহিতের সঙ্গে কথা বলেছে। বুঝতেও পারে, মনের ভিতরে একটা লজ্জার বেদনা করুণ হয়ে হাসছে। ছি ছি, ভাগ্যের সবচেয়ে স্থন্দর ইচ্ছার ভাষাটা কি অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল! কোথা থেকে একটা মূর্খ সন্দেহ এসে মোহিতের নিশ্চিন্ত ভালবাসার মনটাকে যেন ধমক দিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল।

জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে স্থনন্দা। এ সন্ধ্যা তো কোন অমাতিথির সন্ধ্যা নয়। চাঁদ ওঠবার কথা। কিন্তু আর কত দেরি? কুয়াশার উপর চাঁদের হাসি

লুটিয়ে পড়বে কখন ? মোহিত আসবে কখন ? বাবার কাছে কথাটা বলবেই বা কখন ?

সুনন্দার ভাগ্যের এই উৎফুল্ল কৌতূহলের সব ব্যস্ততাকে হঠাৎ শান্ত করে দেবার জন্য ভিতরের আঙিনায় একটা শাঁখ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে একটা কলরবের উৎসব। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় সুনন্দা, মনোরমা আর জয়ন্তী কাড়াকাড়ি করে শাঁখ বাজাচ্ছে ! দেখতে পায়, বাইরের বারান্দায় চক্রবর্তীঠাকুর পাঁজি হাতে নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।

এগিয়ে আসেন নিরুপমা। দু'হাতে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেন।—মোহিত নিজেই বিয়ের কথা বলেছে। তাই দিন ঠিক করছেন চক্রবর্তীঠাকুর।

ওঘরের ভিতর থেকে বিজনবিহারীর গলার একটা গর্বময় উল্লাসের স্বর শোনা যায়।—তুমি কি এখানে একবার আসতে পারবে, নিরু ?

নিরুপমা—কেন ?

বিজনবিহারী—তোমার ধার শোধ করবো। তোমার সেই দেড়শো টাকা নিয়ে যাও।

নিরুপমা হেসে ওঠেন—অ্যাঁ ?

বিজনবিহারী—হ্যাঁ। ঝুমরারাজের স্যাকরা আসবে ; এইবার হারটা গড়িয়ে নাও।

।। বাইশ ।।

কিন্তু আজ হঠাৎ এমন একটা বিষণ্ণ আর চিন্তিত চেহারা নিয়ে কেন বাড়ি ফিরলেন বিজনবিহারী, শিউলিবাড়ির এই মাটিসাহেব, যাঁর দুই চোখে এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একটা প্রসন্ন দুঃসাহসের সূর্য শুধু জলজল করে হেসেছে ? আজকের অগ্রাণের সন্ধ্যার কুয়াশার মধ্যেই বা কোন্ বিভীষিকার ছায়া দেখলেন, যে-জন্যে মাটিসাহেবের মত শক্ত-পোক্ত মানুষের হাতপায়ের জোর শিথিল হয়ে যেতে পারে ? বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েও সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে পারলেন না কেন ? গলার জোরই বা কেন এত অলস হয়ে গেল, যে-জন্যে একটা ডাকও দিতে পারলেন না—আমি এসেছি নিরু ? কিংবা—আমি এসেছি নন্দু !

বেশ তো হেসে-হেসে, আর যেন একটা বিপুল আহ্লাদের ঝড়ের মত শিউলি-বাড়ির চারদিকে সাইকেল ছুটিয়ে ঘুরছিলেন বিজনবিহারী। খোঁজ করে জেনেছেন, ঝুমরাগড়ের শুক্রবারের হাটে সরু চাল ওঠে। কুমারসাহেব বলেছেন, হাতিটাকে দু'-দিনের জন্য দিতে পারবেন। সিলুয়াড়ি কোলিয়ারীর ওভারম্যান মজুমদার বলেছেন, আদ্রা থেকে চারজন ভাল জেলে আনিয়ে দিতে পারবেন ; বড় ঝিলের সব কালবোশ ছেঁকে তুলতে পারা যাবে। পুষ্কর তো রাজি হয়েই আছে, বিয়ের দু'দিন আগে রাঁচিতে গিয়ে ব্যাণ্ডপার্টি সঙ্গে নিয়ে চলে আসবে। সুনন্দার বিয়ের উৎসবটাকে হর্ষে উল্লাসে ভরে দেবার কল্পনা নিয়ে বেশ তো ছুটোছুটি করছিল একটা বিপুল স্নেহের হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আজ এমন কি ব্যাপার হল, যে-জন্যে বাড়ি ফিরে এসেই একটা

অসাড় ক্লান্তির মত খাটের উপর লুটিয়ে শুয়ে রইলেন বিজনবিহারী ?

নিরুপমা বার বার জিজ্ঞেস করেন—কি হল ?

—কিছু না।

সুনন্দা বলে—কি হল বাবা ?

বিজনবিহারী হাসেন—কিছু না। শুধু একটু একলা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

অনেক রাতে সুনন্দা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন মোহিতের উপহার সেই বইটাও সুনন্দার বুকের ওপর পড়ে থাকে, যে-বইটার পাতায় পাতায় ভালবাসার গান ঘুমিয়ে আছে। তখন ও-ঘরের ভিতরে নিরুপমা তাঁর ঘুমহারা দুটো চোখের উদ্বেগ শান্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করেন—কি হয়েছে এবার বল।

বিজনবিহারীও খাটের উপর উঠে বসেন। জোরে জোরে হাই তোলেন, আর গা-মোড়া দিয়ে ষাট বছর বয়সের শক্ত-পোক্ত আত্মাটার সব অবসাদ যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে ওঠেন—কিছুই নয় ; করালীবাবু নামে যে ভদ্রলোক হাওয়া বদলের জন্য এখানে এসেছেন, সেই ভদ্রলোক আজ হঠাৎ কয়েকটা বাজে কথা বলে ফেললেন।

—কি কথা ?

—ভদ্রলোক বললেন, উনি আমাকে চেনেন। কথা শুনে মনে হল, সত্যিই চেনেন।

—তুমি ভদ্রলোককে চেন না ?

—তখন দেখে ঠিক চিনতে পারিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত একটি ছেলে, নাম করালীকান্ত, হয়তো সে-ই হবে। যাই হোক···আর রাত করব না, দাও কিছু খেয়ে নিই।

—কিন্তু কি বললেন করালীবাবু ?

—বললেন, আমি নাকি একজন বিদ্রোহী, গা ঢাকা দেবার জন্য এখানে এসে একটা চমৎকার বনবাস বেছে নিয়েছি। শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, এই যা। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

নিরুপমার চোখের তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে। সেই কালোছায়াটা যেন নিরুপমার চোখ দুটোকে উপড়ে দেবার জন্য হিংস্র-নখরে-ভরা একটা থাবা তুলেছে।

হেসে ফেলেন বিজনবিহারী—করালীবাবুর কথা বাদ দাও। আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না।

বিজনবিহারীর আজকের এই হাসির শব্দটাও যে সেই নির্ভয় জীবনের প্রতি-ধ্বনি। যখনই সেই কালো-ছায়াটা কাছে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তখনই বিজনবিহারীর বুকের ভিতরে যেন একটা সিংহের সাহস গরগর করে উঠেছে।

নিরুপমার কাছে বিজনবিহারীর এই হাসির শব্দটা যে একটা পরম সান্ত্বনার গান, শান্তি আর সম্মানের একটা নির্ভীক অঙ্গীকার। শোনামাত্র শান্ত হয়ে গিয়েছে নিরুপমার কালোছায়া-ভীরু প্রাণটা।

আজও, নিরুপমার চোখের তারা আর কাঁপে না। আতঙ্কিত মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। ঠিকই, আজ আর ওসব কথার কোন মানে হয় না। করালীবাবুর কথা-গুলি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মান-সম্মান আর আনন্দের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। সাধ্যি নেই।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন শুনতে পায় সুনন্দা, কাল রাতে বাবা ভাত খেয়েছিলেন, তখন সুনন্দারও চোখের তারা দুটো হেসে ওঠে।

—চলি বেটি নন্দুয়া! সুনন্দার পিঠে হাত বুলিয়ে আর হেসে হেসে বিজনবিহারী যখন তাঁর মাটিসাহেবী মূর্তিটি নিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যান, তখন অঘ্রাণের সকালের সব কুয়াশা গলে গিয়েছে। রোদ মেখে শিউলিবাড়ির ঘাসের সব শিশির হাসছে।

সারা দুপুর ধরে রামসিংহাসনের চন্দনা শিস দেয়। কাটোয়ার সেই বাউল এক-বার এসে গান গেয়ে আর সিধে নিয়ে চলে যায়।

সোনার হারটা তৈরি হয়েছে। ঝুমরা রাজবাড়ির স্যাকরা এসে হারটা দিয়ে চলে গেল। মেয়ের গলায় হারটা একবার পরিয়ে দিয়ে দেখতে গিয়েই নিরুপমার চোখ ছলছল করে ওঠে।

সুনন্দা হাসে—তুমি এরকম কেন করছ মা? আমি তো বেশ হাসছি।

বিকেলটা কিন্তু কাটতে চায় না। সুনন্দার চোখের দৃষ্টিটা উতলা হয়ে ওঠে, যেন বুকের ভিতরে হাসনুহানার গন্ধ উতলা হয়ে উঠেছে। সেদিন যদি জয়ন্তী আর মনোরমা ওভাবে শাঁখ বাজিয়ে না ফেলত, তবে আজও বোধহয় একবার ঝুমরা কলোনি বেড়িয়ে আসতে পারত সুনন্দা। এরকম অদ্ভুত একটা চক্ষুলজ্জার বাধা সুনন্দাকে এখানে অলস করে বসিয়ে রাখতে পারত না। জানতে ইচ্ছে করে, আজ এখন এই বিকেলের রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে মোহিত?

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চমকে ওঠে সুনন্দা। যেন বিকেলের রোদটাই হেসে উঠে সুনন্দার এই জিজ্ঞাসার উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে! মোহিতের চাকর রঘুনাথ একটা চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি দিয়ে চলে যায় রঘুনাথ, আর চিঠি পড়েই সুনন্দার চোখের হাসি আরও উচ্ছল হয়ে ওঠে। মোহিতের চিঠিটা যেন একটা দুরন্ত আকুলতার আহ্বান!—এখনি একবার এস সুনন্দা, একটুও দেরি কর না।

—আমি একটু ঘুরে আসছি, মা।

ঘরের ভিতর থেকে নিরুপমা বলেন—এস।

।। তেইশ ।।

মোহিতের এই ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়েও দস্তিদার সাহেবের ফটকের মাধবী-লতার বিতান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাধবীলতার গায়ে সত্যিই থোকা-থোকা ফুলের ঝালর দুলছে, না থোকা-থোকা ঠাট্টার ঝালর দুলছে? ও ফুলের আভা কি

লাল-মাণিকের আভা, না লালচে আগুনের আভা? সুনন্দার চোখ দুটো যেন সব জ্ঞান আর সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই ওভাবে এতক্ষণ ধরে আর অপলক চোখে ওই মাধবীলতার বিতানটার দিকে তাকিয়ে থেকেও কিছু বুঝতে পারছে না সুনন্দা। মোহিত বলেছে, বিয়ে হবে না; বিয়ে হতে পারে না।

—কেন?

—না; করালীকাকা যে-কথা বললেন, তাতে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত নয় সুনন্দা।

—কে তোমার করালীকাকা?

—আমার বাবার খুড়তুতো ভাই, আমাদের কেষ্টনগরের কাকা।

—কী বলেছেন করালীকাকা?

—শুনে তোমার লাভ নেই। আমি বলব না।

—লাভ আছে। কোথায় উনি?

—কেন?

—আমি তাঁরই কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

—উনি নেই। কাল এসেছিলেন, আজ সকালেই চলে গিয়েছেন।

—কেন?

—তোমার বাবার ভয়ে।

—তার মানে?

—তার মানে উনি শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের দাপটের কথা জানতে পেরেছেন।

—এ-কথারই বা কি মানে হয়?

—এখানে তোমার বাবা অনায়াসে করালীকাকাকে দু' টুকরো করে কেটে ফেলতে পারেন। মাটিসাহেবকে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কিছু বলবে না।

—আমার বাবাকে এমন ভয়ানক বলে ধারণা হল কেন তোমার করালীকাকার?

—তিনি তোমার বাবাকে চেনেন।

—চিনলে কি বাবাকে কেউ ভয়ানক বলে মনে করতে পারে?

—যাঁরা ভাল করে তোমার বাবাকে চেনেন, তাঁরা তোমার বাবাকে ভয়ানক বলেই মনে করবেন।

—মিথ্যে কথা। তোমার করালীকাকা ভয়ানক মিথ্যেবাদী।

—মাটিসাহেবই একটি ভয়ানক মিথ্যে।

—কি বললে?

—ঠিক কথা বলেছি, সুনন্দা। তুমি কিছু জান না বলেই রাগ করে আমার সঙ্গে এত তর্ক করছ।

—তুমি জানিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছ কেন?

—ভয় নয়, মায়ার জন্যে জানাতে পারছি না।

—একটুও মায়ার দরকার নেই, তুমি এখনি জানিয়ে দাও। আমি দু'কান দিয়ে শুনব।

—তবে শোন।

—বল।

—তোমার বাবা এক ভদ্রলোকের এক মিথ্যে ছেলে।

—কি ?

—সে ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নয়, একটা স্ত্রীলোকের ছেলে। আর তুমিও…।

—বল, চুপ করলে কেন ?

—তুমিও তোমার বাবার একটি স্ত্রীলোকের মেয়ে, বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নও।

—বল, আর যা কিছু জান, সব বল। শুনতে বেশ লাগছে।

—যে বিধবাকে ঘরছাড়া করে নিয়ে এসে শিউলিবাড়িতে ঘর বেঁধেছেন তোমার বাবা, সেই বিধবা হলেন তোমার ওই মা।

সারা শিউলিবাড়ি দাউ দাউ করে পুড়ছে—সেই সঙ্গে পুড়ছে আর ছাই হয়ে যাচ্ছে সুনন্দার চোখ মুখ আর ফুসফুস। জানলার গরাদটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে সুনন্দা। টিপ করে একটা শব্দ গুমরে ওঠে। মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে সুনন্দার মাথাটা গুমরে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে মোহিত—সুনন্দা !

অঘ্রাণের সন্ধ্যার বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। তাই সুনন্দার মূর্ছাটাও যেন একটা হিমাক্ত ভয়ের ছোঁয়া লেগে শিউরে ওঠে। চোখ মেলে তাকায় সুনন্দা। কথাও বলে সুনন্দা।—কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায় ? এখানে তো কেউ বাধা দেবে না। এখানেও তো চক্রবর্তীঠাকুর আছেন, আশীর্বাদ করবার মানুষও আছে।

—ঠিক কথা। এখানে তোমার বাবার দাপটের ভয়ে যত শাস্তর মন্তর আর আশীর্বাদ সবাই বিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু তাতে তো আমার মন ভরবে না। ওটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার হবে, কলকাতার হাতুবাবু যেমন ঘটা করে বেড়ালের বিয়ে দিয়েছিলেন।

একেবারে সুস্থির হয়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে মোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুনন্দা। মোহিত নয়, যেন সুনন্দার ভাগ্যের ঈশ্বর কথা বলছে। ঠিকই তো, মানুষের ছেলে এমন একটা মেয়েজন্তুকে বিয়ে করবে কেন ? মানুষের ছেলের যে দেশ বাড়ি গাঁই গোত্র আছে। নিয়মের সন্তান হয়ে এমন একটা অনিয়মের প্রাণীকে বিয়ে করতে ভয় না করে পারবে কেন মোহিত ?

মোহিত বলে—তুমি বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে আমাকেই ভুল বুঝেছ ? কথা হল, তোমাকেই যদি ঘরে নিয়ে আসি, তবে বিয়ে করবার দরকার কি ?

চমকে ওঠে সুনন্দা। মোহিতের কথার অর্থটা যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে। সুনন্দার

অপলক চোখের উপর থেকে এতক্ষণের উত্তপ্ত বাষ্পের আবরণও যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ছিঁড়ে যায়। চোখের শুকনো খটখটে তারা দুটো প্রখর হয়ে জ্বলতে থাকে।
—কি বললে ?

—বলছি, আমি আমার ভালবাসার অপমান করতে পারব না, তোমারও অপমান হতে দেব না। তুমি আমারই ঘরে আসবে, আমার কাছে থাকবে।

মাটিসাহেবের আদুরে মেয়ের হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ যেন নর্দমার পাঁকের মধ্যে চেপে ধরে গলা টিপে ধরেছে। বোবার আর্তনাদের মত একটা যন্ত্রণার শব্দ যেন সুনন্দার গলা ছিঁড়ে দিয়ে ঠিকরে ওঠে—কি বললে মোহিত ?

—আমি আর এখানে থাকব না সুনন্দা। আজই চলে যাব। আর তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

—কোথায় যাবে ?

—ধরে নাও, অনেক দূরে কোথাও। রায়পুর কিংবা নাগপুর।

—কিন্তু আমি সেখানে কেন যাব ?

—যদি আমাকে ভালবেসে থাক, তবে নিশ্চয় যাবে, যেতে হবে।

—আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে কি করব ?

—আমার কাছে আমার ঘরে থাকবে !

—কেমন করে থাকব ? চেঁচিয়ে ওঠে সুনন্দা।

—তোমার মা যেমন করে তোমার বাবার সঙ্গে রয়েছেন। মোহিতের শান্ত শিক্ষিত সবল ও অবিচলিত দুটো কৌতূহলের চোখ সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাথা হেঁট করে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা—মাগো !

—সুনন্দা ! সুনন্দার একটা হাত ধরে ডাক দেয় মোহিত। চমকে ওঠে সুনন্দা। সত্যিই যে একটা সান্ত্বনার হাত বলে মনে হয়। মুখ তুলে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হয়, মোহিতের দুই চোখ ছলছল করছে। যেন একটা ভয়-পাওয়া ভালবাসা করুণ হয়ে তাকিয়ে আছে।

চুপ করে কি যেন ভাবে সুনন্দা। বোধহয় ভাগ্যের একটা ভ্রূকুটিকে চূর্ণ করে দেবার জন্য সুনন্দার বুকের সব নিঃশ্বাস দুরন্ত একটা সাহস পেতে চাইছে। কিন্তু সুনন্দার সব নিঃশ্বাসের ভার হঠাৎ যেন শ্রান্ত হয়ে যায়। ভ্রূকুটিটাই বলছে, যেতেই যে হবে, উপায় নেই।

সুনন্দা বলে—বেশ। কখন যাবে ?

—শেষ রাত্রের ট্রেনে।

—আমাকে কি করতে হবে ?

—তুমি স্টেশনে চলে আসবে।

॥ চব্বিশ ॥

সিংহানি কোলিয়ারীর বাঁশির শব্দটা শালবনের উপর দিয়ে ভেসে এসে ঘুমন্ত শিউলি-বাড়ির বাতাসকেও একটু সজাগ করে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কয়লার ট্রেনটারও চাকা-গড়ানির শব্দটা দূরে চলে গেল। কাজেই ধরে নিতে পারা যায়, রাতের প্রহর ফুরিয়ে আসছে, দুটো বেজে গিয়েছে।

নিরুপমার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল, তাই দেখতে পেলেন, ওঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সুনন্দাও পাশে নেই।

এত রাতে কি করছে মেয়েটা? ভাত খাওয়ার পর যে মেয়ে নিজেই গরজ করে বলল, আজ আমি তোমার কাছে শোব মা, সে-মেয়ের মনে আবার এ কেমন খেয়াল দেখা দিল? মায়ের পাশে শোবার লোভটা এরই মধ্যে মরে গেল? আর বই পড়বার লোভ হল?

ও-ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আর উঁকি দিয়েই চমকে ওঠেন নিরুপমা। ফিরে এসে বিজনবিহারীর ঘুমন্ত বুকটাকে ঠেলাঠেলি করে, আর যেন একটা করুণ আতঙ্কের স্বর চেপে চেপে ডাক দিতে থাকেন—শুনছ? শিগগির ওঠ। নন্দু কি কাণ্ড করছে দেখ।

বিজনবিহারীও চমকে জেগে ওঠেন—কি হল?

—নন্দু কি-যেন লিখছে আর কি-ভয়ানক কাঁদছে।

—কেন?

সত্যিই তো কেন? যে মেয়ে আজ রাত্রে ইচ্ছে করে বাবার পাতে ভাত খেয়েছে, ইচ্ছে করে মার গা ঘেঁষে ঘুমিয়েছে, সে মেয়ে ঘুম ছেড়ে দিয়ে এই নিশুত রাতে একলা ঘরে বসে বসে কাঁদবে কেন?

সুনন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ান বিজনবিহারী আর নিরুপমা।—কি-লিখছিস নন্দু? বিজনবিহারী ডাকেন।

—কাঁদছিস কেন নন্দু? নিরুপমা ডাকেন।

লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আর চোখ মুছে নিয়ে সুনন্দা বলে—আমাকে এখনই চলে যেতে হবে, মা।

চমকে ওঠেন নিরুপমা—কোথায় যাবি?

—মোহিত যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে।

বিজনবিহারী—কি বললি নন্দু?

—আর জিজ্ঞেস করো না, বাবা।

নিরুপমা—পাগলের মত কথা বলছিস কেন? এখন আবার মোহিত তোকে কোথায় নিয়ে যাবে? বিয়ের পর যাবে।

—বিয়ে হবে না, মা।

নিরুপমা যেন সুনন্দার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুনন্দাকে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকেন—কি হল নন্দু? একথা কেন বলছিস নন্দু?

—বিয়ে হতে পারে না।

—কেন ?

—মোহিতের কাকা করালীবাবু যে-কথা বলে দিয়ে গেছেন, তার পর আর বিয়ে হতে পারে না।

—করালীবাবু যা ইচ্ছে হয় তাই বলুক, কিন্তু মোহিত তো অবুঝ ছেলে নয়।

—মোহিত খুব সবুঝ ছেলে। মোহিতই তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী নয়।

—কিছুই বুঝতে পারছি না নন্দু। মোহিত তোকে বিয়ে করবে না, তবু তোকে নিয়ে যাবে ; একি বিশ্রী কথা, কুৎসিত কথা, ভয়ংকর কথা বলছিস নন্দু ?

—তুমি বুঝতে পারবে না কেন ?

—অ্যাঁ ? কি বললি ?

—বুঝে দেখ। তুমি যা করেছ, তোমার মেয়েও তাই করবে।

সুনন্দার মাথাটাকে দু'হাত দিয়ে টেনে বুকের উপর চেপে ধরে হাঁপাতে থাকেন নিরুপমা—আমাকে ক্ষমা করে দে, নন্দু। আমার কথা ছেড়ে দে নন্দু। তুই যেতে পারবি না।

—যেতেই হবে মা।

—না না, কেন যাবি ? কথ্খনো না।

—অনেক সাহস করেছ, অনিয়মের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করেছ আর পুষেছ। কিন্তু আর বোধহয় সাহস করতে পারবে না।

—খুব সাহস আছে। চিরকাল পুষব।

—না, পারবে না। মেয়ের কোলে একটা অনিয়মের ছেলেকে দেখতে পেলে, তাকে আদর করবার সাহস হবে না।

—এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস ?

—ভাগ্যের কথা বলছি। মরতে সাহস হচ্ছে না বলেই চলে যেতে হচ্ছে।

বিজনবিহারী বলেন—নন্দুকে ছেড়ে দাও নিরু। ওকে যেতে দাও !

বিজনবিহারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সুনন্দা।—আমি মরতেই যাচ্ছি বাবা, তুমি বাধা দিয়ো না।

—না বাধা দেব না। কেন দেব ? দু-হাত দিয়ে সুনন্দার হাত দুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন বিজনবিহারী, আর টেনে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন।

নিরুপমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন বিজনবিহারী ; গলার স্বর যেন শান্ত বজ্ররব।—তুমি ওঘরে চলে যাও নিরু।

মুখটাকে দু'হাতে শক্ত করে চেপে আর টলতে টলতে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর আছড়ে পড়েন নিরুপমা।

তারপর বিজনবিহারী, এদিকে-ওদিকে বা পিছনে, কোন দিকে না তাকিয়ে, আস্তে আস্তে পা ফেলে, শুধু পায়ের তলার মেঝেটার দিকে তাকিয়ে ও-ঘরের ভিতরে

গিয়ে খাটের উপর বসে পড়েন।

শিউলিবাড়ির রাতটাও যেন মরণঘুম ঘুমিয়ে নিতে থাকে। নীরব নিস্তেজ একটা স্তব্ধতা। ওই ঘরে আর সেই বাতিটা জলছে না। খোলা দরজা দিয়ে হিমেল কুয়াশা হু হু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে। কে জানে কখন চলে গিয়েছে সুনন্দা।

নিরুপমার তন্দ্রাটাও যেন একটা মূর্ছা। কাঁদবার শক্তিটাও অসাড় হয়ে গিয়েছে। যেন একটা অভিশাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন নিরুপমা।

কিন্তু মূর্ছাটাও যেন আর নীরব হয়ে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাই হঠাৎ একবার ধড়মড় করে উঠে বসেন আর চোখ মেলে তাকান নিরুপমা। না, ওঘরে আর আলো নেই। কিন্তু এঘরে কেন আলো জলছে? ঘরটা শূন্য কেন?

নিরুপমার নিথর চোখ দুটো অবুঝের মত তাকিয়ে সারা ঘরের শূন্যতার অর্থ-টাকে যেন বুঝতে চেষ্টা করে। সে গেল কোথায়? খাটের উপর চুপ করে বসেছিল যে পাথর মানুষটা?

চমকে ওঠে নিরুপমার অবুঝ চোখ। মানুষটা যে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসছে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়েছে। এইবার টোটার মালাটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ছুটে এসে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো টোটার মালাটা তুলে নিয়ে সরে যান নিরু-পমা। টোটার মালাটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে আর দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে চেপে রেখে চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার পায়ে পড়ি। তুমি বন্দুক রেখে দাও।

বিজনবিহারী—একটা টোটা দাও নিরু। আমি চলে যাই।

—না।

—আমি রাগ করে বলছি না, নিরু। বিশ্বাস কর, কারও ওপর আজ আমার একটুও রাগ নেই।

কী শান্ত আর কত স্নিগ্ধ ও মৃদু একটি চেহারা! গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি, ধুতির কোঁচাটাকে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে দিয়েছেন। কাঁধ আর বুকের ফর্সা রঙটা ধবধব করছে। মাথার চুলের সব সাদাও আলো লেগে চিকচিক করছে। বিজনবিহারী যেন হেসে হেসে এই ঘরের একটা চমৎকার সাধের কাজ সেরে ফেলবার জন্য বন্দুকটাকে আদর করে হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিজনবিহারী হাসেন—ভাবতে বেশ লাগছে, নিরু। কি আশ্চর্য, ঠিক সময় বুঝে চলে এল সেই অভিশাপের রাগ। ধন্যি অভিশাপ রে বাবা!

হাসতে থাকেন বিজনবিহারী। যেন মনখোলা প্রাণখোলা একটা ঠাট্টার হাসি, সে হাসির আড়ালে একফোঁটা ঝাঁঝ নেই, জ্বালা নেই, ধিক্কার নেই।

নিরুপমা বলেন—আমার একটা কথা শুনবে?

—বল।

—তুমি শুয়ে পড়।

বিজনবিহারী নিরুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনই হাসিমুখে আর শান্ত

স্বরে বলেন—তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

—বল।

—আমার কাছে এসে বস।

নিরুপমার উদ্বিগ্ন চোখ দুটো এইবার বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিজনবিহারী ডাকেন—এস নিরু।

ঘর-সংসারের গম্ভীর ডাক নয়। চিন্তার ডাক নয়, কাজের ডাক নয়। যেন খেলার সাথীর ডাক। বিজনবিহারী তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনসঙ্গিনীর একটা অভিমানিত অনিচ্ছা আর কৃপণতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যেন বাজে খরচের জন্য একটা টাকা আদায় করে নেবার মতলবে আদরের স্বরে কথা বলছেন।

নিরুপমা উঠে এসে খাটের কাছে দাঁড়ান। বিজনবিহারী তাঁর পাশের জায়গাটাকে দেখিয়ে দিয়ে নিরুপমাকে আরও স্নিগ্ধ স্বরে অনুরোধ করেন—এখানে বস, আমার কাছে বস নিরু।

নিরুপমা বসেন। বিজনবিহারী হাত পাতেন। যেন একটা মিষ্টি মায়ার কাছে, যে মায়া একটুতেই গলে যায়, তারই কাছে আবেদন করেছেন বিজনবিহারী—দাও নিরু।

কিন্তু নিরুপমার মায়ার প্রাণ তবু গলতে চায় না। আঁচল দিয়ে জড়ানো টোটার মালাটাকে আরও সাবধানে আর শক্ত করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে রাখেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী হাসেন—তুমি মিছে কেন কিপটেমি করছ, নিরু? বুঝতে পারছ না কেন, আমি যে শাস্তিটাকে জব্দ করে দিতে চাই। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেব মাথা হেঁট করেছে, একটা ভীতু কুষ্ঠরোগীর মত স্টেশন রোডের এক কিনারা ধরে চুপি-চুপি চলে যাচ্ছে, এমন মজার ব্যাপার তো সম্ভব নয়।

নিরুপমা তবু অবিচল।—না, তুমি আর যা-ই বল, ওকথা বল না।

—না, না। তুমি আমাকে বাধা দিয়ে বিরক্ত করো না। আমি কারও কাছে হার মানতে পারব না নিরু। ভাল-ছেলেটি হয়ে যার-তার হাতে মার খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকা আমার পোষাবে না।

ষাট বছর বয়সের গলার স্বরের সঙ্গে যেন ষোল বছর বয়সের দুরন্ত বিজুর সেই বিদ্রোহের গর্জন আজও কথা বলছে। বিজনবিহারীর শান্ত গলার স্বর সত্যিই এবার একটু দুরন্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে আর অসুবিধে নেই, বিজনবিহারীর এই দুরন্তপনা আজ আর কোন সান্ত্বনায় শান্ত হবার নয়।

নিরুপমা বলেন—তবে শুধু একটা টোটা চাইছ কেন? দুটো নাও।

বিজনবিহারী যেন একটু চমকে ওঠেন—কি বললে?

নিরুপমার চোখ দুটোও হঠাৎ যেন একটা আশার ছবি দেখতে পেয়েছে, তাই চোখের তারা দুটোতে অদ্ভুত এক ইচ্ছার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।—আমিও যাব।

—কেন?

—কেন আবার কি ? তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে, তুমি এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

—অ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ব্যস্ত লোভীর মত আবার হাত পাতেন বিজনবিহারী—দাও, তাহলে দুটো টোটাই দাও।

বন্দুকের নলটাকে এক হাত দিয়ে টেনে নিয়ে আর নিজেরই বুকের কাছে ঠেকিয়ে রেখে, আর এক হাতে টোটার মালাটাকে বিজনবিহারীর কোলের উপর ফেলে দেন নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলেন, ছিঃ, এরকম ছটোপুটি কোর না নিরু। এতদিন যেমন আমাকে বিশ্বাস করেছ, তেমনই আজও বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাব না।

নিরুপমা যেন লজ্জিত হয়ে হাসেন। সত্যিই হাতটা হঠাৎ অবিশ্বাসী হয়ে বন্দুকের নলটাকে আঁকড়ে ধরেছে, যেন নিরুপমাকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে না পারেন বিজনবিহারী। ছি ছি, কি বিশ্রী অবিশ্বাস। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিরুপমাকে বুকের কোটরে পুরে বেঁচে আছে যে-মানুষটা, সে কি নিরুপমাকে আজ ধুলোর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে ?

—না না, অবিশ্বাস করছি না। বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে যেন একটা স্বস্তিময় নির্ভাবনায় হাঁপ ছাড়েন নিরুপমা।

বিজনবিহারী বলেন—তোমাকে কেন মিছিমিছি যত অপমান আর লজ্জার মধ্যে ফেলে রেখে যাব—কথখনো না। কিন্তু…।

দুটো টোটা আর বন্দুকটাকে দুজনের মাঝখানের ছোট ব্যবধানটুকুর উপর শুইয়ে রেখে দিয়ে বিজনবিহারী এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি-যেন ভাবেন।

নিরুপমা বলেন—কি খুঁজছ ?

—খুঁজছি না, ভাবছি, বিছানাটা রক্তে ভেসে গেলে কি ভাল দেখাবে ? কাজটা ও-ঘরের মেঝের উপর হলেই ভাল হত না কি ?

—না, ও-ঘরে নন্দুর ফটোটা রয়েছে।

—ওঃ, না, তাহলে ও-ঘরে নয়।

—আমি তো বলি, এই খাটের উপরেই ভাল। কিন্তু…।

—কি ?

—আমাকে এখানে একা শুইয়ে রেখে তুমি আবার এদিকে-ওদিকে সরে গিয়ে পড়ে থেকো না।

—না না, তা কি হয় ! আমি ঠিক তোমার পাশেই শুয়ে পড়ব।

—আমি তো দেখতে পাব না, কিন্তু আমার হাতটা তবু ধরে রেখ লক্ষীটি, কেমন ?

—নিশ্চয়। সে কথা কি আর বলতে হবে? নিরুপমার একটা হাত ধরেন বিজনবিহারী।

—এখনই?

—সেটা জেনে তোমার লাভ কি হবে বল? যখনই হোক, ভোর হবার আগেই হয়ে যাবে।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর মাথাটাকে এলিয়ে দেন নিরুপমা। বিজনবিহারী খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ, এই ভাল। তুমি এবার চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমিয়ে নাও।

—তুমি কিন্তু আমাকে ঘুমের মধ্যেই…।

—না না! ঘুম ভাঙবার পর।

—হ্যাঁ, আমি চোখ মেলে তোমাকে একবার দেখব, তারপর। মনে থাকে যেন।

—নিশ্চয়।

বিজনবিহারীর কাঁধের উপর নিরুপমার মাথাটা, যেন একটা নিশ্চিন্ত ঘুমের স্বপ্নভরে ঢলে পড়ে থাকে। বিজনবিহারীও তাঁর একটা হাত নিরুপমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন। দু'জনের মাঝখানে একটা বন্দুক আর দুটো টোটা, যেন একটা ফুলমালা আর দুটো ফুল। আর ঘরটা যেন বাসরঘর। শিউলিবাড়ির ষাট বছর বয়সের মাটিসাহেব আর তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সের জীবনসহচরী যেন এক পরম মিলনের বর আর বধূ। খোলা দরজা দিয়ে অঘ্রাণের কুয়াশা হু হু করে ঘরের ভিতরে ঢুকছে, কিন্তু বাতিটা নিবছে না।

॥ পঁচিশ ॥

অঘ্রাণের কুয়াশা কিন্তু এরই মধ্যে সুনন্দার খোঁপার উপর কুচি-কুচি শিশির ছড়িয়ে দিয়েছে। সুনন্দার গায়ে শাড়িটাও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।

শিউলিবাড়ির স্টেশন নয়, দূরের সিগন্যালের লাল চোখটা যেখানে ঘোলা রক্তের আভার মত কুয়াশার বুকের একটা ক্ষত হয়ে জ্বলছে, সেখানে রেল লাইনের পাশে একটা মাথাভাঙা মরা শিমুলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মেয়ে সুনন্দা।

ঠিকই, স্টেশনেরই দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সুনন্দা। কিন্তু স্টেশনের মাথার উপরের বড় আলোটার দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল সুনন্দা। সেই ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ দুটোও কিছুক্ষণ ধরে দপ্ দপ্ করে জ্বলেছিল।

না, ওই আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়াও যেমন, আর দূরের ওই অন্ধকারের লাইনের উপর মাথা পেতে পড়ে থাকাও তেমনি, দুইই মরণ। শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবের মান-সম্মানের প্রাণটা তাঁর মেয়ের এই দুই মরণের কোন একটি মরণ দেখতে পেলে একই যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরে যাবে। এভাবে মানুষের ছেলের সঙ্গে চলে গেলে অমানুষের মেয়ের প্রাণটাও কি সম্মানের বাঁচা বাঁচতে পারবে? না, অসম্ভব।

দুরাশার চেয়েও মিথ্যে আশা! তুমি বিজনবিহারী নও মোহিত, আর আমিও নিরুপমা নই। মাটিসাহেবের পায়ের ধুলোতে যে সাহস আছে, তোমার বুকেও সে সাহস নেই। নিরুপমার ছায়ার বুকটাতে যে ভালবাসা আছে, আমার এই রক্তমাংসের বুকের ভিতরে সে ভালবাসা নেই।

না, শুধু এই শরীরটার একটা গোপন লজ্জার ভয়ে তোমার মত মানুষের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। একটা অনিয়মের মেয়ের প্রাণের সঙ্গে আর একটা যে অনিয়মের প্রাণ লুকিয়ে আছে, সেটাও চলে যাক। কাঁটা আর কাঁটার ফুল একসঙ্গেই মরে যাক। কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব না। কখখনো না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাকে ভয় করে—তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তোমার কাছে থাকা মানে একটা চমৎকার রঙচঙে ভীরুতার দাসী হয়ে পড়ে থাকা।

না, দুইই সমান অসম্মানের মরণ কেন হবে? তোমার সঙ্গে চলে যাওয়া মরণের চেয়ে ওই অন্ধকারের এক কোণে রেল লাইনের উপর মাথা পেতে দিয়ে মরে পড়ে থাকা বরং সম্মানের মরণ। তোমার মত আলোর জ্বালার কাছে মরে যাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল।

স্টেশনের আলোটাকে যেন একটা ঘেন্নার ভ্রুকুটি দিয়ে তুচ্ছ করে দপ্ দপ্ করেছে সুনন্দার দুই চোখ। তার পরেই এই অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছে; যেখানে একটা মাথাভাঙা মরা শিমুল একলা দাঁড়িয়ে আছে, আর শিশিরে ভিজে গিয়ে পিছল হয়ে গিয়েছে রেল লাইন।

শেষ রাতের ট্রেনটা আসছে বোধ হয়। অনেক দূরে, ঘুমন্ত শালবনের বুকের গভীরে যেন একটা গম্ভীর শব্দের মিহি বোল গুরগুর করে বাজছে। আঁচল দিয়ে কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধে সুনন্দা। দু' পা এগিয়ে গিয়ে, শান্ত প্রতীক্ষার একটা আবছায়া হয়ে আর কান পেতে যেন অঘ্রাণের কুয়াশার একটা গান শুনতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় একটা ছায়া।—বাড়ি ফিরে চলুন।

এ আবার কোন্ রহস্যের দাবি এসে কথা বলছে? এ সময়ে এখানে, অঘ্রাণের শেষ-রাতের এই হিমেল কুয়াশার ভিতরে এ কোন্ শাসনের ধমক কেমন করে কখন এসে আর কতক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল? পুষ্কর দত্ত যে সত্যিই শিউলিবাড়ির একটা রাত-জাগা চক্রান্ত। সুনন্দার দুঃসাহসের চোখ দুটো আশ্চর্য হয়ে আর ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। কাঁপতে থাকে।

ঠিকই, বেশ মৃদুস্বরে কথা বলছে একটা চক্রান্তের মন।—আমি হঠাৎ এখানে এসে পড়িনি। ইচ্ছে করেই এসেছি। আমি আজ এই জন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম।

সুনন্দার হঠাৎ-ভীরু মূর্তিটা এবার পাথরের মূর্তির মত কঠোর হয়ে ওঠে। কথা বলে না সুনন্দা। পুষ্করের শক্ত ছায়াটাকে যেন একটা নীরব তুচ্ছতার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন বিনীত একটা অনুরোধ কথা বলতে থাকে।—আপনি আশ্চর্য হবেন না, ভয় পাবেন না।

তবু কথা বলে না সুনন্দা। কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু শুনতে পায়, এবার যেন একটা দুশ্চিন্তার প্রাণ কথা বলছে।—আমার আজ সন্দেহ হয়েছিল, আপনি এরকম একটা কাণ্ড করতে চাইবেন।

সুনন্দার নিরুত্তর মূর্তিটা একটুও বিচলিত হয় না।

এবার যেন ভয়ানক একটা সবজান্তা আত্মা মায়া করে কথা বলতে শুরু করেছে।—আপনি মোহিতবাবুর ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে যা করতে চাইছেন, সেটা আপনার বাবার আর মা'র অপমান। আপনারও অপমান।

সুনন্দার মাথায় যেন হঠাৎ একটা ঝিম ধরে যায়। চোখ দুটোও চমকে ওঠে। কী সাংঘাতিক এই পুষ্কর দত্তের চোখ আর কান! যেন আড়ালে আড়ি পেতে সুনন্দার ভালবাসার বিপদের সব ভাষা শুনেছে, সব ঘটনা দেখেছে।

যেন কথা বলছে একটা ভুল বুঝিয়ে দেওয়া সান্ত্বনা।—মোহিতবাবু তাঁর করালীকাকার কাছ থেকে একটা গল্প শুনে খুব অন্যায় আর খুব ভুল করলেন। কিন্তু সেজন্যে আপনিও ভুল করবেন কেন?

সুনন্দার বুকেব ভিতরে একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে চায়। কিন্তু জোর করে ঠোঁট চেপে রেখে আর নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

কি আশ্চর্য, এইবার যেন সতর্কচক্ষু একটা পাহারার প্রাণ কথা বলছে।—আপনার ঘরে রাত দুটোর সময় আলো জ্বলতে দেখেই মনে হল, আপনি একটা গণ্ড-গোল বাধিয়েছেন।

যন্ত্রণাভরা একটা নিঃশ্বাসকে ঢোঁক গিলে শান্ত করতে চেষ্টা করে সুনন্দা।

অঘ্রাণের কুয়াশাটা এবার যেন বেশ ব্যথিত স্বরে আক্ষেপ করছে—আপনি আজ আপনার বাবা আর মা'কে যে-সব কথা বললেন, সেগুলো খুব অন্যায় কথা, খুব বাজে কথা।

সুনন্দার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। সবই কুয়াশা বলে মনে হয়। কিন্তু শুনতে কোন অসুবিধে নেই—বেশ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যেন দুরন্ত একটা সন্ধানের প্রাণ কথা বলছে।—আপনি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে এলেন দেখে আমাকে অগত্যা আপনার পিছু পিছু আসতে হল। যাই হোক, দেখে খুশি হলাম যে, স্টেশনে গেলেন না।

সুনন্দার হৃৎপিণ্ডটাই শিউরে ওঠে, তবু কথা বলতে পারে না। দুর্বহ একটা বিস্ময়ের ভার সহ্য করতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে সুনন্দা।

কিন্তু কথা বলছে একটা স্নিগ্ধ আবেদন—আপনি এখানে এসেও খুব ভুল করে-ছেন। বাড়ি চলুন।

সুনন্দার নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন ফুঁপিয়ে হেসে উঠতে চায়। কিন্তু সে নিঃশ্বাসকেও সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুনন্দা।

এবার যেন একটা লজ্জিত কৈফিয়তের প্রাণ এলোমেলো ভাষায় কথা বলতে থাকে।—অবশ্য আপনাকে এখানে আসতে না দিয়ে ওখানে বাড়ির কাছেই বাধা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভয়ও ছিল, আপনি আমার কথা শুনবেন না। উল্টে হয়তো আমাকেও সন্দেহ করবেন। তাছাড়া, তখন বোধহয় আপনাকে এত কথা বলতেও পারতাম না।

কথা বলে সুনন্দা, একটা শুকনো পাথরের গলার শান্ত আর ঠাণ্ডা স্বর।—আপনি চলে যান।

—না।

—আমি একজনের সঙ্গে চলে যাব, তাতে আপনি বাধা দেবেন কেন?

—চলে তো যাননি।

—যদি যেতাম, তবে?

—তবে বাধা দিতাম।

—কেমন করে? মোহিতবাবুকে ছুরি মারতেন?

—দরকার বুঝলে মারতাম!

—দরকার বুঝলে আমাকেও বোধ হয়…।

—কথা বাড়াবেন না। বাড়ি চলুন।

—না। আপনি যান।

—আমি যাব না।

—কেন যাবেন না? তুচ্ছ মানুষের একটা তুচ্ছ মেয়েকে তুচ্ছ করে চলে যেতে আপনারই বা বাধছে কেন?

—আমি কাউকে তুচ্ছ করি না।

—শিউলিবাড়ির মাটিসাহেবকে আপনি তুচ্ছ করেন না?

—সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

—মাটিসাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার সাহস আপনার আছে? তিনি তো আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

—সাহস নেই, অভ্যেস আছে।

—কিন্তু আর কি সে অভ্যেস থাকবে?

—তার মানে?

—করালীবাবুর কাছ থেকে খবর শুনে মাটিসাহেবকে চিনতে পারবার পরেও কি সে অভ্যেস থাকবে?

—ও-খবর আমি পাঁচ বছর আগেই জেনেছি।

চমকে ওঠে সুনন্দা। বুকটাকে খুব জোরে ব্যথা দিয়ে ছোট্ট একটা আনন্দ যেন চমকে উঠেছে। আস্তে একটা হাঁপ ছাড়ে সুনন্দা—কিন্তু আমাকে তো তুচ্ছ করতে পারেন।

—না। কোনদিন তুচ্ছ করিনি, আজও করি না।

—কবে থেকে তুচ্ছ করেননি ?

—জানি না। বোধহয় যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে।

—একথা এতদিন বলেননি কেন ?

—বলতে ইচ্ছে করেনি।

—আজ বললেন কেন ?

—তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে।

দু'হাত তুলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে সুনন্দা। মাটিসাহেবের মেয়ের বুকটার এতক্ষণের সব পাথুরেপনা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময়ের কান্না চাপতে গিয়ে গলে গিয়েছে। পুষ্কর দত্ত নয়, সত্যিই যে ঘুমহারা এক যখের ভালবাসা কথা বলছে। দিন মাস বছর পার হয়েছে, যখের সজাগ চোখ যেন একটা গুপ্তধনের উপর পাহারা রেখেছে। সে গুপ্তধন আজ ধুলো হয়ে যাবে বুঝতে পেরে বিচলিত হয়েছে যখের প্রাণ। বাঃ, মাটিসাহেবের মেয়ের ভাগ্যের উপর আর-এক অদ্ভুত ঠাট্টার আঘাত। গল্পের সেই কাঠুরিয়া মেয়েটার ভাগ্যের মত। নদীর জলে যখন ডুবে যাচ্ছে মেয়েটা, তখন কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমি যে এতদিন তোমারই কথা ভেবেছি।

সুনন্দা বলে, কিন্তু আজ আমাকে তুচ্ছ করুন, আপনি যান। আমি যাব না। আমি ফিরে গেলে কারও কোন ভাল হবে না।

—সবারই ভাল হবে। তোমারও ভাল হবে।

—কেমন করে ?

—যেমন করে সব মেয়ের ভাল হয়। বাপ-মার কাছে থাকবে। তারপর···একদিন স্বামীর ঘরে চলে যাবে।

যেন তীব্র একটা ধিক্কার চাপতে গিয়ে শিউরে ওঠে সুনন্দার গলার স্বর—চুপ! চুপ করুন পুষ্করবাবু। আমাকে কেউ মানুষের মেয়ে বলে মনে করবে না, মন্তর পড়ে হাত ধরবে না, স্ত্রী বলে মেনেও নিতে পারবে না।

—খুব পারবে।

—কেউ পারবে না। আপনিও পারবেন না।

—তুমি বললেই পারব।

—পারবেন না।

হেসে ফেলে পুষ্কর—সত্যি কথাটা কিন্তু বলতে পারছ না সুনন্দা।

—কি কথা ?

—তুমিই পারবে না।

—কেন ?

—তোমার ইচ্ছে নেই। কোনদিন যাকে ভাল লাগেনি, তাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে না হওয়াই তো উচিত।

সুনন্দার গলার কাছে যেন করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে গিয়ে হাঁসফাঁস করে।

—কোনদিন ভাল লেগেছিল কি না জানি না, কিন্তু আজ তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, বেঁচে থাকতে পারলে তোমার কাছেই যেতে চাইতাম।

পুষ্কর দত্তের বুকটাও বোধহয় চমকে উঠে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের আবেশে টলমল করে উঠেছে। তাই গলার স্বরও নিবিড় হয়ে যায়।—তবে তো তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। চল সুনন্দা।

—না।

—আমিই তো ডাকছি, চল।

—তোমার ডাক শুনেও আমি যেতে পারব না পুষ্কর। আমাকে ক্ষমা কর।

—কেন?

—বলতে পারব না। তুমি বুঝে নাও, আর একটি কথাও না বলে চলে যাও।

—আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।

সুনন্দা যেন নিঃশ্বাসের সব শব্দ থামিয়ে দিয়ে, বুকের ভিতরে ধুকপুক করছে যে কুণ্ঠার জ্বালাটা, দম বন্ধ করে সেটাকে নিবিয়ে দিয়ে, আর দু'হাত দিয়ে যেন দুমুঠো কুয়াশাকে খিমচে ধরে নিয়ে, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে—সব বুঝেও এটুকু বুঝতে পারছ না কেন? আমার মরা শরীরটাও যে লুকোতে পারবে না, ময়নাঘরের ডাক্তার যে দেখেই বুঝে ফেলবে আর হেসে ফেলবে, মাটিসাহেবের মেয়ে পেটে একটা কলঙ্ক নিয়ে আত্মহত্যা করেছে?

—কি বললে? পুষ্করের গলাটা কেঁপে ওঠে! পুষ্কর দত্তের প্রশ্নটা যেন ধক্ করে জ্বলে ওঠা একটা ব্যথিত বিস্ময়ের প্রশ্ন।

সুনন্দার চোখ দুটো এইবার অপলক হয়ে, যেন একটা চমৎকার কৌতুকের অন্তিম দেখার জন্য জলজ্বল করতে থাকে। এখনি দেখতে পাবে সুনন্দা, মাটিসাহেবের মেয়েকে একটা ভয়াল মেয়ে-জন্তু বলে মনে করে জওয়ান-ই-বঙ্গালের ভালবাসার মুখরতা কত ভয় পেয়ে কেমনতর বোবা হয়ে যায়। শিউলিবাড়ির কৈসর কেমন করে দু' পা পিছিয়ে গিয়েই ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু কেঁপে ওঠে সুনন্দার অপলক চোখ। দু' পা এগিয়ে এসে সুনন্দার একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়েছে পুষ্কর।—বুঝেছি। সব বুঝেও কিন্তু তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। বিশ্বাস কর সুনন্দা।

—কি বললে?

—তোমাকে হাত ধরে এখনই টেনে নিয়ে গিয়ে চক্রবর্তীঠাকুরকে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, দিন ঠিক করুন।

শেষ রাতের কুয়াশাময় আকাশ যেন হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। শান্ত ঘুমন্ত শালবন যেন স্বপ্নলোকের মায়াবন। পুষ্করের দিকে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে সুনন্দার করুণ মূর্তিটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে টলতে থাকে—তবু ঘেন্না করতে পারলে না?

—না। সুনন্দার হাত ধরে পুষ্কর। কাছে টেনে নেয়। বুকে চেপে ধরে। সুনন্দার শিশিরভেজা মাথাটার উপর হাত বোলাতে থাকে পুষ্কর। একটা আতুরে আকুলতার

হাত একটা ফুলের গায়ের ধুলো মুছে দিচ্ছে।

শালবনের মায়া-কুয়াশার গায়ে দুটো আলোর চোখ ভেসে উঠেছে, সিগন্যালের হাতছানিও ঝুপ করে একটা শব্দ করে সবুজ আলো জ্বালিয়েছে। এসে পড়েছে ট্রেন, এসে পড়েছে একটা কাপুরুষ ইচ্ছার হর্ষ, একটা অপমানের ব্যস্ততা।

সুনন্দা বলে—চল।

পুষ্কর বলে—চল।

—কিন্তু না, ওদিকে নয়, স্টেশন হয়ে যেতে পারব না।

—কেন ?

—ওখানে যে একজন মানুষের ছেলে বসে আছেন, মাটিসাহেবের মেয়ের লাশ নিয়ে যাবার জন্য।

হেসে ওঠে পুষ্কর—মোহিতবাবু রাত আটটার মোটরবাসে চলে গিয়েছেন।

—চমৎকার! হেসে ফেলে সুনন্দা। হেসে ফেলেছে একটা দুঃসহ কৌতুকের সমাপ্তি। হেসে ফেলেছে শিউলিবাড়ির হিমেল নীরবতা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মাটিসাহেবের মেয়ের আত্মাটা যেন ছটফটিয়ে ওঠে আর কেঁদে ফেলে! নিশির ডাকে ঘরছাড়া একটা পাগল ভুলের প্রাণ শিউলিবাড়ির একটা ক্ষমার হাত পা বুক আর কোলের কাছে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে-পুটিয়ে আদর নেবার জন্য ছটফটিয়ে উঠেছে। চোখ মুছে নিয়েই পুষ্করের একটা হাত ধরে টান দেয় সুনন্দা—শিগগির চল।

॥ ছাব্বিশ ॥

খোলা দরজার বাইরে এখনও কুয়াশামাখা অন্ধকার থমকে আছে। শিউলিবাড়ির কোন ঘুম-ভাঙা পাখিও ডেকে ওঠেনি। কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়েছে নিরুপমা।

ভোর হয়নি, তবু নিরুপমার চোখ দুটো যেন ভোরের আলোর দুটি চোখ হয়ে বিজনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খাটের উপর বিজনবিহারীর পাশে শান্ত হয়ে বসে আছেন নিরুপমা।

টোটাভরা বন্দুকটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরেছেন বিজনবিহারী। যেন একটু শান্ত হয়ে, একটু যত্ন নিয়ে, আর অনেক মায়া নিয়ে একটা সুন্দর সাধের কাজ করবার জন্য তৈরি হয়েছে স্বপ্নচারী এক কারিগরের হাত!

কিন্তু বাধা দিল খোলা দরজাটা। পুষ্কর আর সুনন্দা, যেন দুটো ব্যস্ত উদ্বেগ একসঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে, আর কালিমাখা জ্বলন্ত বাতিটার দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়ায় দুটো নিদারুণ বিস্ময়।

ছুটে গিয়ে নিরুপমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সুনন্দা—আমি কোথাও যাইনি মা। তোমার পায়ে পড়ি মা, ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমি এসেছি। এই তো আমি।

পুষ্কর এগিয়ে এসে বিজনবিহারীর হাত ধরে। বন্দুকটাকে কেড়ে নিয়ে খাটের

তলায় ফেলে দেয়।—আপনি এখন ঘরের বাইরে গিয়ে বসুন। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিন।

সুনন্দা এগিয়ে এসে আলোয়ানটাকে বিজনবিহারীর গায়ে জড়িয়ে দেয়।

বিজনবিহারী আর নিরুপমা, দুজনের দু'জোড়া শান্ত আর অচঞ্চল চোখ যেন ভিন জগতের দুটি মানুষের চোখ। সে চোখে কোন প্রতিচ্ছায়া পড়ছে না। কিংবা বাইরে থেকে হঠাৎ যেন দুজন নতুন আগন্তুক এসে বিজনবিহারী আর নিরুপমার স্বপ্নের ঘরে ঢুকেছে। বিজনবিহারী আর নিরুপমার ঘুমের চোখ তাই তাদের চিনতে পারছে না।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন নিরুপমা। সুনন্দা বলে—তুমি শুয়ে পড় মা, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

বিজনবিহারীও পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পুষ্কর বলে—ভোর হয়ে গিয়েছে। চলুন, বাইরে যাই।

খোলা দরজার দিকে চোখ তুলে বাইরের আকাশটার দিকে একবার তাকালেন বিজনবিহারী। তারপর পুষ্করের সঙ্গেই আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের বারান্দায় এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েন।

পুষ্কর বলে—আমি তবে এখন যাই।

বিজনবিহারী বলেন—এস।

ভোরের পাখি ডাকছে। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ক্লান্ত শিশুর মত নিবিড় ঘুমের কোলে যেন ঢলে পড়ে থাকেন নিরুপমা। রান্নাঘরের ভিতরে ঠুং-ঠাং করে চা তৈরি করে সুনন্দা। আর, বাইরের বারান্দায় বসে বিজনবিহারীর চোখ দুটো ভোরের আলোর সঙ্গে যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠতে আর হেসে উঠতে থাকে।

সকালবেলায় রোদ ঝলমল করে। অনেক দূরে, সিংহানি পাহাড়ের গায়ে যে এক টুকরো সাদা কুয়াশা মাকড়সার জালের মত লেপটে ছিল, সেটাও গলে গেল। রাম-সিংহাসনের বউ বিন্ধ্যাচলীর হন্তদন্ত উল্লাসের মূর্তিটা হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়ায়, বিজনবিহারীকে দেখতে পেয়ে মাথার কাপড় টানে, তার পরেই তিন লাফে ঘরের ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ওঠে—পূজারীবাবুর মেয়ে জয়ন্তী এ কি কথা বলছে দিদি?

ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন নিরুপমা—কি?

—পুষ্করের সঙ্গে নন্দুয়া বেটির বিয়ে?

—কে বলেছে?

—পুষ্কর বলেছে।

সুনন্দা এসে বলে—হাঁা, চাচিজী।

ঘরের ভিতরে যেমন বিন্ধ্যাচলীর খুশির হাসি ছড়িয়ে গড়িয়ে ছুটোছুটি করে, তেমনই ঘরের বাইরেও এক একটা খুশির হাসি হঠাৎ এসে এসে বিজনবিহারীর বারান্দাটাকে হাসিয়ে দিয়ে চলে যায়। খবরটাকে যেন সারা শিউলিবাড়ির প্রাণ খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করছে।

সর্দার মুচেত্ত সিং আসেন আর হাসেন।—বড় ভাল খবর মাটিসাহেব। শুনে খুব খুশি হয়েছি।

ফুলনবাবু আসেন—খুব ভাল হল মাটিসাহেব। পুষ্কর বড় ভাল ছেলে।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী আর সেনবাবুর স্ত্রী ব্যস্তভাবে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।—মিষ্টি কই নিরুদি? আজ কিন্তু শুধু আপনার মেয়ের মিষ্টি মুখটি দেখেই ফিরে যাব না।

জয়ন্তী আর মনোরমা, সেই সঙ্গে একদল ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে এসে বারান্দার উপর বিজনবিহারীকে ঘিরে ধরে। জয়ন্তী বলে—আমরা কিন্তু সুনন্দাদির বিয়েতে থিয়েটার করব।...বল না মনু।

মনোরমা বলে—জয়ন্তী হল নাগলতা, আর আমি হলাম কাশ্মীরের রাজা চক্র-বর্মা।...তুই বল না জয়ন্তী।

জয়ন্তী—সত্যিই বলতে কান্না পায়। নাগলতা বলছে : দাও দুঃখ, দাও ক্লেশ, দাও চিতাবহ্নিজ্বালা, সকলি সহিব হাসিমুখে—কিন্তু ঘৃণা নাহি সহিবে পরাণে কভু।

নিরুপমা এসে বিজনবিহারীর কাছে দাঁড়ান—শুনেছ?

বিজনবিহারী হাসেন—শুনেছি।

এত শান্ত হয়ে হাসতে গিয়েও ষাট বছর বয়সের চোখ দুটো ছটফট করে ওঠে। চোখের পাতা ভিজে যায়। যেন গলে গিয়েছে দুরন্ত একটা অভিমান।

মুখটাও যে নিতান্ত একটা ছেলেমানুষের মুখ। শিউলিবাড়ির অঘ্রাণের আকাশের দিকে পিপাসিতের মত তাকিয়ে আছেন বিজনবিহারী। দেখে সন্দেহ হয় নিরুপমার, আর সন্দেহ করতে গিয়ে চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে যায়, যেন ষোল বছর বয়সের বিজুর প্রাণ একটা স্বপ্নের পথে হাঁটা দিয়ে ফিরে চলেছে।

যেন দিগনগরের রাস্তা শেষ হয়ে গেল, ধানক্ষেতের ফুরফুরে হাওয়া পিছনে পড়ে রইল। জলঙ্গীর জল ছলছল করে, একটা একলা নৌকোর বৈঠা ঝুপঝুপ করে, মুচিপাড়ার কুকুর জেগে উঠে ঘুরঘুর করে। কেষ্টনগরের আকাশের ঝিকিমিকি তারা নিবেছে। পথের আলো নিবছে। ভোর হয়েছে। ওই তো বাড়িটা। চেঁচিয়ে ডাকছে বিজু—আমি এসেছি ছোড়দা।

———

মীনপিয়াসী

মী ন পি য়া সী

বড়দা আছেন গ্লাসগোতে, মেজদা পশ্চিম বার্লিনে। আর, যে সেজদা এতদিন কলকাতাতেই ছিলেন, তিনিও এইবার চললেন। কলকাতার বাইরে তো বটেই, দেশেরই বাইরে। ইন্দোনেশিয়ার জাকর্তাতে; এক সিন্ধী সদাগরের কারবারী ইচ্ছা ও চেষ্টার উপদেষ্টা হয়ে।

—শেষে তুমিও চললে সেজদা? এবার যে বাড়িটা সত্যিই খালি হয়ে গেল।

অভিযোগের সুরে কথাগুলি বলে তপতী। বলতে গিয়ে চোখ দুটোও ছলছল করে ওঠে। এত বড় বাড়িতে এবার শুধু একা পড়ে থাকবে তপতী।

প্রতিবেশী হরেনবাবু তখন সামনেই ছিলেন। তিনিও শুনে সুখী হতে পারেননি যে, বিমলও দেশ ছেড়ে ইন্দোনেশিয়াতে চললো। বিমল একা নয়, স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে চলেছে। সুতরাং, বাড়িটা শূন্যই হয়ে গেল। হরেনবাবুর দুঃখ এই যে, তাঁরই স্বর্গত বন্ধু ভবতোষ মল্লিকের সংসারটাই এইবার শূন্য হয়ে গেল। অথচ, হরেনবাবু আজও ভুলতে পারেননি, এবং সে-সব দিনের স্মৃতি আজও তাঁর মনের ভিতরে মাঝে মাঝে যেন সে-দিনেরই ভাষায় কথা বলে ওঠে। সে-সব দিনের হাসির তুফান, তর্কের সোরগোল আর যত সাধের আলোচনা ও পরামর্শের শব্দগুলিকেও যেন শুনতে পান। মনে হয়, এই তো সেদিন ভবতোষ কত খুশি হয়ে একটা কল্পনার আনন্দকে ব্যাখ্যা করে করে বুঝিয়েছিল, আমার নতুন বাড়িতে সবসুদ্ধ বারটি ঘর থাকবে হরেন। সেইভাবে প্ল্যান করেছি। তিন ছেলের প্রত্যেকের জন্য দুটি করে ঘর, অর্থাৎ ছয়টি ঘর। তা ছাড়া, আমার জন্যে দুটি, তপতীর মার জন্যে দুটি, আর তপতীর জন্যে দুটি—এই আরও ছয়টি, সব নিয়ে হলো বারটি।

হরেনবাবু যেন পনর বছর আগের নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পান।

—তা হলে তো ভালই হয় ভবতোষ। ছেলেরা সব বড় হবে, বিবাহিত হবে, তাদের ছেলেপিলেও হবে। দুটি করে ঘর তো দরকারই হবে। কিন্তু তোমরা কর্তা-গিন্নী কেন মিছিমিছি দুটি করে ঘর।......

—তুমি আমার আসল প্ল্যানটা ধরতেই পারনি হরেন। আমরা কর্তা-গিন্নী দু'জনে তো নিতান্ত টেম্পোরারি। মেয়াদ বড় জোর আর পনর বছর; তারই মধ্যে একদিন ভবপারে পাড়ি দিতে হবে। আর তপতীটাও তো বলতে গেলে টেম্পোরারি। ওর বিয়ে হয়ে যাবে, পরের ঘরে চলে যেতে হবে। সুতরাং, এই যে ছটা ঘর বেঁচে যাবে, সেগুলি তিন ভাইয়েরই দরকারে লেগে যাবে। আমার আসল প্ল্যান হলো, তিন ছেলের প্রত্যেকের জন্যে চারটি করে ঘর।

হরেনবাবু হাসেন—তাই বল।

ভবতোষবাবুর প্রৌঢ় চক্ষু দুটি মোটা গ্লাসের চশমার আড়ালে যেন একটা তৃপ্তির সুরে জলজল করে; যেন তাঁর প্ল্যানের এই বাড়িটার একটা সুন্দর কলমুখর

জীবনের ছবি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। —বুঝতেই তো পারছো হরেন, নাতিপুতির ভিড় যেদিন বাড়বে, সেদিন মাত্র দু'টি ক'রে ঘরের মধ্যে বেচারাদের সংসার ধরবে কেমন ক'রে ?

ভবতোষবাবু আর হরেনবাবু, দুই বন্ধুতে যখন পরামর্শ ক'রে এই সার্কাস অ্যাভেনিউ-এর এই দিকে বাড়ি করবার জন্য প্ল্যান করেছিলেন, তখন কলকাতার শহুরে সোরগোল একটু দূরে ছিল। এবং সেই জন্যেই জায়গাটা পছন্দ হয়েছিল। বেশ হবে, শহুরে সুবিধাগুলির সবই পাওয়া যাবে, অথচ বাজার-বাজার নোংরামিটা থাকবে না। পাখির ডাক শোনা যাবে ; শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঘরে বসে ডোবার ব্যাঙের ডাকও শোনা যাবে ; আর তাকালেই চোখে পড়বে, খেজুর আর সুপুরির জংলা মাথার ভিতর জোনাকীর দল ঝিকমিক করছে।

যেমন প্ল্যান করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই বাড়ি করা হয়েছিল। সেই দুই বাড়ি এখনও আছে। আগে হরেনবাবুর বাড়ি, তার কিছুদিন পরে ভবতোষবাবুর বাড়ি। ভবতোষ মল্লিকের বাড়ি থেকে হরেন বসুর বাড়ি, মাঝে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথের ব্যবধান।

হরেনবাবুর বাড়িতে একা হরেনবাবুই হলেন বাড়ির মানুষ। তিনি শুধু একটি ঘর নিয়ে থাকেন। আর পাঁচটি ঘরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা হলেন ভাড়াটিয়া। পাঁচটি ঘরে পাঁচটি পরিবার। তাঁদের মধ্যে দুটি পরিবার হলো শুধু স্বামী-স্ত্রী। বাকি তিনটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া তিন-চারটি করে ছেলেমেয়েও আছে। সুতরাং 'হরেনবাবুর বাড়ি' একটি জনভারপীড়িত বাড়ি। রাত দুটোর সময়েও স্বামী-স্ত্রীর কলহ আর ছেলেমেয়ের চিৎকারের শব্দ শোনা যায়। লোকে বলে, বেচারা হরেন-বাবুর শান্তি নেই।

কিন্তু হরেনবাবু নিজে কখনও এই ধরনের আক্ষেপ করেছেন কিনা সন্দেহ। বরং, দেখে মনে হয় যে, তিনি এই রকমটিই পছন্দ করেন। তা না হলে—এই তো সেদিনও, ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রীর ডেলিভারির সময় তিনি নিজে এই বুড়ো বয়সে ছুটোছুটি করে ডাক্তার আর নার্স ডাকাডাকি করলেন কেন ? সারা রাত জেগে বসে রইলেনই বা কেন ? তারপর, ভোরবেলায় বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে নবজাত শিশুর কান্নার শব্দ শুনে ছেলেমানুষী উল্লাসের মত অমন করে ছটফটিয়ে হেসে উঠলেনই বা কেন ? আর নারায়ণ নারায়ণ বলে ওভাবে চেঁচিয়ে নাম জপতে জপতে একেবারে ক্ষেত্রবাবুর ঘরের দরজার কাছেই বা গিয়ে দাঁড়ালেন কেন ?

কিন্তু বন্ধু ভবতোষের বাড়িটা এভাবে শূন্য হয়ে যাচ্ছে কেন ? সব থাকতেও শূন্য। তিন ছেলে আর এক মেয়ে থাকতেও এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করবে, এমন ভবিষ্যৎ কোন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি ভবতোষ। বরং যা কল্পনা করেছিল ভবতোষ, ঠিক তার উল্টোটি হয়েছে। অমল আর শ্যামল তো আগেই সরেছে, এবার বিমলটাও চললো। ছিঃ, ভবতোষ বেচারার আত্মাটা যে কেঁদে ফেলবে।

বড়ছেলে অমল আছে গ্লাসগোতে। সে আর ফিরবে বলে মনে হয় না। একটা বিখ্যাত কারখানার ইঞ্জিনিয়ার, মাইনেও ভাল পায়। তাছাড়া গ্লাসগোতেই একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে অমল। ছেলেপুলেও হয়েছে। এখন বলতে গেলে গ্লাসগোই হলো অমলের আপন-দেশ।

পশ্চিম বার্লিনে একটা হাসপাতালের সার্জন হয়ে শ্যামলের জীবনটাও বোধহয় জার্মান হয়ে গিয়েছে। তা না হলে দেশে আসে না কেন? শ্যামলটা তো বিয়ে করেনি। কিন্তু···সে সব খবরেরও কিছু কিছু শুনেছেন হরেনবাবু। শ্যামলের মতি-গতি ভাল নয়। শ্যামল নাকি বিবাহিতা এক মার্কিন মহিলার খুবই স্নেহের আস্পদ হয়ে উঠেছে। সেই মহিলার ইচ্ছায় আর ইঙ্গিতে ওঠে-বসে শ্যামল। সে-মহিলা একেবারেই পছন্দ করে না যে, শ্যামল দেশে যাক। বিমলের কাছে লেখা একটা চিঠিতে শ্যামল এমন কথাও জানিয়েছে যে, বোধহয় আমেরিকায় চলে যেতে হবে আর শেষ পর্যন্ত আমেরিকারই নাগরিক হতে হবে। শ্যামলের বেনিফ্যাক্ট্রেস সেই মার্কিন মহিলা বলেছেন, তিনিই চেষ্টা করে শ্যামলকে মার্কিন নাগরিক করিয়ে দিতে পারবেন।

বিমল তবু একটু দেশী জীবন সঙ্গে নিয়েই বিদেশে চলেছে। সরসীও সঙ্গে যাচ্ছে। তবু ভয় হয়, কে জানে হয়তো বড়বুহুরটুহুর দেখে মুগ্ধ হয়ে বিমলও জাকর্তায় নাগরিক হয়ে সে-দেশেই থেকে যাবে। হরেনবাবুর ভীরু মনটা মাঝে মাঝে যেন বেশ রাগ করে তপ্ত হয়েও ওঠে। কারণ তাঁরও একটা আশা ভেঙে যেতে বসেছে।

বিমলের স্ত্রী এই সরসী; যার মুখের মত সুন্দর ধাঁচের মুখ এই দুনিয়াতে কোথাও আছে বলে মনে করেন না হরেনবাবু, সেই সরসীকে আমহার্স্ট স্ট্রীটেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে একদিন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর, বোধহয় একটি দিনও হরেনবাবুর চিন্তা ও চেষ্টা কোন বিশ্রাম পায়নি। সার্কাস অ্যাভিনিউ থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট—তিনটি মাস দৌড়াদৌড়ি করে সরসীর সঙ্গে বিমলের বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করেই ফেললেন। একদিন স্বপ্নও দেখেছিলেন, ভবতোষ বলছে, আমার কোন চিন্তা নেই হরেন, তুমি যখন আছ, তখন বিমলের বিয়ে দেবার সব দায় তোমারই। অমল আর শ্যামল, বড়ই দাগা দিয়েছে হরেন। এখন বিমলটা যদি···।

হ্যাঁ, যেন ভবতোষের এত বড় বাড়িটার শূন্যতার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হরেনবাবু। বার বার মনেও পড়েছিল, মারা যাবার আগের দিন তপতীর মা হরেনবাবুকে যে-কথাগুলি বলেছিল।—উনি নেই, আমিও চললাম। ওদের কে দেখবে আপনি ছাড়া?

কেঁদে ফেলেছিলেন হরেনবাবু—আমি যতদিন আছি ততদিন নিশ্চয় দেখবো।

তপতীর মা বেচারীও এমন ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেননি যে, তিন ছেলে থাকতে এত বড় বাড়িটা একদিন শূন্য হয়ে যাবে। বেচারী বেঁচে নেই, সেটাও বোধহয়

একরকমের বাঁচোয়া। অমল আর শ্যামলের দেশ-ছাড়া জীবন, তা ছাড়া ওসব মতিগতির কাণ্ড ঘটে যাবার আগেই মা বেচারী চলে গিয়েছে। ভালই হয়েছে, অনেক আক্ষেপের যন্ত্রণা থেকে বেঁচে গিয়েছে।

কিন্তু,...হ্যাঁ, ঠিকই, বিমলের বিয়ের দিন বার বার তপতীর মার কথাটাই মনে পড়েছিল হরেনবাবুর। সরসীকে, বিমলের বউকে দেখে কত খুশি হতেন তিনি, সে-কথা ভাবতে গিয়ে হরেনবাবুর চোখে জল এসেছিল। বউ বরণ করে ঘরে তোলবার জন্যে বাড়িতে মেয়েদের হুড়োহুড়ি পড়েছে, শাঁখ বাজছে; শানাইয়ের আওয়াজও বাতাস মিঠে করে তুলেছে। চাদরের খুঁটটা দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে হরেনবাবু সেদিন হেসে হেসে সার্কাস অ্যাভিনিউএর শান্ত সড়কের উপর মাঝরাত পর্যন্ত বেড়াতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তপতীর মা'র অনুরোধের সম্মানটা রাখতে পেরেছেন তিনি, বিমলের বিয়ে দিতে পেরেছেন। এইবার এই বাড়িতে একটু হাসাহাসি আর চেঁচামেচি, একটা নতুন কলরবও জেগে উঠবে বৈকি।

ঠিকই, খবরটা জানতে পেরে হরেনবাবুর প্রাণ একদিন আহ্লাদে প্রায় আটখানা হয়ে গিয়েছিল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের চিঠি পেলেন, সরসীর বাবা জানিয়েছেন, সরসী অন্তঃসত্ত্বা। লেডি ডাফরিনের রিপোর্ট, এই মাত্র তিন মাস। কাজেই আর ছয়-সাত মাস পরেই...হ্যাঁ, সরসীকে এখন আমার এখানেই রাখতে চাই, মেয়েটার প্রথম সন্তান, একটু ভয়ও হচ্ছে, হরেনবাবু। একটু বিশেষ যত্ন চাই। বাপের বাড়ির যত্নে মেয়েটার মনের ভয়ও...।

না, না, না, কখনই তা হতে পারে না। মাপ করবেন কেষ্টবাবু, বউমাকে এখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে রাখা সম্ভব হবে না। ভবতোষের নাতি ভবতোষের বাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হোক। এখানেও সরসীর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। আপনি জেনে রাখুন, বাপের বাড়ির তুলনায় সরসী এখানে বেশি আদর-যত্ন পাবে। আপনি এমন ধারণার গর্ব ছেড়ে দিন যে, আপনি মেয়ের-বাপ বলেই মেয়েকে আদর-যত্ন করতে জানেন, আর আমরা...।

আরও অনেক কড়া কথা হয়তো লিখে ফেলতেন হরেনবাবু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগ সামলে নিয়ে শান্ত ভাষাতেই লিখলেন, বিমলের ছেলে আপনার ওখানে ভূমিষ্ঠ হবে, এটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু হরেনবাবুর এত বড় গর্বের রাগটাও যে জব্দ হয়ে গেল। সরসীও চললো জাকর্তায়। দেখে বোঝা যায়, সরসীরও একটুও আপত্তি নেই। হরেনবাবুর আশা-ভঙ্গ মনের বেদনাকে যেন আরও ব্যথিত করে একটা আশঙ্কার প্রশ্ন বিদ্রূপ হানছে। বিমলও কি আর দেশে ফিরে আসবে? বিমলের ছেলে, বন্ধু ভবতোষের নাতিটিও কি শেষে জাভানীজ হয়ে যাবে না?

বাকি আছে শুধু তপতী। ওটা যাবে কবে? গেলেই তো হয়। ভবতোষের বাড়িটা আরও ভাল করে শূন্য হয়ে খাঁ-খাঁ করুক। আর গবর্নমেণ্ট একদিন বাড়িটাকে রিকুইজিশন করে আমেরিকার গমের গুদাম করে দিক। সব ল্যাঠা

ঢুকে যাক।

হরেনবাবুর মনে এমন ভয়ও যে দেখা দেয়নি তা নয়। বিমল জাকর্তায় চলে যাবে শুনে হরেনবাবু এবাড়িতে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তারপর একদিন না এসে পারলেন না। কারণ, এইবার একটা চিন্তা, তপতীর কি হবে? ভাইগুলো তো এক-একটা পাগল; বোনটার কোন গতি হলো কি না হলো সেদিকে কোন হুঁশই নেই।

এয়ার সার্ভিসের গাড়ি বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সরসী কাঁদছে। বিমল গম্ভীর। হরেনবাবু বিষণ্ণ। তপতীর মুখের কথাগুলি শুধু করুণ হয়ে বাজছে—বাড়িটা যে খালি হয়ে গেল।

এখনি রওনা হতে হবে। হাতঘড়ির দিকে ব্যস্তভাবে তাকায় বিমল। তারপরেই তপতীর মাথায় হাত বুলিয়ে বিমল বলে—তুই বিয়ে কর তপতী।

বিদায়ের ঘটনাটা এরপর নিঃশব্দেই সম্পন্ন হয়ে যায়। কেউ কোন কথা বলে না। বোধ হয় কারও মনের ভিতরেও আর কোন কথা নেই। প্রশ্ন নেই, উত্তরও নেই।

এয়ার সার্ভিসের গাড়িটাও কখন চলে গেল, বুঝতে পারেনি তপতী, বুঝতে পারেনি হরেনবাবুও। ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটা একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। আর, বোধহয় এই অভিশপ্ত নীরবতার আঘাত সহ্য করতে না পেরে হরেনবাবু শেষে চেঁচিয়ে ওঠেন—এবার তোমার বিয়েটা হয়ে যাক তপতী। ঠিকই বলেছে বিমল।

তপতীরও ইচ্ছে বিয়েটা হয়ে যাক; কিন্তু মাঝে মাঝে আশ্চর্য না হয়ে, আর বেশ লজ্জিত না হয়েও পারেনা তপতী। এই ইচ্ছেটার বয়স যে প্রায় উনিশ-কুড়ি হলো। তবু ইচ্ছেটা যেন আজও লজ্জা পায় না। আরও আশ্চর্য, রাগও করে না, হতাশও হয়ে যায় না।

আজ না হয় বয়সটা ত্রিশ পার হয়ে গিয়েছে; কিন্তু বিয়ের কথা ওঠেই না, এমন বয়স যখন ছিল, তখনই বা কী কাণ্ড করেছিল তপতী?

মা বেঁচে ছিলেন তখন, আর বড়মাসী এসেছিলেন নীরুদির বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে; কথায় কথায় বলেছিলেন, আমি কিন্তু তোমার তপতীর জন্যে একটি পাত্র ঠিক করে রেখেছি জয়া। আর একটু বড় হোক, তারপর একদিন···।

সে পাত্রের রূপ গুণের বর্ণনাও করেছিলেন বড়মাসী। মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে দশ বছর বয়সের তপতী সব কথা শুনেছিল। শুনতে শুনতে বোধহয় মুগ্ধও হয়ে গিয়েছিল। বড় ভাল ছেলে। নামটি হলো সমীরণ। এই বছর কলেজে ঢুকেছে। লেখাপড়ায় চমৎকার। স্বাস্থ্যটিও ভাল। মুখটি একেবারে ফুটফুটে ফুলটি।

বড়মাসী চলে যাবার পর সেদিনই তপতী হঠাৎ খেলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে এসে মাকে প্রশ্ন করেছিল—ফুটফুটে মানে কি মা?

—খুব সুন্দর।

শুধু সেদিন নয়, সেদিনের প্রায় একটা বছর পরে, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে মা'র আঁচল চেপে ধরেছিল তপতী—কই, আমার বিয়ে তো হলো না? আমি তো বড় হয়েছি।

হেসে ফেলেছিলেন জয়া—বিয়ে হবার কথা ছিল নাকি?

—ছিল না তো কি? বড়মাসী যে সেদিন বলে গেলেন।

—কি বলে গেলেন?

—মুখটি যেন ফুটফুটে ফুলটি, একজন ছেলে আছে, কলেজে পড়ে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

জয়া আরও আশ্চর্য হয়ে হাসতে থাকেন—কী কাণ্ড! কবে বড়দি এসে একটা গল্প করে গেলেন, সেটা এখনও মনে করে রেখেছে মেয়েটা!

তপতীর মুখটা যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়।—গল্প?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, গল্প। অমন কত গল্প হবে। তারপর বিয়ে হবে।

চুপ করে মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তপতী। এগার বছর বয়সের প্রাণটা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মুখটা বোবা হয়ে গিয়েছে। চোখ দুটো বোকা হয়ে গিয়েছে। একটা আহত বিস্ময়ের বেদনা নিয়ে চোখের দৃষ্টিটাও কাঁপতে থাকে, যেন এক বছর ধরে মনের ভেতরে পুষে রাখা একটা রূপকথার আবেশ হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। বড়মাসীর সেদিনের কথাগুলি নেহাতই গল্প। তার মানে মিথ্যে। আকাশের চাঁদের হাসিটাসি সবই তাহলে গল্প! 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি', এই যে কিছুক্ষণ আগে মাস্টারমশাই গানটাকে কী সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, সে-সবও তাহলে গল্প! মিথ্যে! নতুন আলো হাতে নিয়ে শরৎকালটা সত্যি অঞ্জলি দেয় না, দিতে পারে না। শরৎকালের তো সত্যি দুটো হাত নেই। ওগুলো শুধু গল্প, শুধু মিথ্যে।

মায়ের মুখের সেই আশ্চর্যের হাসির ছবিটা এখনও চেষ্টা করলে মনে পড়ে বৈকি, ছবিটা যদিও একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মনে পড়লে আজও তপতীর বুকের ভিতরটা যেন লজ্জা পেয়ে কেঁপে ওঠে। সে লজ্জার মধ্যে বোধহয় ছোট্ট একটা কাঁটার মুখও লুকিয়ে আছে, যে জন্যে পুরানো দিনের কথা ভাবতে গেলে আজকের এত কঠোর সতর্ক মনটার গায়েও বেশ একটা খোঁচা লাগে।

মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তপতীর জীবনে এমন আরও অনেক গল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। সে-সব গল্পের অনেক কথা ভুলে গেলেও অনেক কথা আবার এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারা যায়। এমন বছর যায়নি; বছর কেন, বোধহয় এমন একটা মাসও পার হয়নি, তপতীর বিয়ের কথা নিয়ে বাড়িতে আলোচনা না হয়েছে। বাড়িতে এমন কোন মহিলা মা'র সঙ্গে দেখা করতে আসেননি, যিনি কথায় কথায় তপতীর বিয়ের কথা তুলে দু-চারটে উপদেশ না দিয়ে চলে গেছেন।

খুব ভাল হয়, বলেছিলেন এক হাসিখুশি মোটা-সোটা চেহারার মহিলা, যদি

একটি খুব ভাল শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে তপতীর বিয়ে হয়। অন্তত ডবল এম-এ, এমন একটি ছেলে না হলে তপতীর মত মেয়ের সঙ্গে মানাবে কেন? লেখা-পড়া এত ভালবাসে যে মেয়ে, সে মেয়েকে সামান্য শিক্ষিত একটা পাত্রের হাতে তুলে দিলে ভুল হবে জয়া, সে পাত্রের গাড়ি-বাড়ি যতই থাকুক না কেন।

সে মহিলা পাঁচ মিনিট পর-পর পান খেতেন, তারপরই এক মুঠো দোক্তা। মনে পড়ে, এই বারান্দারই উপরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন সেই মহিলা। তারপর সারা বাড়িতে আতঙ্ক আর উদ্বেগের কী ভয়ানক ছুটোছুটি; সে দৃশ্য এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দু'জন ডাক্তার এলেন; মহিলার মাথায় বরফের ব্যাগ চেপে ধরে সেজদা তিন ঘণ্টা বসে রইলেন। শেষে মহিলার মূর্ছা ভাঙলো। এবং বিছানার উপরে গড়ানো শরীরটাকে এপাশ-ওপাশ করে, তারপর একটা গা-মোড়া দিয়েই মহিলা কথা বললেন—তপতী ম্যাট্রিকটা পাশ করবে কবে? আর কতদিন বাকি আছে?

মা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—আপনি চুপ করে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন। তপতীর কথা ভেবে এখন কোন চিন্তা করবেন না।

—চিন্তে করবো কেন? চিন্তের কিছু নেই। আমার রমেশ এবারেই এম-এ দেবে। ওঁরও ইচ্ছে···।

মা আরও ব্যস্ত হয়ে বলেন—আপনি এখন বেশি কথা বলবেন না।

—ওঁর ইচ্ছে, রমেশকে অন্তত তিনটে এম-এ পাশ না করিয়ে বিয়ে-টিয়ের কথা মুখেই তুলবেন না। কিন্তু আমি বলেছি, দুটো এম-এ যথেষ্ট। ততদিনে তপতীও বোধহয়···।

মা হেসে ফেলেন—তপতী ততদিনে ম্যাট্রিক পাশ করে ফেলবে।

—বেশ, তাহলে কথা রইল, তুমি তপতীর জন্যে আর কোন চিন্তে করবে না। তপতী আজ থেকে আমারই ঘরের হয়ে গেল।

মা বলেন—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু বোধহয় ছটা মাসও পার হয়নি, আজও মনে করতে পারে তপতী, যাদবপুরের পিসিমার জা একদিন এসেছিলেন। মা বললেন—কী নয়নতারা? তুমি কি রাস্তা ভুল করে হঠাৎ এদিকে···।

পিসিমার জা নয়নতারার মুখটা মনে পড়ে, বয়সটাও। নয়নতারার সেই বয়সটা তপতীর আজকের বয়সের চেয়ে বরং একটু ছোটই হবে, বড় কিছুতেই নয়। ঝকঝকে একটা জর্জেট পরে, ডবল বিনুনী দুলিয়ে, আর চশমা পরা দুই চোখেও কাজল বুলিয়ে নয়নতারার সুন্দর চেহারাটা কিরকম একটু অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল, সে দৃশ্যটাও তপতীর স্মৃতি হতে আজও একেবারে মুছে যায়নি।

নয়নতারা রুমাল দিয়ে গলার পাউডার মুছতে মুছতে একবার তপতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তার পরেই হেসে ফেলেছিল।—গরজ বড় বালাই, জয়াদি। রাস্তা ভুল না করে উপায় কি?

মা আশ্চর্য হন—গরজ।

—গরজ বৈকি। ঠাকুরপো যে প্রায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন।

—তোমার ঠাকুরপো ? তার মানে চঞ্চল ?

—হ্যাঁ।

—চঞ্চল আজকাল কী করছে ?

—একটা ব্যাঙ্কে কাজ নিয়েছে, আর…।

—আর কি ?

—আর কবিতা লিখছে।

—ভাল কথা।

—একটু বিপদেরও কথা জয়াদি।

—কেন ?

—কবিতাগুলো যে তপতীর জন্যে যত ধ্যানের স্তোত্র। তিনটে খাতা ভরে গিয়েছে।

—এ কী কাণ্ড।

—হ্যাঁ, কাণ্ডই বটে, তপতীকে বিয়ে করতে চায় চঞ্চল। কে জানে কবে, ভাল করে মুখ খুলে বলেও না, কবে যেন তপতীকে আপনাদের এ-বাড়ির বাগানে একটা বকুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ; বাস্, তারপর থেকেই…।

—তা, ওরকম একটা ভাব যদি হয়েই থাকে…এমন দোষের কিছু নয় নিশ্চয় …তবে, কথা হলো…।

—আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে ?

—কোন আপত্তি নেই। তপতীও কবিতা খুব ভালবাসে। তুমি বরং একটু পরীক্ষা করেই দেখ ; কথা ও কাহিনীর সব কবিতা এখনই আবৃত্তি করে তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারবে মেয়েটা।

—আঃ, নিশ্চিন্ত হলাম জয়াদি, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো… আগে আপনাকে একটা প্রণাম করে নিই।

বলতে বলতে ঢিপ করে জয়াকে প্রণাম করেই একটা হাঁপ ছাড়ে নয়নতারা। —ওঃ, এই তিনটে মাস ধরে ঠাকুরপোকে বোঝাতে গিয়ে যে কী হয়রানি ভুগতে হয়েছে, তা ভগবান জানেন। কতবার বলেছি, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, একটু ধৈর্য ধরুন, তারপর যদি মনে হয় যে…কিন্তু—না, কবির মন আর ধৈর্য ধরতে রাজি নয়। উনিও বললেন, যাও তবে, তপতীর মা'র কাছে গিয়ে কথাটা পেড়েই ফেল। কাজেই…।

—খুব ভাল করেছ। শুধু একটা কথা, তপতী ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে নিলে ভাল হয় না ?

—সেই তো সবচেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু…।

—যাক গে তবে। চঞ্চলের মত ছেলে, চেনা-শোনার মধ্যে এর চেয়ে ভাল

ছেলে পাওয়াই বা যাবে কোথায়, জানি না। আমার একটুও আপত্তি নেই নয়নতারা।

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে মা আর নয়নতারার যত সহাস্য দাবী আর সহাস্য সম্মতির মুখরতাগুলি চুপ করে শুনেছিল তপতী। আবার একটা গল্পের আবির্ভাব, শুনতে বেশ লাগে। রূপকথার মত সুন্দর মিথ্যে শোনবার আনন্দ।

কিন্তু নয়নতারা বোধহয় তপতীর এই শান্ত মূর্তিটাকে সহ্য করতে রাজি নয়। তপতীর দিকে এগিয়ে এসে কলকল করে হেসে ওঠে নয়নতারা—যাদবপুরেও বকুলগাছ আছে তপতী। কোন চিন্তে করো না।

যেন একটা বিস্মিত ভয় হঠাৎ হতভম্ব হয়ে করুণ লজ্জার মত তপতীর চোখে-মুখে ছমছম করতে থাকে। রূপকথার আবেশটা যে সত্যিই নিবিড় হয়ে বুকের ভিতরের যত নিঃশ্বাসের ঢিপঢিপ শব্দগুলিকে একেবারে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। সত্যিই যে একদিন বাগানের পূর্বদিকের বকুলগাছটার ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে গুণ-গুণ করে গান গেয়েছিল তপতী। কে জানে কখন আড়াল থেকে তপতীর সুন্দর মুখের রূপ দেখে কিংবা বিমনা প্রাণের গুঞ্জন শুনে ঠিক গন্ধচোরা বাতাসের মত উতলা হয়ে চলে গেল নয়নতারা মাসির কবি ঠাকুরপো? নেহাৎ গল্প বলে মনে হচ্ছে না। সত্যিই যে তপতীর নামে এই পৃথিবীতে এব জায়গায় অজস্র কবিতার ফুল ফুটছে।

যাবার সময় তপতীর একটি ফটো নিয়ে গেল নয়নতারা। আর, তপতীর সামনেই অনায়াসে চেঁচিয়ে বলে দিতেও নয়নতারার একটুও বাধলো না—যাই, আপাতত এই দিয়ে কবিকে শান্ত করি। আর ওঁকেও বলবো, যেন এই মাসের মধ্যেই একদিন এসে একটা ভাল দিন ঠিক করে যান···। আমি তাহলে···তাহলে এই কথা একেবারে পাকা কথা হয়ে রইল জয়াদি।

—হ্যাঁ এসো। হ্যাঁ, পাকা কথা বৈকি। জয়াও এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে জবাব দিলেন। চলে গেল নয়নতারা।

কিন্তু আজ মনে করতে পারে না তপতী, কেন আর কিসের জন্যে গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে পারেনি। ডবল এম-এ রমেশ কোথায় গেল? নয়নতারা মাসির কবি ঠাকুরপোর কি হলো? শেষ পর্যন্ত কোথায় যে তারা লুকিয়ে পড়লো, সে খবর হয়তো মা জানতেন; কিন্তু মনেও তো পড়ে না, সেজন্যে মাকে কোন-দিন কোন আক্ষেপ করতে শুনতে পেয়েছিল তপতী। এক-একটা উৎসবের আয়োজন যেন কথায় কথায় পাকাপাকি হয়ে যায় আর বেশ বোঝাও যায় যে, উৎসব নয়, উৎসবের নামে কতকগুলি মিথ্যে ব্যস্ততার কথা যেন হঠাৎ হাসাহাসি করেছে, তারপরেই চিরকালের মত নীরব হয়ে গিয়েছে।

একজন ডবল এম-এ মানুষ, ভাবতে খারাপ লাগেনি সেদিনের সেই তপতীর। বরং বার বার মনে পড়েছিল আর ভাবতে হয়েছিল, নিশ্চয় খুব ভাল-ভাল কথা, খুব চমৎকার কথা বলতে পারবে আর তপতীকে বার বার আশ্চর্য করে দেবে

মানুষটি। এখনই যে শুনতে ইচ্ছে করে সে-সব চমৎকার কথা।

কিন্তু সে ইচ্ছের মায়া যেন চমকে দিয়ে হঠাৎ কোথা থেকে খাতা-ভরা কবিতা গুণগুণ করে উঠলো। আরও ভাল করে শুনতে ইচ্ছে করে, কী বলতে চায় এই অদ্ভুত গুঞ্জন? দেখতেও ইচ্ছে করে, সত্যিই কী লিখেছে কবি মানুষটা। পড়ার বই সামনে খোলা রেখে আনমনার মত এমন কথাও ভাবতে হয়েছে, ভাল ভাল আর চমৎকার বিদ্যার কথার চেয়ে কবিতার কথাই শুনতে বেশি ভাল লাগবে। মাট্রিক পাশ করতে দেরি আছে, হোক না কেন দেরি; কিন্তু সেজন্যে বিয়ে হতে দেরি হবে কেন? মা'র ইচ্ছের চেয়ে নয়নতারা মাসীর ইচ্ছেটাই বেশি ভাল। ম্যাট্রিকটা একটু দেরিতে হলেই ভাল। চঞ্চলের কবিতার খাতাটা এখনি দেখতে ইচ্ছে করে, একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করে না।

আজ ভাবতে গিয়ে তপতীর একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি। সেদিনের সে ইচ্ছার কোন অর্থ না বুঝেও ইচ্ছাটাকে কত ভাল লেগেছিল। সেই ভাল লাগা অনুভবের নেশা বুঝি এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তা না হলে আজও হরেনকাকার অনুরোধের কথা শুনে মনের ভিতরে হঠাৎ একটা দোলা লাগে কেন? যেন একটা হঠাৎ উতলা দাবি এসে বুকের ভেতর একটা গোপন নিরালার উপরে একগাদা বকুল-কুঁড়ি ঝরিয়ে দিতে চায়। বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করতেই তো চায় তপতী।

কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যিই বোধহয় একটা অকরুণ বিদ্রূপ আড়াল থেকে তপতীর জীবনটার দিকে তাকিয়ে হাসছে। যে ইচ্ছার উপর জীবনে কোন-দিন সামান্য একটু রূঢ় হতে পারেনি তপতী, সেই ইচ্ছাটাই যেন তপতীর আশাকে বার বার জব্দ করছে। আজও বিয়ে হয়নি তপতীর, বিয়ে করতেই পারেনি।

বাবা চলে গিয়েছেন, তপতীর বিয়ের নামে অনেক কল্পনা আর সাধের কথা শুধু বলে বলে; মা চলে গিয়েছেন অনেক আক্ষেপ করে; ভগবান যখন এত সৌভাগ্য দিলেন, তখন অন্তত মেয়েটার বিয়ের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবার সুযোগটাও যদি দিতেন। কিন্তু দিলেন না; কে জানে তপতীর কপালে কি আছে?

দাদারাও কয়েকবার চেষ্টা করেছিল।—তুই নিজেই বুঝে শুনে এবার বিয়ে কর তপতী; শুধু এই অনুরোধটাই ছিল দাদাদের চেষ্টা। তার বেশি কোন চেষ্টা করবারই সুযোগ পায়নি অমল কিংবা শ্যামল, আর এই বিমলও।

তপতীও মুখ খুলে বলে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি—এত ভয় করছো কেন? না বুঝে-সুঝে বিয়ে করবার হলে কবেই তো করে ফেলতাম।

তিন দাদা ও ছোট বোন হাসাহাসি আর ঠাট্টা করে আজ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছে, তার বক্তব্য এর চেয়ে বড় কোন চিন্তার কথা হয়ে উঠতে পারেনি। খুবই সহজ ও সরল একটা সত্যের স্বীকৃতি—নিজেই বুঝে-শুনে একটা বিয়ে করে ফেলা।

আজ কিন্তু মনে মনে স্বীকার না করে পারে না তপতী, এই সরল সত্যটাই কী

দুরূহ সত্য। কাউকে যে বুঝতেই পারা গেল না। আর, শুনতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাও পরে শোনা গেল যে, সেটুকুও নিতান্ত ভুল শোনা একটা ফাঁকি। ভয় পেয়েছে, সাবধান হয়ে গিয়েছে, সময় থাকতেই পিছিয়ে এসেছে তপতী। এগিয়ে যাবার আর ইচ্ছেই হয়নি। তা না হলে নতুন ব্যারিস্টার সুকোমলের সঙ্গে পাঁচ বছর আগেই তপতীর বিয়ে হয়ে যেত।

বিয়েটা প্রায় হয়ে যেতেই বসেছিল। সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল, গুড ফ্রাইডের পর সিমলা থেকে সুকোমল ফিরে এলেই তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে। গ্লাসগোতে বড়দার কাছে, আর পশ্চিম বার্লিনে মেজদার কাছে টেলিগ্রামও করেছিল বিমল, এইবার অন্তত একবার দেশে এসে ঘুরে যাও। না এলে কেমন দেখায়? তপতীর বিয়ের সব ঠিক।

সুকোমলকে বুঝেছিল তপতী, চার মাসের পরিচয় আর মাসে অন্তত দশদিন করে দেখা আর গল্প করবার পর কাউকে বুঝতে কতটুকুই বা আর বাকি থাকে? শুনেও ছিল তপতী, সুকোমলের মত ভদ্র বিনয়ী আর মার্জিত রুচির মানুষ আজ-কাল, বিশেষ করে আজকালকার বিলেত-ফেরত শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। সুকোমলের চরিত্রের এই সত্যের বার্তাটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন অমিতার মা। অমিতা আরও খুশি হয়ে বলেছিল, তুমি তো মাত্র চার মাসের পরিচয়ে সুকুদাকে চিনেছ তপতী, আমি চিনি ছেলেবেলা থেকে। এত গুণী মানুষ হয়েও এত নিরহংকার মানুষ কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বান্ধবীর কানের কাছে ফিসফিস করতে একটুও কুণ্ঠা অনুভব করেনি তপতী—আমিও চিনেছি, তুমি সার্টিফিকেট না দিলেও চলবে।

অমিতা—ছাই চিনেছ।

তপতীর চোখ দুটো চমকে ওঠে,—তার মানে?

অমিতা—চার মাস ধরে সুকুদার সঙ্গে এত মন জানাজানি খেলা খেললে, কিন্তু জানতে পেরেছ কি যে···।

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে তপতী—কি?

অমিতা—বিলেতী গান কত ভাল গাইতে পারেন সুকুদা?

—কি আশ্চর্য; যেন একটা বিস্ময়ের সুখ সহ্য করতে গিয়ে অমিতারই একটা হাত আস্তে চেপে ধরে তপতী।—না, সত্যিই জানতে পারিনি; ভদ্রলোকও কোনদিন বলেননি যে, এরকম কোন গুণ···!

অমিতার মা আর অমিতা চলে যাবার পরেও তপতীর মন সেদিন যেন একটা স্নিগ্ধ অহংকারের আবেশে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। যা আশা করে তপতীর জীবন, সুকোমল যেন তার চেয়েও কিছু বেশি প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু তারপর আর একটা মাসও পার হয়নি বোধ হয়। কপালে রুমাল চেপে আর দুই চোখ বন্ধ করে, ঝিকঝিকে মিররটার সামনে যেন নিজেকে অন্ধ করে দিয়ে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকে তপতী। তপতীর জীবনের আশা যেন

একটা ভয়ানক ঠাট্টায় আহত হয়েছে। আয়নাতে নিজের মুখটাকেও দেখতে লজ্জা করে। একটা ভয়াতুর লজ্জা।

বিলেতী গানের এতবড় গুণী ভদ্রলোক যে এক বিলেতী মেয়ের ভালবাসার টানেও পড়েছিলেন, এই সত্যের একটা সামান্য আভাসও কোনদিন সুকোমলের কোন কথায় ভুলেও ধরা পড়েনি, অথচ লণ্ডন-জীবনের কত গল্পই না করেছে সুকোমল। হ্যাঁ, গুণী বটে সুকোমল, কলঙ্ক গোপন করে রাখার ভাল আর্ট জানে। ছোড়দা যদি আজ নীতীশমামার বাড়িতে না যেত, তবে বিলেতে-ফেরত ডাক্তার অবনীনাথের সঙ্গে দেখা হতো না, আর, সুকোমলের জীবনের এই গোপন ইতিহাসের ভয়ানক কাহিনীটাও শুনে আসতো না।

অবনী ডাক্তারই আশ্চর্য হয়ে আর একটু ভয় পেয়ে সব বলে দিয়েছেন। অবনী ডাক্তারের নিজের চোখে দেখা সেই বিলেতী মেয়ের কাণ্ড-কারখানার কথা। সুকোমলের গা ঘেঁষে ছায়ার মত সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো মেয়েটা। সেই মেয়ে নাকি এখনও সুকোমলের কাছে চিঠি লিখছে।

গুড ফ্রাইডের পর সিমলা থেকে কলকাতায় ঠিকই এসেছিল সুকোমল। কিন্তু তপতীর সঙ্গে দেখা করবার ও আর কোন সুযোগ পায়নি। বিমলই জানিয়ে দিয়ে এসেছিল, তপতী এখন বিয়ে করতে রাজি নয়।

—কেন রাজি নয়? আশ্চর্য হয়েও প্রশ্ন করতে ভুলে যায়নি সুকোমল। আর, বিমলও সংক্ষেপে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পেরেছিল, তপতীই জানে কেন সে রাজি নয়। আমি কি করে বলি।

সেই সুকোমল এখন অতীতের একটা গল্প মাত্র; তপতীর জীবনের সঙ্গে সে গল্পের কোন সম্পর্ক আজ আর নেই। এবং সে জন্যে তপতীর জীবনে কোন আক্ষেপও আছে বলে মনে হয় না। বরং ভাবতে গিয়ে যেন একটা মুক্তির হাঁফ ছেড়েছে তপতীর মন, একটা ফাঁকির ভয় থেকে মুক্তি। একটা ছলনার গ্রাস থেকে রেহাই পেয়েছে তপতীর আশা।

সুকোমলকে কি সত্যিই ভালবেসেছিল তপতী? সেদিন হয়তো তাই বিশ্বাস করতে চেয়েছিল তপতী, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ আর নিজের মনটাকে বুঝতে কোন ভুল হয় না, কারণ মনটাকে চিনেছে তপতী।

না বুঝে শুনে যে ভালবাসতে পারা যায় না। ভালবাসবার মত মনে হলে তবে তো ভালবাসতে পারা যাবে? তবে ইচ্ছাটাকে আজও বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে নেই, ভালবাসতেই চায় তপতী।

সুকোমলের মত মানুষকে নিশ্চয় ভালবাসতে পারা যাবে এই বিশ্বাসে মনটা ভরে উঠেছিল বলেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল তপতী। কিন্তু, সে বিশ্বাসটাই একদিন মিথ্যে হয়ে গেল। সুকোমলের জীবনের গোপন করা ভয়ানক সত্যটাই সে বিশ্বাস ভেঙে দিল। এমন মানুষকে ভালবাসতে পারা যাবে না; তবে কেন মিছে আর, শুধু চার মাসের একটা সামান্য জানা-শোনার মুখরক্ষা করবার জন্যে

একটা মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ?

হরেনকাকাও খুব আশা করেছিলেন, আর বেশ খুশি মনে বার বার এসে তপতীর খবর নিয়ে যেতেন, শরীরটা ভাল আছে তো ? রাত জেগে বই পড়বার বাতিক বন্ধ হয়েছে তো ? না, এখন আর ছেলেমানুষী করো না তপতী। সময় মত স্নান খাওয়াটাওয়া করবে। এত ভাল স্বাস্থ্যটাকে ভুল করে কাহিল করে ফেল না।

হরেনকাকাই বোধ হয় সত্যিকারের দুঃখ পেয়েছিলেন, তপতীর সঙ্গে সুকোমলের বিয়ে হলো না। কিসের বাধা, কি এমন অসুবিধা, যার জন্য চার-মাসের চেনা-শোনা একটি ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হলো না তপতী ?

—কি হে বিমল ? তপতী বিয়ে করতে রাজি নয় কেন ?

—তপতীই জানে। এর বেশি কোন কথা হরেনকাকাকেও বলতে পারেনি বিমল।

হরেনকাকার আশাভঙ্গ মনের দুঃখটা বেশ একটু রূঢ়স্বরে বিলাপ করে ফেলেছিল—রাজি হলে ভালই করতো তপতী। সুকোমলের চেয়ে ভাল ছেলে কটাই বা পাওয়া যায় ? আর তপতীও এমন কিছু নয় যে…।

অভিযোগের কথাটাও সামলে নিয়েছিলেন হরেনকাকা। তা না হলে বলেই ফেলতেন বোধ হয়, তপতী রূপে-গুণে কি এমন লক্ষ্মী-সরস্বতী যে সুকোমলের মত ছেলেকেও বিয়ে করতে রাজি হলো না ?

আর একটা বিস্ময়ের কথাও নিশ্চয় বলতেন, সুকোমলের সঙ্গে সত্যিই কি তপতীর ভালবাসা হয়নি ? না হয়ে থাকলে…হয় না কেন ? এটাও তো অদ্ভুত ব্যাপার।

তপতীর বিয়ে হলো না, দুঃখটা যেন শুধু হরেনকাকার। হরেনকাকার গম্ভীর মুখ দেখে তপতীর বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি যে, রাগ করেছেন হরেনকাকা। কিন্তু আসল কথা জানেন না বলেই এভাবে তপতীকে ভুল বুঝে রাগ করতে পারেন হরেনকাকা। সুকোমলকে যতটা শান্ত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ বলে ধারণা করেছেন তিনি, সুকোমল সত্যিই ততটা যে নয়। জানলে রাগ করতেন না হরেন-কাকা।

কিন্তু ঘরের ভিতরে তপতী দাঁড়িয়ে থাকলেও, বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হরেনকাকা বিমলের কাছে অভিযোগের সুরে যে-মন্তব্যটা করেছিলেন, সেটা স্পষ্ট শুনে ফেলেছিল তপতী। তপতীই বা রূপে-গুণে কি-আর এমন…।

কি-করে এত শক্ত কথা বলতে পারেন হরেনকাকা ? হরেনকাকা যে তাঁর নিজেরই একটা বিশ্বাসের আনন্দকে ঠাট্টা করলেন। তপতীকে কথায় কথায় রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী বলে পাঁচজনের কাছে যিনি এতদিন প্রশংসা করে এসেছেন, তিনি হলেন হরেনকাকা। অথচ তিনিও আজ তপতীর জীবনের একটা অতি সাধারণ সতর্কতার দাবিকে বুঝতে না পেরে তপতীকেই ভুল বুঝলেন।

দাবি বলতে এই তো সামান্য একটা দাবি, যাকে বিয়ে করতে হবে তাকে যেন আগেই চিনে নিতে পারা যায়, চিনতে যেন ভুল না হয়। সত্যিই ভালবাসবার মত মানুষ কিনা, সেটুকু না জেনে সে মানুষের জীবনের কাছে গিয়ে ঠাঁই চাওয়া যায় না; উচিতও নয়। যেখানে মিল নেই সেখানে মিলন হবে কেমন করে? যদি হয়, তবে সেটা নিছক একটা মিলনের নকল, স্টেজের উপর নাটুকে মিলনের মত একটা জাঁকাল ঘটনা, কিন্তু ভিতরটা রিক্ত; সে মিলনের ভিতরে মন বলে কিছু থাকতে পারে না।

সুকোমলের সঙ্গে তপতীর বিয়ে হবে না, এই অপ্রিয় সংবাদ শুনে সেই যেদিন রাগ করে কথা বলেছিলেন হরেনকাকা, সেদিন থেকে শুরু করে আজকের এই দিন, মাঝখানে প্রায় পাঁচটা বছরের ব্যবধান। বছরের পর বছর, এক-একটা বৈশাখী ভোরের আলো আর কার্তিকী সন্ধ্যার কুয়াশা সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর এই পথের দু'পাশের গাছের মাথায় অজস্র মুহূর্ত ঝরিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি দিনও, এমন একটিও কথা বলেননি হরেনকাকা, যাতে মনে হতে পারে যে, তপতীর বিয়ের জন্য তাঁর মনে কোন চিন্তা বেঁচে আছে। কতরকম আশার গল্প করে আর ইচ্ছার কথা বলে চলে গিয়েছেন হরেনকাকা; কিন্তু তপতীর বিয়ের কথা নিয়ে কোন আশার কথার ছায়াটুকুও তার মধ্যে ছিল না। বিমলের বিয়ের জন্য যিনি এত চিন্তা করলেন, এত ছুটোছুটি করলেন, তাঁরই আচরণে এটা যে সত্যিই একটা কঠোর বিস্ময়, তপতীর বিয়ের জন্য একটা সামান্য আগ্রহের কথাও তিনি বলেননি।

তাই তপতীর মনটা চমকে উঠেছে, যেন পাঁচ বছরের এই স্তব্ধতাকেই বিচলিত করে দিয়ে হরেনকাকার অনুরোধের কথাটা বেজে উঠেছে।

কিন্তু হরেনকাকা জানেন না এবং জানলে হয়তো কথাটা বলা দরকারই মনে করতেন না। এই পাঁচটা বছর তপতীর কাছে কিন্তু একটা স্তব্ধতা নয়। এই পাঁচ বছরের জীবনেও তপতীর আশার কাননে পাখি ডেকেছে; ফুলও ফুটেই এসেছে। ইচ্ছাটা স্বপ্নের মধ্যেও শানাই-এর সুর হয়ে বেজেছে। তপতীর আত্মাটাই যে এই পাঁচ বছর ধরে ভালবাসার সন্ধানে পৃথিবীর অনেক আলোছায়া ও অনেক মুখের দিকে তাকিয়েছে। সে ইতিহাস জানেন না হরেনকাকা।

ঠিকই, কিছুই জানেন না। তিনি শুধু জেনেছেন, ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশে পৌঁছেছে তপতীর বয়স, তবু বিয়ে হয়নি তপতীর। ভবতোষের মেয়ের জীবনটা এরকম একটা রিক্ততায় ভরে উঠবে, কোন দুঃস্বপ্নেও কি এমন একটা ভয়ের ছবি দেখেছিল ভবতোষ?

তপতীর মা জয়ার সেই রোগমলিন মুখের কথাগুলিতে যে আশা ধ্বনিত হয়েছিল, তা'ও যে মিথ্যে হয়ে গেল।—আমার তো আর বেশি দিন বাকি আছে বলে মনে হচ্ছে না হরেনদা।

—ওটা আপনার মনের বাতিক।

—না হরেনদা, বাতিক বলুন আর যা-ই বলুন, আমার মনে হচ্ছে, আমি আর থাকবো না, তপতীকে বিয়ে দেবার চিন্তাটা আপনাকেই ভুগতে হবে।

—চিন্তাটা ভুগবো কেন, উপভোগ করবো। আপনি বরং চিন্তা-টিন্তা ছেড়ে দিন।

—হ্যাঁ, ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা…

—বলুন।

—আগে মেয়েটাকে পার করবেন।

—তার মানে?

—অমলের বিয়ের আগেই তপতীর বিয়েটা যেন হয়ে যায়।

—তা হয়ে যাবে।

তাই, হরেনকাকার চিন্তার এই পাঁচবছরের স্তব্ধতা যেন তাঁর অক্ষতিত্বের, একটা লজ্জার, একটা অপরাধের স্তব্ধতা। জয়ার অনুরোধ সফল করে তুলতে পারেননি তিনি। ভবতোষের এই বাড়ির আশার বিরুদ্ধে যেন চক্রান্ত করে একটা বিদ্রূপের আহ্লাদ তিন ছেলেরই বিয়ে আগে ঘটিয়ে দিল, আর একা পড়ে রইল শুধু মেয়েটা।

বোধহয় সন্দেহ করেছিলেন হরেনকাকা, তপতী মেয়েটার মনেরই ভিতরে সেই বিদ্রূপটা লুকিয়ে আছে। তা না হলে সুকোমলের মত ছেলেকে সরিয়ে দেবে কেন তপতী? তপতীর উপর এত রাগ করবার কারণটাও বোধহয় এই যে, তপতীর মার কাছে তাঁর এত বড়-গলা করে বলা সান্ত্বনার কথাটাকে মিথ্যে করে দিয়েছিল তপতী।

যার বাধায় সুকোমলের মত ছেলেকে বিয়ে করতে পারেনি তপতী, তাকে হরেনকাকা একটা বিদ্রূপ বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তপতী জানে, সেটা একটুও বিদ্রূপ নয়। সেটা তপতীরই জীবনের একটা সত্য, একটা সামান্য সাধ। মিল নেই, মনের মত নয়—এমন মানুষ যেন তপতীর আপনজন হতে না আসে।

সমস্যাটাকে চারুমাসী একদিন খুব সহজ করে বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন হরেনকাকা সামনে ছিলেন না, তিনি শুনতে পাননি। —কি আর করতে পারে মেয়েটা? কাউকে পছন্দ হলে তবে তো বিয়ে করবে। এটা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়।

হরেনকাকারই বাড়ির ভাড়াটে, চক্রধরবাবুর স্ত্রী সামনেই ছিলেন। তিনি কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করে চারুমাসীকে কিছুক্ষণের জন্য নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন, আর তপতীর মনটাও চমকে উঠেছিল।—আমি বলি, পছন্দ হয় না কেন?

চমকে উঠলেও তপতীর মনের দাবিটা যেন রাগ করে, তপতীর মুখের হাসিটাকেও একটু তপ্ত করে তোলে। ইচ্ছে করে, এখনই বেশ পরিষ্কার ভাষায় মহিলাকে জানিয়ে দিলে হয়—মনের মত মনে হয় না বলেই পছন্দ হয় না।

ইচ্ছেটা বড় হয়ে উঠলেও তপতীর মুখের ভাষাটা অবশ্য রূঢ় হয়ে উঠতে পারে

নি। বরং, শেষ পর্যন্ত হেসে হেসে বলতে পেরেছিল তপতী—কি করে বলি মাসিমা, কেন পছন্দ হয় না।

চারুমাসী আর চক্রধরবাবুর স্ত্রী, দু'জনেই কিন্তু কিছুক্ষণ তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা মুগ্ধতার সুখ সহ্য করতে চেষ্টা করেন। তপতীর সামনেই দুজনে বলাবলি করেন—মেয়েটার চোখ দুটো কী চমৎকার। হাসলে কী সুন্দরই না দেখায় মেয়েটাকে। আলতা পরে না মেয়েটা, কিন্তু পরলে পা দুটোও যেন হেসে উঠতো।

চক্রধরবাবুর স্ত্রী বলেন—এমন রাঙা টুকটুকে পায়ে আলতার দরকারই হয় না।

—একটু থামুন। রক্ষে করুন। চেঁচিয়ে বাধা দিতে গিয়েও তপতীর মুখের হাসিটা আরও লাজুক হয়ে যায়।—চা নিয়ে আসি, বলতে বলতে ঘর ছেড়ে চলে যায় তপতী। চারুমাসী আর চক্রধরবাবুর স্ত্রী, দু'জনে তেমনই মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকেন, মেয়েটার পায়ে জরিদার চটিটাও কী সুন্দর মানিয়েছে। পা দুটোই যেন ঝিকমিক করছে।

এত ভাল লেখাপড়া শিখেছে, গানে-বাজনায় এত গুণী, এত সুন্দর দেখতে, আর সাজে-পোশাকে এত শখ; এ মেয়ে কেন এত বিয়েভীরু মেয়ে হয়? এই অবুঝ রহস্যটাকে নিয়ে আরও অনেক কথা বলাবলি করে সেদিন চলে গেলেন চারুমাসী আর চক্রধরবাবুর স্ত্রী, তার পরেও যে চারটে বছর পার হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হরেনকাকা না বুঝুন, আর চারুমাসী কিংবা চক্রধরবাবুর স্ত্রী কিছু না বুঝুন কিংবা না জানতে পারুন, তপতী জানে, এরই মধ্যে কতবার আশার ছবি দেখতে হয়েছে, আর তার পরেই চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে।

মেজদার সঙ্গে একই প্লেনে জার্মানীতে অ্যানথ্রপলজি পড়তে চলে গেল যে, সেই মণীন্দ্রর সঙ্গেও তপতীর কথা বলবার একটা ব্যাপার ঘটেছিল। মেজদা বাড়িতে ছিল না, অথচ মেজদাকে কয়েকটা জরুরি কথা জানাবার আছে; তাই ড্রইংরুমে অনেকক্ষণ ধরে মেজদার অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিল মণীন্দ্র। অগত্যা, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে তপতীকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।—শ্যামলদাকে যদি কোন জরুরি কাজের কথা জানাবার থাকে, তবে আমার কাছে বলে যেতে পারেন। শ্যামলদা বাড়িতে এলেই···।

জরুরি কথাগুলি তপতীর কাছে বলে দেবার পরে আরও কিছুক্ষণ ছিল মণীন্দ্র। আর তপতীর সঙ্গে কতগুলি নিতান্ত অজরুরি কথা বলতে, গল্প করতে আর বেশ খুশি হয়ে হাসতেও কোন সংকোচ অনুভব করেনি। অনুভব না করবারই কথা। তপতীর আচরণও কোন সতর্ক অহংকারে সঙ্কুচিত হয়ে থাকেনি। মেজদার বন্ধু মণীন্দ্রের কাছে তপতী তার পোষা কাকাতুয়া হেনরীর যত বুদ্ধি আর দুষ্টুপনার গল্প বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেনি।

মণীন্দ্র দেখতে ভাল। যার চোখে ছানি আছে, সেও বোধহয় দেখে বুঝতে পারে, কী সুন্দর রূপের মানুষ মণীন্দ্র। অ্যানথ্রপলজি তপতীরও প্রিয়; এম-এ'তে তপতীর পাঠ্য ছিল। সোশ্যাল অ্যানথ্রপলজি। কথায় কথায় টেনিসের গল্পও এসে

পড়ে। আর, হঠাৎ একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেও ফেলে—আচ্ছা এই সেদিন কলম্বো থেকে টেনিসে ট্রফি জিতে নিয়ে এলেন যিনি, সেই মণীন্দ্র কি……।

মণীন্দ্র হাসে—হ্যাঁ, আমিই সেই মণীন্দ্র। মনে হচ্ছে, আপনিও টেনিস ভালবাসেন।

—ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু ব্যাস্, ঐ পর্যন্ত।

—মানে ?

—আমার টেনিস খেলা দেখে হেনরিও রাগ করে ধমক দেয়।

—কিন্তু আমার পাল্লায় যদি পড়েন, তার মানে কোন দিন আমার পার্টনার হয়ে যদি খেলেন, তবে আপনার খেলা দেখে আপনার হেনরি খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলবে।

তপতীরও হাসিটা যেন উতলা খুশির কাকলীর মত বেজে ওঠে।—হেনরি বেচারার কিন্তু হাত নেই।

খুশি মণীন্দ্র, খুশি তপতী। দু'জনের সম্মিলিত হাসির শব্দ যেন অদ্ভুত দুটি গীতময় মিলের সিম্ফনি। কিন্তু হাসি থেমে যাবার পরেই তপতীর হাতের একটা বই-এর দিকে যেন ভ্রূকুটি করে মণীন্দ্র—আপনার হাতে ওটা কী ? টলস্টয় বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—কি আশ্চর্য। আপনি আবার এসব বাজে জিনিসে ইন্টারেস্টেড হলেন কেন ?

—বাজে ? তপতীর চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা রূঢ় চমকের আঘাতে কেঁপে ওঠে—টলস্টয়কে আপনি বাজে বলছেন কেন ?

—আমার তাই বিশ্বাস। আমি এই ন্যাকা ঋষিটাকে একটুও পছন্দ করি না।

—আমি পছন্দ করি।

—কেন ?

—টলস্টয় হলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর মন হিমালয়ের চূড়ার মত উঁচু।

—আমার তো মনে হয়, তিনি একটা উইটিপি।

—ভাল মন তৈরি করেছেন আপনি।

চমকে ওঠে মণীন্দ্রের চোখ দুটো। বুঝতে পারে মণীন্দ্র, তপতীর গলার মৃদুস্বরের মধ্যে যেন একটা রুষ্ট আপত্তির উত্তাপ ফুটে উঠেছে। আর কোন কথা না বলে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় মণীন্দ্র।

তপতীর মাথাটাও যেন হঠাৎ অলস হয়ে ঝুঁকে পড়ে। যেন অসতর্ক প্রাণটাই হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়েছে। মনের ভিতরে খুবই বিশ্রী একটা অস্বস্তি ছটফট করছে। এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা নিতান্ত অভদ্রতার হবে বলেই চুপ করে বসে থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু মণীন্দ্রের সঙ্গে আর কোন কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। কথা বলতে ইচ্ছেই

করছে না। টলস্টয়ের মত জ্ঞানীকে এত কুৎসিত আর নিন্দা করে কথা বলে যে, তার মনের সঙ্গে মিল রেখে কোন কথা বলা সম্ভবই নয়। টলস্টয়ের প্রতিভাও যার কাছে একটা উইটিপি মাত্র, তার কাছে তপতীর বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড়টা তো একটা ক্ষুদ্র আবর্জনা। সন্দেহ হয়, টলস্টয়েরনামে এইসব তুচ্ছতার কথা বলে মণীন্দ্র যেন তপতীরই শিক্ষিত অভিরুচি আর ধারণাগুলিকে তুচ্ছ করতে চেয়েছে।

ভাগ্য ভাল, শ্যামল এসে পড়েছিল। তপতীকে আর এক মুহূর্তও হেঁটমাথা হয়ে এই কণ্টকাক্ত অস্বস্তিটা সহ্য করতে হয়নি। শ্যামল আর মণীন্দ্রর সঙ্গে জরুরি কথার আলোচনা শুরু হতে না হতেই ঘর ছেড়ে চলে যায় তপতী। ড্রইংরুমে পাখার বাতাসও যেন একটা অদৃশ্য ঠাট্টার নিঃশ্বাস, এতক্ষণ ধরে অকারণে তপতীর শাড়ির আঁচলটাকে ফুরফুর করিয়ে একটা মিথ্যা আশার ছবিকে রঙিন করে তুলেছিল।

ভুলে যায়নি তপতী, প্রায় তিনটি মাস, দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাবার আগের দিন পর্যন্ত মনের ভিতরে সারাক্ষণ বিশ্রী একটা লজ্জার বেদনা যেন কাঁটার মত বিঁধেছে। দার্জিলিং-এ যাবার পর, দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় সকাল আর বিকালের সোনালী মায়ার খেলা দেখে দেখে আরও একটা মাস পার হয়ে গেল। তারই মধ্যে কবে যে এই লজ্জার বেদনাটা শান্ত হয়ে গেল, বুঝতে পারেনি তপতী। মণীন্দ্রর কথা আরও কতবার মনে পড়েছে, কিন্তু সে জন্য কোন আশাভঙ্গের লজ্জা বা বেদনা আর তপতীর মনের শান্তি নষ্ট করেনি। যেন আয়নার বুকে ঝরা পাউডারের একটা দাগ দেখা দিয়েছিল, সে দাগ নিজেই হঠাৎ একদিন মুছে গেল।

দার্জিলিং-এ আরও দুটো মাস থাকবার কথা ছিল, কিন্তু থাকতে আর পারা যায়নি। কারণ কলকাতা থেকে খবর গেল, তপতীর একটা আশার চেষ্টা সফল হয়েছে। এতদিন ধরে ডাচ মিশনারীরা যে মেয়ে-কলেজটা চালিয়ে আসছিলেন, সে কলেজকে গভর্নমেন্টও সাহায্য করতে রাজী হয়েছে। নূতন চারজন অধ্যাপিকা নেবার কথাও হয়েছে। সেজন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, আর তপতীও দরখাস্ত করেছিল। কলেজ কাউন্সিল সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। মাইনে তিনশো দশ টাকা; ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রীদের হিস্ট্রি পড়াতে হবে। বিশেষ করে, হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড।

হিস্ট্রি পড়তে ভালবাসে যে, হিস্ট্রি পড়াবার কাজটাও তার ভাল লাগবে। বেশ আনন্দের কাজ পাওয়া যাবে; অলস দিনগুলি তবু একটা মনের মত কাজের ভিতর দিয়ে পার হয়ে যাবে। এই রকম একটা ইচ্ছার তাগিদ ছিল বলে এই কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিল তপতী। তা ছাড়া, হরেনকাকাও বলেছিলেন— হিস্ট্রিতে যখন ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছিস, তখন চেষ্টা করে দেখ, কোন কলেজে পড়াবার একটা কাজ; অন্তত একটা লেকচারারের কাজ পাওয়া যায় কিনা।

তিনশো দশ টাকা অবশ্য তপতীর জীবনের তেমন কিছু প্রয়োজন নয়। কিন্তু কাজটার বোধহয় প্রয়োজন ছিল। কাজটা মনের মত, শুধু এই জন্যেও বোধহয়

নয়। মনের মতো অনেক কথা বলবার আর পাঁচজনকে সে কথা শোনাবার একটা সুযোগও পাওয়া যাবে, সেই জন্য।

ইংলণ্ডের ইতিহাস যাকে খুব শ্রদ্ধা করে, সেই কুইন এলিজাবেথকে তপতীও যে শ্রদ্ধা করে না তা নয়। কিন্তু শ্রদ্ধা করেও যেন ভালবাসতে পারা যায় না। মনেপ্রাণে ভাল লাগে কুইন মেরি স্টুয়ার্টকে। ছাত্রীদের কাছে ইতিহাসের কাহিনী বলতে গিয়ে আজ যেন তপতীর একটা গোপন মর্মবেদনার আবেগ মুখর হয়ে উঠবার দুঃসাহস পেয়ে যায়। মেরি স্টুয়ার্টকে ভুল বুঝেছে ইতিহাস ; সেদিনও নিতান্ত ভুল বুঝে সেই মহীয়সী নারীর প্রাণ হরণ করা হয়েছিল।

মেরি স্টুয়ার্টকে কেন ভাল লাগে ? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর বোধহয় আজও তৈরি করতে পারেনি তপতী। নইলে সেদিন সেই ছাত্রীটির প্রশ্নের উত্তর তখনি দিয়ে দিতে পারা যেত। মেরি স্টুয়ার্টকে আপনার এত ভাল লাগে কেন ? মিস মুরিলোর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তপতী শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল—জানি না, কেন ভাল লাগে। তবে এইটুকু জানি যে, মেরি স্টুয়ার্টের মৃত্যুদণ্ডের পিছনে ছিল পুরুষের ইচ্ছার চক্রান্ত। নারীর মহত্ত্ব পুরুষ সহ্য করতে পারে না। পুরুষ নারীকে ভুল বুঝতে ভালবাসে।

মিস মুরিলো খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। ক্লাসের প্রায় সব ছাত্রীই হেসে ফেলেছিল। তপতীও হেসেছিল। কিন্তু বলতে ভুলে যায়নি যে, আমার কথাগুলি শুনতে একটু কড়া মনে হলেও নিতান্ত মিথ্যে নয়। পুরুষের লেখা ইতিহাস নারী-জাতির প্রতি সুবিচার পেয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া…।

মিস মুরিলো আবার হেসে ওঠে—কিন্তু ফরাসীরা বলে, শেরশে লা ফাম।

—বাজে কথা বলে। তপতী হাসতে গিয়েও ভ্রূকুটি করে। ইতিহাসের সব ঝঞ্ঝাটের ঘটনার পিছনে নারীকে দেখতে পাওয়া যায়, এর চেয়ে মিথ্যে অভিযোগ আর কিছু হতে পারে না। ইতিহাসের সব গণ্ডগোলের আর উৎপাতের মূলে আছে পুরুষের ভুল। আরও মজার ব্যাপার, পুরুষের ভুল ক্ষমা পেয়ে যায়, কিন্তু নারীর ভুল কোন ক্ষমা পায় না। নইলে একটা ভুলের জন্য আনারকলির জীবন্ত সমাধি হবে কেন, আর সেলিম শাস্তি পাওয়া দূরে থাকুক, একেবারে বাদশাহী গদি পেয়ে যাবে কেন ?

শুধু তপতীর ছাত্রীদের ধারণাতে নয়, কলকাতার যত পিসিমা আর মাসিমা-দের ধারণাতেও একটা সন্দেহ এরই মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে তপতী যেন তার মনের কথাগুলিই বলে ফেলে। পুরুষের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ, একটা আক্রোশের ভাব মনের ভিতর না থাকলে কি এরকমের কথা ঠাট্টা করেও বলতে পারে কোন নারী ?

ছাত্রীরা আড়ালে আলোচনা করে, তপতীদি-র বয়স কত হবে ?

কেউ বলে পঁচিশ, কেউ বলে তিরিশের বেশি নয়। কিন্তু অমিয়া বলে, প্রায় পঁয়ত্রিশ।

অমিয়ার ধারণার প্রতিবাদ করতে পারে না ছাত্রীরা। কারণ, সকলেই জানে অমিয়া হলো তপতীদির এক মাসতুতো দিদির মেয়ে। অমিয়া বলে—মার কাছেই শুনেছি, মার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট হলেন তপতী মাসী। মা'র বয়স এখন ছত্রিশ।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলো, দেখতে এত সুন্দর, তবু হিষ্ট্রির তপতীদি-র আজও বিয়ে হলো না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে আর অসুবিধাও হয় না। তপতীদি নিজে ইচ্ছে করেই বিয়ে করেননি। এবং এই অনিচ্ছারও একমাত্র কারণ এই যে, পুরুষের সম্পর্কে তপতীদির মনে বোধহয়···হয় ভয়, নয় রাগ, কিংবা ঘৃণা আছে।

হরেনকাকাও বোধহয় এইরকম একটা সন্দেহ করে বসে আছেন। তা না হলে আজ এভাবে এরকম একটা করুণ চেহারা করে আর কাতর দাবির মত সুরে তপতীকে অনুরোধ করবেন কেন—তুমি এবার বিয়ে কর তপতী। আর, বিমলই বা বিদেশে রওনা হবার আগের মুহূর্তে ওরকম একটা বিষণ্ণ আবেদনের সুরে বলবেই বা কেন—তুই এবার বিয়ে কর তপতী।

কলকাতার মাসিমারা আর পিসিমারা কিন্তু কোনদিন তপতীকে এমন কথা বলতে শোনেননি যে, বিয়ে করবে না বলে কোন প্রতিজ্ঞা আছে তপতীর মনে। বিয়ে করতে কোন অনিচ্ছার কথাও গর্ব করে কোনদিন বলেনি তপতী। বরং দেখা গিয়েছে, পরের বিয়েতে এহেন তপতীরও কত উৎসাহ। আলিপুরের ছোট-মাসি বলেন, সুলেখার বিয়ের দিন ভাগ্যিস সন্ধ্যা হবার আগেই এসে পড়েছিল তপতী। ছেলের বাড়ির মেয়ের দল দুপুর থেকেই এসে আর মুখ গম্ভীর করে একটা সমস্যা ঘনিয়ে তুলেছিল। অভিযোগ, ফটোতে মেয়েকে যেমন সুন্দর মনে হয়েছিল, মেয়ে সত্যিই তেমন সুন্দর নয়। বরং বেশ একটু কুরূপা বলেই মনে হচ্ছে। ছোটমাসির বুক দুরদুর করেছিল। ছেলের বাড়ির এইসব মেয়েদের এরকম গম্ভীর মুখের থমথমে ভাব, কোঁচকানো চোখের নীরব ভর্ৎসনার চাহনি, আর হতাশার ফিসফাস শেষ পর্যন্ত বিয়েটাকেই বিপদে ফেলবে না তো?

কিন্তু তপতী এসেই তার সমস্যার কথাটা শুনেই হেসে ফেললো—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ঠিকই, সবই ঠিক করে দিয়েছিল তপতী। সুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে তখনি ঘরের ভিতর ঢুকে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আর কপাট বন্ধ করে দিল তপতী। কপাট খুললো যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর বরযাত্রীরা প্রায় সকলেই এসে পড়েছে। বরের আসবার সময়ও হয়ে এসেছে।

সুলেখাকে সাজাতে চার ঘণ্টা সময় নিয়েছিল তপতী। কিন্তু সার্থক হয়েছে এতটা সময়। এখন কার সাধ্যি আছে যে বলতে পারে, সুলেখা মেয়েটা দেখতে কালো আর রোগা? এ সুলেখা যেন সে সুলেখাই নয়। সুলেখার মুখের হাসিটাও

বদলে গিয়ে কী অদ্ভুত মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। যেন রঙিন বেনারসীতে জড়ানো একটি ঢলঢলে মায়ার সুন্দর ছবিটি হয়ে হাসছে সুলেখা। ছোট মাসী তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেঁদে ফেললেন—এ কী কাণ্ড করেছিস তপতী। তুই জাদু জানিস মনে হচ্ছে।

তপতী চেঁচিয়ে ডাক দেয়—কই, ছেলের বাড়ির মেয়েরা, কোথায় গেলেন আপনারা?

একজন মোটা-সোটা আর দাঁত-উঁচু মহিলা, যিনি হলেন ছেলের মামাতো বোন, তিনি সবার আগে এগিয়ে এসে ভ্রুভঙ্গি করেন—কেন? কিসের এত হাঁকডাক?

তপতী—এবার ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মেয়েকে একবার দেখে নিন।

দাঁত-উঁচু মুখটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ফেলেছিল। ঘরের ভিতরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সুলেখা একবার ভয়ে-ভয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু মহিলা যেন আতঙ্কিতের মত বলে উঠলেন—অ্যাঁ, এ কে! বড় সুন্দর তো মেয়েটি!

তপতী—স্বীকার করছেন তাহলে?

মহিলা—কি বললেন?

তপতী—সত্যি সুলেখা যে ফটোর সুলেখার চেয়ে সুন্দর, এটা এখন স্বীকার করবেন তো?

আর সব মেয়েরাও ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে, ফিসফিস করে—তা···সুন্দর বটেই তো···এরকমটি হলে সুন্দর হবে না কেন?

বিয়ে হয়ে যাবার পর বাড়ি ফেরার আগে তপতী ছোটমাসির কাছে বাসর-ঘরের একটা সংবাদও জানতে পেরেছিল। ছোটমাসিই বললেন—শুনেছ তপতী, সুলেখাকে দেখে ওর বর খুশি হয়েছে।

—কে বললে?

—সবাই বলছে। বর শুধু কনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর কারো সঙ্গে কথা বলছে না, বলতে ভুলেই যাচ্ছে বোধ হয়।

—যাক, আমার চার ঘণ্টার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তাহলে। ছোটমাসির কাছে যেন একটা মস্ত বড় কৃতার্থতার আনন্দ ব্যক্ত করে বাড়ি ফিরেছিল তপতী।

এমন মেয়ে কেন যে শুধু নিজের বিয়ের উৎসাহটাকে আজও কাছে ডাকতে পারছে না, এটাই একটা রহস্য। কারও চোখে পছন্দ ধরাতে হলে, কোন সুপুরুষের অহংকেরে চোখ দুটিকে মুগ্ধ করে দিতে হলেও তপতীর পক্ষে সাজবার কোন দরকার হয় না। ছোটমাসি আজও পাটনার বাড়ির একটা ঘটনার কথা মাঝে মাঝে বলেন। তপতী তখন পাটনাতে ছোটমাসির কাছেই ছিল। পাশের বাড়ির মেয়েটির যেদিন পাকা-দেখা, সেদিন মেয়ের মা হঠাৎ এসে ছোটমাসিকে অনুরোধ করেছিলেন, আজ সন্ধ্যাবেলা তপতী যেন পাকা-দেখার ব্যাপার দেখবার জন্যে আর পাঁচজনের সঙ্গে গিয়ে ভিড় না জমায়।

—কেন ?

—শুনে রাগ করবেন না। আমার মেয়ে দেখতে ভাল নয়; তার ওপর বরপক্ষও বেশ খুঁতখুঁতে। এর ওপর তপতীকে যদি আবার ওদের চোখে পড়ে, তবে···বুঝতেই পারছেন, আমার শোভনাকে ওদের চোখে কত কুৎসিতই না মনে হবে, হয়তো পাকা-দেখাটাও কেঁচে যাবে।

হেসে ফেলেছিলেন ছোটমাসি—বেশ, তাই হবে, তপতী যাবে না।

ছোটমাসির মুখে পাটনার এই ঘটনার গল্প এখনও মাঝে মাঝে শুনতে পায় তপতী। কিন্তু সে গল্প আজ আর তপতীর মনের কোন ধারণা প্রসন্ন করে তোলে না। নিজের সম্বন্ধে, নিজের সুন্দর চেহারাটার জন্যেও নতুন করে কোন অহংকার জাগে না।

পৃথিবীতে এই তপতী কারও চোখে পড়লো না, কেউ দেখে মুগ্ধ হলো না, তপতীকে আপন করে নেবার জন্যে কারও ইচ্ছা আর আশা কোন স্বপ্ন দেখলো না, এটা সত্য নয়, এটা তপতীর জীবনের অভিযোগও নয়। দার্জিলিং-এর ইন্দ্রনাথ, স্টেভেডর শশাঙ্ক আর এয়ার ফোর্সের ফ্লাইট-লেফটন্যান্ট চিত্তরঞ্জন—ওরা তো যেচেই নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিল, হরেনকাকার কাছেও চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু সেসব চিঠির আর প্রস্তাবের দাবি মেনে নিতে পারেনি তপতী। ইচ্ছেই হয়নি। ইন্দ্রনাথ শুধু টাকার মানুষ, বি-এ পরীক্ষায় তিনবার ফেল করে এখন শুধু কাঠের কারবার করে। শশাঙ্ক বিপত্নীক আর চিত্তরঞ্জন দেখতে একটুও সুশ্রী নয়। তপতীর জীবনের অভিরুচির সঙ্গে যাদের জীবনের এত অমিল, তাদের কাউকে জীবনের সঙ্গী করা উচিত নয়। কারও উপর কোন অশ্রদ্ধা নয়, তপতী শুধু তার নিজেরই অভিরুচিকে অশ্রদ্ধা করবার ভয় থেকে বাঁচতে চায়।

এইতো সেদিন, নিজের চোখে দেখে এসেছে তপতী, সুমঙ্গলার জীবনটা কী ভয়ানক দুঃখের জীবন হয়ে গিয়েছে। এত হাসতো যে সুমঙ্গলা, সে সুমঙ্গলা তিন ঘণ্টার এত গল্পের মধ্যেও একটিবার হাসলো না। সুমঙ্গলার এসরাজ ঘরের কোণে পড়ে রয়েছে। বোধহয় আধ ইঞ্চিরও বেশি পুরু হয়ে ধুলো পড়েছে এসরাজের উপর।

—এ কি, এসরাজটার এ দশা কেন ? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল তপতী।

—আর এসরাজ। আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সুমঙ্গলা।

তপতী—এসরাজ বাজানো একেবারে ছেড়ে দিয়েছিস মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, তিন বছরের মধ্যে একটিবারও এসরাজে হাত দিইনি।

—কেন ?

—দরকার হয়নি।

—তার মানে ?

—তার মানে ভদ্রলোক একটুও পছন্দ করেন না।

—কেন পছন্দ করেন না ?

—সেটা উনিই জানেন। আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

—কিন্তু তুই তাহলে বেঁচে আছিস কি করে ? তুই এসরাজ বাজাবি না, গাইবি না, এ কি করে সম্ভব ? এসরাজ আর গান যে তোর প্রাণ ছিল সুমঙ্গলা।

—এখন আর নেই।

—ভদ্রলোক তাহলে কি পছন্দ করেন ?

—রান্না।

চমকে ওঠে তপতী—রান্নার নামে তোর গায়ে জ্বর আসতো।

—একদিন আসতো ঠিকই, কিন্তু এখন আর নয়। এখন রোজই একটা না একটা মাংস নিয়ে……।

—তার মানে ?

—কোনদিন ভেড়ার মাংস, কোনদিন গ্রাম-ফেড খাসির মাংস, কোনদিন বা কচি চিকেন কিংবা টার্কি, নয়তো গ্রীন পিজন অথবা সমুদ্রের কাঁকড়া…একটা না একটা আমিষ রান্না করতে হবেই। মাংস ছাড়া কর্তার একটি বেলারও খাওয়ার আনন্দ ধন্য হয় না।

—অদ্ভুত মানুষ!

—একটু অদ্ভুতই বটে।

—বিয়ে করে শেষে এই লাভ হলো ?

—কিছুই বুঝতে পারছি না।…একটু বসো তপতী, মাংসটাকে ভিজিয়ে রেখে আসি।

চেঁচিয়ে ওঠে তপতী—ছিঃ, এ কি করেছিস তুই ? আমি যাই, তারপর না হয়…।

—না ভাই ; আজ খরগোসের মাংস এসেছে। দই আর লেবুর জলে এখনই ভিজিয়ে না রাখলে পরে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, মাংস একটুও গলবে না।

—তুই মরেছিস। বেশ রাগ করে কথাটা বলে দিয়েই উঠে দাঁড়ায় তপতী।

—কি করবো বল্ ? ভদ্রলোক যে খরগোসের মাংসের ভিন্দালু খেতে বড় ভালবাসেন।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু তোকে ভালবাসেন তো ?

এইবার হেসে ফেলে সুমঙ্গলা—তা জানি না, কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

—আর জানতেও হবে না কোনদিন। সেই জন্যেই বলছি, তুই মরেছিস।

বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে সুমঙ্গলার কথাই মনে পড়েছিল তপতীর। এ কিরকমের একটা ছন্নছাড়া জীবন সহ্য করছে সুমঙ্গলা ? তপতী জানে, অনিমেষের সঙ্গে এক বছরের দেখা-শুনা আর ভালবাসার পর সুমঙ্গলা অনিমেষকে বিয়ে করেছিল। কে জানে কি দেখে আর কি জেনে ভালবেসেছিল সুমঙ্গলা। যে দুজনের জীবনের সাধ ইচ্ছা আর অভিরুচির মধ্যে এত অমিল, তাদের দুজনের

মধ্যে ভালবাসাই বা হয় কেমন করে। ভাল করে না জেনে-শুনে আগে থেকে ভালবেসেই বা ফেলে কেমন করে? কি ভয়ানক ভুল! আর সে ভুলের শাস্তিটাও এমন চতুর রকমের কঠোর যে, শাস্তির বেদনাটুকুও বুঝতে দিচ্ছে না। এমন বিয়ে করে লাভ হলো না ক্ষতি হলো, সুমঙ্গলার প্রাণে এটুকু বিচার করবার মত শক্তিও যেন নেই।

জীবনের এই শাস্তির ভয়টারই জন্যে তপতীর ভালবাসার মন ভীরু হয়ে আছে। সত্যি কাউকে ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু এই ভয়টুকুরই জন্য তপতীর প্রাণটা এত সাবধান। ইচ্ছে তো করেই মন-প্রাণের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে একজনকে ভালবাসি। এমন ভালবাসার মানুষকে যেন ভোরের ঘুমের স্বপ্নের মধ্যে এক-একদিন দেখতেও পাওয়া যায়। তপতীর প্রাণের সব ইচ্ছা আর সব সাধের সঙ্গে সে মানুষের সব ইচ্ছা আর সাধ যেন মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। দু'জনের চোখের সামনে যেন একটা বই খোলা পড়ে আছে; আজ দু'জনে পাশাপাশি মাথা রেখে একই সঙ্গে তাকিয়ে আর দু'চোখে একই তৃপ্তির আবেশ নিয়ে একই পাতার লেখা পড়ছে।

দু'জনে দুজনের হাত ধরে রয়েছে। দু'জনের বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের ছন্দের মধ্যেও কোন অমিল নেই। দু'জনের অনুভবের আনন্দও যেন একটি ঢেউ হয়ে দুলছে।

ঘুম ভেঙে যাবার পর স্বপ্নের এই ছবিটাকে অনেকক্ষণ ধরে যেন জাগা চোখেও দেখেছিল তপতী। দেখতে ভাল লাগছিল। এই স্বপ্নটা যেন একটা সান্ত্বনা। সত্যিই যে একেবারে ছবি এঁকে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল স্বপ্নটা, সত্যিই মনের মত মানুষ হলে তাকে ভালবাসতে এক মুহূর্তও দেরি করতে হয় না। ভালবাসা কত সহজ হয়ে যায়।

ভালবাসতেই তো চায় তপতীর জীবন; পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এই মনটা আজও স্বপ্ন দেখিয়ে দিয়ে তপতীর ইচ্ছাটাকে তপতীর কাছে ধরা পড়িয়ে দিচ্ছে। কলকাতার মাসিমারা, পিসিমারা, হরেনকাকা, আর ছোড়দাও ঠিক বুঝতে পারেন নি, বরং উল্টোটাই বুঝলেন। তপতী একটা বিয়ে-বিদ্রোহিনী মেয়েলি চেহারা মাত্র নয়; বিয়ে করতেই চায় তপতী। ভালবেসে সুখী হওয়ার জন্যে একটা মেয়েলি পিপাসা তপতীর এই সুন্দর সুশ্রী আর সুসজ্জিত রক্তমাংসের অস্তিত্বের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

আরও আশ্চর্য, এবং সে আশ্চর্যের লজ্জাকে নিজের মনের কাছে আর ফাঁকি দিয়ে লুকোতে চেষ্টা করে না তপতী। মুখ লুকানো এই পিপাসাটা মাঝে মাঝে সত্যিই যে ব্যাকুল হয়ে ছটফট করে, আর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এই শান্ত সাবধান প্রাণটাকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে।

এই তো সেদিন, ছোড়দা চাকরি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় চলে যাবে, এই খবর শুনতে পেয়ে নিরুদি যেদিন এলেন, সেদিন কি যেন কি ভেবে আর বেশ গম্ভীর

হয়ে তপতীর দিকে তাকিয়ে বলেই ফেললেন—সত্যিই, তুই আর বিয়ে করলি না দেখছি।

নীরুদির কথার মর্মটুকু বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে নেই। তিনি ধরেই নিয়েছেন, তপতীর আর বিয়ে হবে না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পার করে দিয়েও কোন মেয়ে বিয়ে করতে পারে, এটা যেন নিতান্ত অপার্থিব একটা অঘটন।

তপতী কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দ স্বরে, কোন কুণ্ঠা আর লজ্জার ধার না ধেরে বলে দিতে পারে—তুমি এত হতাশ হয়ে গেলে কেন নিরুদি? আমি তো একটুও হতাশ হইনি।

নিরুদি—এখনও হতাশ না হলে আর হবি কবে? চুলে পাক ধরবার পর? না, তখনও হতাশ হবি না?

—বলতে পারি না। হেসে হেসে জবাব দেয় তপতী।

নীরুদি চোখ বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই বিড়বিড় করেন—কে জানে হিস্ট্রির মধ্যে কোন জ্ঞানের আলো পেয়েছিস, যে জন্যে···থাক, অধ্যাপিকার সঙ্গে তর্ক করবার সাধ্যি অন্তত আমার নেই।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সত্যটাকে যেন ভুলেই বসে আছে তপতী, কিংবা সে সত্যটাকে নিয়ে তপতীর চিন্তায় কোন প্রশ্নের বালাই নেই। নীরুদি মনে করিয়ে দিয়েছেন বলেই মনে পড়েছে তপতীর, বয়সটা পঁয়ত্রিশ পার হতে চলেছে। বয়সের হিসাব করবার কোন অভ্যেসও নেই তপতীর। বরং ভাবতে একটু বিশ্রীও লাগে, নীরুদির মত মানুষেরা বুঝতেও পারেন না যে, বয়সের কথা তুলে তাঁরা বিয়ে আর ভালবাসার ব্যাপারটাকে কত ছোট করে দিচ্ছেন। বিয়ে আর ভালবাসা যেন শুধু বয়সের গুণ দেখবার কাজ, বিয়ে করা যেন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। বয়সের কথা বললে যে শরীরটারই কথা বলা হয়, নিতান্ত স্থূল আর অশোভন একটা ইঙ্গিত করা হয়। সত্যি কথা হলেও বিয়ে-করা ভালবাসার জীবনে সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য কিংবা একমাত্র সত্যের কথা নয়। আর, কোন মেয়ের জীবনে সে ইচ্ছেটা প্রাণেরই পিপাসার মত হলেও সেটা এমন পিপাসা হতে পারে না, অন্তত হওয়া উচিত নয় যে, যে-কোন ডোবার জলের কাছে ছুটে যেতে হবে। যেন সূর্য ডুবে গেল, বয়স দেখে এরকম একটা আতঙ্ক নিয়ে তাড়াহুড়ো করাও কোন মেয়ের জীবনের পক্ষে সম্মানের কথা নয়, কাণ্ডজ্ঞানেরও কথা নয়। বাজে বিয়ের চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল।

এত কথা নীরুদিকে বলতে পারে না তপতী। তাই নীরুদিও বোধহয় তপতীকে ভুল বুঝে কিংবা কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু আশ্চর্য হয়ে চলে গেলেন।

নীরুদি চলে যাবার পর কিন্তু তপতীর মনটা নিজেরই একটা গোপনতার লজ্জায় অনেকক্ষণ ধরে বেশ কষ্ট পেয়েছিল। কিছুই বুঝতে না পেরে কিংবা ভুল বুঝে চলে গেলেন নীরুদি, এর জন্য দায়ী তপতীরই একটা মিথ্যে লজ্জা। আর

গোপন করবার কি দরকার ছিল? নীরুদিকে মুখ খুলে কথাটা বলে দিলেই তো কত খুশি হয়ে, আর, নিশ্চয় একটা আশীর্বাদও করে চলে যেতেন নীরুদি। নিরুদি নিজেই বুঝে লজ্জিত হতেন যে, তপতীর বিয়ে হলো না বলে এতটা হতাশ হওয়া তাঁর পক্ষে কত বড় ভুল হয়েছে। আর, ওভাবে হতাশার কথাটা বলে ফেলাও কত অন্যায় হয়েছে। বলে দিলেই তো হতো, না নীরুদি, একটুও হতাশ হবেন না, বোধহয় ছত্রিশ বছরের বয়সটাও পার করে দেবার আর সুযোগ হবে না, তার আগেই একদিন তোমাকে এসে বিয়ে-ভীরু তপতীর মাথায় ছোট্ট একটা লাজুক আনন্দের ঘোমটা চড়িয়ে দিতে হবে।

ঠাট্টার হাসি হেসে আর বাজে কথা বলে নীরুদিকে ভুল বুঝিয়ে দেবার সময়েও যার কথাটা বার বার মনে পড়েছিল তপতীর, তার নাম সুললিত। নীরুদি শুনে খুবই খুশি হতেন, কারণ সুললিত হলো নীরুদিদেরও চেনা মানুষ। কেম্ব্রিজের পড়া সাঙ্গ করে, প্রায় পাঁচ বছর লণ্ডনেরই একটা ব্যাঙ্কে অডিটারের কাজ করে, এই বছর দেশে ফিরেছে। এরই মধ্যে ইমপোর্ট কন্ট্রোলের একটা ভাল মাইনের সার্ভিস নিয়ে কলকাতাতেই আছে। নীরুদির স্বামী বিকাশবাবুর সঙ্গে সুললিতের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। খুব মনে পড়ে তপতীর, নীরুদির মুখে সুললিতের নামটা প্রথম শুনেছিল তপতী। সে প্রায় এক বছর আগের কথা। চোখ অপারেশন করবার জন্যে বিকাশবাবু লণ্ডনে যেতে চান। ভাগনে সুললিত লণ্ডন থেকে লিখেছে, চলে আসুন, কোন চিন্তা করবেন না। লণ্ডনে সুললিতের এক ডাক্তার বন্ধু আছেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে।

সেই সুললিতের সঙ্গে তপতীর বিয়ে হবে। তপতীর প্রাণটা যেন অনেক দিনের ঘুমের পর নতুন হয়ে জেগে উঠেছে। তপতী নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, সুললিত যেন তপতীর মাঝে মাঝে দেখা সেই স্বপ্নের মানুষটিরই মত একেবারে মনের মত মানুষ। যদিও মাত্র ছ'মাসের পরিচয়, কিন্তু তপতীর মনে কোন সন্দেহ নেই যে, সুললিতকে বুঝতে কোন ভুল হয়নি তপতীর। আজ পর্যন্ত দু'জনের আলাপের আনন্দ কোন তর্কের আঘাতে ছিন্ন হয়নি, কোন তর্কই ওঠেনি। দু'-জনেরই মনের মত যত সাধ ইচ্ছা আর অভিরুচি, যত মত মতবাদ আর সংকল্পের মধ্যে কোন অমিল নেই যেখানে, সেখানে তর্ক দেখা দেবেই বা কেমন করে? বিলেতে জীবনের দশটা বছর পার করে দিলেও বিলেত সম্বন্ধে সুললিতের মনে কোন ভক্তিবিহ্বলতা নেই। বিলেতে না গিয়েও তপতীর মনে বিলেত-প্রীতির ছিটেফোঁটাও নেই। সুললিত বরং মাঝে মাঝে বিলেত সম্বন্ধে একটা অভক্তির ভাবই প্রকাশ করেছে—বিলেত দেশটাও মাটির। তপতীও খুশি হয়ে বলেছে, আমার মনে হয়, মাটিটাও বিশেষ সুবিধের নয়।

—আপনি আন্দাজে ঠিকই ধরেছেন মিস মল্লিক। বিলেতের মাটির অনেক গুণ থাকলেও, ভারতীয় বেচারাদের যেন বেশ একটু কামড়ায়। চাকরিটা ভালই ছিল, অনেকের কাছ থেকে অনেক শিখেছি আর উপকার পেয়েছি। সবই সত্যি;

কিন্তু ভারতীয় বেচারাদের সম্পর্কে ওদের যেন একটা প্রভু-প্রভু ভাব আছে, ভাল ব্যবহারের মধ্যেও সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন ধরুন, পঁচিশ বছর বয়সের এক লেখিকা, নামটা বোধহয় হানা নিকলসন, একদিন বি. বি. সি'র অফিসে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করেই চট্ করে বলে ফেললেন, আমার খুব বিশ্বাস আপনাদের ভারতীয় সাহিত্যও একদিন বেশ উন্নত হবে, আর এইরকম একটি উপন্যাসও সৃষ্টি করতে পারবে।

তপতী—কি রকম উপন্যাস ?

সুললিত—লেখিকা মহোদয়া তাঁর নিজেরই লেখা একটা উপন্যাসকে হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এইরকম উপন্যাস।

তপতীর হাসিটাও গম্ভীর হয়ে যায়—এ-ধরনের অহংকারের জন্যেই তো ওদের একটুও ভাল লাগে না !

সুললিত—আপনি কাদের কথা বলছেন ?

তপতী—আপনি যাদের কথা বলছেন তাদেরই কথা। আমাদের কলেজে পড়াবার স্টাফে সবসুদ্ধ দশজন বিদেশী মহিলা আছেন। সকলেই ইউরোপীয়ান, তার মধ্যে একজন হলেন ইংরেজ, যার নাম মিস মলিসন। সকলেই আমার হাত ধরে কথা বলেন, একমাত্র উনি অর্থাৎ মিস মলিসন ছাড়া। লক্ষ্য করেছি, আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বাঁ হাতে ধরা বইটাকে ডান হাতে তুলে নেন, যেন আমি তাঁর ডান হাতটাকে খালি না পাই। পাছে ধরে ফেলি, এই তাঁর ভয় !

সুললিত—ওটা ঠিক ভয় নয়, ওটা হলো এক ধরনের ঘৃণা।

তপতীর গলার স্বর একটু রুষ্ট হয়ে ওঠে—ঘৃণা করবার এত স্পর্ধাই বা ওরা কোথা থেকে পায়, কে জানে ? আমিও ঠিক করেছি, মহিলাকে একদিন একটু শিক্ষা পাইয়ে দেব। সে সুযোগ পাওয়া যাবেই।

সুললিত হাসে—আপনি কি পাল্টা কোন প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছেন ?

তপতী—হ্যাঁ !...একরকমের প্রতিশোধই বলতে পারেন।

সুললিত—কি করবেন আপনি ?

তপতী—বুঝিয়ে দেব, আমিও ইংরেজ জাতকে কত ঘেন্না করি।

—কি করে বোঝাবেন ?

—যেদিন কোন ভুলে, ভুলে কেন, নিজের কোন স্বার্থের মতলবে উদার ভদ্রতার ভান করে আমার দিকে যখন হাত বাড়িয়ে দেবেন মিস মলিসন, আমি তখন হাত গুটিয়ে শুধু মুখের কথায় যা বলবার হয় বলবো।

—এটা কি প্রতিশোধ নেওয়া হল ?

—কি বললেন ?

—এটা প্রতিশোধ নেওয়া হলো না, এতে আপনি শুধু নিজেকেই একটু ছোট করে দিলেন।

চমকে ওঠে তপতী, আর, সুললিতের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে

নিয়ে, যেন নিজেরই মনের একটা বিস্ময়ের চকিত মুগ্ধতা নিক্ষেপ করে, অন্যদিকে মুখ ফেরায় তপতী। না, অমিল নয়, সুললিত আপত্তির সুরে যে কথাগুলি বলছে, সেগুলি যে তপতীরই অভিরুচির কথা। তপতীর মনের ভিতরে কতবার একটা চাপা বিক্ষোভের রাগ যেন জল্পনা করেছে; মিস মলিসনের মত জাতগর্বিতা মহিলার স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেকটাকে একটু জব্দ করে দেওয়া, একটু শিক্ষা দিয়ে দেওয়াই উচিত। সাহেবের দোকানের জিনিসপত্রকে সারদা পিসিমা গঙ্গাজল ছিটিয়ে যে-রকম শুদ্ধ করে নিয়ে তবে স্পর্শ করেন, ঠিক সেরকম না হোক, ইচ্ছে করলে প্রায় সে রকমই একটা ব্যবহার একটু ভদ্রভাবে করতে পারা যায়। মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখের উপর রুমাল চেপে আর মুখটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কথা বলা যায়। মিস মলিসনের অহংকার তাহলে বেশ জব্দ হয়ে যায়। কিন্তু···মনের ভিতরে এ-ধরনের জল্পনার কাণ্ড দেখে তপতী নিজেই লজ্জিত হয়েছে। এই জল্পনা যে মিস মলিসনের হাতের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হবার জন্য একটা লোভের কান্না। দরকার কি, নিজেকে এত ছোট করে দেওয়া ?

কি আশ্চর্য, সুললিতের মনের কথাগুলি যে তপতীরই প্রাণের কথা। তপতীর একটা রাগী ইচ্ছাকে নিন্দে করেছে সুললিত, কিন্তু এই নিন্দেই যে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সুললিতের মার্জিত অভিরুচিটা হুবহু তপতীরই মার্জিত অভিরুচির মত।

চেঁচিয়ে কথা বলে না, বোধহয় বলতেও পারে না সুললিত। তাই তপতীর প্রাণের একটা উদ্বেগও শান্ত হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে কথা বলবার মানুষকে সহ্যই করতে পারে না তপতী। মানুষের মুখে চেঁচানো কথা শুনলেই মনে হয়, যেন একটা রূঢ় রাক্ষুসে ভাব, একটা অমার্জিত ইতরতা কথা বলছে। সেই জন্যে নীরুদির স্বামী বিকাশবাবুকে দেখলেই সভয়ে সরে যেতে হয়। ভদ্রলোক একটা সাধারণ কুশল জিজ্ঞাসার কথাকেও যেন হুংকার দিয়ে বলেন। নীরুদির একবার খুব শখ হয়েছিল পুরী বেড়াতে যাবেন। সমুদ্র দেখবেন। বিকাশবাবুও খুব খুশি হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন, আর পুরীর সমুদ্রের সৌন্দর্যও বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু বিকাশবাবুর মুখে সমুদ্রের সেই বর্ণনা এমন চিৎকার আর হুংকার দিয়ে উঠলো যে, নীরুদি সমুদ্র বেচারাকেই ভুল বুঝলেন। নীরুদির পুরী বেড়াতে যাবার ইচ্ছা-টাই মরে গেল। একদিন এমন কথাও বলেছিলেন নীরুদি—না, ও ছাই সমুদ্র দেখে লাভ কি ? কি আছে দেখবার মত ? তার চেয়ে ডালহাউসি যাওয়াই বোধহয়···।

সুললিত দশ বছর বিলেতে কাটিয়ে দিলেও আমিষ খাওয়া পছন্দ করে না। এমন কি বিলেতে থাকতেও, প্রায় গান্ধীজীরই মত নিরামিষ খাবার খেয়েছে সুললিত। জানতে পেরে তপতীরও প্রাণের একটা ভয় দূর হয়ে গিয়েছে। মাংসের নাম শুনলেই যেন আতঙ্ক বোধ করে তপতী। সেই যে কবে, নিতান্ত ছেলেবেলায়, মা তখনও বেঁচে ছিলেন, মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল তপতী, তারপর আর কোনদিন মাছ মাংস স্পর্শ করেনি। যে যতই যুক্তি দেখাক না কেন, মাছ মাংস খাওয়া যে একটা সুস্বাদু নিষ্ঠুরতার কাল্‌চার, এই সংস্কারটাকে আজও মন থেকে

বিদায় দিতে পারেনি তপতী। বরং সংস্কারটা এখন একটা কঠিন বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে বেশ বিপদে পড়তে হয়। এই সেদিনও রমা মাসিমার বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে তপতীকে দুঃসহ একটা শাস্তি সহ্য করতে হয়েছিল। তপতী যত আপত্তি করে, না মাসিমা, আমাকে মাংস দেবেন না, আমি মাংস খাই না, পছন্দও করি না—রমামাসিমা ততই জেদ করেন আর মাংসটার মহিমা বর্ণনা করেন।—আজে বাজে জানোয়ারের মাংস নয় তপতী, একটু খেয়ে দেখ। রোড আইল্যাণ্ড মুর্গীর মাংস। বাড়িতে পোষা রোড আইল্যাণ্ড। উনি নিজে ব্যাণ্ডেল গিয়ে এক সাহেবের পোলট্রি থেকে খাঁটি জাতের রোড আইল্যাণ্ডের এক ডজন ডিম এনেছিলেন। কত চেষ্টা করে একটা দেশী মুর্গীকে দিয়ে সেই ডিম ফুটিয়ে, তারপর কত যত্ন করে ছানাগুলোকে লালন-পালন করা হয়েছে। উনি সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা নিজের হাতে ছানাগুলোকে বিলিতী যবের দানা খাইয়েছেন। কী সুন্দর টুক-টুক করে যবের দানা খেত ছানাগুলো। ওঁকে দেখলেই ঠোঁট ফাঁক করে দানা চাইতো লোভীগুলো। এক ডজন ডিমের মধ্যে ফুটেছিল মাত্র ছটা, তাও আবার বড় হতে হতে পাঁচটাই মরে গেল। বাকি ছিল শুধু একটা—এটাই হলো সেটা। কী চমৎকার চকচকে পালক হয়েছিল! কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাত সাড়ে চারটার সময় ডাক দিত। ওরই একটা টেংরি, একবার টেস্ট করে দেখ তপতী।

ভয় পেয়ে খাবার টেবিল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তপতী। রমামাসিমা আর …আরও যারা ছিল, তারা হো হো করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু তপতী বাড়ি ফিরে এসেও অনেকক্ষণ ধরে আতঙ্কিতের মত চুপ করে বসেছিল। মাংসের কথা নয়, রমামাসির মুখটা আর সেই হো হো হাসির শব্দটা মনে পড়ছিল বার বার।

সুললিত বলেছে—জীবনে আমিও হ্যাপিনেস চাই; কিন্তু হ্যাপিনেস বলতে যা বুঝি, সেটা গাদা-গাদা টাকা-পয়সা খ্যাতি ক্ষমতা আর পুপুলারিটি নয়। আমি বুঝি, শান্তি মানেই হ্যাপিনেস। চুপচাপ কাজ করে, কারও সামান্য ক্ষতিও না করে, মনের মত মানুষের সঙ্গে মনের কথা বলে জীবনটা যেন পার করে দিতে পারি। মনের শান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো, আর মনের শান্তি নিয়ে জেগে উঠবো… বাস, এর চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই।

তপতীও যে এর চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না। যেখানে ভালবাসা শান্তি এনে দিতে পারে, সেখানেই যে ভালবাসা উৎসর্গ করে দিতে চায় তপতী। আর কোন সন্দেহও নেই তপতীর, সুললিতের মত মানুষকে ভালবাসতে না পারবার কোন কথা নেই। দু'জনের জীবনের ইচ্ছা রুচি আর দাবির মধ্যে একটুও অমিল নেই।

হরেনকাকাকে যে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে, না, আর ভুল বুঝবেন না। আর ওভাবে অনুরোধ করবার দরকার নেই। আপনাদের তপতীর এতদিনের সাবধান জীবনটা এইবার সব ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। এবার আপনিই একবার

সুললিতবাবুকে স্পষ্ট করে বলে দিন যে, তপতীর আপত্তি নেই।

কিন্তু এত কথা বলবার লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য সামান্য একটা কথা বলে হরেনবাবুকে আশ্বস্ত করতে চায় তপতী। তবুও বলতে গিয়ে সারা মুখে চঞ্চলতা শিউরে ওঠে। মাথা হেঁট করে তপতী।—আপনি আর চিন্তা করবেন না কাকা-বাবু। শিগগির দেখতে পাবেন···মনে হচ্ছে যে···।

হয়তো আরও স্পষ্ট করে একটা কথা বলে দিত তপতী। কিন্তু হরেনবাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন—ও কে আসছে? সুললিত বলে মনে হচ্ছে।

তপতীর মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ে। আস্তে আস্তে একটু বিব্রত আর কুণ্ঠিত স্বরে বিড়বিড় করে—হ্যাঁ, কাকাবাবু।

হরেনবাবুর চোখ দুটোও যেন হঠাৎ উল্লাসে দীপ্ত হয়ে ওঠে। বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। আমি এখন তাহলে আসি তপতী।

॥ দুই ॥

সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর দুটি বাড়ি আজও তেমনই দুটি ভিন্ন রকমের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ভবতোষ মল্লিকের বাড়ি, আর হরেন দত্তের বাড়ি। ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটা যেন একটা নীরবতার সৌধ, আর হরেন দত্তের বাড়িটা মুখর-তার মার্কেট। এ-বাড়িতে শুধু তপতী নামে একটা প্রায়-স্তব্ধ প্রাণ, আর, ও-বাড়িতে বিশটি ভাড়াটিয়া পরিবারের দিনরাত্র চেঁচামেচির প্রাণ।

সেই হরেনবাবু, সত্তর বছর বয়সের যে মানুষটি হন হন করে হেঁটে বেড়াতে পারতেন, তিনি এখন সাতাত্তর। হন হন করে না হোক, এখনও বেশ ব্যস্তভাবে হাঁটতে পারেন, এবং হাতে লাঠি না থাকলেও চলে, যদিও একটু কুঁজো হয়ে চলতে হয়।

মাঝখানে পুরো তিনটে বছর কার্সিয়ং-এর এক নার্সিংহোমে ছিলেন হরেন-বাবু। কে জানে কেন, কলকাতাকে হঠাৎ বড় দুঃসহ বলে মনে হয়েছিল। কার্সিয়ং-এর ডাক্তারও আশ্চর্য হয়ে বলেছেন—আপনার এই বুড়ো শরীরের স্বাস্থ্যেও কোন ত্রুটি দেখছি না। মনে হয়, অসুখটা আপনার শরীরের নয়, মনের।

—তার মানে?

—মনের বিমর্ষতাই আপনার একমাত্র অসুখ।

—তা হবে।

কার্সিয়ং-এর জল-হাওয়া ভাল লেগেছে। শরীরটারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তাতে লাভ কি? মনের শান্তিটার যে সত্যিই কোন উন্নতি হয়নি। ঠিকই বলেছে ডাক্তার।

কার্সিয়ং থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন হরেনবাবু, সেও প্রায় এক বছর হলো। আবার বিমর্ষ হয়েছেন। আবার মনে মনে তৈরি হয়েছেন, কার্সিয়ং-এর

নার্সিংহোমই ভাল।

কিন্তু কলকাতার জীবনটাকে দুঃসহ মনে হয়ই বা কেন? সেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন হরেনবাবু। কিন্তু সেটা এমন একটা অদ্ভুত উপলব্ধির কথা যে, কাউকে বলা যায় না। বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এমন কোন বান্ধবও নেই, যার কাছে সেকথা বলা যেতে পারে। বেঁচে থাকতো যদি ভবতোষ, হ্যাঁ, হরেনবাবুর বৃদ্ধ বয়সে জীবনের সেই একটি মাত্র অশান্তির বেদনা যেন তাঁর মনের ভিতরে আজও নীরবে বিড়বিড় করে, তুমি কী আশা করেছিলে ভবতোষ, আর কী হলো? আমি থেকেও কিছুই করতে পারলাম না। তোমার বাড়িটা যে পুরনো উজ্জয়িনীর জঙ্গলের ভিতরের সেই ভাঙা প্রাসাদটার মত নিঝুম, মানুষের সাড়া নেই।

ভবতোষের বাড়ির এই নিঝুম চেহারাটা সহ্য করতে পারেন না হরেনবাবু, মাথায় রোগ আছে বলে সন্দেহ করবে কিংবা হো হো করে হেসে উঠবে, একথা জানেন হরেনবাবু।

নিজেকেও প্রশ্ন করে বুঝতে চেষ্টা করছেন, ভবতোষের বাড়ির এই জনহীন স্তব্ধতা সহ্য করতে তিনি পারবেনই বা না কেন?

হ্যাঁ, মনে পড়ে, নিজেরই বাড়ির একটা স্তব্ধতাকে একদিন কি-ভয়ানক দুঃসহ বলে মনে হয়েছিল। সেই সেদিন, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, ভবতোষের এই বাড়িটা তখনো তৈরি হয়নি, হরেনবাবুর নতুন বাড়িটার প্রথম চুনকাম তখন ধবধব করছে, সেই যে পূর্ণিমা একদিন সকালবেলায় প্রণাম করে হাসপাতালে চলে গেল, আর সন্ধ্যাবেলাতেই হাসপাতাল থেকে খবর এল যে, পূর্ণিমা আর ফিরবে না। শূন্য, স্তব্ধ, একেবারে বোবা হয়ে গেল বাড়িটা। সেই বোবা স্তব্ধতা যেন হরেনবাবুর প্রাণ আর প্রাণের একটা আশার ছবিকে পিষে পিষে গুঁড়ো করে দিয়েছিল।

হাসপাতালে গেল পূর্ণিমা, ফিরে আসবে হরেনবাবুর ছেলেকে কোলে নিয়ে, নতুন বাড়িটার প্রাণ এইবার সত্যিই নতুন হয়ে জেগে উঠবে। শ্বেতপাথরের রাজপুরী হোক, তিন মহল অট্টালিকা হোক, আর মাটির কুটীরই হোক, একটা বাচ্চা ছেলে যদি আঙিনায় বা বারান্দায় ঘুর ঘুর না করে, তবে যে বাড়িকে বাড়ি বলেই মনে হয় না। সে বাড়িকে একটা শুকনো অফিস-বাড়ি বলে মনে হবে। আজও কি ভুলতে পেরেছেন হরেনবাবু, পূর্ণিমা হাসপাতালে যাবার আগেই তিনি পিছনের বাগানে একটা ছোট আমগাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে যে ছোট্ট একটা দোলনা ঝুলিয়েছিলেন, আর ছোট্ট একটা কাঠের ঘোড়াও কিনে এনে রেখেছিলেন?

পূর্ণিমা আর আসবে না। মরা ছেলেকে পেটে নিয়ে পূর্ণিমা মরণ বরণ করেছে। পূর্ণিমা আর কোনদিনই হরেন দত্তের আশার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে এ-বাড়িতে আসবে না। কিন্তু বাড়িটাকে এই ভয়ানক শূন্যতার অভিশাপ থেকে

তো বাঁচাতে হবে। বাড়ির প্রত্যেক ঘর ভাড়া দিয়ে দিলেন হরেনবাবু।

কিন্তু ভাড়াটিয়া ভদ্রলোকের বউ বেচারী যে সত্যিই কচি ছেলে কোলে নিয়ে এবাড়িতে ঢুকেছে। দেখতে বেশ লাগে। পঞ্চাননবাবু তিনটি ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন এসে এই বাড়ির একটা ঘর ভাড়া নিলেন, সেদিনের সে ঘটনাও মনে পড়ে। হরেনবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কত মাইনে পান ?

—একশো দশ টাকা।

—সর্বনাশ। তার মধ্যে তিরিশ টাকা যে বাড়িভাড়া দিতেই লেগে যাবে মশাই ?

—কি আর করবো বলুন ? আপনি তো একটা টাকাও কম নিয়ে ছাড়বেন না।

—কে বললে ছাড়ব না ? আপনি কুড়ি টাকা ভাড়া দেবেন।

ভাড়াটিয়া মানুষগুলিও এতদিনে ভাল করে চিনতে পেরেছে এই হরেন-বাবুকে। মহালয়ার দিন এই বাড়ির পঁচিশটা কাচ্চা-বাচ্ছা ছেলে-মেয়ে উপরতলার দাদুর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সোরগোল করে একটা দাবিও হাঁকে—পুজোর উপহার দাদু।

হরেনবাবু ঘর থেকে বের হয়ে শুধু ওদের বয়সের চেহারাগুলিকে একবার দেখে নেন। তারপর সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির সব বারান্দায় বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের হুল্লোড় জাগে। সবারই জন্য নতুন জামা প্যাণ্ট আর ফ্রক কিনে এনেছেন দাদু।

গোপনে আরও একটা কাণ্ড করে রেখেছেন হরেনবাবু, যার খবর হরেনবাবুর কোন আত্মীয় মানুষও জানে না। এই পাড়ার কোন মানুষও না। এই কাণ্ডটাও হরেনবাবুর জীবনের একটা হঠাৎ বেদনার সৃষ্টি। বড় দুঃসহ হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই বেদনা, কারণ আঘাতটাও ছিল বড় কঠোর।

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে, কনকনে শীতের একটা কুয়াশাভরা ভোরে, সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর দক্ষিণের ঐ বস্তিটারই কাছ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলেন হরেনবাবু। একটা ঘরের কাছে ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

—কি ব্যাপার ?

—একটি বাচ্চা পড়ে আছে বাবুজী। এক মাসের একটা বাচ্চা। উত্তর দিল যে, তাকে চিনতে পারেন হরেনবাবু, কয়লাওয়ালা রামপূজনের মা।

—কিস্‌কা বাচ্চা ? প্রশ্ন করে ভিড়ের আরও কাছে এগিয়ে যান হরেনবাবু।

—শিশিওয়ালা কিষণের বউ জগমতিয়ার বাচ্চা।

শিশিওয়ালা কিষণ আর কিষণের বউ জগমতিয়া, দু'জনেই পালিয়েছে। ঘরের দরজা খোলা পড়েছিল, তাই বস্তির মানুষ এই ভোরেই দেখতে পেয়েছে, বাচ্চাটা এক টুকরো চটের ওপর পড়ে আছে আর কাঁদছে।

ভিড়ের একটা লোক বলে ওঠে—থানামে লে যাও।

—কেন ? প্রশ্ন করেন হরেনবাবু।

—বাচ্চাকো লেনেওয়ালা কোই হ্যায় নেহি বাবু।

—না, থানায়ে নয়। হরেনবাবু বিচলিত স্বরে কথা বলেন।

—তব কহাঁ ?

—বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে কেউ একজন আমার সঙ্গে চল। এখনই চল।

চিন্তা করবার কিছু ছিল না। সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর উপরে ঐ যে লালরঙা এত-বড় একটা বাড়ি, ওটা একটা অনাথ আশ্রম। নাম—লিট্‌ল ফ্লাওয়ার্স। হরেনবাবু জানেন, অনাথ শিশুদের কী সুন্দর যত্ন নিয়ে লালন-পালন করে এই লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার্স। এই চমৎকার স্নেহের কাজটা করেন যাঁরা, তাঁদের মুখের হাসিও চমৎকার। ইউরোপের এক বিখ্যাত চার্চের অনুগত এক ভক্তগোষ্ঠীর এক ফাদার আর তাঁর সহায়িকা এক মাদার, একদল দেশী চাকর চাকরানি নিয়ে দিনরাত খেটে এই অনাথ শিশুর আশ্রমটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। লিট্‌ল্ ফ্লাওয়ার্সের লাল-রঙা স্নিগ্ধ মূর্তিটার দিকে মাঝে মাঝে মুগ্ধভাবে তাকিয়েছেন হরেনবাবু।

কিন্তু সেদিন হরেনবাবুর সেই মুগ্ধ চোখের বিশ্বাস যেন হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাতের বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো। ফাদার বললেন—মাপ করবেন, আমরা একেবারে খাঁটি নেটিভ পেরেণ্টেজের কোন শিশুকে রাখি না। অন্তত মিক্সড্ ব্লাড হওয়া চাই।

—হোয়াট ডু ইউ মীন ?

—আমাদের নিয়ম, শিশুর ফাদার ও মাদারের মধ্যে অন্তত একজন যদি অব ইউরোপীয়েন ওরিজিন হয়, তবে আমরা তাকে নিতে পারি।

আর কোন কথা না বলে বস্তিতে ফিরে এসে, আর কয়লাওয়ালা রামপূজনের মাকে একশো টাকা দিয়ে বাচ্চাটাকে একটা বস্তিরই নোংরা যত্নের কাছে গছিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলেন হরেনবাবু। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যেন একটা ক্রুদ্ধ জ্বালাময় আগুনের উত্তাপও ছিল। সেইদিনই হরেনবাবু তাঁর বাড়িকে একটা পরিকল্পনার কাছে সঁপে দিলেন। পরদিনই ডীড তৈরি করে বাড়িটাকে ভবিষ্যতের হাতে দান করে দিলেন। সে দান রেজিস্টারী করাও হয়ে গেল। হরেনবাবু যখন আর ইহজগতে থাকবেন না, তখন এই বাড়িটা একটা শিশু-আশ্রম হয়ে যাবে, আর, নাম হবে 'পূর্ণিমার আলো'। দেশের সরকার হবেন সেই আশ্রমের অভি-ভাবক। হরেনবাবুর যে টাকা ব্যাঙ্কের খাতায় জমা থাকবে, তার সবই হবে এই আশ্রমের সাহায্যের ফণ্ড।

কিন্তু হ্যাঁ, ডীডের মধ্যে একটা কঠোর নিয়মের নির্দেশ রয়ে গেল। 'পূর্ণিমার আলো'তে শুধু দেশী পিতা-মাতার শিশু ঠাঁই পাবে। শিশুর জন্মের মধ্যে ইউরোপীয় মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও থাকলে চলবে না, সে শিশুর ঠাঁই এখানে নয়।

বাড়ির আয় অর্থাৎ ভাড়া বাবদে যা কিছু পান হরেনবাবু, তার সবই ব্যাঙ্কের কাছে এই ভবিষ্যতের শিশু-আশ্রমের সাহায্য ফণ্ডের নামে জমা হয়। পেনসনের প্রায় অর্ধেকও হরেনবাবুর স্বপ্নের সেই 'পূর্ণিমার আলো'র সাহায্যের জন্য প্রতি মাসেই ব্যাঙ্কের খাতায় নিয়মিতভাবে জমা হয়ে চলেছে।

তাই সড়কের উপর বেড়াতে বেড়াতে নিজের বাড়িটার দিকে তাকাতে হরেনবাবুর চোখে আর কোন শূন্যতা ছলছল করে না। বরং, একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সুখ যেন হরেনবাবুর সে চোখের দৃষ্টিতে ছলছল করে। দীর্ঘশ্বাসও ছাড়েন; কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে আর একটুও উত্তাপ নেই; বরং অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা।

কিন্তু ভবতোষের বাড়িটা দেখতে কষ্ট হয় এবং সে কষ্ট সহ্য করতে আর বোধ হয় রাজি নন হরেনবাবু। তাই কলকাতা ছেড়ে দিয়ে তিনটি বছর কার্সিয়ং-এর হোমে কাটিয়ে দিলেন।

ডাক্তার বলেছেন, বিমর্ষতাই হরেনবাবুর একমাত্র অসুখ। কিন্তু কেন বিমর্ষতা? বিমর্ষতা-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভদ্রলোকও কিন্তু কারণটা ধরতে পারেননি। ডাক্তারের মতে, বৃদ্ধ বয়সের একটা অসহায়তাবোধ থেকে এই বিমর্ষতা দেখা দিয়েছে।

অসহায়তাবোধ মোটেই নয়, ডাক্তারের অভিমত শুনে হেসে ফেলেছিলেন হরেনবাবু।

ডাক্তার কিছুই জানেন না, কিন্তু হরেনবাবু সন্দেহ করেন, ভবতোষের বাড়িটাই বোধহয় তাঁর জীবনের প্রাণটাকে এরকম বিমর্ষ করে দিয়েছে। তপতীরই ব্যবহারে হরেনবাবুর একটি সাধের আশার ছবি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, সুললিতকেও বিয়ে করলো না তপতী।

অমল গ্লাসগো থেকে, শ্যামল মিশিগান থেকে, আর বিমল জাকর্তা থেকে চিঠি লিখেছে—তপতী যেন এইবার বিয়ে করে হরেনকাকা। আর এভাবে একলা পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। বিয়ের পরেও ও-বাড়িতেই থাকুক তপতী।

অমল শ্যামল আর বিমল এই কথাও লিখেছিল, বাড়ির স্বত্ব তপতীরই নামে রেজেস্টারি করিয়ে দিন। কাগজপত্র পাঠিয়ে দেবেন, সই করে দেব।

তপতীর নামে বাড়ির স্বত্ব রেজেস্টারি করিয়ে আর সুললিতের মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন বড় খুশি হয়েছিলেন হরেনবাবু। এইবার ভবতোষের বাড়ির শূন্যতা ঘুচবে। মৃত্যুর পর যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে ভবতোষ আর জয়া, তাদের আদরের নাতিকে কোলে নিয়ে তপতী গুনগুন করে ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। কিন্তু নাতিটা ভয়ানক দুরন্ত, ঘুমনো দূরে থাকুক, হাত-পা ছুঁড়ে ছটফট করছে আর চেঁচাচ্ছে। হাসতে হাসতে চলে যাবে ভবতোষ আর জয়ার অশরীরী তৃপ্তিটা।

কিন্তু তপতীর বিয়ে হলো না।

কেন হলো না, এ প্রশ্ন নিজের মনে কয়েকবার দেখা দিলেও তপতীর কাছে সে প্রশ্ন কোনদিন উচ্চারণ করেননি হরেনবাবু। আর ইচ্ছেও করে না। এমন কি তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে হরেনবাবুর স্নেহাক্ত চোখের চাহনিটা আগের মত আর মায়াময়ও হয়ে ওঠে না।

কদাচিৎ কখনো ভবতোষের এই বাড়িতে আসেন হরেনবাবু। বিষণ্নভাবে তপতীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন, তার পরেই চলে যান। চলে যাবার ব্যস্ততা

দেখে মনে হয়, শুধু ভবতোষের বাড়ির শূন্যতাকে নয়, তপতীর এই একলা পড়ে থাকা জীবনটাকে, একটা অর্থহীন কুমারীত্বের মিথ্যা গর্বকে সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন হরেনবাবু।

একদিন কথায় কথায় বলেও ফেললেন হরেনবাবু।—একটা লেখায় পড়লাম, রবিঠাকুর বলেছেন, আশি বছর বয়সটা একটা ধৃষ্টতা।

হেসে ফেলে তপতী—হ্যাঁ, মৃত্যুর একবছর আগে কবি এরকম একটা কথা বলেছিলেন।

হরেনবাবু—কিন্তু…।

তপতী—কি?

হরেনবাবু—আমার মনে হচ্ছে, সাতাত্তর বছর বয়সটাই একটা ধৃষ্টতা।

তপতীর মুখটা করুণ হয়ে যায়।—এরকম কথা কেন বলছেন কাকাবাবু?

হরেনবাবু—না, আর ঝুলে থাকবার কোন মানে হয় না। খুব ভাল হতো যদি এইবার সরে পড়তে পারতাম।

তপতীর চোখের দৃষ্টি এইবার যেন একটা সন্দেহের ভয়ে ভীরু হয়ে ওঠে।—আপনি যেন খুব হতাশ হয়ে এরকম কথা বলছেন।

—তা হতাশ হয়েছি বৈকি।

—আপনি বোধহয়…।

—বল, কি বলতে চাও?

—আপনি বোধহয় আমার কথা ভেবে খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন।

—হ্যাঁ।

—আমাকে আপনি খুব ভুল বুঝেছেন কাকাবাবু।

—ভুল বুঝেছি? একটু আশ্চর্য হয়ে তপতীর মুখের দিকে তাকান হরেনবাবু। সত্যিই কি মেয়েটাকে ভুল বোঝা হয়েছে? তপতীর মুখের উপরে সত্যিই যে একটা লজ্জালু আশার রক্তাভা সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। বয়স কত হলো তপতীর? বেয়াল্লিশের কম তো নয়। তবু কি তপতী সত্যিই এখনো একটা আশার উৎসবের অপেক্ষায় দিন গুনছে?

হরেনবাবুর মনের আশা-হতাশার দ্বন্দ্বটা হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। হরেনবাবুর চোখ দুটো মায়াময় হয়ে ওঠে। কারণ তপতী যেন সব কুণ্ঠা আর লজ্জার বাধা তুচ্ছ করে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, আপনার হতাশ হবার কোন কারণ নেই কাকাবাবু।

অনেকদিন পরে আজ ভবতোষের বাড়িতে বেশ মনভরা খুশি আর চোখভরা হাসি নিয়ে চা খেলেন হরেনবাবু। চলে যাবার সময়, আজ বেশ সোজা হয়ে হাঁটতেও পারলেন। না, সাতাত্তর বছর বয়সটা ধৃষ্টতা হবে কেন? না, আর কলকাতার বাইরে গিয়েও কাজ নেই। আবার কার্সিয়াং-এর হোমে গিয়ে একটা বছর কাটিয়ে দেবার যে ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, সে ইচ্ছাটাও যেন হরেন-

বাবুর আজকের একটা আশ্বাসের তাড়া খেয়ে দূরে সরে গিয়েছে।

ভবতোষের বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, পিছু ফিরে বাড়িটার দিকে আজ বেশ খুশি চোখেই তাকাতে পারলেন হরেনবাবু।

এই খুশির উপর অতিরিক্ত আর একটা বিস্ময়। একটা গাড়ি ছুটে এসে ফটকের কাছে থেমেছে। গাড়ি থেকে নামছে বিহঙ্গভূষণ, হরেনবাবুরই সলিসিটর বন্ধু নেপাল বসুর ভাইপো।

হাত তুলে হরেনবাবুকে নমস্কার করে বিহঙ্গ—কেমন আছেন আপনি?

—ভাল আছি। নেপাল কেমন আছে?

—কাকা ভালই আছেন।

—তুমি এখন···।

—আমি এখানেই এসেছি। কাকিমা তপতীকে একবার দেখতে চেয়েছেন।

—কেন?

বিহঙ্গ লজ্জিতভাবে হাসে—সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে···। আমি অবশ্য স্পষ্ট করে···। না, এখনই আমার পক্ষে কিছু বলা উচিত নয় কাকাবাবু। শিগগিরই সব জানতে পারবেন।

—ভেরি ওয়েল। হাঁটতে শুরু করেন হরেনবাবু। হরেনবাবুর বিস্ময়টাই যেন উদ্দাম হয়ে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

বিহঙ্গ বলে—আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসি কাকাবাবু?

—নো, থ্যাংকস্। হাতের লাঠি দুলিয়ে টান হয়ে আর হন্-হন্ করে হেঁটে চলে যান হরেনবাবু।

॥ তিন ॥

হরেনবাবু তবু বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বয়সটা প্রায় ধৃষ্টতার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু তপতী কি কিছু বুঝতে পারে?

ক্ষুব্ধভাবে মুখ ফিরিয়ে রেখে, আর আড়চোখে একটা কঠিন অবজ্ঞার ভাব শক্ত করে ধরে রেখে, তপতী যেদিন সুললিতের ছায়াটাকে বাড়ির ড্রইংরুমের দরজা থেকে চিরকালের মত সরে যেতে দেখেছিল, সেদিনের পর থেকে পুরো সাতটা বছরের আলো আর বাতাসের ছোঁয়া নীরবে সহ্য করে ভবতোষ মল্লিকের বাড়ির সাদাটে চেহারাটা বেশ ধূসর হয়েছে; কিন্তু তপতীর বয়সের চেহারাটা ধূসর হয়েছে বলে মনে হয় না। সেদিন যে ছিল পঁয়ত্রিশ, সে আজ বেয়াল্লিশ।

আয়নাতে তপতীর রূপসী প্রতিচ্ছবির শরীরটা আজও নিটোল ছন্দের তৃপ্তিতে টলটল করে। দেখতে পায় না তপতী, বোধহয় কোন সন্দেহও মনে জাগে না যে, এই প্রতিচ্ছবিটা বেয়াল্লিশ বছরের একটা মেয়াদের শেষ সুন্দরতার ছবি। তপতীর মনটাই নিশ্চয় বয়স ভুলে গিয়েছে; নইলে এই সামান্য সন্দেহটাও মনে দেখা দিত নিশ্চয়।

সুললিতের ছায়া সাত বছর আগেই চোখের কাছ থেকে সরে গিয়েছে। তপতীর মনের কাছে সুললিত আজ আর একটা ছায়াও নয়। সুললিত অনেকদিন আগের শোনা একটা গল্প মাত্র। সে গল্পের আরম্ভটা ভাল, মাঝখানটাও ভাল, কিন্তু শেষটা? শেষটা আর সহ্য করতে পারেনি তপতী। কি-ভয়ানক অমিল। সুললিতের জীবনে যে এত বড় একটা কদর্যতা গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ভুলেও কোনদিন সন্দেহ করতে পারেনি তপতী। সুললিতের মুখে মদের গন্ধ পেয়ে সেই যে চমকে উঠলো তপতী, তারপর থেকে আর নয়। সুললিতের মুখের দিকে আর তাকাতে পারেনি তপতী।

—মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় অসুবিধে হচ্ছে। আপনি এখন যদি···। প্লীজ এখনি চলে যান সুললিতবাবু।

সুললিতবাবু বলেছিল—আমি যে আজ অনেক আশা করে, সত্যিই স্পষ্ট করে একটা আশার কথা বলবার জন্য এসেছি।

—না, কোন কথা বলবার দরকার নেই।

—তুমি কি কিছু সন্দেহ করে অর্থাৎ আমাকে একটা মাতাল-টাতাল মনে করে ক্ষুণ্ণ হয়েছ?

—প্লীজ, আর বেশি কথা বাড়াবেন না সুললিতবাবু।

—আশ্চর্য, এই সামান্য একটা···এটা আমার সন্ধ্যেবেলার সামান্য একটা অভ্যাস মাত্র। সারাদিনের খাটুনির পর সামান্য একটু···।

—না। আর কোন কথা বলবেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় তপতী, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আড়চোখের দৃষ্টিতে একটা কঠোর অবজ্ঞা ধরে রাখে, যতক্ষণ না সুললিত নিঃশব্দে চলে যায়।

তপতীর আশাটা শুধু লজ্জিত নয়, অপমানিত বোধ করেছিল। নিজের উপর রাগ করেছিল তপতী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকেও ক্ষমা করতে পেরেছিল। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে যে মানুষের, তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া যে একটা শাস্তি। একটা ঘৃণার সঙ্গে আপস করে যে বিয়ে করতে হবে, সে বিয়েতে দরকার নেই। সে বিয়ে জীবনের শান্তি কখনো হয়ে উঠতে পারে না। জেনেশুনে আর ইচ্ছে করে একটা ভয়ের কাছে নিজেকে অসাবধান করে দিতে পারা যায় না। তা ছাড়া, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, একটা ব্রাণ্ডিধন্য মানুষকে, সে মানুষ যতই গুণী হোক, ভালবাসতে পারা যাবে না, তখন তাকে বিয়ে করার অর্থ হবে নিছক একটা কপটতা। মনটা যখন আর রাজি নয়, তখন মনের বিরুদ্ধে জোর করবার কোন মানে হয় না।

আজ আরও মনে হয়, ভালই হয়েছে। জোর করে মনটাকে দুর্বল করে দিয়ে সুললিতকে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে ভালই হয়েছিল। তাই আজ তপতীর জীবনের আশাটা হেসে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটাকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। গোপালবাবুর স্ত্রী—মাধবীকাকিমা যদি কলেজের মেয়েদের

আঁকা ছবির একজিবিশনে সেদিন না আসতেন, তবে আজ আর বিহঙ্গবাবুর সঙ্গে …হরেনকাকা জানেন না, তপতী আজ মনে মনে রাজি হয়েই আছে। মাধবী-কাকিমা শুধু একটা দিন ঠিক করবেন আর তপতী সেদিন একটা সুন্দর উৎসবের মধ্যে এই বিহঙ্গবাবুরই হাত ধরে ভালবেসে সুখী হবার একটা জগতে চলে যাবে।

স্বপ্নের আবছা স্মৃতির ছবির মত অনেক দূরের একটা অনুভবের ছবিকে হঠাৎ কেন যেন বার বার মনে পড়ে যায়। সেই কবে, যেন পূর্বজন্মের একটা জীবনে তপতীকে একটা বকুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই কে-যেন মুগ্ধ হয়েছিল আর খাতাভরে কবিতা লিখেছিল। বিহঙ্গও প্রায় সেইরকমের একটা কাণ্ড করেছে। তপতীকে দেখেছে আর শুধু সেই একটি দেখার মায়াতেই মুগ্ধ হয়েছে। মাধবীকাকিমা নিজের মুখেই তপতীর কাছে এই গল্প করে গিয়েছেন। বিহঙ্গ বলেছে, আমি ওসব খোঁজ-খবর করবার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যত ইতিহাস জানবার আর শোনবার ধার-ধারি না ; পছন্দও করি না কাকিমা। তপতী যদি রাজি হয়, ব্যাস্, আমি রাজি হয়েই আছি।

তপতীর মনেও আর কোন ভয় নেই। বেশ সুশ্রী শিক্ষিত সুস্থ আর ভাল রোজগারের মানুষ, এই বিহঙ্গভূষণ কেন যে আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি, যে প্রশ্নের উত্তরটাও মাধবীকাকিমা নিজেই গল্প করে তপতীকে শুনিয়ে দিয়েছেন।—বিহঙ্গর প্রতিজ্ঞা ছিল, কারবারে উন্নতি না করা পর্যন্ত বিয়ে করবে না। সত্যিই তপতী, ছেলেটা কোনদিন বিয়ে করবার একটা ইচ্ছের কথা ভুলেও বলেনি। কিন্তু আমার মনে হয়…

কি-যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন আর থেমে গেলেন মাধবীকাকিমা।

তপতী হাসে।—হাসলেন কেন কাকিমা ?

মাধবীকাকিমা আরও হাসেন—আমার সন্দেহ, কোন মেয়েকে আজ পর্যন্ত ভাল চোখে দেখেইনি বিহঙ্গ। এই প্রথম তোমাকে দেখলো আর…।

বিশ্বাস করে তপতী ; হ্যাঁ, তপতীকে দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে বিহঙ্গ। জীবনের এই প্রথম মুগ্ধ হওয়ার আনন্দকেই চিরকালের আনন্দ করে তুলতে চায় বিহঙ্গ।

উল্টোডাঙ্গায় এতবড় গ্লাস ওয়ার্কস, যেখানে দেড়শো মানুষ কাজ করে, সেটা বিহঙ্গভূষণেরই চেষ্টার কীর্তি। রুড়কি থেকে পাশ করবার, আর টাটার লেবরেটরিতে পাঁচ বছর কাজ করবার পর খুব ভাল মাইনের একটা সরকারী চাকরি পেয়েছিল বিহঙ্গ। কিন্তু চাকরি পছন্দ করেনি বিহঙ্গ। সামান্ত পুঁজি নিয়ে কারখানাটা চালু করেছিল। মজুর আর মিস্ত্রিদের সঙ্গে প্রায় একাকার হয়ে কাজ করত বিহঙ্গ। সেই বিহঙ্গের প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে। এখন বছরে এগার হাজার টাকা আয়কর দেয় বিহঙ্গ।

মাধবীকাকিমা কেন ডেকেছেন, সেটা অনুমান করতে কোন অসুবিধে নেই। বিয়ের দিনটাই ঠিক করতে চান মাধবীকাকিমা। তপতীও জানে, মাধবীকাকিমাকে

কি বলতে হবে। আজ কালের মধ্যে নয়, এই তিনমাসের মধ্যেও নয়, বড়দিনের সময় কলেজটা যখন বন্ধ থাকবে তখন যে-কোন একটা দিনে…হ্যাঁ, তার মানে হরেনকাকার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে যেন দিন ঠিক করেন মাধবীকাকিমা।

লঘু ভয়েলের শাড়ির গোলাপী আভা ফুরফুর করে। ঢিলে খোঁপার স্নিগ্ধ স্তবকও যেন একটা নিবিড় কুহকের ভারে টলমল করে। তপতীর সাজে আর প্রসাধনে বয়সভীরু কোন সঙ্কোচের ছায়াও নেই। তপতীর মূর্তিটা যেন ভালবেসে সুখী হবার একটা রঙিন আশা।

বিহঙ্গ ডাকে—চলুন, আর দেরি করে লাভ কি? না, আর দেরি করে লাভ নেই। বরং ক্ষতিই হতে পারে। তপতীর আশা আজ একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চায়। সেই নিশ্চিন্ততার পরম প্রতিশ্রুতি যেখানেগিয়ে আজ পাওয়া যাবে, সেখানেই তপতীকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ডাক দিচ্ছে বিহঙ্গ। একহাতে পাইপ আর অন্য হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে যে, ফুরফুর করে উড়ছে যার গলার সিল্কের নেকটাই, তার পাশে বসতে আজ আর একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না তপতী। যে-মানুষের জীবনের আশা ইচ্ছা আর আনন্দের গল্পগুলির সঙ্গে তপতীর জীবনের যত আশা ইচ্ছা আর আনন্দের সব গল্পগুলি একেবারে বর্ণে বর্ণে মিলে গিয়েছে, তার পাশে বসতে আর কুণ্ঠা বোধ করবারই বা দরকার কি?

তপতীকে দেখতে পেয়ে মাধবীকাকিমা প্রথমেই যে কথাটা প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেললেন, সে-কথা শোনবার পর তপতীর আর কোন কথা বলবারও রইল না। —আমাদের ইচ্ছা, বড়দিনের ছুটিতে তোমার কলেজ যখন বন্ধ থাকবে, তখন কোন একটি দিনে…হ্যাঁ, হরেনবাবুর সঙ্গে একবার একটা পরামর্শ অবশ্য করে নিতে হবে।

বিহঙ্গও মাধবীকাকিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারে তপতী, যেন তপতীর রাজি হবার লজ্জিত হাসিটাকে দেখে মুগ্ধ হবার আশায় তপতীর মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে আছে বিহঙ্গ।

তপতী বলে—আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করুন কাকিমা।

মাধবীকাকিমা আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,—তোমরা তাহলে এখন…হ্যাঁ এখানেই বসে একটু গল্প-সল্প কর, আমি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নিই।

মাধবীকাকিমা চলে যাওয়া মাত্র বিহঙ্গ বলে—কিন্তু এখন আর তোমাকে আপনি-আপনি করে কথা বলতে পারবো না।

তপতী মাথা হেঁট করে—আপনার অভিরুচি।

বিহঙ্গ—আমার অভিরুচি, ওভাবে একটি খাঁটি বাঙালী মেয়ের মত মাথা হেঁট করে আর ঘাড় গুঁজে, লজ্জায় একেবারে মাটির পুতুলটি হয়ে গিয়ে কথা বললে চলবে না।

তপতী হাসে—খাঁটি বাঙালী মেয়ের কাছ থেকে বেশি অবাঙালীপনা দাবি করা তো উচিত নয়।

বিহঙ্গ—না, আমি বাঙালীপনা একেবারেই পছন্দ করি না। ভারতীয়পনাও না।

—তার মানে ?

—সত্যি কথা, এসব আমার ধাতে সহ্য হয় না। আমি পছন্দই করি না।

—একটু স্পষ্ট করে বলুন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ধর, তোমার এই শাড়ি, এভাবে ললিতলবঙ্গলতার মত দুলিয়ে ঝুলিয়ে না পরে, বেশ ফিটফাট গাউনের কিংবা স্কার্টের মতো ভঙ্গিতে তো পরতে পারা যায়।

—তা যাবে না কেন ? চৌরঙ্গীতে বেড়াতে গেলেই তো দেখা যায়, কোন কোন শ্বেতাঙ্গী ওভাবে শাড়ি পরে চলেছে। কিন্তু সেটা কি দেখতে···।

—দেখতে খুব চমৎকার লাগে। সেটাই তো আমার চোখে একটা আইডিয়াল মেয়েলি স্টাইল।

—কিন্তু আমার তো দেখতে ভয় করে।

—ওসব ভয় করলে চলবে না, নিতান্ত বাজে ভয়।

—আমার তো মনে হয়, ভয়টা বাজে নয়, স্টাইলটাই বাজে।

—আশ্চর্য, তুমি যে ঠিক খাঁটি বাঙালী মেয়ের মত কুসংস্কারের কথা বলছো।

—বিলিতী কুসংস্কারের কথাই বা বলবো কেন ?

—বিলিতী কুসংস্কার ? তুমি শিক্ষিতা হয়েও কী অদ্ভুত কথা বলছো তপতী ?

—আপনি কি কখনো বিলেতে ছিলেন ?

—না ; কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? আমার মনে কোন ফল্‌স্ পেট্রিয়টিজ্‌ম্ নেই। আমি জানি, আমাদের দেশী ধর্মকর্ম রুচিটুচি আর ধারণা-টারনা সবই বাজে। তা না হলে দেশটা এক হাজারেরও বেশি বছর ধরে পরের অধীন হবে কেন ?

—সবই বাজে নয়। ভাল-মন্দ দুই আছে।

—একটুও ভাল নেই। এদেশে আজ পর্যন্ত কোন ভদ্রলোক জন্মেছে বলতে পার ?

—কি বললেন ?

—একটা মানুষের মত মানুষ। অর্থাৎ একটা গ্রেট মানুষ কিংবা একটা গ্রেট প্রতিভা ?

—কেন ? গৌতম বুদ্ধের মত···।

—ছিঃ, একটা পাগলকে নিয়ে ইতিহাসের বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে যে···।

চমকে উঠে তপতী—আপনি যে সত্যিই দেখছি···।

বিহঙ্গ—কিছুই দেখনি তপতী। সেই জন্যেই বলছি। তুমি তো এখন কাকিমার

সাজে বসে দিব্যি কইমাছের ঝোল আর লাউচিংড়ি আর যত লতাপাতার চচ্চড়ি খাবে। আমি ওসব অখাদ্য স্পর্শ করি না। আমার খাবার আসে ম্যাদাম কস্টে-লোর কিচেন থেকে। প্রতি মাসে তিনশো টাকা আগাম জমা করে দিই। ম্যাদাম কস্টেলোর বয় দিনে দুবার খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। পাঁচ কোর্স লাঞ্চ আর আট কোর্স ডিনার; হ্যাম কম্পালসরি।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে বিহঙ্গের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মাথা হেঁট করে তপতী। তাকাবার ভঙ্গিটাও অদ্ভুত; যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে চোখ দুটো কিংবা চারদিকের আলো হঠাৎ সরে গিয়েছে, কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিহঙ্গ কিন্তু তেমনই তার জীবনের যত বিশ্বাসের আর ইচ্ছার আর অভিরুচির আনন্দটাকে আরও মুখর করে দিয়ে বলতে থাকে,—বিশু গাঙ্গুলী নামে আমার একটা কেরানী ছিল। লোকটাকে আমি বেশ একটু পছন্দও করতাম। মাত্র একশো টাকা মাইনে পায়, তবু ট্রাউজার আর নেকটাই পরে, লোকটার রুচি দেখে ভালই লাগতো। কিন্তু একদিন ভুল ভাঙলো, বুঝলাম লোকটা নিছক একটা খাঁটি বাঙালী কেরানী। অফিসে বসে বিবেকানন্দের বই পড়ছিল। তাড়িয়ে দিয়েছি লোকটাকে।

—কেন? তপতীর চোখের দৃষ্টিটা যেন এইবার কঠোর হয়ে চমকে ওঠে।

—না তাড়িয়ে উপায় কি?

—অফিসে বসে অন্য বই পড়া একটা অন্যায় ঠিকই, কিন্তু আপনি কি সেই জন্যে…।

—না না না; লোকটা যদি অফিসে বসে উডহাউস পড়তো, তাহলে কি ওকে তাড়িয়ে দিতাম? কখখনো না।

—কিন্তু আমি তো উডহাউস পড়তে ঘেন্না বোধ করি।

—কেন?

—ঘেন্না লাগে বলে।

—বিবেকানন্দ পড়তে খুব ভাল লাগে না তো?

—খুব ভাল না হোক, ভালই লাগে।

—এঃ, তোমার রুচি আর আমার রুচি…একেবারে যে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। কোন মিল নেই দেখছি।

—না, একটুও মিল নেই।

—যাক্, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে অবশ্য এটা কোন সমস্যা নয়।

—সমস্যা বৈকি।

বিহঙ্গ হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে—আমি যা বলতে চাই, তুমি সেটা বোধ হয় ঠিক ধরতে পারছো না তপতী। দুজনের মধ্যে ভালবাসা থাকলে এসব অমিল কোন সমস্যাই হতে পারে না।

কি ভয়ানক প্রবীণ বিজ্ঞের মত ভালবাসার রহস্য ব্যাখ্যা করছেন ভদ্রলোক, যেন ভালবাসার কতই অভিজ্ঞতা হয়েছে জীবনে। অথচ বয়স যে তপতীরই সমান, একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে সে-কথাও মাধবীকাকিমা একদিন গল্প করে তপতীর কাছে বলেছিলেন। ভদ্রলোকের উপদেশ দেবার ভঙ্গিটা কত জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ কথাগুলি অজ্ঞানতার যত ছেলেমানুষী মুখরতা।

বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, দু'জনের জীবনের অভিরুচির এত বড় একটা অমিল দুজনের মধ্যে কোন সমস্যা হয়ে উঠবে না। সমস্যা যে এখনই হয়ে উঠেছে, ভদ্রলোকের কাছে বসে থাকতে আর একটুও ইচ্ছে করে না। উঠে পড়তে পারলে বাঁচা যায়। গলার স্বর এত নামিয়ে আর নরম করে যে কথাটা বললেন ভদ্রলোক সেটা যে নিছক একটা দেহতত্ত্বের চিৎকার। ভদ্রলোক যেন বলতে চাইছেন, মানুষের প্রাণ হলো একটা জন্তু, আর সেই জন্তুটারই একটা দরকারের জন্য বিয়ে আর ভালবাসা। তাই তিনি কোন সমস্যার ভয় দেখতে পাচ্ছেন না।

কিন্তু তপতীর মনটা যেন এরই মধ্যে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এতদিনের যত ধারণার কল্পনার আর আশার মনটা দুঃসহ লজ্জায় শিউরে উঠেছে। এমন বিয়ের কোন অর্থ হয় না। এত সাবধানে থেকে, এতদিন ধরে যে অপেক্ষার ধৈর্য স্বীকার করেছে তপতী, সেটা কি শেষ পর্যন্ত এরকম একটা ভুল বিয়ে করবার জন্য?

বিহঙ্গ একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছ তপতী?

না, আর দেরি করে না তপতী। যেন একটু পরিচ্ছন্ন বাতাস নিঃশ্বাসে পাওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

মাধবীকাকিমা এসে আরও আশ্চর্য হলেন—কোথায় চললে তপতী?

তবু আর দেরি করতে পারে না, এক কাপ চা খেতেও রাজি হয় না তপতী। বিহঙ্গকে নয় ড্রাইভারকেই ডাক দিয়ে মাধবীকাকিমা বলেন—তপতীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এস সনাতন।

॥ চার ॥

হরেনকাকা কেন যে আর আসেন না সেটা কল্পনা করতে পারে তপতী। হিসেব করে বুঝতে পারে, কমদিন নয়, প্রায় একটা বছর পার হতে চললো, হরেনকাকা আর এদিকে আসেননি, এই সড়কের উপর দিয়ে কোনদিন তাঁকে আর বেড়াতে যেতে দেখা যায়নি।

হরেনকাকার কিছু আর জানতেও বাকি নেই। বরং বেশ ভাল করে জানতে পেরেছেন বলেই একেবারে ক্ষমাহীন হয়ে দূরে সরে আছেন। তপতীর জীবনের ভাল-মন্দের জন্য তাঁর আর কোন আগ্রহ নেই।

মাধবীকাকিমাকে যে চিঠি লিখেছিল তপতী, সে চিঠির বক্তব্য হরেনকাকাকে জানিয়ে দিতে একটু দেরি করেননি মাধবীকাকিমা।

আমার বিয়ের কথা নিয়ে আপনারা আর চিন্তা করবেন না। দিনও ঠিক করবেন না। মাধবীকাকিমাকে অনিচ্ছার কথাটা জানিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি তপতী।

মাধবীকাকিমাও একটুও দেরি না করে বড় করুণ রকমের রাগের ভাষায় অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছিলেন—তোমার অদ্ভুত ব্যবহারের কথা হরেনবাবুকেও জানিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। ভগবান জানেন, আমরা কি অপরাধ করলাম যার জন্যে তুমি আমাদের এত বড় একটা আশার সঙ্গে এমন অভদ্র ব্যবহার করলে।

হরেনকাকা নিশ্চয় আবারও ভুল বুঝলেন। মাধবীকাকিমার কথাগুলিকে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করে তপতীকে একটা খামখেয়ালী অহংকারের মেয়ে বলে ধারণা করেছেন। তপতীর প্রাণটাকেই বোধহয় একটা উগ্র-শীতল অভদ্রতা বলে সন্দেহ করেছেন তিনি। ভালবাসতে জানে না, বিয়ের নামে ভয় পায়, ভবতোষের মেয়েটা বোধহয় একটা উত্তাপহীন নিঃশ্বাস মাত্র; একটা রূপসী আয়না।

ভুল, ভয়ানক ভুল করেছেন হরেনকাকা, যদি এরকম কোন সন্দেহ তিনি করে থাকেন। তপতীর প্রাণটা যে এই বাড়ির নিভৃতে বসে আজকাল কেমন করে একটা অভিমানের কান্নার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, সে খবর জানেন না হরেনকাকা। কি ছাই একটা মন এসে জুটেছে তপতীর জীবনে। এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি গেঁয়ো চাষীর দশ বছর বয়সের একটা মেয়ের মন পাওয়া যেত। কিছুই ভাবতে হতো না, হেসে হেসে একগাদা মেটে সিঁদুর মাথায় ছড়িয়ে নিয়ে যে-কোন একটা লোকের বউ হয়ে যেতে পারা যেত।

কিংবা চোখ কান বুজে, কোন বাছবিচার না করে কাউকে ভালবেসে ফেলা যেত; তপতীরই ছাত্রী অনিন্দ্যা যে-রকম একটা ভালবাসার কাণ্ড করে বসে আছে। বিয়েও হয়ে গিয়েছে অনিন্দ্যার; অ্যাটর্নির মেয়ে হয়ে পাশের বাড়ির টিউটর ছেলেটাকে বিয়ে করেছে।

কিন্তু হরেনকাকাও কি স্বীকার করবেন, খুব ভাল একটা কাণ্ড করেছে অনিন্দ্যা? কখনো না। হরেনকাকাও বলবেন, এসব কাণ্ডকে ভালবাসা বলে না। এগুলো অশিক্ষিত আর অসাবধান মনের একটা মূর্খতার ব্যাধি। মূর্খতাটা খুব দুঃসাহসী বলেই ব্যাধিটাকে একটা মস্ত সুখের অ্যাডভেঞ্চার বলে মনে হয়। শেষে অবশ্য...।

জানে তপতী অনিন্দ্যার মনের অবস্থাটা শেষে কি দাঁড়িয়েছে। তপতীকেই চিঠি লিখেছে অনিন্দ্যা, ভুল করেছি তপতীদি, কিন্তু সে ভুল থেকে রেহাই পাবার কোন উপায়ও যে দেখছি না! শুনে আশ্চর্য হবেন, কিন্তু সত্যি কথা, স্বামীকে আর একটুও ভাল লাগে না, কিন্তু কোলের বাচ্চাটাকে বড় ভাল লাগে। যদি বাচ্চাটা না থাকতো, তবে এমন একটি বিচিত্র চেহারা আর চরিত্রের স্বামীকে কবেই ছেড়ে দিয়ে, বাপের বাড়িতে যদি ঠাঁই পেতাম ভাল, নয়তো হাসপাতালের নার্স হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতাম।

না বুঝে-সুঝে ভালবেসে ফেলবার ভয়টাই যে তপতীর জীবনের ভয়। হরেন-কাকা যদি এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারতেন, তবে তপতীকে একটা বিয়ে-ভীরু অপদার্থ অহংকার বলে সন্দেহ করতে পারতেন না।

যে টলস্টয়কে তপতীরই মত এত শ্রদ্ধা করেন হরেনকাকা, তিনিই বা কি করে-ছিলেন? জীবনের প্রথম ভালবাসাকে সত্যিই ভালবাসা বলে বিশ্বাস করে ফেলেননি টলস্টয়। সে ভালবাসা সত্যিই ভালবাসা কিনা পরীক্ষা করে জানবার জন্যে সে-নারীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন টলস্টয়। দু'জনের কেউ কারও চোখের কাছাকাছি ছিলেন না। এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, দুজনের মধ্যে চিঠি দিয়ে জানাজানির আগ্রহটুকুও ফুরিয়ে এসেছে। চিঠি লেখালেখিও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। টলস্টয় বুঝেছিলেন, যেটা ভালবাসা বলে বোধ হয়েছিল, সেটা মোটেই ভালবাসা নয়, একটা অবুঝ উৎসাহের চঞ্চলতা।

হরেনকাকা আসেন না, কিন্তু তপতী তো একবার নিজে গিয়ে হরেনকাকাকে দেখে আসতে পারে। বুড়ো মানুষের শরীরটা কেমন আছে, এটুকু জানবারও কি কোন ইচ্ছে হয় না তপতীর?

অস্বীকার করে না তপতী, খুবই অভদ্রতা···অভদ্রতা কেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ-তার ব্যাপার হচ্ছে। তপতীর মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে এখনো যে একটি মাত্র আন্তরিক প্রার্থনা বেঁচে আছে, তারই অপমান করতে হচ্ছে। কিন্তু হরেনকাকার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও যে একটা ভয় আছে। যখন তপতীর মুখের দিকে ভয়ানক উদাস ভাবে তাকিয়ে থাকবে বুড়ো মানুষটির সেই স্নেহের চোখ দুটো, তখন এমন কোন আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে কি তপতী, না কাকাবাবু, আপনি হতাশ হবেন না?

আশ্বাস দিতে পারবে তপতী। কিন্তু আজ নয়। হরেনকাকাকে দেখতে যাবে তপতী, কিন্তু আজ নয়।

তবে কবে?

আজ যদি নীরুদি আসেন, তবে আজই। শুধু নিরুদির কাছ থেকে একটা কথা স্পষ্ট করে শোনবার অপেক্ষায় আছে তপতী। সে কথা শোনবার পরে আর একটুও দেরি করবে না, সোজা হরেনকাকার কাছে গিয়ে, হরেনকাকার দু'হাত চেপে ধরে, কিন্তু বেশ একটু রাগ করে বলে দিতে হবে, আপনি আমাকে মিথ্যে বার বার ভুল বুঝে মিথ্যে এত কষ্ট পেয়েছেন হরেনকাকা। কিন্তু···? আর আমাকে ভুল বোঝ-বার সুযোগ পাবেন না। আমার বিয়ে। নিরুদি এসে আপনাকেও সব খবর জানিয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে নীরুদিরই অপেক্ষায় ড্রইংরুমের একটা কৌচের উপর বসে বই পড়ছিল তপতী। আশ্বিন মাসের একটা সকালবেলা। বাগানের ঘাসের উপর গাদা গাদা ঝরা শিউলি ছড়িয়ে আছে। কি আশ্চর্য, মৌমাছিগুলি এই ঝরা শিউলিগুলিকেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর গুনগুন করে যেন পিপাসার গান শুনিয়ে দিয়ে

চলে যাচ্ছে।

নীরুদি নয়, নীরুদির স্বামীর চাপরাশি এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। লিখেছেন নীরুদি—না, সুধাময় আসেনি, সুধাময়ের কাছ থেকে কোন চিঠিও আসেনি। কাজেই তোমাকে স্পষ্ট করে জানাবার মত কোন কথা এখন আর কিছু নেই।

নীরুদির বড় জায়ের ছেলে সুধাময়। নীরুদিই কিছুদিন আগে হঠাৎ এসে তপতীর মনে আচমকা একটা বিস্ময় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি এবার তোমার অহংকার ঘুচিয়ে দেব।

—অহংকার? বেচারী এক মাস্টারনীর জীবনে কিসের অহংকার দেখলেন নীরুদি?

—বিয়ে করতে চাও না, বিয়েই করলে না, এই অহংকার।

—কে বললে বিয়ে করতে চাই না?

—তাহলে সমস্যাটা কি?

—সমস্যা হলো, কাকে বিয়ে করবো।

—কেন? আমাদের সুধাময়কে?

—সুধাময়ই বা আমাকে বিয়ে করবে কেন?

—ওর যে তোমারই মত দশা। বুঝতেই পারছে না কাকে বিয়ে করবে।

—ওঃ, এ যে চমৎকার মিল, মিলের ট্রাজেডি। তপতীর সাবধান প্রাণটা যেন একটা উদাস ঠাট্টার হাসি হেসে নীরুদির মুখের গল্পটাকে লঘু করে দিতে চেয়েছিল।

নীরুদি কিন্তু ভ্রূকুটি করেন—কেন, সুধাময়কে কি তোমার মনে পড়ে না?

—মনে পড়ে বইকি। আলাপও হয়েছিল। ভদ্রলোক কানপুরে না কোথায় যেন থাকেন?

—এখন আগ্রাতে আছে। কিন্তু আর বেশিদিন নয়, ওদের অফিসটাই কলকাতাতে চলে আসছে।

—জার্মানীর সঙ্গে লেনদেনের কাজ করে, বোধহয় এইরকম কোন কোম্পানির অফিস?

—হ্যাঁ, নানারকম মেশিনারীর একটা এজেন্সির অফিস। সুধাময়ই হলো চীফ অর্গানাইজার।

—কিন্তু সুধাময়বাবু তো ল' পাশ করেছেন বলে শুনেছিলাম?

—ঠিকই শুনেছিলে। বেশ কিছুদিন ওকালতিও করেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভাল, এক জার্মান মক্কেলই সুধাময়কে একরকম জোর করে কলকব্জার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। ওকালতি করে তিনশো টাকাও হতো না। এখন কম করেও মাসে হাজার দুই হয়েই যায়।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় তপতী। আর নীরুদি যেন সেই নীরবতার উপর তাঁর প্রতিজ্ঞার জল্পনাকে আঁকতে থাকেন।—আমার খুব ইচ্ছে তপতী, সুধাময়ের সঙ্গে

তোমার বিয়ে হোক। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তোমরা সুখী হবে। বড়দি তোমার বিষয় সবই সুধাময়কে জানিয়েছেন। এখন আমার শুধু ভয়...

—কিসের ভয় করছেন নীরুদি?

—তুমি আবার বেঁকে না বস। তা হলে আমাকে কিন্তু খুবই অপ্রস্তুত হতে হবে তপতী।

—না, আপনাকে আর অপ্রস্তুত করতে চাই না।

—বেঁচে থাক লক্ষ্মী বোনটি। নীরুদি খুশি হয়ে একবার তপতীর গলা জড়িয়ে ধরে সেই যে চলে গিয়েছিলেন, তার পর থেকে যেন আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আসতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু প্রায়ই চিঠি লিখতেন।—সুধাময় কলকাতায় আসছে। এলেই তুমি সব জানতে পারবে। আমি নিজেই গিয়ে সব কথা জানিয়ে আসবো। কিন্তু আর জানাবারই বা কি আছে? মোটকথা, তুমি আবার কোন রকম আপত্তি করে আমাকে বিপদে ফেলবে না।

তাই এখন শুধু প্রতীক্ষা। নীরুদি কবে এসে শেষ কথাটা বলবেন? তার মানে, সুধাময় কবে কলকাতায় এসে নীরুদিকে শেষ কথাটা বলবে।

সুধাময়কে সঙ্গে নিয়েও কি এখানে একবার আসবেন না নীরুদি? নিশ্চয় আসবেন। সুধাময়কে আর একবার দেখতেও পাবে তপতী। আবার আলাপ করবার একটা সুযোগও পাওয়া যাবে।

বিশ্বাস করতে ভালই লাগে, সুধাময়ের মত মানুষের ইচ্ছার আনন্দটাকে মাটি করে দেবার দুর্ভাগ্যে আর পড়তে হবে না। নীরুদির মনে কোন সন্দেহ নেই, তাই বলে দিতে পেরেছেন, তোমরা দুজনে সুখী হবে। তপতীর মনে কোন সন্দেহ নেই, সুখী হতে পারা যায় বৈকি। নীরুদির কাছ থেকে সুধাময়ের নামে কত কথা শুনতে পেয়েছে তপতী, তার সবই যে ভাল কথা। এত জানবার পর আর কিছু জানবার কোন দরকারই হয় না।

কলেজ যাবার সময় হয়েছে।

হ্যাঁ, এখনও কিছুদিন শুধু বাড়ি থেকে কলেজ আর কলেজ থেকে বাড়ি, তপতীর জীবনটাকে শুধু এই মাত্র একটা ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। যতদিন না সুধাময় কলকাতায় আসে ততদিন তপতীর জীবনে আর কোন ঘটনা নেই। তার আগে হরেনকাকার কাছে গিয়ে, হরেনকাকাকে সুখী করার মত কোন কথা বলবারও আর সময় নেই।

তপতীর ছাত্রীরাই বরং মাঝে মাঝে বেশ মিষ্টিরকমের ঘটনার আনন্দ উপহার দিয়ে তপতীর ক্লান্ত আশার হাসিটাকেও স্নিগ্ধ করে তোলে। হেন মাস আসে না, যে মাসে তপতীরই কোন না কোন ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যায়। ছাত্রীর বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়; সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভালই লাগে তপতীর। মিষ্টি উৎসবের কাছে নিজেকেও মিষ্টি করে সাজিয়ে নিয়ে যেতে ভুলে যায় না। কিন্তু প্রভার বিয়ে

দেখতে গিয়ে প্রভার মার মুখের একটা কথা শুনে একটু আশ্চর্য হয়, একটু চমকেও ওঠে তপতী। প্রভার মা মিছিমিছি কেন এত আশ্চর্য হচ্ছেন?

—আপনাকে দেখে কিন্তু বুঝতেই পারিনি যে আপনি হলেন প্রভার তপতীদি। কি আশ্চর্য!

কিসের আশ্চর্য! ওভাবে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার পরেই তপতীর রঙিন সাজের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন প্রভার মা?

ডোরা ডানকানের বিয়ে দেখতে গিয়ে আরও অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের আঘাত সহ্য করে বাড়ি ফিরে আসতে হলো।

ডোরার মা এগিয়ে এসে তপতীর হাত ধরে জিজ্ঞেস করেন—আপনি কে ম্যাদাম?

কোথা থেকে ডোরার বাবা ছুটে এসে ডোরার মা'র কৌতূহলের ভাষাটাকে শুধরে নেন।—মিস তপতী মল্লিক, ডোরার কলেজের সিনিয়ারমোস্ট টিচার।

দূরে একটা টেবিলের কাছের ছোট একটা গল্পমুখর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত ভাবে ডাক দেন ডোরার বাবা।—জর্জ।

তরুণ এক শ্বেতাঙ্গের মূর্তি ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে। ডোরার বাবা বলেন—এই দেখ জর্জ, তুমি যা দেখতে চেয়েছিলে। ইনি হলেন ভারতীয় মহিলা, দেখ—হাউ গ্রেসফুল।

—ইনডিড। তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তোলে জর্জ।

তপতীর দিকে তাকিয়ে ডোরার বাবা বলেন—আমার বন্ধুর ছেলে জর্জ ক্রিস্টফার আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছে। মাত্র একমাস হলো লণ্ডন থেকে এদেশে এসেছে জর্জ। শুনে খুশি হবেন আপনি, সংস্কৃত ভাষা শেখার জন্য জর্জ ইণ্ডিয়াতে এসেছে। জর্জ একজন স্কলার।

তপতীর হাত ধরে টান দেন ডোরার মা—চলুন, ডোরাকে একবার দেখবেন। ডোরা আপনার ব্লেসিং চায়।

শুধু ডোরাকে নয়, মাঝে মাঝে আরও ছাত্রীর বিয়েতে ব্লেসিং জানাতে হয়েছে। দূরে চলে গিয়েছে যে-সব ছাত্রী, তাদেরও চিঠি আসে, অমুক তারিখে আমার বিয়ে, ব্লেসিং চাই তপতীদি।

ঘটনাগুলি যেন জানিয়ে দিয়েছে, তপতী এখন শুধু পরের বিয়েতে ব্লেসিং দেবার মানুষ, নিজে বিয়ে করে ব্লেসিং পাওয়ার মানুষ নয়। কেন? তপতীর উপর পৃথিবীটার চোখে এরকম একটা শ্রদ্ধার আবেশ দেখা দিল কেন?

রোজই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ করবার সময়ই বা এই প্রশ্নটা বার বার তপতীর মনের মধ্যে একটা উৎপাতের মত আনাগোনা করে কেন। পাউডারের পাফ হাতের মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে ধরে হঠাৎ কেন স্তব্ধ হয়ে যায় তপতী? নিজেরই চোখের দৃষ্টিটাকে কেমন যেন সন্দেহ হয়; ওটা যেন তপতী মল্লিকের

চোখের দৃষ্টি নয়, একটা করুণ আতঙ্কের দৃষ্টি।

দুর্বহ একটা ক্লান্তির দৃষ্টি বলেও যে মনে হয়। একটা আশার ভার আর অপেক্ষার উদ্বেগ সহ্য করে করে সত্যিই কি ক্লান্ত হয়ে এসেছে তপতীর বয়সটা?

নীরুদির শেষ চিঠিটা এসেছিল কবে? হিসেব করতে গিয়ে চমকে ওঠে তপতী। কম দিন তো হলো না। আরও যে প্রায় একটা বছর পার হতে চলেছে। আবার একটা শিউলিঝরা আশ্বিন যে প্রায় এসে পড়েছে। সুধাময় তবে কি কলকাতায় আসেনি? হরেনকাকা কি আবার কার্সিয়ং-এর হোমে চলে গিয়েছেন?

ও কি? আয়নাটা যে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুরতার আনন্দে ঝকঝক করে হাসছে। আয়নার বুকে তপতীর খোঁপার ছবিটার স্নিগ্ধ কালোর মধ্যে তিন-চারটে সাদা সুতো কুঁকড়ে আছে কেন? সত্যিই কি সুতো?

রোজই হেয়ার টনিকে চুবিয়ে যে চুলের এত আদর করা হয়েছে, সেই চুলের উপর একটা সাদাটে ধিক্কারের চোরা বৃষ্টির ছিটে লেগে রয়েছে। জীর্ণতার জানান দিয়েছে তপতীর বয়সটা।

আর না বুঝতে পেরে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ডোরার মা মিস তপতী মল্লিককে কেন মাদাম বলে ডেকে ফেলেছিলেন। আর, প্রভার মা কেনই বা তপতীর সাজসজ্জার ঝলমলে রঙিনতা দেখে এত আশ্চর্য হয়েছিলেন।

বুকের ভিতরে যেন একটা আর্তনাদ গুমরে উঠতে চায়। তপতীর প্রাণটা যেন তপতীরই আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে এখনই শোকের কান্না কাঁদতে চাইছে।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটোকে মুছতে গিয়ে তপতীর হাতটা অলস হয়ে যায়। চোখের উপর রুমালটা চেপে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী।

কার পায়ের শব্দ? কে যেন ডাকছে বলে মনে হলো। ঘর থেকে বের হতেই বারান্দার উপর দেখা হয়ে যায়, নীরুদি এসেছেন।

নীরুদির মুখটা গম্ভীর। নীরুদির চেহারাটা যেন অপ্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তপতীর মুখটা তবু যেন জোর করে হাসে।—কি খবর নীরুদি?

—কোন খবর নেই তপতী।

যাক, আর কোন কথা নীরুদিকে না জিজ্ঞাসা করলেও চলবে, তবু জানতে ইচ্ছে করে, কেন কোন খবর নেই।

নিরুদি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করেন।—সুধাময় কলকাতায় এসে-ছিল। কিন্তু বিয়ে করতে রাজি নয় সুধাময়। স্পষ্ট বলে দিয়েছে।

বেশ করেছে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে, কেন বিয়ে করতে রাজি হলো না সুধাময়।

নীরুদি বোধহয় তপতীর মনের এই প্রশ্নটাকে আঁচ করতে পেরে, আগে থেকেই সাবধান হয়ে যান,—আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না তপতী।

তপতী হাসে—আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু আপনি তো উত্তরটা দিয়েই দিলেন।

—কি বললে তপতী ?

—আপনি না বললেও বুঝতে পেরেছি নীরুদি। আপনাদের সুধাময় বোধহয় আমার বয়সের হিসেবটা জানতে পেরেছে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সেজন্য আপনি কেন দুঃখ করছেন ?

—তুমি দুঃখিত না হলে আমিও দুঃখিত নই।

—আমি একটুও দুঃখিত নই নীরুদি।

—শুনে সুখী হলাম, আমি এখন আসি তপতী।

নীরুদি চলে গেলেন। আর তপতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন হৃৎপিণ্ডের ভিতরের একটা বহ্নিজ্বালার দাউ দাউ শব্দ শুনতে থাকে। জীবনে এই প্রথম প্রত্যাখ্যান, তপতী মল্লিকের কাছে আসতে এই প্রথম অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে পৃথিবীর পুরুষ। কেন করেছে এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েও গিয়েছে তপতী। একেবারে ভুলেই গিয়েছিল, বুঝতেই পারেনি, শিউলি ঝরানো রিক্ততার বাতাসটা কবে থেকে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তপতী মল্লিক এখন আর পৃথিবীর নয়নলোভা একটা রঙিন ফুল্লতা নয়।

আয়নার সামনে গিয়ে আবার দাঁড়াতে ভয় হয়। আয়নাটা যে তপতীর জীবনের একটা জীর্ণতারই অভিশাপের ছবি দেখিয়ে দেবার জন্য নির্মম আনন্দে ঝিকঝিক করে হাসছে।

না, আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এমন শূন্যতা জীবনে কোনদিনও বোধ করেনি তপতী। সুন্দর সুস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাবার পরই যদি কেউ শুনতে পায়, তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে, তবে তার চোখের সামনে সব আলো যেমন শূন্য হয়ে যায়, এ যেন তেমনি একটা শূন্যতা।

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর দু'পাশের গাছের মাথায় পাখির ভিড় যেন বেড়েছে। পথের ভিড়ও বেশি। মানুষের পৃথিবী যেন বুঝতে পেরে খুশির উৎসবে মেতে উঠেছে, তপতী মল্লিকের জীবনটা আজ শেষ আশা হারিয়ে একেবারে একলা হয়ে গিয়েছে।

ফটকের দরজা ঠেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে সেই ভিখারীটা, অনেকদিন আগে যেটা একদিন এসে, একেবারে বারান্দার কাছে এসে বিশ্রী চিৎকার করে গান ধরেছিল। কম দিন তো নয়, সেই যে, একবছরেরর বেশি হবে, যেদিন হরেনকাকাও এখানে দাঁড়িয়ে তপতীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

ভিখারীটা কিন্তু কাছে এসেও গান ধরে না। তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা ভাষায় সোজা ভিক্ষার দাবি জানায়—দুটি ভিক্ষে দিন মা।

ভিক্ষার দাবি নয়, যেন একটা থান ইট ছুঁড়ে তপতীর কপালটাকে জখম করেছে ভিখারীটা। ভিখারীটারও চোখে তপতী মল্লিকের বয়সের অভিশাপটা ধরা

পড়ে গিয়েছে। এই ভিখারীটাই যে সেদিন অন্ত ভাবায় ভিক্ষে চেয়েছিল—দুটি ভিক্ষে দিন দিদি।

ভিক্ষে পেয়ে কখন চলে গিয়েছে ভিখিরীটা, জানে না তপতী। কে ভিক্ষে দিল, দারোয়ান দীননাথ সত্যিই দীনের ওপর দয়া করে দু'টো চাল ভিখিরীটাকে দিয়েছে কিনা, সে-খবরও রাখে না তপতী। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, ড্রয়িংরুমের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে একটা স্মৃতি-হারানো স্তব্ধ অস্তিত্বের মত নিথর হয়ে বসে আছে তপতী। আর চোখের জল মোছার যে রুমালটা কোলের উপর পড়ে আছে, সেটা এখনও স্যাঁতসেঁতে, ঠোঁটটা এখনও নোনা।

কলেজ যাওয়া হয়নি। দুপুর পার হতে চলেছে। কলেজে যাবার উৎসাহ নেই, ইচ্ছে নেই, শক্তিও নেই বোধহয়। কিন্তু মনটা যেন মরিয়া হয়ে একটা শক্তি পেতে চাইছে, খুব জোর চেষ্টা করছে, ভাবনাগুলিকে ভুলিয়ে দেবার মত একটা শক্তি।

বার বার উঠে গিয়ে আর বই নিয়ে এসে এই চেয়ারের উপরে বসে আর পড়তেও থাকে তপতী। কিন্তু মন ভোলে না। বই-এর কথার মধ্যেও যেন আর কোন শক্তি নেই; তপতীকে বার বার আনমনা করে দিয়ে বইগুলোও যেন তপতীকে একলা করে দিয়ে সেই দুঃসহ শূন্যতারই মধ্যে ঠেলে দিতে চায়। ওয়ার অব রোজেজ—লাল গোলাপের যুদ্ধ···তপতীর প্রিয় ইতিহাসের প্রিয় কাহিনীর প্রিয়তাও যেন একটা নিরর্থক শূন্যতা; ওটা কলেজের এক মাস্টারনীর জীবনের বেশ ভাল তৃপ্তি, খুব ভাল সার্থকতা। কিন্তু তপতী মল্লীকের জীবনে? কিছুই নয়, ভাবনা ভোলাবার মতও নয়।

হাতের কাছের ছোট ডেস্কটার দেরাজ টেনে একটা অ্যালবাম বের করে তপতী।

খানাসামা পাঁচকড়ি এসে বার বার তিনবার ডাক দেয়। সাড়া দিতে ভুলে যায় তপতী। আরও কতক্ষণ পার হয়ে গেল, তা'ও বুঝতে ভুলে যায়। যেন বুঝতে আর ইচ্ছেও করে না। তা না হলে ঘড়ির দিকে আরও একবার তাকাতে পারতো তপতী।

কিন্তু এইবার, এতক্ষণ পরে, ভাবনা-ভোলানো একটা স্বস্তির মধ্যে তপতীর মনটা যেন ডুবে গিয়েছে। চোখ দুটো হেসে হেসে চিকচিক করছে। খোলা অ্যালবামটার পাতার পর পাতা উল্টে কি এমন মধুরতার ছবি দেখছে তপতী, যার জন্যে তপতীর চোখ দুটোতে এরকম একটা পিপাসামধুর নিবিড়তা স্মিত হয়ে ফুটে উঠতে পারে?

অ্যালবামে অনেক ছবি। বাবা আর মা'র ছবি।

অমলদা শ্যামলদা আর বিমলদার ছবি। গ্লাসগোর আনা বউদি, মিশিগানের লিজা বউদির ছবি। ছোট বউদি সরসীর ছবিও আছে।

গতবছর জাকর্তা থেকে যে ফটোটা এসেছে, সেটাও আছে।

হেসে ফেলে তপতী। কি কাণ্ড করেছে সরসী! কিন্তু কি চমৎকার দেখাচ্ছে! সরসীর এই নতুন সাজের চেহারা দেখে কার সাধ্যি বলতে পারে, এটা পটলডাঙার একটি মেয়ের ছবি? এ সরসী যে একেবারে বিশুদ্ধ একটি জাভানীজ তরুণী।

অমলদার তিন ছেলে আর এক মেয়ের ছবি—সিরিল, আলফ্রেড, নোয়েল আর ক্লারা। শ্যামলদার এক ছেলে আর এক মেয়ের ছবি—জুলিয়ান আর আরাবেলা। বিমলদার এক ছেলে—সিরিমন্তো মহীধরো মল্লিক।

সিরিমন্তো অবশ্য বাংলাতেই একটা চিঠি লিখেছে—তুমি আর কলকাতাতে একলা থেক না পিসি, জাকার্তায় চলে এস। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

যাক, সরসী জাভানীজ সাজ-টাজ যাই করুক না কেন, ছেলেটাকে তবু বাংলা শিখিয়েছে।

মিশিগান থেকে আরাবেলাও বছরে অন্তত একটি করে চিঠি দেয়। এই মেয়েটার কথা ভাবতে তপতীর মনটা মাঝে মাঝে বড় উতলা হয়ে ওঠে। মেয়েটা প্রত্যেক চিঠিতে চুমো পাঠায় আর চুমো চায়।

জুলিয়ানটাকে খুব দুরন্ত বলে মনে হয়! ইণ্ডিয়াতে বাঘ শিকার করতে আসবে জুলিয়ান, প্রত্যেক চিঠিতে এই সাধের কথাটা লিখতে ভোলে না। অনুরোধও করে, ডিয়ারেস্ট আন্টি তপতী নিশ্চয় যেন কয়েকটা বাঘের ব্যবস্থা করে রাখে।

সত্যি, একেবারে একটা ফোটা ফুলের মত দেখতে বড়দার ছোট মেয়েটা—ক্লারা। ফটোটাকেই বুকে চেপে চটকাতে ইচ্ছে করে। আনা বউদি এই ক্লারার একটা আবদারের কথা গত মাসের চিঠিতে লিখে জানিয়েছে—আরও এক ডজন কেষ্টনগর চাই। তার মানে কেষ্টনগরের পুতুল—ছোট্ট ছোট্ট এক ডজন হাতি। সিরিল আলফ্রেড ও নোয়েলের দাবি—আরও আমসত্ত। তিন ভাইয়ের জন্য ক্রিস্টমাসের উপহার, এক পাউণ্ড আমসত্ত পাঠিয়েছিল তপতী। তার পরেই একটা ফটো এসেছে, তিন ভাই তিনটি আমসত্ত হাতে নিয়ে হাসছে। ইণ্ডিয়ার গ্রেট পূজা উপলক্ষে তপতীকে এই ফটোটাই উপহার পাঠিয়েছে গ্লাসগো থেকে তিন ভাই।

কে জানে কি মনে হলো, ক্লারার ফটোটাকে একেবারে চোখের কাছে তুলে ধরে আদরের আবেগে সত্যিই কথা বলে ফেলে তপতী। দুষ্টু, ভয়ানক দুষ্টু, তোমাকে একবার কাছে পেলে হয়।

দরজার পর্দাটা হঠাৎ সরে যায়, আর একটা বিস্মিত কৌতূহলের মুখ উঁকি দেয়।

হরেনবাবু এসে ড্রইং-রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। পর্দাটা তিনিই সরিয়েছেন, আর, তাঁর হাতটাও যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পর্দাটাকে শক্ত করে খিমচে ধরে রয়েছে। ভবতোষের বাড়ির ভিতরে এ কেমন কাকলী শোনা গেল? কে কথা বলছে কার সঙ্গে? এ যে কোলের ছেলের সঙ্গে কারও প্রাণের একটা আদুরে মায়ার কাকলী।

কিন্তু না, কিছুই না, ভবতোষের এতবড় বাড়ির ভেতরে শুধু তপতী; তপতী নামে সেই শূন্যতার মূর্তিটাই একা বসে আছে। হরেনবাবুর উজ্জল বিস্ময়ের চোখ দুটো আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

—আসুন কাকাবাবু। ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে আর এগিয়ে এসে হরেনবাবুর হাত ধরে তপতী।

হরেনবাবু বলেন—তুমি তো আমাকে দেখতে গেলে না, কাজেই আমি বাধ্য হয়ে তোমাকে দেখতে এলাম।

তপতীর খুশির মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়। হরেনকাকার গলার স্বর বড় রুক্ষ, যেন বড় কঠোর একটা ভর্ৎসনার শাস্ত বজ্ররব।

ঘরের ভিতরে এসে চেয়ারের উপর বসেন হরেনবাবু।—বুঝেছি আমাকে আবার কার্সিয়ং-এর হোমেই চলে যেতে হবে। তাই এলাম, ভবতোষের খালি বাড়িটাকে শেষবারের মত দেখে নিয়ে চলে যাই।

—একথা কেন বলছেন কাকাবাবু?

—বলতে বাধ্য হলাম তপতী। তুমি আমার আশার কোন সম্মানই আর রাখতে পারলে না। কাজেই···।

তপতীর চোখ দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে। নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দটাও ভীরু হয়ে যেন বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকতে চায়। হরেনকাকার অভিযোগের কাছে দাঁড়িয়ে আর মাথা তুলে কথা বলবার শক্তিটাই চরম ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছে।

—কি? কথা বলছো না কেন তপতী? চুপ করে রইলে কেন?

—মাপ করবেন কাকাবাবু, কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

—নীরু লিখেছিল, সুধাময়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে একরকম ঠিক হয়েই আছে। কিন্তু কই আজ পর্যন্ত তো আর কিছুই শুনলাম না।

—আপনার শোনবার মত কিছুই ছিল না। তাই বোধহয় নীরুদি আপনাকে আর কিছু জানায়নি।

—তার মানে আমার শেষ আশাটাও ব্যর্থ হলো।

তপতী আবার নীরব হয়ে যায়। ভবতোষের বাড়ির দুঃসহ শূন্যতার বেদনাটা যেন এইবার হরেনবাবুর গলার স্বরে ক্ষুব্ধ ধিক্কারের মত গম্ভীর হয়ে বেজে ওঠে। —তার মানে, আমাকে আশা দেবার মত কোন কথা তোমার নেই।

মুমূর্ষু মৌমাছির গুঞ্জনের মত ক্লান্ত-করুণ স্বরে তপতী বলে—আমিই যে আর আশা করতে পারছি না কাকাবাবু।

—বেশ, আমি তাহলে উঠি। লেট গড ব্লেস ইউ।

চলে যেতে যেতেই একবার থমকে দাঁড়ান হরেনবাবু। অ্যালবামটা চেয়ারের উপর থেকে হাতে তুলে নিয়ে চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন।

তপতী এগিয়ে আসে। হরেনবাবু পাশে দাঁড়িয়ে মুখটাকে জোর করে হাসিয়ে নিয়ে, আর, যেন হরেনকাকার কঠোর ভাবনার কষ্টটাকে ভুলিয়ে দেবার একটা

কৌশলকে কাছে পেয়ে তপতী ব্যাকুল হয়ে বলে—ফটোগুলি আপনি কোনদিন দেখেননি কাকাবাবু।

—কিসের ফটো ?

—এই দেখুন।

—কে এটা ?

—ছোড়দার ছেলে সিরিমস্তো মহীধরো মল্লিক।

—বিচিত্র ছেলে। হরেনবাবুর চশমার কাচটা যেন অপ্রসন্ন হয়ে যায়।

—এই দেখুন।

—কে এরা ?

—সিরিল আলফ্রেড নোয়েল আর ক্লারা। বড়দার তিন ছেলে আর এক মেয়ে।

—সাহেব আর মেমের ছেলে-মেয়ে বল। ভবতোষের নাতিনাতনিরা এরকম হয় না। হরেনবাবুর চোখের দৃষ্টিটা রিক্ত হয়ে আর একেবারে রুক্ষ হয়ে কাঁদতে থাকে।

—এই দেখুন, মেজদার ছেলে আর মেয়ে, জুলিয়ান আর আরাবেলা।

হাত তুলে অ্যালবামটাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেন হরেনবাবু—এসব দেখিয়ে আমার ঘৃণা আর বাড়িয়ে তুলো না তপতী।

সরে গিয়ে অ্যালবামটা হাতে নিয়ে কুণ্ঠিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। হরেনবাবু বলেন—এসব হলো ভবতোষের আশার শত্রু যত লিটল্ ফ্লাওয়ার্স ; ওদের আমি চিনি। খুব ভাল করে চিনি।

যেন ভবতোষের কুলনাশা একটা অভিশাপের বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি করে, একটা দুঃসহ ঘৃণা লজ্জা আর ভয়ের সান্নিধ্য থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার জন্যই তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেলেন হরেনবাবু।

॥ পাঁচ ॥

কার্সিয়ং-এর হোমের লনের কিনারায় একটা কাশ্মীরী চেনার। বেশ কিছুদিন আগেই গাছটার মাথা নতুন পাতায় ভরে উঠেছে। পাতাগুলি যেন তাজা সবুজের একটা উৎসবের মত দৃপ্ত পতাকা। সেই তাজা সবুজই ধীরে ধীরে ফিকে হতে হতে আবার যেন কেমন করে নতুন রক্তের মত টকটকে লাল হয়ে গেল। হাওয়া লেগে পাতাগুলি কাঁপে যখন, তখন তাকিয়ে দেখলে চোখেরও ভুল হয়ে যায়, পাতাগুলি যেন আগুন-লাগা জ্বালার রং মেখে হাসছে।

বুঝতে পারেন হরেনবাবু, অনেকগুলি মাস পর হয়ে গিয়েছে। চেনারের পাতার তাজা সবুজ লাল হয়ে যেতেই তো চার মাস সময় লাগলো। তার আগে একেবারে নেড়া ছিল চেনারটা। তারও প্রায় ছ'মাস আগে তিনি এসেছেন। কাজেই একটা বছর যে পার হয়ে গিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

দূরের বরফের গায়ে সন্ধ্যার ম্লান আভা লুটিয়ে থাকে, লনের কিনারায় পায়-

চারি ক'রে বেড়াতে বেড়াতেও হঠাৎ একবার থমকে যান হরেনবাবু। বরফের বুকে সেই ঝিকিমিকি সোনালী উৎসব আর নেই। শেষ হয়েছে উৎসব। এখন শুধু ক্লান্ত আবীরের কান্নাটাই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে লুটিয়ে পড়ছে। তাই দূরের বরফকে এরকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন হরেনবাবু। মনে হয়, ঐ দূরের বরফ আর হরেন-বাবুর এই প্রাণ, মাঝখানে সত্যিই আর কোন দূরত্ব নেই। এই প্রাণের বয়সটা এখন নিতান্তই ধৃষ্টতা। এই হোমের আরামের মধ্যে আর পড়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, চোখ বন্ধ করলে যে সত্যিই সোনালী উৎসবের দিনের মত দিনগুলির ছবি মনে পড়ে যায়। ভবতোষের বিয়ে, লজ্জা পেয়ে ভবতোষের মুখের দিকে তাকাতে না পেরে মাথা হেঁট করে হাসছে জয়া,খোঁপার সঙ্গে গাঁথা একগাদা ধবধবে যূঁইও কেঁপে কেঁপে হাসছে। ঐ তো, ভবতোষই ব্যস্তভাবে আসছে। সত্যিই কি পূর্ণিমার ফটোটা নিয়ে এল ভবতোষ? তবে তো আর রেহাই নেই, বিয়েটা করতেই হয়। কিন্তু···তুমি যে তোমার ফটোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর পূর্ণিমা।

ভুরু কুঁচকে চোখ দুটোকে যেন নিংড়ে নিয়ে আবার পায়চারি করেন হরেনবাবু।

মাঝে একদিন নিঃশ্বাস নিতে অদ্ভুতরকমের একটা কষ্ট পেয়েছিলেন হরেনবাবু। ডাক্তার বললেন—নিশ্চয়ই আবার এমন কোন পুরনো কথা মনে করেছেন, যেটা মনে করতে আপনার খুব খারাপ লাগে।

—হ্যাঁ, একটা পুরনো কথাই বটে।

কে জানে কেন ভবতোষের বাড়িটারই কথা মনে পড়েছিল। ভবতোষ আর জয়ার ব্যর্থ স্বপ্নের একটা প্রকাণ্ড কবরমহলের মত যে বাড়িটা এখনও সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে হয়, এখনই তপতীকে একটা চিঠি লিখে অনুরোধ করতে, বাড়িটাকে তুমিও গিফ্ট্ করে দাও তপতী। তুমি কোন হোস্টেলে গিয়ে ঠাঁই নাও। আর বাড়িটাকে গবর্নমেন্ট যেন শিশুদের একটা হোম করে ফেলেন।

শেষ পর্যন্ত এরকম কোন অনুরোধের চিঠি তপতীকে অবশ্য লিখতে পারেননি হরেনবাবু। শুধু এরকম চিঠি কেন, কোন রকমই চিঠি লিখতে পারেন নি।

আর, আর-একদিন ভাবতে গিয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, এই প্রায় দু'বছরের মধ্যে তপতীর কাছ থেকে একটাও চিঠি এল না। তপতী মেয়েটা কি সত্যিই একটা পাথর? ওর মনে স্মৃতি বলে কোন জিনিস নেই। তা না হলে এমন ক'রে ভুলে থাকে কেন, এই হরেনকাকাই যে ওর বাবা ভবতোষের কাছে ওর মা জয়াকে এনে দিয়েছিল। এই হরেনকাকা যদি সেদিন রাগারাগি করে একটা কাণ্ড না বাধাতো, তবে ভবতোষ ভয় পেত না, বিয়ে করতে রাজিই হতো না, জয়ার

সঙ্গে বিয়েই হতো না, আর জয়া আর যারই মা হোক, তোমার মা হতো না তপতী তুমিই যে হতে না তপতী।

তুমি যে আজ তপতী হতে পেরেছ, এ সত্যটা যে হরেনকাকারই সেদিনের একটা রাগারাগি দাবির সৃষ্টি। কি আশ্চর্য, এহেন আপনজনের কাছে একটা চিঠি লেখবার আগ্রহও তোমার হয় না!

তপতীর কাছে চিঠি লেখবার কোন আগ্রহ হরেনবাবুও আর বোধ করেননি। এখন আগ্রহ বলতে শুধু একটি আগ্রহ, ভবতোষের বাড়িটার কথা যেন আর মনে না পড়ে। মনটাই যেন একটা ধূসর সন্ধ্যার ছায়ায় ভরে গিয়ে আবছা হয়ে যায়, সব স্মৃতি মুছে যায়।

কিন্তু জানেন না হরেনবাবু, সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর উপর এখন ধূসর সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলেও ভবতোষের বাড়িটার ড্রইংরুমের ভিতরে আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর তপতীর মুখের হাসিটাও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যাটা যে ফাল্গুনের সন্ধ্যা, সে সত্য জানালা দিয়ে ঘরের বাইরের দিকে না তাকিয়ে শুধু নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে তপতী। কিন্তু…নিঃশ্বাসের শব্দটা এরকম হয়ে গিয়েছে কেন? প্রাণটাকে এত একলা মনে হয় কেন?

যেন জোর করে, মনের ভিতরের ভয়-দেখানো প্রশ্নটাকে দমিয়ে দেবার জন্য চিঠি লেখে তপতী। আমি ভাল আছি। পর পর চারটে চিঠি লিখে ফেলে তপতী। একটা পটলডাঙ্গাতে সরসীর বাবাকে, একটা গ্লাসগোতে বড়দাকে, একটা মিশিগানে মেজদাকে, আর একটা জাকার্তায় ছোড়দাকে।

নীরুদির গাড়িটা যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বাড়ির ফটকের উপর দাঁড়ায়।

—কেমন আছ তপতী? ঘরে ঢুকেই বেশ উৎসাহের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নীরুদি। তপতীর গম্ভীর মুখটা দেখতে পেয়েও একটুও গম্ভীর হলেন না।

তপতী হাসতে চেষ্টা করে—ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?

—আমিও ভালই আছি। শুধু তোমার কথা মনে পড়লে ভাল থাকতে পারি না।

—কেন?

—তুমি বিয়ে করলে না।

—কেউ যখন বিয়ে করলোই না, তখন আর কি করে বিয়ে হবে বলুন?

তপতীর মুখের দিকে যেন দুটো গভীর কৌতূহলের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন নীরুদি। বোধহয় তপতীর মুখের এই কাতর হাসির অর্থটাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন। এক অভিমানিনী কুমারী প্রৌঢ়ার আক্ষেপের হাসি।

এই রকমের একটি মুখ দেখবার আশা নিয়েই যে নীরুদি এসেছেন। জানতে চান, এখনও, এই পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটা নিয়ে বিয়ে করবার কোন ইচ্ছা আছে কিনা তপতীর।

নীরুদির চোখ দুটো যেন অদ্ভুত একটা সমবেদনার ভারে মায়াময় হয়ে ওঠে।

তপতীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে তপতীর একটা হাত ধরেন নীরুদি। তপতীর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকেন। তারপরেই তপতীকে একটা সোজা সহজ ও স্পষ্ট জিজ্ঞাসার আক্রমণ দিয়ে চেপে ধরেন—ঠাট্টা করো না, সত্যি করে বল তপতী। আমার কাছে সত্যি কথা বলতে লজ্জা কিসের।

—কি বলবো, বলুন?

—বিয়ে করতে চাও?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে তপতী। কোন কথা বলে না। তপতীর প্রাণটাই যেন হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। কিংবা নিঃশ্বাসের একটা প্রচণ্ড লজ্জাময় জড়ত্ব ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জীবনের ইচ্ছাটাকে চিনতে চেষ্টা করছে। সত্যিই ইচ্ছাটা আছে কি নেই?

তপতীর গম্ভীর মুখের উপর এক ঝলক লজ্জাভীরু রক্তের আভা যেন হঠাৎ উথলে ওঠে। মাথাটাও ঝুঁকে পড়তে চায়।

নীরুদি ডাকেন—বল, তপতী।

তপতী—ইচ্ছে তো হয়।

নীরুদি—শুনে সুখী হলাম, বিশ্বাস কর তপতী।

এইবার নীরুদির মুখের হাসিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন নীরুদি। আর এই নিশ্চিন্ততারই আনন্দে গল্প করতে থাকেন। আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকে গত মাসেই অনিমার একটা ছেলে হয়েছে। কী চমৎকার দেখতে বাচ্চাটা। দশ পাউণ্ড ওজন; ক্লিনিকের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন,—এখন এটাই হলো রেকর্ড ওজন। এর আগে যে বাচ্চাটার ওজন রেকর্ড করেছিল, সেটা ছিল সাড়ে ন' পাউণ্ড।

তার পরেই অন্য একটা গল্প বলেন।—তুমি কি তোমার জামাইবাবুর বন্ধু ধরণী-বাবুর নাম কখনো শুনেছ?

—না।

—ধরণীবাবু এখন কলকাতায় আছেন। বেশি দিন থাকবেন না, বড় জোর একটি মাস। এখন পাঞ্জাব গবর্নমেণ্টের সার্ভিসে আছেন। ইরিগেশনের ইঞ্জিনিয়ার। এরকম একটা ভদ্রলোক মানুষ আমি অন্তত কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, ড্রাইভার ধরণীবাবুর বিছানায় শুয়ে আছে, আর পাখা হাতে নিয়ে ড্রাইভারের মাথায় বাতাস দিচ্ছেন ধরণীবাবু।

তপতীর চোখ যেন একটা অদ্ভুত খুশির বিস্ময়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।—বাঃ, আজকাল এরকম মানুষ পৃথিবীতে আছে তাহলে!

নীরুদি—ভদ্রলোক কিন্তু আজ পর্যন্ত বিয়ে করেননি।

তপতীর মাথাটা আবার ঝুঁকে পড়ে।

নীরুদি বলেন—এখন কিন্তু বিয়ে করতে চান।

তপতী যেন গল্পটাকে প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে। কোন কথা না

বলে শুধু একটা হাত তুলে কপালটাকে আস্তে টিপে ধরে তপতী।

নীরুদি—ভদ্রলোক দেখতেও বেশ আর বয়স বোধহয় পঞ্চাশের বেশি হবে না। ধর পঞ্চাশ।

তপতীর কপাল-টেপা হাতটা হঠাৎ চমক লেগে শিউরে ওঠে। নীরুদির মুখের গল্প যেন হঠাৎ শিউরে উঠে তপতীর মৃদু নিঃশ্বাসের ছন্দটাকে একটা রূঢ় আঘাত দিয়েছে। মুখ তুলে আবার কোলের উপর রাখা বইটাকে একহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তপতী। আর, হঠাৎ মুখর হয়ে, যেন নীরুদির এই গল্পটাকে এখানেই স্তব্ধ করিয়ে দিতে চায়।—শুনেছিলাম অনিমার স্বামী নাকি এভারেস্ট-যাত্রী একটা দলের সঙ্গে যাবার চেষ্টা করছে।

নীরুদি—না, সেটা আর হয়ে উঠলো কোথায়? ইংরেজদের দল, ওরা কোন শিক্ষিত ইণ্ডিয়ানকে সঙ্গে নিতে রাজি নয়। সে যাই হোক···তুমি আমার সব কথা শুনলে তো।

—শুনেছি।

—এবার আমি তবে···।

—কি?

—ধরণীবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা নিয়ে।

—ছিঃ।

—তার মানে?

—আপনি ওসব কথা বাদ দিন নীরুদি।

—কেন? ধরণীবাবুর বয়সটার কথা শুনেই কি তোমার ইচ্ছেটা মরে গেল?

নীরব হয়ে হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে থাকে তপতী। নীরুদি গম্ভীর হয়ে বলেন—আশ্চর্য করলে তপতী। তুমিও তো বোধহয় পঁয়তাল্লিশ পার করে দিয়ে বসে আছ।

তপতীর মুখটা যেন হঠাৎ করুণ লজ্জায় অভিভূত হয়ে আস্তে আস্তে বিড় বিড় করে।—আমাকে মাপ করবেন নীরুদি।

করুণ লজ্জা নয়, নীরুদি বোধহয় দেখলেন যে, একটা অকরুণ নির্লজ্জতাই তপতী মল্লিকের সুন্দর মুখটাকে কুৎসিত করে দিয়েছে। নীরুদির গলার স্বরটা একটু ক্ষুব্ধ আর ক্ষমাহীন হয়ে সত্যিই একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী ধ্বনিত করে ফেলে—তা হলে তোমার আর বিয়ে হবে না তপতী, হতে পারে না।

নীরুদি চলে যাবার পর ঘরের ভিতরে চুপ করে, আর, যেন একটু হতভম্বের মত একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। ঠিক মাথার উপরেই পাখাটা খুব জোরে, যেন একটা চাপা আক্রোশের গুঞ্জনের মত শব্দ করে ঘুরছে। ফুরফুর করে উড়ছে তপতীর ভাঙা-খোঁপার চুলের ছোট ছোট গুচ্ছ। কিন্তু কান দুটো যেন বড় বেশি তপ্ত হয়ে উঠেছে, পাখার বাতাসের ছোঁয়া কানের উপরে ফুরফুর করলেও সে-ছোঁয়া

যেন অনুভব করতে পারা যাচ্ছে না।

যাক, তবু বেশ স্পষ্ট করে আপত্তি করতে পেরেছে তপতী। নীরুদির মায়াময় অনুরোধের কাছে হঠাৎ দুর্বল হয়ে গিয়ে, তপতী তার এই সুন্দর চেহারার অনেক আশার স্বপ্নটাকে মিথ্যে করে দিতে রাজি হয়নি। প্রৌঢ় ধরণীবাবু তপতীর জীবন-বাসরের দোসর হবে, প্রস্তাবটা যেন একটা ঠাট্টার বজ্রনাদের শব্দ, একটা শাস্তির আবদার, একটা প্রতিহিংসার আবেদন। তপতীর পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটাকে যেন একটা ভিখিরী মনে করে একটা সান্ত্বনা দান করতে চেয়েছিল নীরুদির প্রস্তাবটা। অসম্ভব! নীরুদির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেন তপতী মল্লিকের আত্মাটাই প্রতিবাদ করেছে।

কিন্তু...বুঝতে পারে তপতী, তপতী মল্লিকের আত্মার এই জোরটাই যেন এইবার ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। কাঁপছে তপতীর চোখের তারা দুটো। হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে যেন দুঃসহ একটা লজ্জা উথলে উঠছে। পাখার গুঞ্জনের মধ্যে যেন একটা ঠাট্টার চাপা গান গুনগুন করছে। ছিঃ, তপতী মল্লিকের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের স্বপ্নটা কোন্ লজ্জায় একটা অল্পবয়সের, নিজের চেয়েও কম বয়সের দোসরতা আশা করে? শুনতে পেলে এই ঘরের বাইরের সারা পৃথিবীর আলো-বাতাস যে হেসে ফেলবে। ভালবাসার মানুষ বাছতে গিয়ে তপতী মল্লিকের প্রাণটা কি এতদিনে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে গিয়ে এমনই বেহায়া হয়ে গেল যে, নিজের চেয়ে কম বয়সের মানুষকেই জীবনের বান্ধব বলে মনে করবার আর মেনে নেবার একটা নতুন সাধের দাবি তপতীর স্নায়ুতে আর ধমনীতে গোপন উৎসের মত কল্লোল জাগিয়ে তুলেছে?

মনে পড়ে, নীরুদি একদিন সুধাময়ের কথাটা বলতে গিয়ে কত দুঃখিত হয়ে আর কাঁদ-কাঁদ চোখ তুলে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তপতীর বয়সের পরিচয় জানতে পেরে সুধাময় ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে, শুনতে পেয়ে তপতীর মুখে একটা মৃদু হাসির বিস্ময় ফুটে উঠলেও বুকের ভিতরে যেন একটা ধিক্কার গর্জে উঠেছিল। সুধাময় নামে সেই ভদ্রলোক যেন ভদ্রজগতের এক অদ্ভুত ক্যানিবালিজ্ম্-এর প্রতিনিধি; মনুষ্যত্বের বয়স খোঁজে না, শুধু মাংসলতার বয়স খোঁজে। ভালই হয়েছে, তপতী মল্লিককে বিয়ে করতে চায়নি সুধাময়। তপতীর জীবনটা যেন এক নরখাদকের নখরাঘাতের অভিশাপ থেকে বেঁচে গিয়েছে। সুধাময়কে সেদিন একটা ঘৃণ্য প্রাণী বলেই মনে হয়েছিল তপতীর।

কিন্তু আজ? আজ তপতী মল্লিকের প্রাণটা এ কী কাণ্ড করে বসে আছে? সন্ধ্যার আকাশ তো সূর্যোদয় দাবি করে না। কিন্তু তপতী মল্লিকের প্রাণের উপর অপরাহ্নের ছায়া ছড়িয়ে পড়লেও তপতীর আশা যেন নবারুণের ছোঁয়া দাবি করছে। সুধাময়ের আপত্তির মধ্যে যে অভিরুচির রূঢ়তা দেখে ঘৃণা বোধ করেছিল তপতী, আজ যে সেই অভিরুচি তপতীর বুকের সব নিঃশ্বাসের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। কত সহজে, একেবারে এককথায়, ধরণীবাবুর মত মানুষের ইচ্ছাকে

সরিয়ে দিতে পেরেছে তপতী। ধরণীবাবু শুধু বয়সে প্রৌঢ়, এ ছাড়া আর কি কোন দোষ ধরতে পেরেছে তপতী? কিছুই না। অথচ বুঝতে অসুবিধা নেই, আর নীরুদিও বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের তপতী মল্লিকের পক্ষে ধরণীবাবুর বয়সটাকে দোষ বলে মনে করা কী অদ্ভুত পরিহাস! সাপের কামড়-খাওয়া মানুষ বিছার কামড়-খাওয়া মানুষকে ঠাট্টা করে, ঘৃণা করে, দুর্ভাগা বলে মনে করে? কি আশ্চর্য!

বুঝতে পারেনি তপতী, কখন দু'চোখ থেকে এত জল ঝরে পড়েছে! কোথায় লুকিয়ে ছিল এত কান্না? কেনই বা এত কাঁদাকাটা? কিসের জন্য?

কী লজ্জা! মনটা যেন বয়সের শাসন মানতে চায় না। কল্পনা করতে যেন তপতীর অন্তরাত্মাই ভয় পায়; তপতীর এই মূর্তিটা এক প্রবীণ স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কি ভয়ানক কল্পনা! এমন জীবন যে জীবনই নয়, জীবনের শেষ অঙ্কের একটা ঘটনার ছবি মাত্র। একটা ক্লান্তিময় অবসর মাত্র।

ভিজে চোখ আবার কখন শুকিয়ে শান্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, তাও বুঝতে পারেনি তপতী। শুধু বুঝতে পারে, আর নয়। আশার লজ্জাটাকে আজ এখনই স্তব্ধ করে দিতে হবে। তপতী মল্লিক আর কোন মুহূর্তের ভুলেও আশা করবে না। তপতীর এই একা-জীবন নিজের গৌরবে শান্ত আর সুখী হয়ে থাকুক। হরেনকাকাকে এখনই শেষ ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে, আর আমাকে ভুল বুঝবেন না কাকাবাবু। আমি আর আশা করছি না। একা থাকতে ভাল লাগছে, সারা জীবন একলা থাকতেই ভাল লাগবে।

চিঠি লেখা শেষ হয়নি, বাইরের বারান্দার সিঁড়ির কাছে কারা যেন কথা বলছে মনে হয়।

এসেছে আলিপুরের ছোটমাসি আর সুলেখা।

ছোটমাসির মাথাটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। আর চোখে এক-জোড়া পুরু লেন্সের চশমাও পরেছেন ছোটমাসি।

ছোটমাসি বলেন—তিনটে বছর প্রায় অন্ধ হয়ে ছিলাম।

তপতী—তাই বলুন।

ছোটমাসি—তার মানে?

তপতী হাসে—তাই একদিনও একটু খোঁজও নিতে পারেননি যে, তপতী বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে।

ছোটমাসি—ঠিক কথা, কিন্তু তুমি তো অন্ধ হওনি। মাসিটা মলো কি গেল, সে-খবর তুমি তো একবার নিতে পারতে।

তপতী—নীরুদির কাছ থেকে আপনাদের সব খবরই পেয়েছি।

ছোটমাসি—আমিও নীরুর কাছ থেকে তোমার খবর পেয়েছি।

তপতী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে ওঠে। কারণ খিলখিল করে হেসে কথা বলছে সুলেখা—তপতীদি যে আমাকে এখনও দেখতেই পাননি

বলে মনে হচ্ছে।

লজ্জিত হয় তপতী—দেখতে পেয়েছি বইকি।

সুলেখা—না, পাননি। দেখতে পেলে এতক্ষণ ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতেন না।

তপতী তবু সেভাবেই শুধু সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুলেখা এইবার মিটিমিটি হাসে, আর মাসিও হেসে ফেলেন।

তপতী—কি হলো? কি ব্যাপার? হাসবার কি হলো?

ছোটমাসি—সুলেখা যে তোমাকে ঠাট্টা করে কথা শোনাচ্ছে, বুঝতে পারছো না?

তপতী—সত্যিই বুঝতে পারছি না।

সুলেখা এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে। ছোটমাসি বলেন—তুমিই দেখছি অন্ধ হয়ে গেছ তপতী। আমার চোখের ছানি গিয়েছে, তোমার চোখে ছানি পড়েছে।

তপতী—কি বললেন?

ছোটমাসি—তা না হলে এতক্ষণেও কি দেখতে পেতে না, সুলেখার কোলে ওটা কে?

সত্যিই তো, সুলেখার কোলে একটা ফুটফুটে গাল-ফোলা ছ'মাসের বাচ্চা, মাথাটা যেন কালো রেশমের মত নরম চুলের স্তবক দিয়ে সাজানো।

—সুলেখার বাচ্চা? হেসে চেঁচিয়ে ওঠে তপতী।

ছোটমাসি—হ্যাঁ।

সুলেখার চোখের তারা দুটো যেন অদ্ভুত এক অহংকারের তারার মত ঝিক-ঝিক করে হাসতে থাকে।—যাক, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হলো, তবে দেখতে পেলেন! তা না হলে বোধহয় দেখতেই পেতেন না।

সুলেখার চোখের তারা দুটো হাসলেও মুখের ভাষাটা যেন ভয়ানক একটা ঠাট্টার চিমটি কেটে কথা বলছে। কিন্তু কেন? তপতীর আচরণে কী অপরাধ দেখতে পেয়েছে সুলেখা?

ছোটমাসি এবার যেন বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়ে, কিন্তু বেশ হেসে-হেসে সুলেখাকেই একটা ধমক দিয়ে সাবধান করে দেন—আঃ, বেচারা তপতীর অত কাছে এসে দাঁড়াসনি সুলেখা, বেবিটা শেষে একটা কাণ্ড করে তপতীর সিল্কের শাড়িটাকে ময়লা করে দিলে···।

সুলেখা হেসে ওঠে—ঠিক কথা। আমি তাহলে একটু সরেই দাঁড়াই।

ছোটমাসি এইবার সুলেখার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।—অত ছটফট করিসনেরে শালা—মেম মাসির কোলে চড়বি, এমন আশা করিস না।

—এসব···কি-রকমের···যত বাজে কথা বলছেন ছোটমাসি। বিড়বিড় করে তপতী। কিন্তু তপতীর চোখে-মুখে যেন একটা দুঃসহ যন্ত্রণার জ্বালা ছমছম করতে

থাকে। ছোটমাসি আর সুলেখার এইসব হাসিভরা ঠাট্টার ভাষা যেন কতগুলি ধিক্কারের প্রতিধ্বনি। তপতীর জীবনের ভুল ধরা পড়ে গিয়েছে, আর সেই ভুলের উপর যেন কতগুলি ঠাট্টার কশাঘাত আছড়ে পড়েছে।

না, দুঃসহ মনে হলে হবে কি? ছোটমাসি আর সুলেখার ভাষা যে কোন মিথ্যের চিৎকার নয়। সুলেখার কোলের ছেলেটাকে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়নি তপতী, এ যে একেবারে বাস্তব সত্য।

হাত বাড়ায় তপতী—দাও সুলেখা, ওকে আমার কাছে দাও। কি নাম রেখেছ?

সুলেখা এবার যেন একটু খুশি হয়ে হাসে। বাচ্চাটাকে তপতীর হাতে তুলে দিয়ে বলে—এখনও কোন নাম হয়নি। যার যা ইচ্ছে সেই নামে ওকে সবাই ডাকে। ভুতো, ভম্বল, জ্যাকল, জমাদার, হাবা, হেরম্ব, অনিন্দ্য, ফেন্‌চু, বাবুই, হর্ষবর্ধন···।

কিছুক্ষণ ড্রইংরুমে, কিছুক্ষণ দোতলার ঘরে, তারপর কিছুক্ষণ ছাদের উপর; শেষে বাগানের চারদিকে ঘুরে ফিরে গল্প করে তপতী, সুলেখা আর ছোটমাসি। এতক্ষণের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও সুলেখার বাচ্চাটাকে কোলছাড়া করেনি তপতী। খানসামা পাঁচকড়ি যখন চা আনে, তখনও বাচ্চাটাকে দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখে গল্প করে তপতী।—জাকার্তা থেকে ছোট বউদির চিঠি এসেছে, বড়দা এখনও গ্লাসগোতেই আছেন···।

ছোটমাসি বলেন—আমি অবিশ্যি একটা উদ্দেশ্য নিয়েও এসেছি তপতী।

গম্ভীর হয় তপতী—বলুন।

ছোটমাসি—নীরুর সঙ্গে আমার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। হয়তো তুমিও শুনে থাকবে আর আমাকে ভুল বুঝে থাকবে।

তপতী—আমি কিছুই শুনিনি।

ছোটমাসি—কথাটা এই যে, নীরু অনর্থক তোমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ইঞ্জিনিয়ার ধরণীবাবুর সঙ্গে···।

তপতী—সে-সব কথা শেষ হয়ে গেছে ছোটমাসি, আপনি জানেন কিনা জানি না।

ছোটমাসি—শেষ হয়ে গেছে মানে? বিয়ে ঠিক হয়েছে?

তপতী—না।

ছোটমাসি—কেন?

তপতী—অসম্ভব।

ছোটমাসি খুশি হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন—ঠিক বলেছ, আমিও নীরুকে এই কথাটা কত করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নীরু বুঝলো না যে, এ বয়সে কোন মেয়ের বিয়ে করে লাভ নেই।

চমকে ওঠে তপতী। ছোটমাসি নিজের মনের খুশিতে বলতে থাকেন—এ

বয়স পরের ছেলে কোলে নিয়ে সুখী হবার বয়স, নিজের ছেলে তো কোলে আসতে পারে না। কাজেই…

তপতী—কি বললেন?

ছোটমাসি—কাজেই এ বয়সে বিয়ে করবার কোন মানে হয় না।

সুলেখার বাচ্চাটা আর একটু হলে তপতীর কোল থেকে বোধহয় পড়েই যেত। ছোটমাসির কথাগুলি যেন তপতীর হাত দুটোকে ভয়ানক একটা হিংস্র অভিশাপের কথা দিয়ে আঘাত করেছে।

সুলেখার কোলে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে দরজার পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকে তপতী।

—এবার চলি তপতী। তুমি চেষ্টা করে যেও একদিন। বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ান ছোটমাসি। সুলেখাও ব্যস্ত হয়ে বলে—চলি তপতীদি।

যেন তপতীর জীবনের হিসাব-নিকাশ করে শেষে একটা শূন্য পাওয়া গেল, এই সত্যটাকেই চেঁচিয়ে বলে দিয়ে চলে গেলেন ছোটমাসি। তপতীকে যদি বলতেন ছোটমাসি, তুমি একটা বুড়ি মাধবীলতা, তুমি একটা পাথরচাপা ঝর্না, তুমি একটা ছন্নছাড়া মেঘ—তবু কথাগুলি একেবারে সব আশা তাড়িয়ে দেওয়া এক ভয়ানক নিয়তির গর্জনের মত শোনাতো না। কিছু আশা থাকতো। দেখেছে তপতী, বাগানের সাত বছরের একটা মাধবীলতা এবার ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। পাথরটা সরে গেলে চাপা ঝর্নার জল উথলে উঠবে। শুধু পাথরটাই দুর্ভাগ্য, কিন্তু ঝর্নার বুকের ভিতরে প্রাণের কল্লোল তো জেগে আছে। সে জাগতে পারে, যদি দুর্ভাগ্যটা সরে যায়। ছন্নছাড়া মেঘ তবু তো মেঘ, সুযোগ পেলেই জল ঝরিয়ে মাটির পিপাসা মিটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ছোটমাসি যে-কথা বলে গেলেন, সেটা যে তপতী মল্লিকের এই মেয়েলী শরীরটার মৃত্যুর কথা। এখনও যে তপতীর এই উষ্ণ দেহটাকে জড়িয়ে যেন একটা সৌরভের আনন্দ খেলা করছে। ভুরভুর করছে সকালবেলার স্নানের সাবানের গন্ধ। কিন্তু ছোটমাসি যেন এই সত্য মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন, ওটা একটা বেঁচে-থাকা শরীরের স্নান-করা তৃপ্তির সুগন্ধ নয়, ওটা একটা মমির গায়ের মশলার সুগন্ধ। তুমি একটা মিথ্যে অস্তিত্ব; সুলেখার কোলের ছেলেটার মত ফুটফুটে একটা প্রাণ সংসারকে উপহার দেবার মত শক্তি তোমার নেই তপতী। তুমি শুধু দেখতে মরুকুঞ্জ, কিন্তু আসলে ছলনা, মরুকুঞ্জের ছবি-মরীচিকা।

ছিঃ, কি বিশ্রী আক্ষেপ করছে, যত এলোমেলো কল্পনা আর ভাবনা। জীবনে কোনদিনও সন্দেহ করতে পারেনি তপতী, এরকম একটা আক্ষেপ তপতীর প্রাণের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। ইতিহাসের অধ্যাপিকা, এত শিক্ষিতা, আর, বস্তুত জ্ঞানিনী বলে ছাত্রীমহলে যে-নারীর এত সুনাম, সে-নারীর মনও এমন আক্ষেপ করতে পারে, শুনতে পেলে ছাত্রীরা যে আশ্চর্য হয়ে যাবে। নারীজাতির

ইতিহাসকে পুরুষজাতির ইতিহাসের চেয়ে অনেক বড় গৌরবের ইতিহাস বলে ব্যাখ্যা করা যার অভ্যাস, সে আজ যেন হঠাৎ আদিমকালের রক্তমাংসের নারী হয়ে ভাবতে শুরু করেছে। নারীজাতির ইতিহাস বুঝি আঁতুড়ঘরের ইতিহাস। ছিঃ, চিন্তার এই দুর্বলতার কথাটা ভাবতেও লজ্জা করে।

বিকেল পার হতে চললো, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মনে হয়, আর দেরি না করে এখনই একবার স্নান করে ফেলতে পারলে, মনের এই ঘিনঘিন ভাবটা কেটে যাবে, শরীরটাও আর ঘিনঘিন করবে না। ছোটমাসির একটা বাজে কথাকে এত বেশি লাই দিয়ে ভাবতে গিয়ে যেন শরীরটাতেই ময়লা মাখিয়েছে তপতী।

হ্যাঁ, হরেনকাকাবাবুর কাছে লেখা চিঠিটাতেএবার আরও কয়েকটা কথা লিখে দিয়ে মুক্তি পেতে পারা যায়। আর দেরিও করে না তপতী। অনায়াসে, যেন প্রাণের এক নতুন অহংকারের আবেগে লিখে ফেলতে পারে—না কাকাবাবু, আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। এতদিন যখন একলা হয়ে থাকতে পেরেছি, তখন বাকি জীবনটাও একলা থাকতে পারবো, থাকতে ভালোই লাগবে।

চাকরটা চিঠি নিয়ে ডাকবাক্সে সঁপে দিয়ে আসবার জন্য যখন চলে যায় তখন আর মাত্র একটা মিনিট ড্রইংরুমের ভিতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। তার পরেই জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে। আর, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সত্যিই যেন জীবনের সব আশার ক্লান্তির ভার হাঁপ ছেড়ে সরিয়ে দিতে পেরেছে তপতী। বুঝতেও পারা যায়, প্রাণটা যেন অনেকদিনের একটা অপমানের চক্রান্তের গ্রাস থেকে মুক্তি পেল এতদিনে।

কিন্তু, এ কী হলো ? তপতী মল্লিকের প্রাণের মুক্তি-পাওয়া আনন্দটাকে যে একেবারে বিস্বাদ করে দিল বাথরুমের মিরর। ঠাট্টা করছে, ধিক্কার দিচ্ছে মিররটা। নিটোল মেয়েলী শরীরের স্বাস্থ্য আর সুন্দরতার একটা প্রতিচ্ছবিকে বুকে ধরে মিররটা যেন মুখ টিপে হাসছে। বোধহয় বলতে চায়, দেখতে এত নিখুঁত আর সুন্দর মেয়েলী হলে হবে কি, ও-দেহ যে একটা সুন্দর অপদার্থ। সুলেখার চোখের তারায় যে গর্বকে আজ ঝিকঝিক করে হাসতে দেখেছো, সে গর্ব তোমার চোখে কোনদিন ঝিকঝিক করে হেসে উঠতে পারবে না।

এতক্ষণ ধরে স্নান করা, এত ধোওয়া-মোছা শরীরটাকেও যেন আবর্জনার ভার বলে মনে হয়। বাথরুমের ভিতর থেকে যেন একটা যন্ত্রণার মূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে তপতী।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আর ইচ্ছা করে না। পাউডারের পাফ আর চিরুনি হাতে তুলে নিতে ভয় করে। বিছানার উপর অলস হয়ে বসে একটা বালিশকে কোলের উপর তুলে নেয় তপতী। আর বুঝতেও পারে চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে বড় বড় কয়েকটা জলের ফোঁটা বালিশের উপর ঝরে পড়লো। এ কী ভয়ানক মৃত্যুর কথা বলে দিয়ে গেলেন আলিপুরের ছোটমাসি। সত্যিই কি তপতী মল্লিকের এই চেহারা নিছক একটা চেহারার পাথর মাত্র ? স্নায়ু নেই ?

ধমনী নেই? রক্তধারা স্তব্ধ করে দেবার অভিশাপ কি সত্যিই এত কাছে এসে পড়েছে?

নীরুদি সেদিন বেশ রাগ করে আর তপতীর জীবনের ইচ্ছাটাকে একটা অসম্ভবের লোভ বলে ঘোষণা করে দিয়ে চলে গেলেন, সেদিন তপতীও কল্পনা করতে পারেনি যে, আর ক'দিন পরে, তপতীর জীবনের এত পুরনো আর এত ক্লান্ত ইচ্ছাটারই উপর একটা নতুন বসন্তের ফুল ফোটানো হাওয়া এমন করে ঝরে পড়বে।

মনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌-এর সংস্কৃত ডিক্সনারির একটা ভল্যুম আর এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে কলেজের গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল জর্জ। শেষ ক্লাসের পড়াবার পালা শেষ করে দিয়ে আর বাড়ি ফেরবার জন্যে একটু ব্যস্ত হয়ে হেঁটে কলেজের গেট পার হতেই চমকে ওঠে তপতী। এ কি? এ যে চেনা মুখ। জর্জ ক্রিস্টফার। ডোরা ডানকানের বিয়ের দিনে যার সঙ্গে শুধু একটু বিনাকথার আলাপ হয়েছিল।

চেহারা দেখে মনে হয় না যে, ওটা সংস্কৃতভাষার একজন রিসার্চ স্কলারের চেহারা। যেন ছবি-আঁকা কিংবা গান-গাওয়া একটা কাঁচা শখের কাঁচা চেহারা। বয়সটাও যে তাই। কলেজের থিয়েটারে রোমিও-জুলিয়েটের রোমিও সেজেছিল যে ডোরা, বোধহয় তার চেয়েও কাঁচা রোমিও দেখাতো, যদি এই জর্জ ক্রিস্টফার রোমিও সাজতো। বয়সটা ত্রিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে।

সন্দেহ হয়, জর্জের সঙ্গে বোধহয় থার্ড-ইয়ারের মেরি কস্টেলো'র কোন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। বোধহয় মনের টানের কোন সম্পর্ক। কলেজের মধ্যে মেরি কস্টেলো মেয়েটাকে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।

আরও একবার চমকে ওঠে তপতী, জর্জের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় কথা বলছে জর্জ, কী অদ্ভুত কথা!—আমি আপনারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

বাংলাতেই কথা বলছে জর্জ ক্রিস্টফার। কিন্তু সেদিন ডোরা ডানকানের বিয়ের দিনে প্রথম সাক্ষাতে ধারণাও করতে পারেনি যে, নমস্কার জানাবার ভঙ্গিটা জানলেও এই জর্জ বাংলা বলতেও জানে। কবে বাংলা শিখলো জর্জ? কেমন করে শিখলো? ও যে সবে মাত্র লণ্ডন ছেড়ে কলকাতায় এসেছে।

জর্জ বলে—সেদিন আপনার সঙ্গে আমার বেশি কথা বলবার সৌভাগ্য হয়নি। তাই বলতে পারিনি, আমি দেশে থাকতেই বাংলা শিখেছি। আর, শুনে আশ্চর্য হবেন, আপনার দাদা শ্রীবিমল মল্লিকের কাছেই আমি বাংলা শিখেছি। আমি যে গ্লাসগোতে দু'বছর ছিলাম।

—আপনি বিমলদাকে চেনেন? তপতীর চোখ-মুখ উতলা করে দিয়ে একটা খুশির হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

—সেই কথাই তো বলছি, বিমলদারই কাছে আপনার কথা শুনেছি। কলকাতায়

এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য ক'দিন ধরে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার আগেই ডানকানদের বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—কিন্তু আপনি তো সেদিন আমাকে কিছু বললেন না।

—আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বলেই আর কোন কথা বলিনি, সেই জন্যেই আজ…।

—এখানে এলেন কেন?

—আপনার বাড়িতেই গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি কলেজে আছেন। তাই …আপনি হয়তো বলতে পারেন…।

—কি?

—আপনাকে এত ব্যস্ত হয়ে দেখতে আসবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু……।

—কি বললেন?

—কিন্তু মাপ করবেন, যদি একটা সত্য কথা সাহস করে বলে ফেলি।

তপতীর বিস্ময়টা এইবার যেন বুকের ভিতরে একটা আতঙ্কের দুরু-দুরু শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে বাজতে থাকে।

জর্জ বলে—আপনাকে দেখতে এত ভাল লেগেছিল যে, এই কটা দিন কোন মুহূর্তে আপনাকে ভুলে থাকতে পারিনি।

চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তপতী এক নিঃশ্বাসে কতগুলি কথা বলে দিয়ে এগিয়ে যায়।—আমি চলি; বিমলদাকে নিশ্চয়ই লিখবো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

জর্জ বলে—কিন্তু, আমি কি এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না?

—মিস্টার ক্রিস্টফার! আপত্তি করবার অসৌজন্যের ভয়টাকে কৌশলে চাপা দেবার জন্য একটা ভীরু হাসি কোনমতে হেসে নিয়ে কি যেন বলতে চায় তপতী। কিন্তু জর্জই বাধা দিয়ে বলে—প্লীজ, আমাকে মিস্টার ক্রিস্টফার বলে ডাকবেন না। আমি আপনার জর্জ।

কিছুক্ষণের মত যেন একটা মূর্ছাময় ভীরুতার আবেশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। তপতী মল্লিকের আপত্তি করবার শক্তিটাই যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আর, আপত্তি করতেও পারে না তপতী।

জর্জেরই পাশে পাশে হেঁটে ভবতোষ মল্লিকের এই বাড়িতে ঢুকে এই ড্রইং-রুমের ভিতরে দুটি কোচের উপর দু'জনে বসে। যেন দুটি ভয়ানক উতলা বিস্ময় বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখে দুটি শান্ত মুখ হেসে হেসে গল্প করতে থাকে।

গল্পগুলি এমন কোন কৌতুকের গল্প নয়; এদেশ আর ওদেশের জল-বাতাসের যত দোষ-গুণের গল্প। তবু, এহেন নিতান্ত যত তথ্যের কথাও যেন দু'জনের হাসির ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। এদেশের বৃষ্টি দেখতে জর্জের খুবই ভাল লাগে।

তপতী হাসে—এদেশের কাদা?

জর্জ—অসম্ভব। এদেশে এসে যা দেখে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি, সেটা হলো কাদা।

তপতী—আপনাদের দেশে কাদা নেই?

—আছে বৈকি। কিন্তু এরকম ভয়ানক কাদা নয়।

তপতী বলে—আপনাদের দেশের শীতটা কিন্তু ভয়ানক।

জর্জ—আমি অবশ্য তাই মনে করি; যদিও অনেকে সেটা মনে করে না। আপনাদের দেশের শীত সত্যিই যেন একটা আশীর্বাদ। কিন্তু…।

তপতী—কি?

জর্জ—আপনাদের দেশের গ্রীষ্ম কিন্তু একটা অভিশাপ।

পাঁচকড়ি খানসামা যখন চা নিয়ে আসে, তখন এই স্মিত হাস্যবিজল্পিত আলাপ আলোচনার একটানা উল্লাসটা একটু আনমনা হবার সুযোগ পায়। জর্জ ক্রিস্টফার চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে; বোধহয় চায়ের পেয়ালার গায়ে আঁকা সাকুরাহানার কুঞ্জটার দিকে তাকিয়ে জাপানী আর্টের কথা ভাবতে শুরু করেছে জর্জ। কিন্তু তপতী মল্লিক যেন এতক্ষণে নিজের দিকে তাকাতে পেরেছে। চমকে ওঠে তপতীর চোখের দৃষ্টিটা। যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে তপতী মল্লিকের এতক্ষণের এই অদ্ভুত রকমের নির্লজ্জ অসতর্কতা। এ কি কাণ্ড করে বসে আছে তপতী। তপতীর প্রাণটা যেন হঠাৎ পাগল হয়ে নিজের বাগানের বেড়া ভেঙে দিয়েছে। তা না হলে, জর্জ ক্রিস্টফারের মত একটা মানুষ আজ এ-বাড়িতে তপতীর এত কাছে বসে আর এত সুখী হয়ে চা খাওয়ার সুযোগ পাবে কেন?

জর্জ হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলে, তাই; তা না হলে তপতী বোধহয় বুকের ভিতরের ভিতরের ভয়াতুর নিঃশ্বাসটার ভয়েই এখনি একটা দৌড় দিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেত।

জর্জ বলে—আমি সংস্কৃত ভাষাকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সভ্য ভাষা বলে মনে করি। আজকের অনেক সভ্য ভাষাই সংস্কৃতের কাছে ঋণী। কিন্তু…।

তপতী—কি বললেন?

জর্জ—কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে ভারত বিদেশের কাছে ঋণী।

তপতী—তার মানে?

জর্জ—ধরুন বৌদ্ধধর্ম। এটা গ্রীস থেকে ধার করা ধর্ম।

তপতী আশ্চর্য হয়—কী অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি!

জর্জ—ঠিক কথা বলছি। গ্রীক পাইথাগোরাসের চিন্তার কাছ থেকেই ধারণা সংগ্রহ করে ভারতীয়েরা বৌদ্ধ মতবাদ তৈরি করেছিল।

তপতী—কোন্ ইতিহাসে একথা লেখা আছে?

জর্জ—তা জানি না, তবে আমাদের দেশের বিখ্যাত স্কলার রিচার্ডসন, যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, এখন তিনি ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক

উপদেষ্টা···যিনি আমাদের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি বলেছেন, একদিন একটা লোক একটা ব্যাঙকে লাঠি দিয়ে মারছিল। আহত ব্যাঙ আর্তনাদ করছিল। পাইথাগোরাস সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকটাকে অনুরোধ করলেন, ব্যাঙটাকে প্রহার করো না। কেন? প্রশ্ন করেছিল লোকটা। পাইথাগোরাস বলেছিলেন, তুমি বুঝতে পারছো না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার এক মৃত বন্ধুর গলার স্বর এই আহত ব্যাঙের আর্তনাদের মধ্যে বাজছে।

তপতী—এতে কী প্রমাণিত হলো?

জর্জ—রিচার্ডসন বলেন, পাইথাগোরাসের এই উক্তিই একটা থিওরি, ট্র্যান্সমাইগ্রেসন অব সোল, আত্মা এক জীবকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জীবের ভিতরে গিয়ে আশ্রিত হয়। বৌদ্ধরা পাইথাগোরাসের এই ভেক-কাহিনী থেকেই জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করেছে।

তপতী হাসে—আপানাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রিচার্ডসনকে ইতিহাস যেন ক্ষমা করে।

জর্জ—আপনি অস্বীকার করছেন? বৌদ্ধধর্ম কি সত্যিই গ্রীস থেকে··· ।

তপতী—বেচারা বুদ্ধ পাইথাগোরাসের এই গল্পটি শুনলে হেসে ফেলতেন।

জর্জ—যাক, বোঝা গেল আপনি রিচার্ডসনের অভিমত পছন্দ করেন না।

তপতী—পছন্দ করা বা না-করার প্রশ্ন নয়।

জর্জ—তবে?

তপতী—আমার বিশ্বাস, রিচার্ডসন হয় পাগল, নয় ভারতবিদ্বেষী।

জর্জ হেসে ওঠে—বিশ্বাসের দেবতা আপনাকে ক্ষমা করুন।

তপতী—অকারণে ঠাট্টা করছেন।

জর্জ—না, ভারতীয়দের মনের সঙ্কীর্ণতা দেখে আমি খুব কষ্ট পাই। তারা একটা কুসংস্কারের জন্য প্রাণ দিতেও পারে; পাণ্ডিত্য আর বিজ্ঞানকে কিছুতেই বিশ্বাস না করাই যেন ভারতীয় মনের ধর্ম।

তপতী—শুনেছি, আপনাদের দেশের রাজ সিংহাসনের সঙ্গে মস্ত বড় একটা পাথর আছে, যার নাম ভাগ্যের পাথর, স্টোন অব ডেস্টিনি।

জর্জ—হ্যাঁ। বড় সুন্দর একটা ঐতিহাসিক পাথর।

তপতী—ঐতিহাসিক তো বটে, কিন্তু আপনাদের বিজ্ঞান কি বলে? পাণ্ডিত্যই বা কি বলে? সত্যিই কি ওটা ভাগ্যের পাথর?

জর্জ—তা জানি না। তবে আমাদের বৈজ্ঞানিক আর পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিছু বলবার দরকার আছে বলে মনে করেন না।

তপতী—তার মানে তাঁরা একটা কুসংস্কারকেই ভালবাসেন?

জর্জ চোখ বড় করে তাকায়—কুসংস্কার?

তপতী—হ্যাঁ মিস্টার ক্রিস্টকার। ওটা যে একটা কুসংস্কারের পাথর।

জর্জ—বুঝলাম, আপনি বিদেশবাসীর একটা রোমান্টিক ধারণাকেও কুসংস্কার

বলে মনে করেন।

তপতী—রোমাণ্টিক কুসংস্কারকেই কুসংস্কার বলে মনে করি, রোমাণ্টিক ধারণাকে নয়।

জর্জ—আপনি তর্ক করতে খুব পটু।

তপতী—আপনি যুক্তি স্বীকার না করতে খুব পটু।

জর্জ—এরই মধ্যে আপনি আমার এত বড় একটা অপরাধ আবিষ্কার করে ফেললেন?

বড় বেশি বিমর্ষ হয়ে, আর কেমন যেন করুণ হয়ে গিয়ে, মৃদুস্বরে কথা বলে জর্জ।

তপতী হঠাৎ অপ্রস্তুতের মত, আর যেন একটু লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়—আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার কোন অপরাধ আবিষ্কার করবার জন্য আমার কোন সাধ নেই। আমি শুধু তর্কের জন্য তর্ক করেছি।

জর্জের মুখটা যেন তপতীর এই সামান্য সান্ত্বনাতেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে।—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এদেশকে ঘৃণা করবার জন্যে এদেশে আসিনি। অনেক আশা নিয়ে এসেছি। ইচ্ছে আছে, অন্তত একটা বছর সংস্কৃত ভাষা নিয়ে রিসার্চ করবো।

তপতী—তারপর?

জর্জ—তারপর দেশে ফিরে যাব।

তপতী কি-যেন বলতে চেষ্টা করে। জর্জ তার আগেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়, জানালার বাইরে সাদা ফুলে ভরা যে গাছটাকে দেখা যায়, সেটার দিকে যেন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে জর্জ।

তপতী—কি দেখছেন?

জর্জ—এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি।

তপতী—কি?

জর্জ—এতক্ষণ ধরে বাতাসে যে সুগন্ধ অনুভব করছিলাম, সেটা ঐ ফুলেরই গন্ধ বোধহয়।

তপতী—হ্যাঁ।

জর্জ—তাই বলুন। আমি মনে করেছিলাম, আপনারই চুলের গন্ধ।

চমকে ওঠে তপতী। জর্জ যেন নিজের মনের আবেগে বলতে থাকে।—এখন বুঝতে পারছি, বাজে প্যারিসিয়ান হেয়ার অয়েলের গন্ধটা এতক্ষণ ধরে আপনার খোঁপা থেকেই আসছিল।

তপতী মল্লিকের মুখের দিকে আরও অদ্ভুত রকমের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থেকে জর্জ বলে—যাই বলুন, ঐ সাদা ফুলের সুগন্ধটা যদি আপনার খোঁপাতেও থাকতো, তবে আপনাকে আরও কত সুন্দর বলে মনে হতো।

তপতী মল্লিকের হৃৎপিণ্ডটাই বোধহয় ভয়ে আর লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে যায়। জর্জ তেমনিই মুখর হয়ে বলতে থাকে।—ভারতীয় ফুলের চেয়ে মিষ্টি গন্ধ কোন দেশের

ফুলে নেই। এটা আমি জোর করে বলতে পারি। আপনি কেন মিছিমিছি বিদেশের ফুলের গন্ধের তেল মাথায় মাখেন ?···আচ্ছা চলি।

বারান্দার সিঁড়ির মাত্র তিনটে ধাপ জর্জের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে পার হয়ে তপতী মল্লিকের মূর্তিটাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তপতীর অন্তরাত্মা বোধহয় এই স্তব্ধতা সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে ওঠে। চলে যাচ্ছে জর্জ। চেঁচিয়ে ডাক দেয় তপতী।—আবার কবে আসছো জর্জ ?

থমকে দাঁড়ায় জর্জ। পিছু ফিরে তাকায়।—আসতে বলছেন ?

তপতী—নিশ্চয়।

জর্জ বলে—তাহলে কালই আসবো।

চলে গেল জর্জ। আর তপতীও যেন একটা বিস্ময়ের সৌরভে অভিভূত সত্তার মত আস্তে আস্তে হেঁটে উপরতলার ঘরের দিকে চলে যায়। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে গিয়েই দেখতে পায়, কি-ভয়ানক লালচে হয়ে গিয়েছে তপতী মল্লিকের মুখটা। সত্যিই যে, প্যারিসিয়ান হেয়ার অয়েলের গন্ধটা একটুও ভাল লাগছে না। কিন্তু···ভগবান জানেন, কামিনী ফুলের গন্ধ মেশানো হেয়ার অয়েল ভূ-ভারতে কোথায় পাওয়া যায়।

কালই আবার আসবে জর্জ। ছি-ছি, এ কি হলো! জর্জের অঙ্গীকার যেন তপতী মল্লিকের অদৃষ্টের চারদিকে একটা আশার অঙ্গীকার হয়ে গানের সুরে গুনগুন করছে। এত তর্ক হলো, কথায় কথায় কত অমিল ধরা পড়ে গেল, তবু যে জর্জকে ভাবতে ভাল লাগছে!

আর এমন কোন একটি দিনও বাদ যায়নি, যেদিন জর্জ এই বাড়িতে না এসেছে। না, আজ আর তপতী মল্লিকের জীবনের যত ভীরুতার, লজ্জার আর সাবধানতার স্মৃতিটুকুও নেই। সবই ভুলে গিয়েছে তপতী, ভাগ্যটাই যে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। দু'জনের মধ্যে যে অমিল, সেটা যে দুটো মহাদেশের অমিল, তাও বুঝতে ভুলে গিয়েছে তপতী। দু'জনের বয়স দুটো যে কত বড় অমিল সেটা তো মনেই পড়ে না। বরং তপতীর চোখের তৃপ্তিবিহ্বল দৃষ্টিটা চোখে পড়লে মনে হবে, তপতীর পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়স এই অমিলেরই জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল। জর্জের ভালবাসা যেন তপতীর বয়স্ক লজ্জাটাকেই একটা গর্ব করে তুলেছে। কত মিথ্যে হয়ে গেল নীরুদির ভবিষ্যদ্‌বাণী।

কথায় কথায় তর্ক উঠেছিল একদিন। তর্কটা বড় বেশি তপ্তও হয়ে উঠেছিল। তপতীর মুখের ভাষাও সেদিন যেন সব সংযম হারিয়ে একেবারে বিদ্রোহের আর ধিক্কারের ভাষা হয়ে বেজে উঠেছিল। জর্জ একটুও বিচলিত না হয়ে, তপতীকে কটুভাষার আঘাতে জর্জরিত করেছিল। কি-ভয়ানক অহংকারের ভঙ্গিতে কথা বলেছিল জর্জ।—তুমি ইতিহাসের অধ্যাপিকা হতে পার, কিন্তু ইতিহাসের কিছুই

বোঝ না।

তপতীর চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।—কি বললে ?

জর্জ—তুমি অকারণ একটা পলাশীর যুদ্ধ বাধিয়ে আমাদের ভালবাসার শান্তি নষ্ট করতে চাইছো।

তপতী—তবে স্বীকার কর, তুমি একটি ক্লাইভ দি অ্যাডভেঞ্চারার, শুধু লুঠপাট করবার জন্যে এদেশে এসেছো।

জর্জ—মিথ্যে কথা।

তপতী—খুব সত্যি কথা, তা না হলে তুমি একেবারে নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে কস্টেলোদের বাড়িতে যাও কেন ?

জর্জ—মিস্টার কস্টেলো জানেন, কেন যাই।

তপতী—মেরি কস্টেলোও জানে, কেন তুমি ওদের বাড়িতে যাও।

জর্জ—জানে। মিস্টার কস্টেলো আমাকে হিব্রু ভাষা শিখতে সাহায্য করেন, একথা সে-ও জানে।

তপতী—তুমি যে মেরির সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে ভালবাস, সেটাও বোধহয় মেরি জানে।

জর্জ—সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে যে আমি ভালবাসি, সেটা তো তুমিও জান। তা না হলে তোমার মুখের দিকে··· ।

তপতী—আগে তাই জানতাম, কিন্তু এখন জানতে পারছি, আমার ধারণা ভুল।

জর্জ—তোমার সন্দেহটাই ভুল।

তপতী—একটুও ভুল নয়। ভালবাসা তোমার কাছে একটা অ্যাডভেঞ্চার মাত্র। যখন যেখানে সুবিধা··· ।

জর্জ—সাবধানে কথা বল তপতী।

তপতী—তুমি দ্বিতীয় ক্লাইভ, এদেশকে অপমান করতে এসেছ।

জর্জ—তোমার দেশ নিজেকে অপমানিত করবার জন্য ক্লাইভকে কাজে লাগিয়েছিল। ক্লাইভের দুর্ভাগ্য যে, সে এদেশে এসেছিল।

তপতী—তার মানে ?

জর্জ—ক্লাইভের চরিত্রকে তোমার দেশই খারাপ করেছিল।

তপতী—কোন্ মূর্খ বলেছে একথা ?

জর্জ—আমি বলছি, আমি, একজন মূর্খ হয়েও তোমার দেশের অনেক পণ্ডিতদের চেয়ে কম মূর্খ। যে বিদেশী এদেশে আসে, তাকে তোমরাই তোমাদের হীনতা দিয়ে আগে খারাপ করে দাও। তাকে দিয়ে নিজের ঘরে আগুন লাগাও, তারপর তাকেই গালি দিয়ে বল অত্যাচারী, দস্যু, শঠ··· ।

তপতী—তার মানে ক্লাইভ একজন সেণ্ট ছিলেন ?

জর্জ—ক্লাইভ ছিলেন ক্লাইভ। একটা বাজে ইংরেজ, একটা সাধারণ খারাপ মানুষ। কিন্তু তোমার দেশ তাকে আরও খারাপ করেছিল।

তপতী—তুমি তাহলে মেরি কস্টেলোদের বাড়িতে যাবেই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ ?

জর্জ—যতদিন দরকার থাকবে, যাবই। তোমার গালাগালিতে ভয় পাব না।

তপতী—তোমার গালাগালিতে কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি।

জর্জ—তারপর ?

তপতী—তারপর তুমি বুঝে দেখ।

জর্জ—আমি আর এখানে আসবো না ?

তপতী—আমার ইচ্ছে, মেরি কস্টেলোকে বিয়ে করে তারপর এস।

জর্জ—কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, আজই তোমাকে বিয়ে করে মেরি কস্টেলোদের বাড়িতে একবার বেড়িয়ে আসি।

তপতী—জর্জ।

জর্জ—তুমি আমাকে জব্দ করতে পারবে না তপতী। তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও আমি ভালবাসবো।

তপতীর দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে টলমল করে।—আমাকে অপমান করবে না জর্জ, প্রতিজ্ঞা কর।

জর্জ বলে—আমাকে এমন সন্দেহ করো না তপতী। এতে যে আমাকে অপমান করা হয়।

তপতীর চোখের জলই যেন হেসে ওঠে। কী সুন্দর দেখতে লাগছে জর্জের এই করুণ মুখটা। আর, জর্জের এই করুণ মুখের ভাষাতেও কী স্নিগ্ধ সান্ত্বনা!

তপতীকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে জর্জ, যেন একটা স্বপ্নময় আশাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

জর্জ বলে—এ কি! তোমার খোঁপাতে এ কোন্ ফুলের তেলের গন্ধ ?

তপতী বলে—চামেলী।

কার্সিয়ং-এর নার্সিং হোম। তপতীর চিঠিটা বার বার তিনবার পড়েছেন হরেনবাবু। প্রথম দিন চিঠি পড়া শেষ হবার পর অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ হয়ে আর চোখ বন্ধ করে ইজি-চেয়ারটার উপর যেন একেবারে এলিয়ে পড়েছিলেন ; যেন তাঁর চোখ দুটো এতদিন পরে তাঁর সাধের আশার ছবিটাকে দেখতে পাওয়ার সব ভরসা ছেড়ে দিয়েছে। তপতী বিয়ে করবে না। ভবতোষের বাড়িটা শুধু একটা দালান হয়ে পড়ে থাকবে—ওটা আর মানুষের কলরবের বাড়ি হয়ে জেগে উঠবে না।

তপতীর চিঠিটার মধ্যে যেন একটা আর্তনাদ নীরব হয়ে রয়েছে ; ভাষার রকম দেখে সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

কেন মিছে আর এই আর্তনাদ! খুব ভুল করেছ তপতী—সারা জীবন ধরেই ভুল করে এসেছ। কাউকে আপন করে নিতে পারলে না, কারণ তুমি কাউকে

আপন করবার নিয়মটাই জান না ; যদিও তুমি এত শিক্ষিতা আর এত রোমান্সের সাহিত্য পড়েছ। নিয়মটাই বা তুমি জানবে কি করে ? তোমার যে সে মনই নেই। এত বাছাই করে কি জীবনের দোসর পাওয়া যায় ? খুঁত ধরতে গেলে শিবঠাকুর মশায়ও বোধহয় উমার মনপ্রাণ আর চেহারাটার মধ্যে অনেক খুঁত ধরে ফেলতে পারতেন। শিবস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্যঃ—উমার অধর সুষমা লক্ষ্য করে যোগী শিবের মনও তাহলে আর ধৈর্য হারিয়ে ফেলতো না ; কবি বাজে কল্পনা করেন নি।

কিন্তু ভবতোষের এই মেয়েটি কী সাংঘাতিক ধৈর্যের মেয়ে। শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। শুধু পরীক্ষা আর পরীক্ষা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু চেষ্টা করে পার করে দিতে পেরেছে। নির্ভয়ে ভালবাসতে পারা যায়, এমন কোন মানুষকেই দেখতে পেল না। এত সাংঘাতিক ধৈর্যের ফল শেষে এই দাঁড়ালো, এই চাপা আর্তনাদের চিঠি। ধৈর্যের উপহার, একলা হয়ে পড়ে থাকবার একটা জীবন।

কিন্তু তুমি তো সে গল্প শুনেছিলে তপতী। তোমার বাবা যে জয়াকে শুধু একবার চোখে দেখেই প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল, জয়াকে বিয়ে করতে হবে। ভবতোষ কি জয়াকে পেয়ে সুখী হয়নি ? না, ভবতোষকে পেয়ে জয়া সুখী হয়নি ? অমন সুন্দর ভালবাসার জীবন পাওয়া ক'টা স্বামী-স্ত্রীর সৌভাগ্য হয়েছে ?

যাক, যখন চরম পরিণাম বুঝতে পেরেছ তপতী, তখন আমার আর কিছু বলবার নেই। এখন শুধু ভেবে দেখ, ভবতোষের বাড়িটাকেও একটা শিশু-হোম করে দিলে কেমন হয় ? তুমি একটা মেয়ে-হোস্টেলে গিয়ে ঠাঁই নিয়ে আর কলেজের ছাত্রী পড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দাও। ভবতোষের বাড়িটাকে গবর্নমেন্টের নামে গিফট্ করে দাও, যেন সেখানে দেশের অনাথ শিশুদের একটা আশ্রম গড়ে তোলেন গবর্নমেন্ট। হ্যাঁ, একটি শর্ত রেখে দানের ডীড তৈরি করবে—বিলিতী রক্তের ছোঁয়া আছে, এমন কোন শিশু যেন সেখানে ঠাঁই না পায়।

বোধহয় তপতীর কাছে চিঠি লেখবারই জন্যে চেয়ারের উপর ধড়ফড় করে নড়ে বসেন হরেনবাবু, চোখ মেলে তাকান।

বুঝতে পারেননি হরেনবাবু, ডাক্তার ভদ্রলোক কখন এসে এত কাছে দাঁড়িয়েছেন।

ডাক্তার একটু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করেন—আজ কি একটু বেশি কাহিল বোধ করছেন ?

হরেনবাবু—কই ? সে-রকম বিশেষ কিছু বোধ করছি না। তবে কাহিল তো হয়েই আছি। বয়সটা কাহিল, প্রাণটা কাহিল, আর আশাটাও কাহিল।

ডাক্তার—আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, আপনি যেন একটা দুঃখ চেপে কথা বলছেন।

—কি বললেন ? দুঃখ চেপে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা, নিতান্ত ভুল বলেননি। জীবনের একটা শূন্যতা সহ্য করতে খুবই কষ্ট হয়েছে। সে শূন্যতা দূর করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। মনটাকে নতুন করে তৈরি করে নিয়েছিলাম, খুব আশাও করেছিলাম, সে শূন্যতা একদিন কেটে যাবে; কিন্তু…কাটলো না।

"আমার কেউ নেই ডাক্তার। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, তখন আমার বয়স তোমার চেয়েও কম। আমার প্রথম সন্তান প্রাণহীন হয়েই পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল। আর আমার স্ত্রী সেই প্রাণহীন ছেলেকে শুধু একবার চোখে দেখে নিয়েই চিরকালের মত চোখ বন্ধ করেছিল। সে আর হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে আসেনি।"

"আমি কিন্তু দমে যাইনি, ডাক্তার। আমার ঘরে ছেলে এল না; আমার ঘরে আমার সংসার-সুখের কলরব জাগলো না, কিন্তু সে-জন্যে চুপ করে পড়ে থাকিনি। আমার বাড়িকে পরের ছেলে-মেয়েতে ভরে দিয়েছি।"

ডাক্তার চোখ বড় করে তাকায়—তার মানে…।

হরেনবাবু মৃদুভাবে হাসেন—তার মানে ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়েরা বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখে।

ডাক্তার হাসেন—দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছেন। বেশ ক্লেভার কম্প্রোমাইজ। ভাড়াও পাচ্ছেন, অথচ…।

হরেনবাবু—না ডাক্তার, ভাড়া এমন কিছু পাই না। তা ছাড়া, ওরা নিয়ম মত ভাড়া দিতেও পারে না। যা দেয়, তাই…।

ডাক্তার যেন একটু লজ্জিত হয়ে বলে—তাই বলুন!

হরেনবাবু—বাড়িটাকে অবিশ্যি দান করে দিয়েছি ডাক্তার; আর ব্যাঙ্কের খাতায় যা-কিছু আছে, তাও সব দান করে দিয়েছি। আমি যখন থাকবো না, তখন গবর্নমেন্ট আমার ঐ বাড়িটাকে একটা শিশু-আশ্রম করে নেবে; আমার সব টাকা ও-কাজেই গবর্নমেন্ট খরচ করবে।

ডাক্তার এবার বিস্মিত হয়ে, আর যেন অপরাধীর মত বেশ একটু অনুতপ্ত হয়ে, যেন মার্জনা চাইবার ভঙ্গিতে কথা বলে।—তাই বলুন, তাই বলুন। আমি আপনাকে ভুল করে বেশ একটু ভুল বুঝে ফেলেছিলাম। আপনি সত্যিই মহৎ কাজ করেছেন।

হরেনবাবু—চালাক জোচ্চোরের মত নয়, তবে চালাক ফিলসফারের মত একটা কাজ করেছি বটে। কিন্তু দেখলাম, ওতে পেট ভরছে না, ডাক্তার। দুধের সাধ ঘোলে মেটে না। আমার বাড়িটা যদি পৃথিবীর সব শিশুর বাড়ি হয়ে যায়, তবুও মনে হচ্ছে, ওর মধ্যে আমি যেন নেই। তার মানে, নিতান্ত আমার মায়া বলে কোন সত্য ওর মধ্যে নেই।

ডাক্তার—কিন্তু আপনার মত উদার মানুষের মনে এরকম ভাব থাকা তো উচিত নয়।

হরেনবাবু হাসেন—উচিত নয় কিনা জানি না। কিন্তু না থাকলে মন্দ হতো না। তাহলে একটা শূন্যতার পাল্লায় পড়তে হতো না।

ডাক্তার—আপনার নিজের ছেলে-মেয়ে যখন নেই, তখন আর আপন সংসার নামে একটা মায়ার ছবি···অর্থাৎ···আমি ফিলসফি বুঝি না স্যার···তাই বুঝিয়ে বলতে পারছি না···তাহলে আপনাকে একটু শূন্যতা ভুগতেই হবে।

হরেনবাবু—তবু, আর একটা চেষ্টা করেছিলাম ডাক্তার। এটা ঠিক দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মত ক্লেভার কম্প্রোমাইজ নয়। বলতে পার, পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া। অর্থাৎ, আমার বন্ধু ভবতোষের ছেলে-মেয়েগুলোকে আমার ছেলে-মেয়ের মত আপন বলে ভেবে নিতে পেরেছিলাম। আর আশাও করেছিলাম যে, ভবতোষের বাড়িতেই···অর্থাৎ আজ আমার এখানে এসে এই নার্সিং-হোমে পড়ে থাকতে হতো না ডাক্তার, আমি আজ ভবতোষের বাড়িতে বসে যত নাতি-নাতনীর ভীড়ের মধ্যে বসে···হ্যাঁ, একটা আপন মায়ার সংসারের স্বাদ পেতে পারতাম। কিন্তু হলো না। ভবতোষের মেয়েটিও শেষ পর্যন্ত বিয়েই করলো না।

ডাক্তার—ভবতোষবাবুর ছেলেরাও কি···।

হরেনবাবু—না, তারা বিয়ে করেছে। কিন্তু···তারা ভবতোষের আশাটাকে, ভবতোষের স্ত্রী জয়ার সাধের স্বপ্নটাকে, আর আমার শুভেচ্ছার দাবিটাকেও অপমান করেছে। তারা আমাদের জাতিটাকেই অপমান করেছে ডাক্তার!

ডাক্তার—কিছুই বুঝলাম না স্যার।

হরেনবাবু—ভবতোষ আজ আর বেঁচে নেই, ভবতোষের স্ত্রী জয়াও নেই, তাদের তিন ছেলে এখন বিদেশে থাকে। এক একজন বিদেশিনীকে ওরা জীবন-সঙ্গিনী করেছে। ছেলেপুলেও হয়েছে। ভবতোষের বাড়িটা শূন্য।

ডাক্তার—দুঃখের কথা বটে।

হরেনবাবু—ভবতোষের বাড়িটা শূন্য হয়ে গেল, এটাই আমার দুঃখের একমাত্র কারণ নয় ডাক্তার। ভবতোষের তিন ছেলে, যাদের আমি নিজের ছেলের মত আপন-জন বলে মনে করতাম, তারা যদি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে বাড়িটাকে শূন্য করে দিত, তবে আমার কষ্ট হতো ঠিকই, কিন্তু অপমানিত বোধ করতাম না।

ডাক্তার—আজ্ঞে?

হরেনবাবু—অপমানিত বোধ করতাম না। আমার বন্ধু ভবতোষ জীবনে এক-বার মাত্র অপমানিত হয়েছিল, ঐ শ্বেতচর্মা এক বিদেশিনীরই কাছে।

—আজ্ঞে? ডাক্তারের কৌতূহল যেন দপ্ করে চমকে উঠেছে।

—না, প্রেম-টেমের অপমানের ব্যাপার নয়, মনুষ্যত্বের অপমান। ভবতোষ বেচারার মনুষ্যত্বকে কি-ভয়ানক ঘৃণায় অপমান করেছিলেন সেই ইংরেজ মহিলা। ···ব্যাপারটা হলো, ভবতোষের বয়স তখন কুড়ি-বাইশ হবে। এক ইংরেজ সাহেবের অফিসে তখন চাকরি করতো ভবতোষ। বড় সাহেবের নাম মিস্টার টেম্পল্। একদিন বড় সাহেবের বাড়িতে ফাইল পৌঁছাতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল

ভবতোষ, মিস্টার টেম্পলের মেয়েটা···ফুটফুটে সুন্দর একটা ছ'বছর বয়সের মেয়ে··· ফুলের টবের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভবতোষটা খপ্ করে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়েছিল। কিন্তু···

হরেনবাবুর শিথিল ভুরু দুটো হঠাৎ যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে।—মিসেস টেম্পল্ হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে ভবতোষের দিকে কটমট করে তাকিয়ে যেন একটা হুংকার ছাড়লেন—নেটিভের কী দুঃসাহস। তোমাকে একটা গ্রেট মূর্খ বলে মনে হচ্ছে, তাই তোমাকে ক্ষমা করলাম। তখুনি সাবান জল দিয়ে মেয়েটার মুখ ধুয়ে দিয়ে, তোয়ালে দিয়ে বারবার মুছে আর ইউকালিপটাস তেল মাখিয়ে···আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না ডাক্তার। মেয়েটার মুখে জুতোর কাদা লাগলেও মিসেস টেম্পল্ বোধহয় এতটা আতঙ্কিত হয়ে মেয়েটার মুখটাকে ধোয়া-মোছা করতেন না।

ডাক্তার স্তব্ধভাবে বিড়বিড় করে—কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ।

হরেনবাবু—সাংঘাতিক হলো ওদের গায়ের রক্ত। অহংকার আর ঘৃণা ওদের রক্তে থৈ-থৈ করছে। শুধু আমাদের ভবতোষকে নয়, এই ভারতের সব ভবতোষ-কেই ওরা পশুর চেয়েও নিচু প্রকারের জীব বলে মনে করে।

হরেনবাবু হঠাৎ হেসে ফেলেন—কিন্তু ভবতোষের ওপরেও সেদিন বেশ রাগ হয়েছিল।

ডাক্তার—হবারই কথা। সাহেবের মেয়েকে আদর করবার লোভটা ওর না হলেই ভাল ছিল।

হরেনবাবু—না, সে জন্যে নয়। রাগ হয়েছিল এই কারণে যে, মিসেস টেম্পলের কাণ্ড দেখেও ভবতোষটা একটুও রাগ করেনি। বরং, বেহায়ার মত কি বলেছিল জান?

ডাক্তার—কি?

হরেনবাবু—ভবতোষ বললে, আমি কিন্তু মুখ ধুয়ে ফেলতে পারবো না হরেন। চুমোর স্বাদ মুখে লেগে থাকুক।

হেসে ফেলে ডাক্তার—তারপর?

হরেনবাবু—তারপর আর কি? আমার কাছে যে সব গালাগালি শুনেছিল ভবতোষ, সে রকম কড়া গালাগালি আমি জীবনে কাউকে দিই নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার এত শক্ত শক্ত কথা আর গালাগালির উত্তরেও ভবতোষ শুধু হেসেছিল—ওরকম অদ্ভুত হাসিও আমি কখনও দেখিনি।

ডাক্তার—সত্যি অদ্ভুত।

হরেনবাবু—সে-সময় আমার সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল, পড়বার জন্য অক্সফোর্ড যাব। কিন্তু···সেই দিনেই প্রতিজ্ঞা করলাম, যাব না। যে জাত আমাদের এত ঘেন্না করে, সে-জাতের দেশে যেতে আমিই বা ঘেন্না করবো না কেন?

হরেনবাবু হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে আবার যেন আনমনার মত দূরের কুয়াশার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা আবার হঠাৎ কেঁপে উঠেই যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—আমিও সে-সময় আইন পাশ করে এক সাহেবের ফার্মে চাকরি করছিলাম। কিন্তু চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ডাক্তার—রাগ করে?

হরেনবাবু—রাগ করে তো বটেই, আরও একটা কাণ্ড দেখে। একদিন আসানসোলের রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই কাণ্ডটা দেখেছিলাম। থার্ড ক্লাসের একটা কামরার ভিতরে তীর্থযাত্রিনী বুড়িদের একটা ভিড় ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছিল, আর সব কামরাতেও ভিড় ছিল। একদল গোরা সোলজার ঐ ট্রেনে জায়গা নেবার জন্য এ-কামরা থেকে সে-কামরার দরজায় উকিঝুঁকি দিয়ে ছুটো-ছুটি করছিল। খুব রেগে উঠেছিল গোরারা। এক জন স্টেশনমাস্টারের অফিসের দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে গিয়ে ঝগড়া বাধালো। স্টেশনমাস্টার বিড়বিড় করে কি বললেন, শুনতে পাইনি। কিন্তু দেখলাম, গোরা সোলজারের দল সেই তীর্থযাত্রিনী বুড়িদের কামরার ভিতরে ঢুকে আর লাথি মেরে সব পোঁটলা-পুঁটলি ফেলে দিল। বুড়িরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেও গোরারা বুড়িদের গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে নামিয়ে দিল। আমি সহ্য করতে না পেরে একটা গোরাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলাম। পুলিশ তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল, আর আদালতে আমার তিনশো টাকা জরিমানাও হয়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে দুঃসহ ব্যাপার কি হয়েছিল জান, ডাক্তার?

—বলুন, শুনি।

হরেনবাবু—ভবতোষ আমার এই লাঞ্ছনার ঘটনার সব রিপোর্ট শুনেও হেসে ফেলেছিল।

—কেন?

হরেনবাবু—ভবতোষ বললো, গোরা সোলজারগুলোর উপর আগে রাগ না করে, স্টেশনমাস্টার করালীবাবুর উপরেই আগে তোমার রাগ করা উচিত ছিল।

—কেন?

হরেনবাবু—ভবতোষ বললে, আমি ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিনি, তবু বুঝতে পারছি, করালীবাবু পরামর্শ না দিলে গোরা ব্যাটারা বোধহয় বুড়িদের কামরায় ঢুকে ওরকম ইতরতা করতো না।

হেসে ফেলে ডাক্তার—ভবতোষবাবু সব ব্যাপার একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতেন?

হরেনবাবু—মোটেই না। ইংরেজ জাতের কোন দোষ ধরতে ভবতোষের যেন সাহসে কুলতো না। এটাই ছিল ওর চরিত্রের সবচেয়ে বড় ভুল। আমি কিন্তু··· সত্যি কথা বলতে গেলে, কতকটা ভবতোষের এ ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধেই রাগ করে, সাহেবের অফিসের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ডাক্তার—ভালই করেছিলেন, আপনি আপনার মনের মত কাজ করেছিলেন।

হরেনবাবু—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো ডাক্তার? ভবতোষের সংসার-সুখের উপরেই কত বড় ঠাট্টা আর অপমান সত্য হয়ে উঠলো। বিজাতের উচ্ছিষ্টের কাঙালের মত এক-একটা জীবন নিয়ে বিদেশে পড়ে আছে তার তিন ছেলে। ভবতোষ আজ বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতো, তার সেই অদ্ভুত হাসিটা আজ কত জব্দ হয়ে তারই বাড়িটাকে শূন্য করে দিয়েছে। ভবতোষের তিন ছেলে ভবতোষের জাতের রক্তকেও অপমানিত করেছে। ভবতোষের দেশ আর জাতকে একদিন আরও বেশি অপমান আর ঘেন্না করবে ঐ ওরাই, ঐ তিন ছেলের ছেলে-মেয়েরা।

বলতে বলতে হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে একটা হাঁপ ছাড়েন হরেনবাবু—যাই হোক, ভবতোষটা মরে বেঁচেছে। এ শূন্যতা সহ্য করবার দুর্ভাগ্য ওর হলো না। কিন্তু আমাকে সে দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হচ্ছে।

ডাক্তার—আমার মনে হয়, এ বয়সে আপনার এখন এসব চিন্তা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

হরেনবাবুর চোখ দুটো আবার দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।—তুমি হয়তো আমার এসব চিন্তার মধ্যে একটা মানসিক ব্যাধির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছো ডাক্তার। হতে পারে, তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু আমি জানি, সাদা জাতকে ঘেন্না করতেই আমার ভাল লাগে। এ ঘেন্না যাবার নয় ডাক্তার। কোন চিকিৎসাতেও আমার এ ঘেন্না চলে যাবে না। আমি জাতিবোধবিহীন একটা জীব মাত্র নই, ডাক্তার।

ডাক্তার বলেন—আমি এখন চলি।...হ্যাঁ, আপনার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এবার থেকে আপনার রোজই সোডা-বাথ দরকার। আশা করছি, তাতে আপনার ঘুম ভাল হবে, আর শরীরটাও একটুতে কাহিল হয়ে যাবে না।

ঠিকই, আরামের ঘুমটা যেন হরেনবাবুর জীবনের ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছে। এই এক বছরের মধ্যে একটা রাতও গভীর ঘুমের শান্তি বোধ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আছে শুধু অদ্ভুত একটা তন্দ্রার ঘোর। জেগে থাকলেও যেন চোখের উপর একটা কুয়াশাময় আবরণ নেমে আসে। বুকটা যেন নিঝুম হয়ে যায়, আর এই জাগা পৃথিবীর কোন শব্দ কানে শোনা যায় না। রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার আয়েঙ্গার, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্যালিপলির অ্যাকশনে ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ দেখিয়ে তিনটে কৃতিত্বের মেডাল পেয়েছেন যিনি, সে ভদ্রলোক তাঁর প্রিয় সহচর যে হাউণ্ডটাকে নিয়ে হরেনবাবুর চোখের সামনেই লনের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটা চিৎকার করছে। কিন্তু হরেনবাবুর হঠাৎ তন্দ্রার জগতে হাউণ্ডের সেই চিৎকারটা যেন অনেকদূরের প্রতিধ্বনির মত, ক্ষীণস্বরের একটা সুরময় কুহকের মত রিমঝিম করে বাজতে থাকে। হঠাৎ চমকে ওঠেন, ধড়মড় করে নড়ে বসেন আর জোর করে চোখ মেলে তাকান হরেনবাবু।

চোখ দুটোও জলে ভরে গিয়ে চিকচিক করতে থাকে। কী দুঃসহ এই একলা

হয়ে পড়ে থাকা জীবন। নিঃশ্বাসের তাপটুকুও যেন অদৃশ্য এক হিমভারের চাপে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বুকটাও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আজ একটা মমতাময় ছায়াও কাছে নেই যে, হাত বুলিয়ে এই ঠাণ্ডা বুকের নিঃশ্বাসটাকে একটু উষ্ণ করে দেয়।

যাক, কোন মমতার ছায়া কাছে নেই, কিন্তু মমতার স্মৃতি নামে ছায়াময় একটা সত্য যে হরেনবাবুর এই ক্লান্ত আয়ুর শেষদিনের নিঃশ্বাসগুলির কাছে আছে। পূর্ণিমার মুখটা যে খুবই স্পষ্ট করে মনে করতে পারা যায়। তার মুখের হাসিটাকে যেন চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। ভালবাসায় ধন্য হওয়া একটা জীবনের স্মৃতি যে হরেনবাবুর এই নিঃসঙ্গতার সব শূন্যতার মধ্যেও লুকিয়ে আছে। তবু একটা সান্ত্বনা আছে।

কিন্তু ভবতোষের মেয়েটা? তপতী যে পৃথিবীর সঙ্গে কোন মমতার সম্পর্ক মেনে নিল না। ওর জীবনে ভালবাসার ঘটনা নেই; ওর স্মৃতিটাও যে রিক্ত শূন্য সাদা। এ মেয়ে তার একলা জীবনের ভার কিসের জোরে বহন করতে পারবে? এখনও বোধহয় কল্পনা করতে পারছে না তপতী, শুধু নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকা একটা জীবন যে বেঁচে-থাকা একটা মৃত্যু।

এ কি? হরেনবাবুকে 'ঘিরে-ধরে এত অভিমানের স্বরে ডাকাডাকি করছে কারা? কাকাবাবু, আপনি আমাদের একটা চিঠিরও উত্তর আজ পর্যন্ত দিলেন না। আমরা তো জানি, আপনি যতদিন আছেন, ততদিন আমাদের দেশও আছে। বাবা নেই, মা নেই, এখন আপনিই তো আমাদের আশীর্বাদ। ছেলে-মেয়েগুলো যে আপনার ফটো দেখতে চায়।

এ কি সত্যিই তন্দ্রার ছবি? চমকে ওঠেন হরেনবাবু। দু'হাতে চোখ মোছেন। মনে হয়, বুকের ভিতরে কি যেন আটকে রয়েছে। অমল বিমল আর শ্যামলকে কি-যেন বলতে গিয়ে কথাটাই বুকের ভেতর আটকে গিয়ে বোবা হয়ে গিয়েছে।

চমৎকার একটা ঠাট্টার ছবি। হরেনবাবুর মনটাই যেন বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে।

যাই হোক, তপতীর চিঠির উত্তর আজই লিখে ফেলতে যে পারা যাচ্ছে না। কি লিখতে হবে, তাও যে ভেবে উঠতে পারা যাচ্ছে না। সারাটা জীবন একলা হয়ে পড়ে থাকবে তপতী, আর সত্তর বছর বয়স হলে কার্সিয়ং-এর এই হোমে অন্তিমের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনবে, তপতীর এমন একটা অদৃষ্টকে কি আশীর্বাদ করা যায়?

শোনা গুজব নয়, পরের মুখে ঝাল খাওয়া একটা মিথ্যে উপলব্ধিও নয়, নীরুদি নিজের চোখেই দেখেছেন, আর লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছেন।

অল্পবয়সের এক ইয়োরোপীয়ান ছোকরার সঙ্গে ময়দানের রেড রোডের কিনারা ধরে হেসে-হেসে আর গল্প করে করে চলে যাচ্ছে তপতী। প্রথমে মনে হয়েছিল, প্রায় তপতীর মত দেখতে একটা মেয়ে সাহেবটার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে

যাচ্ছে। তার পরেই মনে হয়েছিল, একদিন তপতীটাও তো দেখতে ঠিক এইরকমই ছিল। অনেকদিন আগের তপতী, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটার পর যেদিন নীরুদির সঙ্গে এই ময়দানেই বেড়াতে এসেছিল তপতী, তপতীর বয়স তখন বোধহয় কুড়ি বছরের বেশি ছিল না। ফিকে নীল ভয়েলের শাড়ি আর ডবল বিনুনীর দু'প্রান্তে দুটো মেরি রোজ ঝুলছে, টাটকা ফোটা ফুলের মত চেহারা তপতীটা সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে বনহরিণীর মত ছটফটিয়ে ছুটো-ছুটি করেছিল।

কিন্তু সেদিনটা তো প্রায় পঁচিশ বছর আগের একটা দিন। আজ আর সে তপতীকে চোখে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তবু যে দেখতে পাওয়া গেল। না, কোন ভুল নেই, ঠিক, কোন সন্দেহ নেই, তপতীই যাচ্ছে। নীল রঙা বেনারসী সিল্কের শাড়ি আঁটসাট করে গায়ে জড়ানো; সত্যিই যে ডবল বিনুনী আর বিনুনীর প্রান্তে শিউলির মালা জড়ানো।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাবার জন্য বলতে গিয়েও নীরুদি চুপ করে গেলেন। বোধ হয় বেশ ভয় পেয়েছিলেন, তাই। গাড়ির দিকে একবার তাকিয়েও দেখলো না তপতী, কে চলে গেল গাড়িতে। কিংবা, দেখে থাকলেও বোধহয় চিনতে পারলো না। তপতীর চোখ যেন নিজের চোখের আলোতেই মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। হাসছে, ঝিকঝিক করছে।

যাদবপুরের পিসিমা একদিন এসেছিলেন। সার্কাস অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ফটক পার হয়ে আর বারান্দায় উঠে, আর একটা হাঁপ ছেড়ে একটা মিনিট একটু জিরিয়ে নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। অনেক কথা বলবার, অনেক কিছু জানবার, আর একটা শুভ ঘটনার সংবাদ জানাবার জন্য তিনি এসেছিলেন। অমল, শ্যামল আর বিমলের খবর কি? সরসী কি এ-বছরেও দেশে ফিরবে না? পুরো পাঁচটা বছর তিনি ভবদার বাড়ির কোন খবর নিতে পারেননি; কারণ, এই পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি পাঁচবার যাদবপুর ছেড়ে অনেক দূরে দূরে গিয়ে হাওয়া বদল করে এসেছেন—উটিতে, পাঁচমারিতে, সিমলাতে, শিমূলতলায় আর ওয়ালটেয়ারে। মেজ মেয়ে সরযূর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। শুভ ঘটনার সংবাদটা তপতীকে জানিয়ে দিয়ে বলে যেতে হবে, তপতী যেন নিশ্চয়ই বিয়ে দেখতে যায়। না-যাবার কোন অজুহাত শুনবেন না যাদবপুরের পিসিমা।

কিন্তু তপতী কোথায়? ভবদার বাড়িটা যেন শূন্যতার ভারে মুখভার করে নীরব হয়ে রয়েছে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত সত্যি বিয়েই করলো না। চিরকাল পুরুষ জাতকে ভয় পেয়ে আর ঘেন্না করেই সরে রইল। অনেকবার কথাটা শুনে-ছেন যাদবপুরের পিসিমা, চারুর মেয়ে অমিতা কতবার তপতীর সম্পর্কে কলেজ-ছাত্রীদের এই সন্দেহের কথাটা যাদবপুরের পিসির কাছেও বর্ণনা করে বলেছে। মাস্টারনী হবার পর থেকে যেন আরও একরোখা হয়েছে তপতী। শুধু বই-পড়া আর পড়ানো। শুধু কলেজ আর বাড়ি ফিরে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে

বন্ধ করে পড়ে থাকা—ভবদার মেয়ে তপতীর জীবন এরকম একটা অদৃষ্ট তৈরি করে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

খানসামা পাঁচকড়ি এসে কথা বলতেই কেঁপে উঠলেন যাদবপুরের পিসি। তপতী বাড়িতে নেই। কলেজেও যায়নি, কারণ, এই সময়টা কলেজ যাবার সময় নয়। পাঁচকড়ি বলে—সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে গিয়েছেন দিদিমণি।

—বসেছা ?

—হ্যাঁ পিসিমা। একটি ফুটফুটে সাহেব, চমৎকার বাংলা কথা বলে।

—কিন্তু একটা সাহেবের সঙ্গে তোমার দিদিমণির কাজটা কি ? শুনি ?

—জানি না পিসিমা। চাকর-বাকরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই পিসিমা।

পিসিমার বুক দুরদুর করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরি করেন না পিসিমা। আতঙ্কিতের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থেকেই বারান্দা থেকে নেমে পড়েন। গেট পার হয়ে নিজের গাড়িতে উঠেও হাঁপাতে থাকেন।

একদিন অমিতা এসেও চমকে উঠলো। তারপরেই অপ্রস্তুতের মত, আর যেন বোবা হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। অমিতার সঙ্গে অমিতার স্বামী বিলাসও এসেছিল।

ড্রইংরুমের ডিভানের উপর পাশাপাশি বসে আছে তপতী আর এক যুবক ইওরোপীয়ান—ইংরেজ না জার্মান না ফ্রেঞ্চ, কে জানে ?

—তপতী, হেসে হেসে ডাক দিতে গিয়েই অমিতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

বিলাসও অমিতার কানের কাছে ফিসফিস করে—সাহেবটাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে।

আরও আশ্চর্য, তপতী একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে, একটুও গম্ভীর না হয়ে, স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে এগিয়ে এসে অমিতার হাত ধরে। আর, ব্যস্তভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্য একটি ঘরে অমিতাকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলে। বিলাসকেও অনুরোধ করে—চা না খেয়ে চলে যাবেন না বিলাসবাবু।

চা আসা পর্যন্ত এই ঘরের ভিতরেই বসে থাকে অমিতা আর বিলাস। তপতী তিনবার চলে যায়, আরতিনবার ফিরে আসে। কত রকমের নতুন কথা শোনাতে থাকে তপতী। জাকর্তাতে সরসী এখন বড় বড় গামেলাং-এর আসরে গান গায় আর নাচে। ওদেশী ভাষার গান আর ওদেশী নাচ চমৎকার রপ্ত করেছে সরসী। ইন্দোনেশিয়ার সরকার সরসীকে তিনটে সার্টিফিকেট অব মেরিট দিয়েছে। হ্যাঁ, বাগানটার চেহারা বদলে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ অমিতা, সেই কসমসের আর ক্যাকটাসের জঙ্গল আর নেই। এখন শুধু শিউলি, টগর, জুঁই আর কামিনী।

দেশী ফুলের উপর এত বড় অনুরাগের কথা এত মুখর হয়ে বলে চলেছে যে তপতী, তারই বাড়িতে ঐ ড্রইংরুমের ভিতরে যে একটি বিদেশী মনুষ্যত্ব শক্ত হয়ে

বসে রয়েছে। তপতীর উল্লাসের ভাষাটাকে যেন একটা পাগলাটে আহ্লাদের প্রলাপের মত মনে হয়। তপতীর কথা আর কাজের মধ্যে যেন কোন নিয়মের, কোন মিলের বালাই নেই।

এত কথা বলছে তপতী, কিন্তু ভুলেও একবার বললো না, ওঘরে বসে আছেন ঐ সাহেব ভদ্রলোকটি কে? কেন এসেছেন? তপতীর কাছে বিদেশী ছোকরাটার কাজই বা কি?

শেষ পর্যন্ত সত্যিই তপতী সামান্য একটা কথা খরচ করেও বলতে পারলো না, কে ওই সাহেব ভদ্রলোক। বিলাসের সঙ্গে সাহেব ভদ্রলোকের একটু পরিচয়ও করিয়ে দিলো না। তপতীর আচরণ যেন বেশ সূক্ষ্ম একটা সতর্কতার আচরণ। যেন কিছু গোপন করে রাখবার জন্য বেশ সাবধান আর চতুর একটা আচরণ। যেন একটা পরম প্রাপ্তির রত্নকে সবার গোচর থেকে আড়াল করে ঢেকে রাখতে চাইছে তপতী।

বিলাস বিরক্ত হয়, অমিতা বেশ লজ্জিত হয়। আর, চা খাওয়া শেষ হতেই দু'জনে উঠে পড়তে আর এক মুহূর্তও দেরি করে না।

সুমঙ্গলা ভেবেছিল, তপতীকে একটা চিঠি লিখে জেনে নেবে, ব্যাপারটা কি? সত্যিই কি, যে অদ্ভুত কথাটা রটেছে, সুমঙ্গলার বান্ধবী, এত সাবধান আর শক্ত মনের মেয়ে সেই তপতী কি এরকম একটা কাণ্ড করে এই বয়সের জীবনটাকে লজ্জা দিতে পারে? এ কি সম্ভব?

সুধাময়বাবু দু'বার এসে সুমঙ্গলার স্বামীর কাছে গল্প করে গিয়েছেন। জর্জ ক্রিস্টকার নামে এক ইংরেজ ছোকরার সঙ্গে তপতীর নাকি বড় বেশি অন্তরঙ্গতা দেখা দিয়েছে। সুধাময়বাবু ভয়ানক ঠাট্টার সুরে হেসে হেসে যে-কথা সুমঙ্গলার স্বামীকে বলছিলেন, সে-কথাটা সুমঙ্গলা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেয়েছিল।

—এইবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন অনিমেষবাবু, তপতী মল্লিককে বিয়ে করতে কেন আমি রাজি হইনি। আমার ঘোর সন্দেহ ছিল, এত বয়স হয়েও যে-মেয়ের বিয়ে হয়নি, সে-মেয়ে কি এতদিনের মধ্যে একটুও এদিক-ওদিক করেনি? একেবারে ক্লীন স্লেট, কোন আঁচড়ও পড়েনি? বিশুদ্ধ টেবুলা রেজা? কোন রেকর্ডই নেই? হতেই পারে না অনিমেষবাবু।

সুমঙ্গলার স্বামী অনিমেষ কবুতরের রোস্ট চিবোতে চিবোতে হাসেন।—অর্থাৎ একটু স্পাইসড্ মাটন, একেবারে র মাটন নয়; কিন্তু আপনি তো অতীতের কোন রেকর্ডের কথা বলছেন না, যেটা বলছেন, সেটা তো নিতান্ত সাম্প্রতিক।

সুধাময়—তা বটে। কিন্তু সেটাই কি প্রমাণিত করে না যে, মহিলার জীবনে আরও কত রেকর্ডের দাগ আছে, যেগুলি কারও চোখে ধরাই পড়েনি?

—যাই হোক, আপনার আর এবিষয়ে কিছু করবারই বা কি অধিকার আছে?

—কিছু নয়। শুধু লজ্জা পেতে হচ্ছে, এহেন মহিলার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল।

শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনেছে সুমঙ্গলা। সুমঙ্গলার স্বামী অবশ্য তপতীর কথা নিয়ে সুমঙ্গলার কাছে কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু সুধাময়বাবুর ঠাট্টার হাসি আর ভাবাটা যেন একটা অপমানের কাঁটার মত সুমঙ্গলার মনটাকে বিঁধে বিঁধে যন্ত্রণা দিয়েছিল। ছিঃ, তপতীর মত মেয়ে কি এমন ভুল করতে পারে? সুমঙ্গলা তার অনেক বান্ধবীর জীবনের অনেক ঘটনার কথাই জানে। ছাত্রী-জীবনের বান্ধবীদের কথাও মনে আছে। মাধুরী, বিরজা আর হিমানী কলেজের মাত্র চারটি বছরের পড়াশোনার জীবনেই যে-সব কাণ্ড বাধিয়েছিল, সে-সব কথা ভুলে যায়নি সুমঙ্গলা। কিন্তু এই সত্যও ভুলে যায়নি, তপতী কোনদিন সে-ভুল করেনি। সেই জন্যেই তো তপতীকে এত ভাল লাগতো।

না, সোজা গিয়ে তপতীকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়।

সুমঙ্গলা এসে সটান ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকেও কাউকে দেখতে পায় না। কিন্তু তবু চমকে ওঠে। ড্রইংরুমের একটা ডিভানের উপর একটা হ্যাট আর মোটা একটা বই পড়ে আছে, কালিদাসের কাব্যের একটা ভল্যুম। হ্যাঁ, টেবিলের উপর একটা ট্রের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা পাইপ, পাইপের মুখের ভিতরে তখনো ঠাসা তামাকের মিক্সচার ধিকিধিকি করে জ্বলছে, ধোঁয়া উড়ছে।

নিচের তলার কোন ঘরে কেউ নেই। উপর তলায় ওঠবার সিঁড়িতে কেউ নেই। উপরতলার কোন ঘরেও কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে। সব ঘরেই দরজা খোলা, পর্দাগুলি দুলছে। কিন্তু কোথাও কোন কথার শব্দ বাজছে না, কোন মৃদু স্বর, কোন হাসির উচ্ছ্বাস, একটা ফিসফাসও শোনা যায় না।

কিন্তু···সুমঙ্গলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃশ্বাসটাও যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। একটি ঘর, যে-ঘরটা তপতীর বেডরুম, সেটারই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

তপতীকে ডাক দেবার মত শক্তিটাও যেন সুমঙ্গলার কণ্ঠস্বর থেকে হঠাৎ আতঙ্কে উবে গিয়েছে। ডাক দেবার সাহস নেই, সাধ্যি নেই। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু সন্ত্রস্ত বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে সুমঙ্গলা, তারপরেই ছুটে পালিয়ে যায়। সিঁড়ি ধরে একেবারে নিচের তলায়, তারপরেই বারান্দা ছাড়িয়ে একেবারে ফটকের কাছে। সুমঙ্গলার গাড়িটাও উধাও হবার আগে গাড়ির হর্নটাও যেন আতঙ্কের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

পাইপ ঠুকে পোড়া তামাকের ছাই ফেলে দিয়ে, আর প্রকাণ্ড বইটা হাতে তুলে নিয়ে যখন রওনা হয় জর্জ ক্রিস্টফার, তখন ডিভানের উপর যেন একটা পরিশ্রান্ত তৃপ্তির মূর্তির মত অদ্ভুত রকমের একটা শিথিল অথচ স্নিগ্ধ হাসি হেসে তপতী বলে—আমি আর উঠতে পারবো না জর্জ। তুমিই কাছে এসে···।

এগিয়ে আসে জর্জ, আর তপতীর হাত ধরে বলে—আজ তাহলে আসি তপতী।

তপতী—আর কিছু বলবার নেই?

জর্জ—আমার আর কিছু বলবার নেই। এবার যা বলবার হয়, তুমি বলবে। একেবারে স্পষ্ট করে বলবে।

জর্জ ক্রিস্টফার নয়, যেন তপতীর ভাগ্যটাই স্নিগ্ধ হয়ে, প্রসন্ন হয়ে, বিপুল এক প্রতিশ্রুতির ঘোষণা শুনিয়ে কথা বলছে। জর্জ ক্রিস্টফার যেন দুরন্ত ভালবাসার জগতের এক নিঃসঙ্গ পথিক ; আর তপতী যেন একটা ছায়াবীথি। সে ছায়াবীথির সব ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে পথিকের প্রাণ।

চলে যায় জর্জ আর তপতী যেন তার মন-প্রাণের, আর এই শরীরেরও সব তৃপ্তি, নির্ভয় আনন্দে বরণ করে নিয়ে, যেন একটা স্বপ্নালু আবেশের মধ্যে দুই চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি ঝরেছে। বাগানের টগর আর গন্ধরাজ যেন নতুন জলে স্নান করে আরও সাদা হয়েছে ; তাই দেখা যায়, অন্ধকারের মধ্যে ধবধব করছে ফুলগুলির সাদা দেহের হাসি।

কিন্তু···তপতীর শুধু চোখ দুটো নয়, মনটাও যেন ফুলগুলির ঐ টাটকা সাদা হাসির ধবধবে গৌরবের ছবি দেখে চমকে উঠেছে। এই কাদাটে বর্ষার অন্ধকার যেন ওদের স্পর্শ করতে পারছে না। ওরা যেন এক একটা শুচিতার অহংকারের মত ফুটে রয়েছে।

তপতী মল্লিকের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা যন্ত্রণার সাপ যেন মোচড় দিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে। বুকটা ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। আজকের এই বর্ষার সন্ধ্যার কোন স্নিগ্ধতার আর শুচিতার ধারা নয়, এক গাদা কাদা ছিটকে এসে তপতীর প্রাণে আর গায়ে লেগেছে। কোথা থেকে একটা হিংস্র পাগলামি এসে তপতী মল্লিকের এই শান্ত বয়সের দেহটাকে একটা ভয়ানক লোভের উৎসবের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সব লজ্জার সর্বনাশ করে দিল। এখনও মনে পড়ে, এই তো দশ বছর আগের কথা, জোলার এক উপন্যাসে এক প্রবীণার জীবনের ঠিক এমন-তর একটি ঘটনার কাহিনী পড়ে তপতীর মনটা কেমন ঘিনঘিন করে উঠেছিল। সে নারীকে নারী-জীবনের রীতি-নীতি থেকে পলাতকা এক নির্লজ্জা ভ্রষ্টা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ ? আজ তপতী মল্লিকও যে নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় সতর্কতার শাসনটাকেই ছিন্নভিন্ন করেছে। কলেজের ছাত্রীরা যে আজও তপতীকে পুরুষদ্বেষিনী বলে ঠাট্টা করেও একটা সম্মান দিয়ে ফেলে। ওরা যে কোন দুঃস্বপ্নেও সন্দেহ করতে পারবে না, এই ঠাট্টা কত বড় মিথ্যা। ওরা বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, পুরুষের স্পর্শলোভিনী এক নারী শুধু ঢং করে পুরুষবিরোধী তত্ত্বকথা বলে। এ তত্ত্বটা তপতীর জীবনের একটা অভিমানের কান্নার তত্ত্ব। তা না হলে, জর্জ ক্রিস্টফারকে একটুকু বাধা না দিয়ে, বরং যেন মাতালের খুশির নেশার মত একটা বিহ্বলতার সুখে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আর একেবারে অলস হয়ে এলিয়ে পড়ে কেন, তপতীর এই অহংকারের শরীর।

যন্ত্রণাটা দুঃসহ। তপতী মল্লিকের বুকের ভিতরটাকে যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাচ্ছে এই যন্ত্রণা। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। মনে হয়, চোখ কেটে যেন রক্ত ঝরছে।

একদিন ভাবতেও যে লজ্জা পেত তপতী, বিয়ের আগে নাকি ভালবাসা হয়। সে ভালবাসার মধ্যে যেন একটা সস্তা লোভের নোংরামি আছে বলে মনে হতো। সেই তপতী যে বিয়ের আগেই··· ভালবাসার চেয়েও ভয়ানক অসাবধানতা··· সেই কাণ্ডই করে বসে রইল, যেটা পৃথিবীর চোখে ক্ষমাহীন ঘৃণার কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেকে এত কঠোর শাস্তি দেবার দুঃসাহসই বা পেল কোথা থেকে তপতী মল্লিক?

না, সন্ধ্যার এই অন্ধকারটার এত হুমকি ভ্রুকুটি আর ধিক্কার সহ্য করা যায় না। ড্রইংরুমে আলো জ্বলছে না, তাই বোধ হয় সন্ধ্যার অন্ধকারটা এত দুঃসাহসী হয়ে তপতীর অদৃষ্টটাকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। বুকের ভিতরের যন্ত্রণার সাপটাকে গলা টিপে একেবারে স্তব্ধ করে দেবার জন্য একটা কঠোর নিঃশ্বাসও যেন তপতীর বুকের ভিতরে ছটফটিয়ে ওঠে।

উঠে দাঁড়ায় তপতী। আলো জ্বালে। না, কিসের এত ভয়? কতগুলি ভীরু আতঙ্কের কালো ছায়া দিয়ে তপতী তার আশার ভালবাসাগুলিকে কালো করে দিতে পারবে না। মিথ্যে আতঙ্ক। শুচিতা অশুচিতার প্রশ্নটাই মিথ্যে। জর্জ ক্রিস্টফার যখন তপতীর জীবনের বান্ধব হয়েই গিয়েছে, তখন আর কতগুলি রীতি-নীতি আর নিয়মের কথা ভেবে ভীরু হয়ে যাবার কোন মানেই হয় না।

কি আশ্চর্য, তপতী নিজেই বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে যায়, আলোটা যেন হাসছে। তপতীর দু'চোখের সব বিষাদের ঘোর কেটে গিয়েছে। হাসছে তপতীর চোখ দুটো। আজকের এই সন্ধ্যাটাকে যে সারা মনের প্রীতি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হয়।

কি-যেন সেই গানটা। কাল সকালবেলাতেও রেডিওতে যে গানটা খুব মিষ্টি সুরে বেজেছিল। পানিমে মীন পিয়াসী রে···বোধহয় সন্তকবি কবীরের একটি গান। জলেতে থেকেও মাছের প্রাণ পিপাসিত হয়ে থাকবে, এ কোন্ দুর্ভাগ্য? ঠিক কথা। ভালবাসাকে কাছে পেলে শুধু মন দিয়ে কেন, এই শরীর দিয়েই বরণ করে নিতে হয়। তাতে কোন দোষ নেই, কোন ভুল নেই। তৃপ্তির জল কাছে পেয়েও পিয়াসী হয়ে থাকবে কেন জীবনের সাধ?

এতক্ষণের ভয়টার উপর রাগ করতে গিয়ে নিজের উপরেই রাগ করে তপতী। না, আজ তপতীর গায়ের উপর কোন নির্লজ্জতার কাদা ছিটকে পড়েনি। আজ তপতীর দেহটা একটা শ্রদ্ধার স্পর্শকেই বরণ করেছে।

না, কি দরকার স্নান করে? কোন্ অপরাধের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে হবে যে, গায়ের উপর কলের জল ছিটোতে হবে। গ্লানি নয়—তৃপ্তি। সব সন্দেহ সরে গিয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই, তপতীর প্রাণের ভিতরে আর সারা দেহ জুড়ে যেন তাজা বকুলের সৌরভ আজও বেঁচে আছে। দেখতে পায় তপতী,

সন্ধ্যার ভেজা বাতাসে বাগানের মাধবীলতা কি সুন্দর দুলছে।

কলকাতার পিসিমারা আর মাসিমারা নিশ্চয়ই কোন খবর রাখেন না, কল্পনাও করতে পারেন না, আর কল্পনাতে আশা করতেও পারবেন না যে, তপতীর জীবনের আশা সফল হয়েছে। এ বাগানের বকুল শুকিয়ে যায়নি, ঝরেও পড়েনি, সত্যিকারের বসন্তের হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে এতদিনে সত্যি করে ফুটেছে। জানতে পারলে কি আশ্চর্য হয়ে ওঁরা ছুটে আসতেন না? ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটার ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ একটা সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা সহ্য করেন যাঁরা, তাঁরা কি শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন না, ভবতোষ মল্লিকের মেয়ের ভবিষ্যৎ এইবার কাছে এসে হাত এগিয়ে দিয়েছে?

হতে পারে, খুব জাঁকাল রকমের একটা নিন্দে রটে গিয়েছে। একটা বিদেশী মানুষের সঙ্গে তপতীর মেলামেশার কাণ্ডটাকে ভবতোষ মল্লিকের মেয়ের একটা ভয়ানক পতনের কাণ্ড বলে মনে করে সবাই হয়তো শিউরে উঠেছেন। কিন্তু যদি জানতেন যে, এ মেলা-মেশা একটা ফ্যাশন মাত্র নয়। ঐ বিদেশী স্কলার মানুষটা যে ভালবাসার জোরে তপতীর জীবনের আপনজন হয়েই গিয়েছে। তবে বোধহয় ওঁরা, বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তপতীর সৌভাগ্যটাকে মনে মনে সহ্য করবেন। আর সুমঙ্গলা হয়তো হিংসে করেই দুটো বাঁকা কথা শুনিয়ে দেবে।

টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে কেন? বোধহয় বিকেলের ডাকে এসেছে। কি আশ্চর্য, এতক্ষণের মধ্যে একবারও চিঠিটা চোখে পড়েনি। না পড়বারই কথা, জর্জ যে এই কিছুক্ষণ হলো চলে গেল। বিকেল থেকে এই রাত আটটা পর্যন্ত, এর মধ্যে জর্জের মুখের দিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার সুযোগই যে পায়নি তপতী।

চিঠি পড়া শেষ হতেই তপতীর দু'চোখের ঝকঝকে হাসিটা যেন রাগ করে জ্বলে ওঠে। কী অদ্ভুত সন্দেহের আর ভয়ের কথা লিখেছেন যাদবপুরের পিসিমা। চিঠির ভাষাটা কত কর্কশ!—যা শুনছি, সেটা ভাল নয়, একটুও ভাল নয়—কোনমতেই ভাল নয় তপতী।

চিঠিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই তপতী যেন তীব্র একটা ভ্রূকুটি তুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে একটুও অসুবিধে নেই, বাইরের অন্ধকারটা নিতান্ত নিরেট একটা অবুঝ হিংসুটে অন্ধকার।

ইচ্ছে করে নয়, চেষ্টা করেও নয়, তপতীর ঠোঁট দুটো যেন ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরা জীবনের একটা প্রতিজ্ঞার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিড়বিড় করে।
—সব ভাল, সব দিক দিয়ে ভাল, সব মতেই ভাল।

পর পর দুটো মাস, তারপর আরও কয়েকটা দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে জর্জের কথা আর নিজের কথা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন আলো-ছায়ার কথা তপতী ভাবতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। ভিতরের বারান্দার একপাশে কাচের জারের

ভেতরে অর্কিডগুলি যে মরে যেতে বসেছে, তাও চোখে পড়েনি। কলেজে পড়াবার সময় ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে যেন একটা কলের গলা দিয়ে শুধু আউড়ে গিয়েছে তপতী, কিন্তু মনটা শুধু ভেবেছে, জর্জ কি সত্যিই একদিন দেশে ফিরে যেতে চাইবে ?

হ্যাঁ, শুধু একটা উদ্বেগের কথা কয়েকবার মনে পড়েছিল। কার্সিয়ং থেকে হরেনকাকাবাবুর চিঠি আজও এল না। তিন মাসের মত হলো হরেনকাকাবাবুকে চিঠি লিখেছে তপতী। সে চিঠির উত্তর এতদিনে আসা উচিত ছিল।

কিন্তু সে চিঠির উত্তরে কি লিখবেন হরেনকাকাবাবু ? প্রশ্নটা তপতীর মনের ভিতরে প্রচণ্ড একটা ভয়ের জিজ্ঞাসা হয়ে বার বার তপতীর চোখের হাসি স্তব্ধ করে দিয়েছে। চিঠিতে যে ভয়ানক একটা মিথ্যে প্রতিজ্ঞার কথা লিখে হরেন-কাকাবাবুকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে তপতী। তপতী বিয়ে করবে না, একলা হয়ে থাকা জীবনের অহংকার নিয়েই বেঁচে থাকতে পারবে তপতী। হরেনকাকাবাবু যদি খুশি হয়ে চিঠির উত্তরে এমন কথা লিখেই ফেলেন, শুনে সুখী হলাম তপতী, তবে ? তবে আবার সেই ভয়ানক দুঃসাহসের কাগজ-কলম কোথা পাবে তপতী, যার জোরে লিখে ফেলতে পারা যাবে, না কাকাবাবু, একলা হয়ে পড়ে থাকা জীবন নিতান্ত অসহ্য একটা অভিশাপ। আপনি আমার আগের চিঠির প্রতিজ্ঞাটাকে যদি আশীর্বাদ করে থাকেন ভুল করেছেন। আজ বরং এই আশীর্বাদ করুন যে···।

তপতীর নীরব চিন্তার ভাবাটা যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে আর স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন্ মানুষের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে তপতী, কোন্ সাহসে ? ভবতোষ মল্লিকের দুই ছেলেকে দুটো পুরো অস্পৃশ্য বলে, আর এক ছেলেকে আধা স্পৃশ্য বলে মনে করেন যিনি, বিদেশী বেজাতের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা বোধ করেন যিনি, ফটোর আরাবেলা ক্লারা আর সিরিলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে একটুও আগ্রহ নেই যাঁর, সে মানুষ কি তপতীর এই সৌভাগ্যকে আশীর্বাদ করবেন ? অসম্ভব। হরেনকাকাবাবুর কাছ থেকে কোন ক্ষমাও আশা করা যায় না।

না, হরেনকাকাবাবুর কাছ থেকে কোন চিঠি না আসাই ভাল। হরেনকাকা-বাবুকে আর কোন চিঠি না লেখাই ভাল। ঐ মানুষটির স্নেহ আর আশীর্বাদের মহত্ত্বটা যেন বড় সংকীর্ণ একটা ক্ষুদ্রতার শর্ত দিয়ে বাঁধা। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে সবার আগে মানুষটার রক্তের জাতের কথা ভাবে যে মানুষ, তার আশীর্বাদ আর অভিশাপ দুটোই দুই ভুল, দুটো মিথ্যে। না কাকাবাবু, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আপনার ঐ ভয়ানক বিশ্বাসটাকে আমি শ্রদ্ধা করি না। জানি জর্জকে আপনি ঘেন্না না করে পারবেন না, কিন্তু মাপ করবেন, আমার পক্ষে এটা অপমান, বড় দুঃসহ অপমান।

হরেনকাকাবাবুর কথা ভেবে দুটো দিন দুঃখিত হলেও তপতী একদিন নিজের

মনের জোরের রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তপতীকে ভয় পাইয়ে দেবার শক্তি আজ আর এই পৃথিবীর কোন আলো-ছায়ার নেই। তপতীর জীবনটাকে আর ভুল করিয়ে দিতে কেউ পারবে না। পিসিমা আর মাসিমাদের, কিংবা সুমঙ্গলা আর অমিতার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, হরেনকাকাবাবুও পারবেন না।

পৃথিবীর কারও তো কোন ক্ষতি করছে না তপতী, কারও জিনিস কেড়েও নিচ্ছে না—শুধু নিজের সৌভাগ্যটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেউ বাধা দিলে মানবে কেন তপতী? মানবার দরকার কি? কিসের ভয়ে?

আজকাল আর ড্রইংরুমের মধ্যে নয়, উপরতলার একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিয়েছে তপতী। যে ঘরের ভিতরে একটি সোফা ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। জর্জ যখন আসে, তখন সোজা উপরতলায় উঠে এই ঘরের ভেতরেই এসে বসে। আর তপতীও, যদি খোঁপা বাঁধা বাকিও থাকে, তবুও দেরি করে না। এই ঘরের ভেতরে এসে একই সোফার উপর জর্জের সঙ্গে বসে গল্প করে। খানসামা পাঁচকড়ি এ ঘরের ভিতরে কখনও চা পৌঁছে দিতে আসে না।

বাইরের পৃথিবীটার যত যুক্তি বুদ্ধি আর সমালোচনা, যত ঠাট্টা হিংসে আর আপত্তি, যত ধারণা সংস্কার আর বিশ্বাসের বন্ধন থেকে ছিন্ন করে যেন একটা মুক্তিময় নিরিবিলি তৈরি করে নিয়েছে তপতী, একটা একলা সৌভাগ্যের ঘর, তার মধ্যে শুধু দুজন, তপতী আর জর্জ।

তপতী সেদিন হেসে হেসে তার সুখী অদৃষ্টের গর্বটাকে যেন আবৃত্তি করে বলতে থাকে—সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।...

জর্জ হাসে—পোয়েট বুঝি একথা বলেছেন?

তপতী—একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন।

জর্জ—আশ্চর্য।

তপতী—আশ্চর্য হবার কি আছে?

জর্জ—এটা কি সম্ভব?

তপতী—কেন সম্ভব নয়? মানুষ কি পৃথিবীর দশজনের পছন্দ অপছন্দের মুখ চেয়ে ভালবাসে?

জর্জ—না, বাসে না। কিন্তু...।

—কিন্তু আবার কি?

তপতীর বিরক্ত অথচ আতঙ্কিত মুখটার দিকে তাকিয়ে জর্জ মৃদুভাবে হাসে—তবে দশজনের ব্লেসিং থাকলে ভালবাসাটা একটু বেশি সুখী হয়।

তপতী—হয়তো হয়। কিন্তু সে-জন্যে...।

জর্জ হেসে চেঁচিয়ে ওঠে।—সে-জন্যে আমি বলবো না যে, তুমি আমাকে না ভালবাসলেই ভাল করতে। যখন জানি শুরু হয়েই গিয়েছে, তখন থামবার দরকার কি, আর ভাবনা করেই বা লাভ কি?

তপতী—ভাবনা করবার কোন কারণও নেই। মানুষ তার নিজেরই মনগড়া

—সেই ভয়ানক হিংস্র ইনভেডার, যেটা সোমনাথের মন্দির বার বার ভেঙেছিল?

—ইয়েস তপতী, তারই নামে জয়গান গাওয়া একটা বই আছে, এক হিন্দু পণ্ডিত-কবিই লিখেছিলেন, উদয়রাজের লেখা রাজবিনোদ।

—ছিঃ! যেন হঠাৎ ঘেন্না পেয়ে শিউরে ওঠে তপতী।

জর্জ হাসে—কার ওপর রাগ করছো তপতী?

তপতী—এমন বই লিখতে পেরেছিল যে পণ্ডিত তার কোন মনুষ্যত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। নিজের দেশের এক সর্বনেশে শত্রুর প্রশস্তি গাইতে···

জর্জ—যাক, আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় তোমাদের গভর্নমেন্টের পেটোয়া সোসাইটিটার উপর রাগ করছো।

তপতী—কি বললে?

জর্জ—সোসাইটির মনুষ্যত্বে বোধহয় কোন ভুল নেই? ইংরেজীতে অনুবাদ করবার মত এত বই সংস্কৃত-সাহিত্যে থাকতে, তারা দেশের ইতিহাসের অপমান-কারী একটা ইনভেডারের প্রশস্তিকে অনুবাদ করবার জন্য বেছে নিয়েছে—এটা বেশ ভাল মনুষ্যত্বের প্রমাণ, কেমন?

তপতী চমকে ওঠে।—বুঝেছি, তুমি ঠাট্টা করছো জর্জ। এই সোসাইটিকে ঘেন্না করে বলা যায়···।

জর্জ হাসে—যাক, আর কিছু বলে দরকার নেই। ওতে কোন লাভ হবে না। তাতে আমার ধারণা বদলাবে না।

তপতী—তোমার কোন্ ধারণা?

জর্জ—যদি আবার রাগ না কর, তবে বলতে পারি।

তপতী—বল। রাগ করবো না।

জর্জ—আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছি, একটু লজ্জাও পেয়েছি তপতী, তোমার দেশ নিজেই নিজেকে অপমান করতে বড় ভালবাসে।

তপতী গম্ভীর হয়।—যখন কথা দিয়েছি, তখন রাগ করবো না, তর্কও করবো না।

জর্জ হাসতে চেষ্টা করে।—শুনে সুখী হলাম, যদিও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

তপতী—কেন?

—বোধহয় আমার মনে একটা সন্দেহ আছে।

—সন্দেহ?

—হ্যাঁ। মনে হয়, তোমার দেশকে আমি মনে-প্রাণে ভালবাসতে পারছি না বলে তুমিও আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে পারবে না।

—এমন সন্দেহ করবার মত কোন কারণ দেখতে পেয়েছ?

—এখনও দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু বুঝতে পারছি না, কেন আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

—ছিঃ, জর্জ। তুমি ভয়ানক ভুল করছো।

—হতে পারে, তোমাকে শ্রদ্ধা করতে যদি আমার মনে কোন কুণ্ঠা গোপন হয়ে থাকে, তবে সেটা ভুল করাই হবে; ভয়ানক ভুল।

কথাগুলি মৃদুস্বরে বলতে গিয়েও জর্জের সারা মুখের ছবিটা যেন আহত মানুষের মুখের মত একটা অস্বস্তির জ্বালা চাপতে গিয়ে লালচে হয়ে ওঠে। যেন জর্জের কল্পনার আনন্দটা একটু ভয় পেয়েছে। কিংবা জীবনের একটা প্রিয় বিশ্বাসের গায়ে তীক্ষ্ণ এক অপমানের কাঁটার খোঁচা লেগেছে।

তপতীর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ একটা শংকার ছায়া ছটফট করে—আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে না, এই কি তোমার সন্দেহ?

জর্জের চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিস্ময়ের আবেশে মুগ্ধ হয়ে থমথম করে।—কি বললে তপতী? বিয়ে?

—হ্যাঁ।

—কবে বিয়ে?

—তুমি যেদিন বলবে?

তপতীর একটা হাত বুকের কাছে টেনে নেয় জর্জ।—তোমাকে কি-কথা বলে যে আদর করবো, ভেবে পাচ্ছি না তপতী। এই কথাটি তোমার মুখে কোনদিন শুনতে পাইনি বলেই আমার ভুল হয়েছিল তপতী।

—বুঝলাম না।

—সন্দেহ করতে হয়েছিল, তপতী বোধহয় তার জীবনের সাথী হবার অধিকার দিয়ে আমাকে সুখী করতে চায় না। শুধু একটা স্পোর্টের আনন্দ দিয়ে আমাকে দুদিনের জন্য খুশি করে দিতে চায়!

—কী অদ্ভুত সন্দেহ!

—না, আমার সন্দেহের জন্য এখন আমি লজ্জিত। আমাকে মাপ কর তপতী।

তপতীর দু'চোখের দৃষ্টিতে তবু একটা অভিমান যেন নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে থাকে।—আমার ভালবাসাকেও তুমি ভয় করতে শুরু করেছিলে, আমার দুর্ভাগ্য।

জর্জ—আমারই দুর্ভাগ্য। তোমাকে শ্রদ্ধা করতে বাধা ছিল। কিন্তু থাক এসব কথা। আমি আজ সম্মানিত, আশ্বস্ত, নিশ্চিন্ত। তোমার ভালবাসার সাহসকে ধন্যবাদ।

তপতীর মুখটাও যেন বিপুল এক আশ্বাসের স্নিগ্ধতায় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

চলে যাবার আগে তপতীর খোঁপা থেকে দুটো ফুল তুলে নিয়ে জর্জ বলে—তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পার তপতী, খেলার ছলে ভালবাসা আর ভালবাসার ছলে খেলা করা, দুইই দুটো সমান ভুল।

তপতী হাসে—নিশ্চয় স্বীকার করি।

—বিশ্বাস কর নিশ্চয়?

—নিশ্চয়।

—কবে থেকে?

—এই তো কিছুক্ষণ আগে, যখন তুমি বললে যে, তুমি এদেশেই থাকবে।

—তাতে কি প্রমাণিত হলো?

—ঐ যে, যা বললে। প্রমাণিত হলো যে তুমি ভালবাসার ছলে খেলা করছো না।

তপতীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কৃতার্থভাবে হাসতে থাকে জর্জ।—তোমারও মনে সন্দেহ ছিল?

তপতী—ছিল বোধহয়।

জর্জ চলে যাবার পরেও তপতীর মনের ভিতরে যেন বিচিত্র এক প্রতিধ্বনির মূর্ছনা ভেসে বেড়াতে থাকে। না, সন্দেহ নেই। প্রতিধ্বনিটা যেন তপতীর ভালবাসার বিজয় সংগীত।

তপতীর ভালবাসার সাহসকে ধন্যবাদ জানিয়েছে জর্জ। এই সাহসটাও যে তপতীর ইচ্ছার জয়পতাকা। কোন ক্ষতি নেই, কেউ যদি এই বিয়েকে আশীর্বাদ না করে। জর্জ ক্রিস্টফার আর তপতী মল্লিক, স্বামী আর স্ত্রীর একটি নিরিবিলি ভালবাসার ঘরটা যদি একগাদা আশীর্বাদী চেঁচামেচির অভাবে একঘরে হয়ে যায়, তাতেই বা কি আসে যায়?

কিন্তু···নিরালা ঘরে সোফার উপরে পড়ে থাকা তপতীর শরীরটা যেন ধড়ফড় করে নড়ে ওঠে। কি আশ্চর্য, সত্যিই যে সোফার কাঁধের উপর মাথাটা কতক্ষণ ধরে এভাবে এলিয়ে পড়ে আছে, কে জানে? চোখ দুটোই বা বন্ধ হয়ে এত স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল কখন? ইস্, কতকাল আগের কত কথা আর কত ছবি এই সামান্য কিছুক্ষণের ঘুমন্ত প্রাণটার উপর ছুটোছুটি করে চলে গেল!

কথা নয়, যেন কতকগুলি ঠাট্টার কোরাস। ছবি নয়, যেন একগাদা ভ্রুকুটি। নিদারুণ একটা ভুলের ইতিহাস ধিক্কার দিয়ে ছুটোছুটি করেছে। তোমার সারা জীবনের ইচ্ছা চেষ্টা বিশ্বাস আর ধারণা, সব হেরে গিয়েছে। তুমি একটি আস্ত পরাজয়। তোমার সব হিসেব মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। জর্জ ক্রিস্টফারকে ভালবেসেছ, এটা তোমার জীবনের সেই নিদারুণ হিসাব আর সাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত। ভালবাসার নিজেরই একটা নিয়ম আছে, তোমার ইচ্ছার শাসনে ভালবাসা চলে না।

দু'হাত দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে জোরে একটা হাঁফ ছাড়ে তপতী। না, আর কিছু বলবার নেই। অস্বীকার করবারই বা যুক্তি কোথায়? মানুষের ইতিহাসেও যে একটা ঠাট্টার গল্প এখনও হাসছে। সিরাকিউজের সেই টায়রেন্ট রাজা ডায়োনিসিয়াস চেয়েছিল, বরফের উপর ফুল ফুটুক। কিন্তু বরফের উপর ফুল ফোটেনি। রাজ্যের সব মালী ভয় পেয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে

কোন বাগানের মাটিতেও ফুল ফোটেনি।

ছিঃ, যেন নিজেরই অতীতের ইতিহাসটাকে ছোট্ট একটা ঠাট্টার শব্দ দিয়ে ধিক্কৃত করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় তপতী। কে জানে কোন্ অহংকারের ভুলে তপতীর অতীতের জীবনটা, ঐ টায়রেন্টের মত মানুষের সংসারের উপর তার ইচ্ছাটা চালাবার চেষ্টা করেছিল।

পাশের ঘরের দেয়ালঘড়ির বুকে সময়ের সংকেত মিষ্টি শব্দ করে বাজছে। কলেজ যাবার সময় হয়েছে।

ব্যস্ত হতে গিয়ে তপতীর চোখে-মুখে যেন একটা নিরুদ্বেগ তৃপ্তির হাসি এক ঝলক ভোরের আলোর মত চমকে ওঠে। তপতী যেদিন বলবে, সেদিনই বিয়ে হয়ে যাবে। তপতীর হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই যেন একটা লগ্নের সংকেত মিষ্টি শব্দ করে বাজতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ভাবতে গিয়ে প্রাণটাও যেন একটু লজ্জিত হয়ে হেসে ওঠে, ভালই হয়েছে। অতীতের সেই সব ভুলের কাঁটা ধন্য করে তপতীর আশা যে আজ সত্যিই গোলাপ হয়ে ফুটেছে। ভুল করেই এতদিনের অপেক্ষার যাতনা সহ্য করেছিল বলেই যে জর্জকে আজ নিজের জীবনের ঘরে দেখতে পেয়েছে তপতী।

নীরুদির বাড়িতে আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা তপতীর জীবনের মান-সম্মানের কথাটা ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। এসেছেন যাদবপুরের পিসিমা। অমিতা আর সুমঙ্গলাও এসেছে। আলিপুরের ছোটমাসি এসেছেন। তা ছাড়া আরও একজন এসেছেন, যাঁর আসবার কথা ছিল না, এবং তিনি তপতীর কোন আত্মীয়-সম্পর্কের মানুষ নন, বান্ধবী অমিতা ও সুমঙ্গলার মত তপতীর কোন পরিচিত-জনও নন। তিনি হলেন সুধাময়বাবু।

বাপ নেই মা নেই, ভাইগুলো সব বিদেশে পড়ে আছে, মেয়েটার এরকম একটা একলা আর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোথাকার একটা ইংরেজ ছোকরা বিশ্রী একটা সমস্যা ঘটিয়ে তুলেছে, যাদবপুরের পিসিমা আর আলিপুরের ছোটমাসি এই কথাই ভাবছেন। কিন্তু উপায় কি? সে-কথাও ভাবছেন। ভয় হয়, তপতী ওর এরকম বয়সের জীবনেও একটা আরও বিশ্রী রকমের ভুল করে ফেলতে পারে। শুধু নিজের জীবনের সম্মান নয়, ভবতোষ মল্লিকের বংশের সম্মান ভুল করে ডুবিয়ে দিতে পারে তপতী—যদি এখনই ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সাবধান না করে দেওয়া যায়।

সুধাময়বাবু বললেন—আমি কিন্তু তপতী মল্লিকের মান-সম্মানের কথাটা বড় করে ভাবছি না।

অমিতা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে—তবে কার সম্মানের কথা ভাবছেন?

সুধাময়—আমি ভাবছি বাঙালীর মান-সম্মানের কথা। জর্জ ক্রিস্টফারকে আমি কিছুটা চিনি। একটি বার্ড অব প্যাসেজ বলে মনে হয়। ফুর্তির আবেগে উড়ে

এসেছে, দুদিনের জন্য এখানে-সেখানে নেচে গেয়ে বেড়াবে, আর এরই মধ্যে কোন না কোন বাগানের ফল ঠুকরে দিয়ে সরে পড়বে।

অমিতা—কিন্তু উনি তো বলছিলেন, ব্যাপারটা তা নয়।…

সুধাময়বাবু—উনি কে?

নীরুদি বলেন—অমিতার স্বামী বিলাস, অর্কিয়লজির সার্ভেতে কাজ করে।

অমিতা—জর্জ ক্রিস্টকারের সঙ্গে ওঁর আলাপ-পরিচয় হয়েছে। জর্জ ক্রিস্টকার নিজের মুখেই ওঁকে একথা বলেছে, সে এদেশেই থাকবে আর এদেশেই এক বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করবে।

সুধাময়বাবু মৃদুভাবে হাসেন—একথা থেকে কি এমন কিছু প্রমাণিত হয় যে, আমার ধারণাটা মিথ্যে?

অমিতা—যদি এদেশেই থাকবে, আর তপতীকে বিয়ে করবে, তবে আর…।

সুধাময়—আহা! সেটাই কি এক হিসাবে বাঙালীর অপমান নয়?

অমিতা—ভগবান জানেন, আপনি কি বলতে চাইছেন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নীরুদি বলেন—আমি শুধু তপতীর বয়সটার কথা ভেবে লজ্জা পাচ্ছি। নিজের চেয়ে কম বয়সের একটা মানুষকে…, ভাবতে বিশ্রী লাগে, তপতীর মত শক্ত সাবধানী মেয়ের মনও এরকম হ্যাংলা হয়ে গেল কেন?

সুমঙ্গলা বলে—এখন শুধু আমাদের চেষ্টা করা দরকার, বিয়েটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তবেই সম্মান বাঁচবে।

সুধাময়বাবু যেন একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রূভঙ্গি করেন—কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় কিনা, যদি বিয়েটাই না হয়?

সুমঙ্গলা—না।

সুধাময়—কেন?

সুমঙ্গলা—আমি জানি, বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

যাদবপুরের পিসিমা বলেন—ভাল হয়, সাহেব ছেলেটা যদি হিন্দু হয়ে গিয়ে বিয়ে করে।

আলিপুরের ছোটমাসি বলেন—বিয়েটা হিন্দুমতে হলে আরও ভাল হয়।

সুধাময়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কি আশ্চর্য, আপনারা সবাই দেখছি বিয়ে দেবার কথাটাই চিন্তা করছেন। কিন্তু এমন বিয়ের অর্থটা কি?

অমিতা—আপনিই বলুন, কি অর্থ?

সুধাময়বাবু—আমি তো দু'বার বললাম। এটা আমাদের সমাজের অপমান, জাতির আর দেশের অপমান।

অমিতা আর সুমঙ্গলা বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সুধাময়বাবু তবু চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—আপনারা সবাই তপতী মল্লিকের আত্মীয় আর পরিচিত। তপতীর জন্যে আপনারা স্বার্থবাদীর মত কথা বলবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু

আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি শুধু জাতির সম্মানের কথাটা ভাবছি। যেন এদেশে কোন মানুষ ছিল না, যে-জন্যে তপতী মল্লিক আজ এক ইংরেজ ছোকরাকে বিয়ে করবে।

অমিতা ফিরে এসে বলে—আপনার ভাইপো সমরেশ কেন আইরিশ মেয়েটাকে বিয়ে করলো? এদেশে মেয়ে ছিল না? তাতে বাঙালী জাতের অপমান হয়নি?

সুধাময়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন।—আপনি খবরটা জানেন দেখছি। কিন্তু... সত্যি কথা...আমি ঠিক আপনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবো না,...বাঙালী জাতের মান-সম্মানের প্রশ্নও বোধহয় নয়...ওটা আমার একটা কথার কথা... আসল কথা হলো, আমি কিছুতেই কাণ্ডটা সহ্য করতে পারছি না।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন সুধাময়বাবু। তারপরেই উঠে দাঁড়ান।— আচ্ছা নমস্কার, আমি চলি। আপনাদের একটা পারিবারিক ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কিছু বলতে আসাই ভুল হয়েছে।

সুধাময়বাবু চলে যাবার পর ঘরের ভিতরে যাঁরা রইলেন, তাঁরা সবাই মহিলা। এই মহিলা-সমাবেশের মধ্যে ঘরের বা বাইরের কোন ভদ্রলোক নেই, কাজেই আলোচনাটাও এইবার মনখোলা আর মুখখোলা হয়ে উঠতে কোন বাধা নেই। হয়েও ওঠে।

নীরুদি বলেন—তুমি এত জোর দিয়ে কথাটা কেন বলছো, সুমঙ্গলা?

সুমঙ্গলা—কি কথা?

নীরুদি—তপতীর সঙ্গে সাহেবটার বিয়ে না হলে খুবই খারাপ হবে, কথাটার মানে কি?

সুমঙ্গলা—নিজের চোখ দুটোকে অবিশ্বাস করতে পারি না, তাই বলেছি।

যাদবপুরের পিসিমা চমকে ওঠেন—কি দেখেছো?

সুমঙ্গলা—দেখেছি, তপতীর জীবনে আর কোন লজ্জা-ভয়ের বালাই নেই। বিয়ের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার মত সামান্য সভ্য-ভব্য ধৈর্যটুকুও চুলোয় দিয়েছে তপতী।

—সর্বনাশ! আর্তনাদ করে ওঠেন যাদবপুরের পিসিমা।

—ছিঃ, চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেন আলিপুরের ছোটমাসি।

অমিতা হতভম্বের মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে—তপতীর মাথাটা কি খারাপ হয়েই গেছে?

নীরুদির গলার স্বর এবার বেশ তপ্ত হয়ে ওঠে।—বড় বেশি বেপরোয়া আর বেহায়া হয়ে গিয়েছে তপতী।

আলিপুরের ছোটমাসি—এ বয়সে এভাবে নিজেকে নষ্ট করতে পারে, ভাবতেও যে আমার আশ্চর্য লাগছে।

নীরুদি—বেশ তো, সাহেব ছোকরার সঙ্গে চেনা-শোনা আর ভাব-সাব যদিই

বা হলো, আমাদের পাঁচজনকে বলে একটা পরামর্শ তো নিতে পারতো। তপতী আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না বোধহয়।

সুমঙ্গলা—আমার শুধু ভয়, যদি বিয়েটা না হয়।

নীরুদি—এমন বিয়ে হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি ?

অমিতা—ভগবান করেন, সাহেবটা যেন ঠগ না হয়।

নীরুদি—ধরে নিলাম, সাহেবটা ঠগ নয়। ধরে নিলাম, বিয়েটা হবেই। কিন্তু ও ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করবার আছে ?

সুমঙ্গলা—আমাদের আবার কি করবার আছে! কিছুই না।

নীরুদি—সে কথাই বলছি। তপতী যখন বেপরোয়া হয়ে আমাদের সবাইকে তুচ্ছ করে, আর একটা যাচ্ছেতাইপনা করে সুখের ঘর বাঁধতে চাইছে, বাঁধুক। আমি আপত্তি করবো কেন ? কিন্তু আমি যাব না।

সুমঙ্গলা হাসে—কোথায় যাবেন না ?

নীরুদি—ওদের বিয়েতে।

সুমঙ্গলা—তপতী আপনাকে যেতে বলবে, এটাই বা মনে করছেন কেন ?

নীরুদি—মনে করছি না। যদি যেতে বলে, তবুও যাব না।

আলিপুরের ছোটমাসি—আমিও যাব না।

সুমঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাও বলে—আমরাও যাব না। কিন্তু…।

নীরুদি—কি ?

অমিতা—কিন্তু সত্যিই বুঝতে পারছি না নীরুদি, কেন ওদের বিয়েতে যেতে ইচ্ছে করছে না।

নীরুদি—বুঝতে অসুবিধের কিছু নেই। মানুষের জীবনের সব নিয়ম-কানুন চিরটা কাল তুচ্ছ করে তপতী শেষে বিয়েটাকেও একটা জুলুমের মত কাণ্ড করে তুললো—এতটা সহ্য করা উচিত নয় অমিতা। বয়স মানলে না, জাত মানলে না, সমাজ মানলে না, দেশ মানলে না, সাধারণ একটা মেয়েলী সাবধানতাকে মানলে না। কারও কোন উপদেশের পরামর্শের বা সাহায্যের ধারও ধারলো না। মেনে নিলাম, এসব করেও শেষ পর্যন্ত ওর একটা ভাল হয়েই যাবে। কিন্তু সেটা আমরা সবাই ভাল বলে মেনে নিতে পারি না।

আলিপুরের ছোটমাসি বলেন—ভুল করেও যদি কেউ বেঁচে যায়, তাতে ভুলটা মিথ্যে হয়ে যায় না, আর, মেনে নেওয়াও যায় না।

যাদবপুরের পিসিমা—আমরা যদি এ বিয়েতে যাই, তবে শুধু তপতী নয়, আর দশটা মেয়ের মনেও ধারণা হতে পারে তপতীর কাণ্ডটা আমরা সমর্থন করছি, ওতে দোষের কিছু নেই।

নিরুদি—ঠিক বলেছেন। ধরুন যদি আর পাঁচটা মেয়ে তপতীর পথ ধরে, তবে ওদের মধ্যে অন্তত তিন-চারটের জীবন কি নষ্ট হয়ে যাবে না ?

সুমঙ্গলা—শোনেন নি ? অপরাজিতার কি দশা হয়েছে ?

নীরুদি—কি হয়েছে ?

সুমঙ্গলা—সিমলাতে থাকতে ভালবেসে এক ইটালিয়ান মার্চেন্টকে বিয়ে করেছিল অপরাজিতা। একদিন পুলিশ এসে মার্চেন্ট ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে। জানা গেল, ভদ্রলোক সত্যি মার্চেন্ট নন, সোনার স্মাগ্‌লার।

নীরুদি—ভগবান করুন, তপতীর যেন এরকম দুর্ভাগ্য না হয়।

অনেকদিন আগে জর্জ দেশে ফিরে যাবে শুনে সেই যে একবার ভয় পেয়ে আর নিঃশ্বাসের একটা অভিমানের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, চোখের জল ফেলেছিল তপতী, তারপর আর কোনদিন নয়, অনেক কথা ভেবে চোখ ভিজেছে ঠিকই, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়। আজ কিন্তু খুবই ভয় পেয়ে, আর এত বড় বাড়ির সব চেয়ে ছোট ঘরটার এক কোণে নিরেট অন্ধকারের মধ্যে একটা সোফার উপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, নিজের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই, তবু বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আহত লজ্জার কান্না তপতীর চোখ দুটোকে কাঁদিয়ে আকুল করে তুলেছে। এ কি হলো ? এত সাবধান তপতী মল্লিকের প্রাণটা এত অসাবধান হয়ে গেল কেমন করে ? জর্জের হাত ধরতে লজ্জা করবার কোন দরকার ছিল না ; কিন্তু···এখনও যে বিয়েটা হয়ে যায় নি, এখনও যে জর্জকে তপতীর স্বামী বলে কেউ মনে করে না, স্বীকারও করে না। এতদিন ধরে এত সাবধানে রাখা এই শরীরের ভিতরে কোথায় লুকিয়েছিল এত লোভ, এত দুঃসাহস ? জোর করে জর্জের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে পারেনি কেন তপতী ?

ডাক্তার মৃণালিনী যে এমন একটা কথা সত্যিই বলে দেবেন, ভাবতেই পারেনি তপতী। মনে হয়েছিল, না, সে-সব কিছু নয়। শরীরটা এমনি শুধু একটু খারাপ হয়েছে। কিন্তু তপতীর হৃৎপিণ্ডের গভীরে গোপন করা একটা সত্যকে যেন এক মিনিটেই আবিষ্কার করে ফেললেন ডাক্তার মৃণালিনী।—আর মাস দুই পরে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে নেবেন। আর, একটু সাবধানে থাকবেন।

—তপতী, তুমি কোথায় ? ঘরের কোণে বসে, সেই কান্নারই মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠে আজই শুনতে পেয়েছে তপতী, তপতীর নাম ধরে জর্জ ডাকছে। তপতীকে দেখতে না পেয়ে যেন ভালবাসার একটা প্রাণ উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকছে।

শেষে তপতীর সেই কান্নার চোখই হেসে উঠেছে। তপতীকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আর যেন দুর্জয় একটা প্রতিজ্ঞার মূর্তি হয়ে জর্জ শুধু কয়েকটা কথা বলেছে—আমি থাকতে তোমার কিসের লজ্জা, কিসের ভয় আর কিসের অপমান ? থ্যাংক গড, আমার ছেলে তোমার কাছে এসে গিয়েছে।

তপতী বিহ্বল হয়ে বলে—এবার তবে বিয়ের দিনটা··· ।

জর্জ—ঠিক করে ফেল। আমি তো আগেই বলেছি, যেদিন তোমার সুবিধে, যেদিন তোমার ইচ্ছে, সেদিনই বিয়েটা হয়ে যাক্।

তারপর, আজকের সারাদিনের কোন মুহূর্তেও তপতী মল্লিকের প্রাণের কাছে কোন বিষণ্ণতার ছায়াও ঘেঁষতে পারেনি। সেই চরম অসাবধানতা, যেটাকে হঠাৎ ভুলের একটা ভয়ানক অপরাধ বলে মনে করে কেঁদে ফেলতে হয়েছিল, সেটাও যে জীবনের একটা পরম কৃতার্থতার মত গর্বের হাসি হেসে তপতী মল্লিকের মুখের হাসিটাকে গর্বিত করে রেখেছে।

তপতীর ইচ্ছার আনন্দকে ভয় পাইয়ে দেবার মত কোন ভ্রূকুটি আর পৃথিবীতে নেই। শুধু একটা দুঃখ এই আনন্দের বুকে যেন ছোট্ট একটা কাঁটার মত বিঁধছে। হরেনকাকাবাবুকে চিঠি লেখা আর সম্ভব হলো না। কেন যেন মনে হয়, হরেন-কাকাবাবু এই বিয়ের কথা শুনে একটুও খুশি হবেন না।

ভয়টা ঠিক হরেনকাকাবাবুকে নয়, হরেনকাকাবাবুর মনের একটা ভয়ানক সংস্কারকেই ভয়। গ্লাসগো বার্লিন আর মিশিগান কাউকেই ক্ষমা করতে পারেননি হরেনকাকা, এমন-কি লিট্‌ল ফ্লাওয়ার্সও যাঁর চোখের বিষ হয়ে উঠেছে, ক্লারা আর জুলিয়ানদের ফটোর অ্যালবামটাকে ঘেন্না করে হাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেন যিনি, তিনি কি তপতীর এই বিয়েকে ক্ষমা করতে পারবেন? যাক্, যিনি আশীর্বাদ করতে পারবেন না, যেচে তাঁর কাছ থেকে অভিশাপ কুড়োবার দরকার কি? হরেনকাকাবাবুকে চিঠি না দেওয়াই ভাল।

আর দশদিন পরে, এই সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের এক সার গুলমোরের মাথার উপর আকাশের চাঁদের সুধা গলে গলে ঝরে পড়বে। আর সাতদিন পরে পূর্ণিমা তার মানে বিয়ের দিনের শুভসন্ধ্যায় প্রথম আঁধার একটু ঘনিয়ে উঠেই হেসে উঠবে। কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদটা তো আর এককালি রোগা চাঁদ নয়। গেটের মাথার বুগেনভিলিয়ার ঝাড়ও সেই ঢালা জ্যোৎস্নায় স্নান করে ঝলমল করবে।

তপতী মল্লিকের দু'চোখের দৃষ্টিতেও যেন জ্যোৎস্না ঝরছে। সারা জীবনের অপেক্ষার অদৃষ্টটা যে এমন একটা পরিতৃপ্তির জ্যোৎস্নাময় লগ্ন পেয়ে যাবে, এ যে তপতীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। চিঠি লিখতে শুরু করে তপতী।

প্রথম চিঠিটা জর্জ ক্রিস্টফারকেই লিখতে হলো। এলিয়ট রোডে মিসেস পার্কারের ঘরোয়া হোটেলের ছোট একটি ঘর আর একটি বারান্দা, আর তিন শেল্‌ফ বই, জর্জ ক্রিস্টফারের প্রবাস-জীবনের এই সামান্য সংসারটাও তপতীর এই চিঠি পেয়ে বোধহয় জ্যোৎস্নাময় হাসিতে ভরে যাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এই সেদিনও জর্জের চোখে যেন অদ্ভুত একটা ভীরুতার ছায়া দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সে ছায়াটা যেন একটা সন্দেহ। বিয়ের দিনটা স্থির করতে দেরি হচ্ছে বলে জর্জের মনটা যেন তপতীর ইচ্ছার প্রাণটাকেই সন্দেহ করেছে। এখনও যদি জর্জের মনে কোন ছায়া থেকে থাকে, তবে এই চিঠিই সে ছায়ার সব অন্ধকার আজ ঘুচিয়ে দেবে। মনে মনে বোধহয় একটু লজ্জিতও হবে জর্জ।

জর্জের কাছে চিঠি লেখা শেষ করতে গিয়ে যেন একটু হাঁপিয়ে পড়ে তপতী।

বুকটা ধড়কড় করছে। নিঃশ্বাসের সব বাতাস যেন নিজেরই দুঃসাহসে ভয় পেয়ে মন্থর হয়ে গিয়েছে। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মোছে তপতী।

কিছুদিন আগেও একবার, তপতী মল্লিকের এই উৎসবমুখী প্রাণের সব নিঃশ্বাসের বাতাস হঠাৎ মন্থর হয়ে গিয়েছিল। দুঃসাহসের ভয়ে নয়, দুঃসাহসের লজ্জায়। সত্যিই যে তপতীর ইচ্ছাটা সেদিন যেন মনের ভিতরে কথা বলে উঠেছিল, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না। বিয়ে না হলেই বা কি আসে যায়? জর্জ আর তপতী, দুটি ভালবাসার প্রাণ যদি বিনা রাখীর বন্ধনে চিরকালের দুটি বান্ধব হয়ে থেকে যেতে পারে, তবে ক্ষতি কি? আর, এর মধ্যে আক্ষেপেরই বা কি আছে। ঠিকই তো, মিথ্যে সন্দেহ করেনি জর্জ।

কিন্তু, সেদিনের এই কল্পনার ভাষাটাকে একটা প্রলাপ বলে মনে করতেও দেরি হয়নি। সেই মুহূর্তে, বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ উথলে ওঠা একটা লজ্জিত বেদনা তপতী মল্লিকের চোখ দুটোকেও চমকে দিয়েছিল।

আর, বেশিক্ষণ দেরিও করেনি তপতী। টেলিফোনে ডাক্তার মৃণালিনীকে ডাক দিয়েছিল তপতী। এসেছিলেন মৃণালিনী। আর তারপর, ডাক্তার মৃণালিনী চলে যাবার একটু পরেই, যেন নিদারুণ এক লজ্জার ভারে অলস হয়ে এই ঘরেরই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল তপতী।

কিন্তু সে ঘুমের মধ্যে কোন লজ্জা ছিল না। ঘুমটাই যেন একটা সার্থক গৌরবের যত উৎসবের স্বপ্ন দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আলিপুরের ছোটমাসি যে অভিশাপের কথা বলেছিলেন, সেটা একটা মিথ্যা কৌতুকের কথার চেয়েও অসার। ছোটমাসির ধারণাকে মিথ্যে করে দিয়েছে তপতীর এই দেহটার অনাহত অহংকার। ঝরনার কলগীতি একটুও মৃদু হয়ে যায়নি। পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটাই নতুন মাধবীলতা হয়ে ফুল ফুটিয়েছে।

হ্যাঁ, সুলেখার বাচ্চাটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। সেদিন সত্যই কেমন যেন একটা নির্বোধ ভাবনার ভুলে বাচ্চাটাকে ভাল করে বুকে জড়িয়ে ধরতে ভুলে গিয়েছিল তপতী। সুলেখা আশ্চর্য হয়েছিল। আশ্চর্য হবারই কথা। একটা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে যে-মেয়ের আচরণে কোন লোভের চেষ্টা নেই, লোকে তাকে মেয়েমানুষ বলে মনে করবে কেন?

বিয়ের দিনের কথা জানিয়ে আর নিমন্ত্রণ জানিয়ে আলিপুরের ছোটমাসিকে চিঠি লিখতে গিয়ে তপতীর চোখে হঠাৎ যেন একটা গর্বের হাসিও ফুটে ওঠে। —আপনি আসবেন, সুলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, সুলেখা যেন ওর বাচ্চাটাকেও সঙ্গে নিয়ে আসে।

সুমঙ্গলা আর অমিতা, দুই বান্ধবীর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে যেমন আর একটা, বেশ একটু অদ্ভুত রকমের গর্বের হাসি তপতীর চোখ দুটোকে হাসিয়ে দিয়ে ঝিকঝিক করে।

নীরুদির কাছে চিঠিটাকে একটু বড় করে লিখতে হলো। আপনি যেন

সকাল-সকাল, অন্তত বিকাল হবার আগেই চলে আসেন নীরুদি।

নীরুদির কাছে এত বড় চিঠি লিখতে গিয়ে যেন আর-এক রকমের একটা গর্ব, যেন একটা অসাধারণ সৌভাগ্যের গর্ব, তপতী মল্লিকের চোখের তারা দুটোকে উজ্জ্বল করে তোলে। নীরুদিও সেদিন তপতীর পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সটাকে যেন একটু খোঁটা দিয়ে আর বেশ একটু ছোট করে দিয়ে কথা বলেছিলেন। ধরণীবাবুর মত বয়স্ক প্রবীণ ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কেউ থাকতেই পারে না, যে এসে সমাদর আর শ্রদ্ধা দিয়ে তপতীর হাত ধরতে পারে। নীরুদি জানেন না যে, জর্জের বয়স তপতীর চেয়ে কিছু কমই হবে। প্রাণের নবীনতার চোখে তপতী একটা জরা হয়ে যায়নি। সত্যিই, নীরুদি সেদিন বড় বেশি শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কলেজে যাবার পালা এখন স্থগিত আছে। কাজেই তাড়াহুড়ো নেই। চিঠিগুলিকে ডাকে ফেলে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে বিয়ের রেজিস্ট্রার অজিতবাবুকে টেলিফোন করে তপতী।

গেটের মাথার উপর বুগেনভিলিয়ার ঝাড় দুলছে, কিন্তু অনেক পাতা শুকিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ভাল দেখাচ্ছে না।

মালীকে ডাক দিয়ে, বাগানটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে তপতী। দেখতে অদ্ভুত লাগছে, সেই পুরনো বকুলটা যেন তপতীর দিকে তাকিয়ে আছে।

মালী আসতেই ব্যস্তভাবে উপদেশ দেয় তপতী—গেটের মাথার উপরে ঐ লতাগুলোর সব শুকনো পাতা সরিয়ে দাও।

॥ ছয় ॥

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতবাবু আসবেন সন্ধ্যা হবার একটু পরে। তপতীর বিয়ের দলিলে সাক্ষী হয়ে সই করবেন আর যে দুজন তাঁরা সন্ধ্যা হতেই এসে যাবেন। কলেজের প্রিন্সিপাল মোনিকা রাসেল আর ডোরার বাবা মিস্টার ডানকান।

আর যাদের আসবার কথা, মাসিমা আর পিসিমারা, তাঁরা চলে আসবেন বিকাল হবার আগেই। নীরুদিকে দুপুরেই চলে আসবার জন্য অনুরোধ করে আবার চিঠি দিয়েছে তপতী। জর্জ টেলিফোনে জানিয়েছেন, সে আসবে তার চারজন অভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময়। 'কি করবো বল ? আমার দুর্ভাগ্য এতদিনের মধ্যেও আমার পক্ষে কোন ভারতীয় বন্ধু পাওয়া সম্ভব হলো না।'

—তপতী। টেলিফোনেও একটা নিবিড় আহ্বানের স্বরে তপতীকে ডাক দিয়ে, তপতীর মনটাকে আরও বিহ্বল করে দিয়েছে জর্জ।

—কি বলছো, টেলিফোনে আবার ওভাবে ডাকছো কেন ?

—আমার একটা অনুরোধ আছে তপতী।

—কি ?

—সেই, সেদিন যেমন সেজেছিলে, ডোরার বিয়ের দিনে, ঠিক সেইরকম নীল

শাড়ির সঙ্গে একটা কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়াবে। আর···।

—আবার কি?

—খোঁপাতে রজনীগন্ধা।

—তথাস্তু। আসতে কিন্তু দেরি করো না। হ্যাঁ···কিন্তু তুমি যেন আজকের দিনেও তোমার ঐ শক্ত সার্জের কোর্ট আর ট্রাউজারে···।

—তুমি ভুল করছো তপতী। আমি আমার দেশী সাজেই যাব। ওটা বদলাতে পারবো না। তোমার দেশের পুরুষদের মত সাজ করতে আমার একটুও ভাল লাগবে না।

—কেন?

—ভাল লাগলে ভালই ছিল, কিন্তু ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয় না।

—তার মানে, এদেশকে এখনও আপন বলে মনে করতে পারলে না জর্জ।

—কেমন করে মনে করি বল? এদেশ কি আমাকে আপন বলে মনে করতে পেরেছে?

—থাক, আজ আর তর্ক করো না জর্জ।

—ঠিক কথা, তর্কের আর কোন দরকারই নেই।

এক গাদা রজনীগন্ধার কুঁড়ি টেবিলের মার্বেলের উপর পড়ে আছে। এখনও মিররের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় হয়নি। এখন মাত্র দুপুর। কিন্তু নীরুদির যে এরই মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা ছিল।

নীরুদি না এলে আজকের উৎসবের সব কাজের দায় সামলাবেই বা কে? এতগুলি মানুষকে চা খাওয়াবার ভার খানসামা পাঁচকড়ির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। অন্তত আজকের দিনে, উৎসবের কাজটা চাকর-বাকরকে দিয়ে করানো উচিত নয়। লোকে বলবেই বা কি? কলকাতা শহরে যার এতগুলি পিসিমা মাসিমা আর কুটুম্বজন আছে, তার বিয়ের উৎসবের কাজে ব্যস্ত হবে কতগুলো চাকর-বাকর?

সেই জন্যেই নীরুদিকে তিনটে চিঠি দিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে তপতী, আপনি একটু আগে না এলে আমাকে কিন্তু খুবই বিপদে ফেলা হবে নীরুদি।

গেটের দরজাটা শব্দ করে নড়ে উঠেছে। তপতীর উৎসুক চোখ দুটো খুশি হয়ে চমকে ওঠে। একটু দেরি হলো, যাই হোক, আসতে খুব বেশি দেরি করেন নি নীরুদি।

না, নীরুদি নয়। ডাকপিয়নটা আসছে। আরও খুশি হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়ায় তপতী। চিঠিটাকে লুফে নেবার জন্যে তপতীর হাতদুটো যেন ছটফট করছে। নিশ্চয় গ্লাসগো থেকে বড়দার ব্লেসিং এসেছে।

না, বড়দার ব্লেসিং নয়, নীরুদির লেখা একটা চিঠি।

—তুমি হয়তো আশা করে থাকবে, তাই জানিয়ে দিলাম, তোমার বিয়েতে

আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।

এ কি ? কী-ভয়ানক অভদ্রতার কথা লিখেছেন নীরুদি।

—ভণ্ডামি করতে পারবো না ; তাই তোমার বিয়েতে যেতে পারলাম না। যে বিয়ে দেখে খুশি হব না, সে বিয়েতে গিয়ে মিছিমিছি একটা খুশির ভান করতে পারবো না। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে তোমার চোখে যখন একটা ইংরেজ ছোকরাকে এত ভাল লেগেছে'তখন···।

কোন্ সাহসে নীরুদি এমন করে ঠাট্টা করেন। নীরুদির দেবর বলাই যে পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে একটা ইংরেজ মেয়েকে··· ।

—তখন আমাদের কিছু বলবার নেই।

যাক্, নীরুদি তবু একটা কাণ্ডজ্ঞান রেখে কথাগুলি লিখেছেন।

—কিন্তু···।

এর মধ্যে আবার কিন্তু কেন ?

—কিন্তু যে রকম বিশ্রী কাণ্ড করে নিয়ে তারপর যে বিয়ে করছো, সে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে আমাদের সাহস নেই।

কেন ? নীরুদির অণিমা কি ঠিক এইরকমই একবছর ধরে ভালবাসার কাণ্ড করে তারপর বিয়ে করেনি ?

—আমি যাব না। তোমার পিসিমা আর মাসিমাদের কেউই যাবেন না। সকলেই লজ্জিত ও অপমানিত।

—কেন ? তপতীর চোখের দৃষ্টিটা কঠোর হয়ে ওঠে।

—কারও জানতে আর বাকি নেই যে, তুমি একটা কেলেঙ্কারীর আনন্দ পেটে পুষে রেখেছ। ছিঃ, তপতী, তুমি যে এরকম পাগল হতে পার, আমরা কেউ যে কোন দুঃস্বপ্নেও সে-ভয় করিনি।

কেলেঙ্কারীর আনন্দ ? কী-ভয়ানক হিংস্র হয়ে কথা বলছে নীরুদির চিঠিটা।

—কেমন করে জানলাম জান ? আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকের মেট্রন বনবালা নিজে এসে আমাকে এই কেলেঙ্কারীর কথা বলে গিয়েছে।

বনবালা। কোন্ জগতের মানুষ এই বনবালা ? সে জানবে কেমন করে তপতীর জীবনের ইচ্ছাটা তপতীর হৃৎপিণ্ডের গভীরে যে এরই মধ্যে একটা প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছে ?

—বনবালা কেমন করে জানলো জান ? ডাক্তার মৃণালিনী বনবালাকে বলেছেন।

চিঠিটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে যেন গুঁড়ো করে দিতে চায় তপতী। হাতটা থরথর করে কাঁপে, সেই সঙ্গে চোখ দুটোও।

আর ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ঘরের ভিতরে ছুটে চলে যায়। আর মিররের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই দেখতে পায়, ভবতোষ মল্লিকের মেয়ে তপতী মল্লিকের চোখ-মুখ আজ যেন একটা হিংস্র স্পর্ধায় বীভৎস হয়ে

উঠেছে। তপতীর জীবনের উৎসবকে বয়কট করেছে পৃথিবীর আশীর্বাদ। করুক গিয়ে, পৃথিবীর কোন ভ্রূকুটিকে ভয় করে না তপতী।

কিন্তু বুঝতে পারে তপতী, মিররের সামনে ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তপতীর স্পর্ধাময় মূর্তিটা করুণ হয়ে গিয়েছে। মিররের কাছ থেকে কখন সরে গিয়েছে, তাও জানে না। বিকেল যে হয়েছে, বাগানের গাছে কাকের কলরবও যে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তাও বুঝতে পারেনি। বিছানার উপর লুটিয়ে আর একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে তপতী।

একটা আর্তনাদ চেপে দিয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে তপতী। না, আর চেপে রাখবার দরকারই বা কি? এখনই টেলিফোন করে নীরুদিকে একবার জানিয়ে দিলে হয়, কেলেঙ্কারী নয় নীরুদি, জীবনের অনেকদিনের ভুল ভাঙতে গিয়ে একটু বেশি সাহস করে ফেলেছি। সাবধানে ভালবাসতে পারা যায় না, ভালবাসলে সাবধান হওয়া যায় না।

না, নীরুদিকে এসব কথা বলে কোন লাভ হবে না। নীরুদি কোন্ ছাই বুঝবেন, কি ভুল করেছিল তপতীর জীবনটা, আর সে ভুল ভাঙলোই বা কেমন করে?

যদি বলা যায়, মনের মত করে কাউকে পাওয়া যায় না, মনের মত হয়ে যায় বলেই তাকে পাওয়া যায়; কারও সঙ্গে কারও মিলটিল থাকে না, অমিলগুলিই ভালবাসার দায়ে মিলে যায়। তারই নাম মিলন। ভেবে-চিন্তে ভালবাসা হয় না, ভালবেসে ফেলে তবে ভাবতে হয়; জর্জকে একটা ইংরাজ ছোকরা বলে মনে করো না নীরুদি, জর্জ আমার ভুল-ভাঙানো আনন্দের আবিষ্কার; তবে কি নীরুদি···।

বললে কিছুই বুঝবেন না নীরুদি; শুনে হয়তো আরও ঠাট্টা করবেন, এসব কথা হলো একটা বেশি শিক্ষিত মেয়ের কাব্যি করা বাচালতা। কেলেঙ্কারীর একটা ফিলসফি শোনাচ্ছে হিস্ট্রির এক মাস্টারনী।

থাক্, নীরুদির মনের ঘেন্না বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। নীরুদির কাছে আবেদন করার কোন মানেও হয় না।

কিন্তু, নীরুদির চিঠির সবটা বোধহয় পড়া হয়নি। এতগুলি বাজে কথা লিখে শেষদিকে আবার কোন্ নতুন বাজে কথাটা লিখেছেন নীরুদি?

বিছানার উপর একটা বাজে কাগজের আবর্জনার মত পড়ে আছে নীরুদির চিঠিটা। চিঠিটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার পড়তে থাকে তপতী।

—আমরা তোমার খুব নিকটজন নই। কাজেই তুমি বলতে পার, তোমার ভালমন্দের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এত দুঃখ করবার কোন অধিকার নেই। বেশ তো, নেই, মেনেই নিচ্ছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেতেন। এই ঘেন্না কি তিনি সহ্য করতে পারতেন?

বাবাও ঘেন্না করতেন? একটা দুরন্ত বোবা জিজ্ঞাসা যেন তপতীর বুকের ভিতরটাকে গুমরে দিয়ে ছটফট করতে থাকে।

বাবার কথা ভেবেও ভয় পেয়ে বুকটা গুমরে উঠবে, এমন ভয় যে তপতীর জীবনে কোনদিন ছিল না। ভুলেই গিয়েছে তপতী, এই বাড়িটা ভবতোষ মল্লিকেরই একটা সাধের ইচ্ছার বাড়ি। তপতী নামে তাঁর মেয়েটির যথেচ্ছার বাড়ি নয়।

ঠিক, সত্যি কথা বলেছেন নীরুদি, বাবাও এ বিয়েতে আশীর্বাদ করতেন না। এই ভয়ংকর সত্যের একজন সাক্ষী আজও বেঁচে আছেন, ভবতোষ মল্লিকেরই প্রাণের বন্ধু হরেনকাকাবাবু।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভবতোষ মল্লিকের বাড়িটা সমাধির মত নীরব। উৎসবটা মরেই গিয়েছে মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। আরও ভাল করে মরে যাক্। মানুষের আশীর্বাদ পাবে না যে উৎসব, সে উৎসবে কাজ নেই।

তপতীরই বা আর থেকে কাজ কি? জীবনের প্রথম ভালবাসার গল্পটাকে, হোক না অনেক বেশি বয়সের মাত্রাছাড়া ভালবাসার গল্প, এখানেই ফুরিয়ে দিলে ক্ষতি কি?

ছি-ছি! তপতী মল্লিকের স্পর্ধার অদৃষ্টটা কী-ভয়ানক অসহায়ের মত দুর্বল হয়ে আক্ষেপ করছে। বিয়ের দিনে দু-চারটে আত্মীয়জন এসে সোরগোল করতে রাজি হলো না বলেই তপতী মল্লিকের জীবনের উৎসব এত করুণ হয়ে মুসড়ে পড়বে কেন? নীরুদির একটা চিঠিতে লেখা কয়েকটা কুসংস্কারের ধমক শুনেই একেবারে নিজের জীবনেরই উপর হিংস্র হয়ে উঠতে চাইছে তপতী মল্লিকের মন; এ কেমন ভীরু মন?

কিন্তু শুধু নীরুদি তো নন, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ছোটমাসি আসবেন না। সবচেয়ে আশ্চর্য সুমঙ্গলা আর অমিতাও আসবে না। আসবার হলে ওরা কি এই দশটা দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা না দিয়ে যেত?

কি আশ্চর্য, ঐ কয়েকটা মানুষ বিয়েতে আসবে না শুনেই বিয়ের উৎসাহটাকেই এত বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছে কেন? আশা আর ভালবাসার সৌভাগ্য নিয়ে একটা একা ঘরে পড়ে থাকবার কল্পনাটা যাকে কোন মুহূর্তেও ভয় দেখাতে পারেনি, তাকে কেমন করে এত ভীরু করে দিতে পারলো নীরুদির চিঠিটা? কি এমন শক্তি আছে ঐ চিঠিতে? এত সাহস করে, জীবনের প্রতিজ্ঞাটাকে এত বিশ্বাস করে, শেষে শুভদিনটাই এমন কাঙাল হয়ে গেল কেন? পরের মুখের একটু খুশির হাসি আর দুটো ভাল কথার চেঁচামেচি শোনবার জন্য আজকের শুভদিনের আত্মাটা পিপাসাতুরের মত ছটফট করে কেন?

না, নীরুদির চিঠিটা বড় বেশি ক্ষমাহীন। আজকের উৎসবের আনন্দটাকে শাস্তি দেবার জন্যই যেন কতগুলি অবুঝ অভিমান আর সংস্কার জোট বেঁধেছে। কিন্তু···সত্যিই যে শাস্তি; এই কয়েকটি আত্মীয়জনের আপত্তিকে একমুঠো ধুলোর আপত্তি বলে তুচ্ছ করবার শক্তিটাও যেন তপতী মল্লিকের দুঃসাহসের বুকের ভিতরেই শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। তা না হলে, এখনই টেলিফোনে

নীরুদিকে একবার ডাক দিয়ে জোর গলায় শুনিয়ে দিতে পারা যেত, তোমরা এলে না বলে আমি একটুও দুঃখিত নই নীরুদি।

না, এমন সাহসের ভাষাটাকে চেষ্টা করেও মুখের কাছে আনতে পারা যাচ্ছে না। তপতীর চোখ দুটো এতক্ষণ ধরে একটা শুকনো জ্বালার ছোঁয়া সহ্য করে এইবার ভিজে গিয়ে ছলছল করতে থাকে।

ক্লান্তভাবে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার আঁকড়ে ধরে তপতী। না, আর এভাবে চুপ করে একা একা বসে থাকলে তপতীর প্রাণটা মিথ্যা ভয়ের ভ্রুকুটি দেখে দেখে শুধু চমকে উঠবে আর হাঁপাবে। এখনি চলে আসুক জর্জ। উৎসবের কলরব যখন মুখর হয়ে উঠবেই না, তখন জর্জ আর কেন একটা জ্যোৎস্না-ভরা সন্ধ্যার লগ্নের অপেক্ষায় বসে থাকবে?

—জর্জ। তপতীর আহ্বানের স্বর টেলিফোনের রিসিভারের মুখের উপর যেন দুরন্ত একটা প্রার্থনার স্বরের মত লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু নো রিপ্লাই। তপতীর কানে যেন একটা নিরুত্তর জগতের শব্দ শুধু একবার ঘর্‌ঘর্‌ করেই থেমে যায়। বাড়িতে নেই জর্জ।

বাড়িতে নেই; তবে বোধ হয় বন্ধুদের বাড়িতে গিয়েছে। কারা যে জর্জের বন্ধু তাও জানা নেই তপতীর। শুধু জানে যে, ওরাও বিদেশী।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই টেলিফোনের ঝংকার শুনে তপতীর গম্ভীর মুখের বিষাদ-টাই যেন ছোট্ট একটা হাসির ঝংকার তুলে পালিয়ে যায়।

না, জর্জ নয়। টেলিফোনে নীরুদিরই গলার স্বর বেজে উঠেছে; নীরুদির গলার স্বরটা যেন একটা হিংস্র বিদ্রূপের রাগিণীর উতলা ঝংকারের মত বাজছে। এক হাতে কপালটাকে যেন খিমচে ধরে নীরুদির কথা শুনতে থাকে তপতী।

নীরুদি—এ আবার কেমন খবর শুনছি, তপতী?

তপতী—কি খবর শুনলেন?

—বিয়ে নাকি হবে না?

—কে বললে?

—সুধাময়বাবু এইমাত্র টেলিফোনে এই কথা বললেন।

—কেন বললেন?

—সেই ইংরেজ ভদ্রলোক নাকি তোমাকে অবিশ্বাস করে সরে পড়েছে।

—কি বললেন? কে সরে পড়েছে?

—জর্জ ক্রিস্টফার, যার সঙ্গে তোমার আজ বিয়ে হবার কথা।

—কোথায় সরে পড়েছে?

—তা জানি না। সুধাময়বাবু বললেন, সে তোমাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক।

—কেন অনিচ্ছুক?

—তোমাকে সে সন্দেহ করে।

—কেন সন্দেহ করবে?

—বনবালা যে খবরটা আমাদের কানে পৌছে দিয়েছিল, সে খবরটা নাকি জর্জও শুনতে পেয়েছে।

—তাতে কি হয়েছে?

—জর্জ বুঝতে পেরেছে, তোমার এই অবস্থার জন্যে জর্জ দায়ী নয়। তোমার সঙ্গে নাকি অন্য কারও অন্তরঙ্গতা আছে।

—জর্জ একথা বলেছে?

—সুধাময়বাবু তাই তো বললেন, জর্জ তাঁকে এসব কথা বলেছে।

—কোথায় কখন জর্জ এমন কথা বললে?

—আজই বলেছে। আজ সুধাময়বাবু জর্জ ও তার কয়েকটি বিদেশী বন্ধুকে চায়ের পার্টি দিয়ে অভ্যর্থনা করেছেন।

—কেন?

—জর্জের সংস্কৃতচর্চা আর পাণ্ডিত্যের জন্য সুধাময়বাবু আর তাঁর কয়েকজন বাঙালী বন্ধু, জর্জকে অভ্যর্থনা করে একটা মানপত্র দিয়েছেন। শুনলাম ঐ চা-পার্টিতেই সুধাময়বাবুর কাছে জর্জ এসব কথা বলেছে। আর···।

—কি?

—আরও একটা কথা বলেছে।

—কি বলেছে?

—জর্জ আজই চলে যাবে।

—কোথায়?

—প্রথমে দিল্লি, তারপর সোজা ইসরায়েলের টেল আভিভ; সেখানে থেকে হিব্রু ভাষার ব্যাপার নিয়ে কি-একটা রিসার্চ করবে জর্জ।

—হিব্রু ভাষা?

—হ্যাঁ।

—সুধাময়বাবু আর কোন খবর দেননি?

—আর কোন্ খবর?

—আর কারও নাম বলেননি?

—কিসের নাম? কার নাম?

—হিব্রু ভাষা খুব ভাল জানেন আর কলকাতাতে থাকেন এরকম একজন ভদ্রলোকের নাম···কিংবা তাঁর মেয়েরই নাম।

—বলেছেন। কিন্তু আমি এতক্ষণ ইচ্ছে করেই সে-কথাটা তুলি নি। নামটা কি যেন বললেন···।

—মেরি কস্টেলো?

—হ্যাঁ।

—মেরি কস্টেলোও বোধ হয় টেল আভিভ যাবে।

—সুধাময়বাবু বললেন, বোধহয় মেরি কস্টেলোর সঙ্গেই জর্জের বিয়ে হবে।

তবে কোথায় যে হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি।

—বেশ। এবার তবে ফোন রেখে দিই নীরুদি? সুধাময়বাবু বোধহয় আর কিছু বলেন নি।

—না, আর তো কিছু মনে পড়ছে না। যাই হোক…।

—না, আর কিছু বলবেন না নীরুদি।

টেলিফোনের রিসিভারটা তপতী মল্লিকের হাত থেকে যেন ঝুপ করে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। তপতী মল্লিকের অদৃষ্টটাই একটা বিদ্রূপের ঢিল হয়ে ঝুপ করে আছড়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাটা এখনও ঘনিয়ে ওঠেনি। ঘরের ভিতরের আলোও জ্বলছে না। কিন্তু নিরেট অন্ধকারের ঘরেও কুৎসিত একটা অন্ধকারময় বিভীষিকার গুমোট যেন ঘরটার বুকের ভিতরে ছমছম করছে।

আবার বাজতে শুরু করেছে টেলিফোন। তপতী মল্লিকের হাতটা যেন মূর্ছিত রোগীর হাতের মত কোন মতে রিসিভার আঁকড়ে ধরে কানের কাছে তুলে নেয়।
—কে?

—আমি সুধাময়। আপনার ভালর জন্যই একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই।

—বলুন।

—আপনি আজ ও-বাড়িতে থাকবেন না। অন্য কোথাও চলে যান।

—কেন?

—জর্জ ক্রিস্টফার হয়তো আপনার কোন ক্ষতি করে দেবে। তাই অনুরোধ, আপনি চলে যান, সে যেন আপনার নাগাল না পায়।

—জর্জ ক্রিস্টফার আমার ক্ষতি করবে?

—আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু আপনারই বা এরকমের একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস কেন যে, জর্জ ক্রিস্টফার আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী?

—হিতাকাঙ্ক্ষী না হোক, অহিতাকাঙ্ক্ষী কেন হবে?

—ভয়ে?

—কিসের ভয়ে?

—আপনি যদি কোন মামলা-টামলা করে বসেন, সেই ভয়ে।

—মামলা করবো? কেন?

—করতে পারেন তো। আপনার এখন যে অবস্থা, সে অবস্থার জন্যে জর্জ ক্রিস্টফারকেই দায়ী করে যদি একটা মামলা…

—শুনুন।

—বলুন।

—জর্জের সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হবে?

—হতে পারে।

—তবে তাকে বলবেন, তপতী মল্লিক মামলা করবে না। সে যেন কোন ভয়

না করে। কিন্তু… ।

—কি ?

—সে যেন আমার এখানে আর না আসে।

—বলবো। হ্যাঁ আর একটা কথা…।

—বলুন।

—সে না হয় আর আপনার ওখানে না-ই গেল, কিন্তু আপনি কি করবেন ?

—আপনি কেন একথা জিজ্ঞাসা করছেন ?

—দেখুন মিস মল্লিক, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বাঙালী, এবং সেই জন্যেই, আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ না থাকলেও একজন বাঙালী মহিলার সম্মানের প্রশ্নটা চিন্তা না করে পারি না। আমি বলি… ।

—বলুন।

—আপনি এখনি আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকে গিয়ে যদি ওদের সাহায্য নেন, তবে ওরা আপনাকে রক্ষা করতে পারবে।

—রক্ষা ?

—হ্যাঁ মিস মল্লিক। ওরা সাহায্য করলে আপনি পরিষ্কার হয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসতে পারবেন। কাজেই, আপনার এই বয়সের সম্মানের প্রশ্ন নিয়ে বিশ্রী একটা বিপদে পড়বার ভয় থেকে বেঁচে যাবেন।

টেলিফোনের রিসিভারটা আবার তপতী মল্লিকের হাত থেকে ঝুপ করে খসে পড়ে। যেন একটা বোবা আর্তনাদের পিণ্ড ঝুপ করে নিষ্ঠুর এক বলিদানের হাড়ি-কাঠের উপর আছড়ে পড়েছে।

বেশিক্ষণ নয়, সোফার উপর একটা মৃতদেহের মত পড়ে থাকা শরীরটা যেন হঠাৎ এক বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যেন এক মুহূর্তে সরে পড়তে, ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে তপতী মল্লিকের যন্ত্রণাক্ত এই শরীরটা।

না, আলিপুরের মেটার্নিটি ক্লিনিকে যাবার কোন দরকার নেই। কিসের স্বার্থে, কার জন্যে, হৃৎপিণ্ডহীন একটা শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবে তপতী মল্লিক ? এই জীবনটা যখন পঁয়তাল্লিশ বছরের নিছক ঠাট্টার, ভুলের আর মিথ্যে দুঃসাহসের গল্প, তখন সে গল্পকে এখনই এই মুহূর্তে ফুরিয়ে দিলেই তো হয়।

হ্যাঁ, এখনই ফুরিয়ে দিতে হয়।

হেসে ফেলে তপতী। অদ্ভুত একটা শান্ত প্রতিজ্ঞার জ্বজ্বলে হাসি। সে হাসিটাকে একবার দু'চোখ নিয়ে দেখে নিতেও ইচ্ছে করে। নিজের মুখের এই হাসি দেখবার জন্য লোভীর মত ব্যস্ত হয়ে মিররের কাছে এসে দাঁড়ায় তপতী।

আর দেরি করবার সময়ও যে নেই। সন্ধ্যাটা আর একটু কালো হয়ে গেলেই যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতবাবু এসে পড়বেন।

হাল্কা গোলাপী সেই বেনারসীটা আর সেই কাশ্মীরী শালটা। সেজে ফেলতে একটুও দেরি করে না তপতী।

বিছানার উপর থেকে নীরুদির লেখা পরম অভিযোগের চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে, শুধু কয়েকটি মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। কি-যেন ভাবে ; তার-পর আর দেরি করে করে না। ছোট আলমারিটার ভিতর থেকে যেন একটা পরম নিষ্কৃতির আনন্দ লুফে নিয়ে নিচে নেমে যায়।

ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকে, টেবিলের মার্বেলের উপর স্তবক করে সাজিয়ে রাখা রজনীগন্ধার একগাদা কুঁড়ির পাশে দুটি পরম নিদর্শন রেখে দিয়ে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তপতী। নীরুদির চিঠিটা আর করাল আরকের শিশিটা—তপতী মল্লিকের অদৃষ্টের মামলার বিচার আর ন্যায়। সারা মুখ জুড়ে জ্বলজ্বল করছে প্রতিজ্ঞাময় সেই শান্ত হাসিটা। রজনীগন্ধার কুঁড়িও খোঁপায় গেঁথে নিতে দেরি করে না তপতী।

বাস্, আর তো কোন কাজ নেই।

—তপতী।

কি আশ্চর্য ? বাধা দিল কে ? ডাক শুনে তপতীর খোঁপার রজনীগন্ধা কেঁপে ওঠে।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই হরেনবাবু বলেন—আমার অবিশ্যি এখানে আসবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। তবু এলাম।

তপতীর কাছ থেকে শোনবার আশায় নয়, চশমাটাকেও একটু মুছে নেবার জন্য কিছুক্ষণের জন্য কথা থামিয়ে আবার কথা বলেন হরেনবাবু।—কলকাতাতেও আসবার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চলে এলাম।

তপতীর ঠোঁট দুটো হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে।—দুঃস্বপ্ন দেখে ?

—হ্যাঁ, দুঃস্বপ্নের মত একটা খবর পেয়ে।

—কবে ?

—এই দিন তিন-চার হলো।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে কোন চিঠি লিখিনি।

—তুমি লিখবে কেন ? সলিসিটর নেপাল লিখেছে। আমার পূর্ণিমার আলোর ট্রাস্ট ডীডের ভাষাটা নাকি বদলাবার দরকার আছে। ভাষার মধ্যে নাকি জাতি-বিদ্বেষের কথা আছে। সাদা জাতের রক্তের ছোঁয়া আছে, এমন কোন শিশু আমার পূর্ণিমার আলোতে ঠাঁই পাবে না, ডীডে এই কথাটা থাকলে নাকি গবর্নমেণ্ট অসুবিধায় পড়বে। আমি মরে যাবার পরে আমার বাড়িতে শিশু-আশ্রম করতে গবর্নমেণ্ট এরকম শর্তে রাজি হবেন না।

চশমাটা চোখে পরিয়ে নিয়ে হরেনবাবু যেন একটা প্রতিজ্ঞার জ্বালায় থরথর করে কেঁপে ওঠেন।—আমি কিন্তু একটি লাইনও বদলাবো না। আমার ঘেন্নার কোন নড়চড় হতে দেব না। যাক্ সে-কথা…আমি এসেছি একবার জেনে যেতে, সত্যিই কি তোমার বিয়ে ?

—কে বললে ?

—আমার বাড়ির ভাড়াটে চক্রধরবাবু বললেন।

—ঠিকই বলেছেন।

—কার সঙ্গে বিয়ে ?

—জর্জ ক্রিস্টফারের সঙ্গে।

—কি জাত ?

—ইংরেজ।

—ইংরেজ কেন ? তোমার সঙ্গে একটা ইংরেজের বিয়ে হবে কেন ?

—বিয়ে হওয়া উচিত।

—বেশ কথা। কবে বিয়ে ?

—আজ।

—কখন ?

—এখনি।

—তার মানে ? যদি বিয়ে বাড়ি, তবে বাড়ি এত ফাঁকা কেন ?

—কেউ আসবে না।

—কেন আসবে না ?

—কোন মাসিমা, কোন পিসিমা, এমন কি নীরুদিও আসবেন না জানিয়েছেন।

—কেন ?

—ওঁরা এই বিয়েতে আশীর্বাদ করতে পারবেন না।

—তাই বল!

হরেনবাবু জোরে একটা হাঁফ ছেড়ে এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারলেন। ফুরফুর করে উড়ছে ঘরের দরজার পর্দাটা, সেই দিকেই তাকিয়ে আর লাঠি ভর দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান হরেনবাবু।

—আমি চলি। তপতীর মুখের দিকে একটা ভ্রুক্ষেপ করবারও চেষ্টা না করে, আস্তে আস্তে পা ফেলে, যেন ভবতোষের এই বাড়ির সান্নিধ্য থেকে তাঁর চিরকালের অন্তর্ধান এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ করে দেবার জন্য চলে যেতে থাকেন হরেনবাবু।

ঘুমন্ত পাখির কাকলীর মত মৃদুস্বরে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে তপতী—আপনি কি...।

—না না, আমি কিছু না, আমি পারবো না। আমাকে আর কোন কথা বলো না, তপতী।

কথা শেষ করে তপতীর দিকে একটা ভ্রুক্ষেপ করতে গিয়েই চমকে ওঠেন হরেনবাবু।

এ কি ? ভবতোষের মেয়ে তপতীর মুখটা এরকম হয়ে গিয়েছে কেন ? দেখতে যে...সত্যিই যে মনে হচ্ছে তপতীর মা জয়ার সেই মুখটা, মরে যাবার এক মিনিট আগে যে ফ্যাকাসে মুখটা হঠাৎ লালচে হয়ে, ঠোঁটে হাসি আর চোখে জল নিয়ে

একটা শূন্যতার দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

—কি হলো তপতী? আস্তে আস্তে ডাকেন হরেনবাবু।

—আপনি শুনে খুশি হয়ে চলে যান কাকাবাবু, বিয়ে হবে না।

—কেন?

—আমি এখনই চলে যাব। আমি আর এ বাড়িতে থাকবো না।

—এমন জেদই বা কেন? কে তোমাকে চলে যেতে বলছে?

—কেউ বলেনি, আমিই বলছি।

—কোথায় যাবে?

—আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না কাকাবাবু।

—আমাকে এত অসম্মান করে কথা বলতে তোমার কি···। বলতে বলতে কাঁপতে থাকেন হরেনবাবু। ভবতোষের বাড়িটাকে চিরকালের মত শূন্য করে দেবার কুৎসিত গর্বে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কথা বলছে ভবতোষেরই মেয়ে?

হঠাৎ হরেনবাবুর এই রুষ্ট মূর্তির সব কাঁপুনি যেন আরও তীব্র একটা বেদনায় আহত হয়ে চমকে ওঠে। শ্বাসকষ্টের হিকার মত একটা করুণ অথচ কঠোর শব্দ হরেনবাবুর বুক কাঁপিয়ে দিয়ে বেজে ওঠে। চেঁচিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন হরেনবাবুও, কিন্তু কথা বলবার শক্তিটা যেন দুঃসহ এক ক্লান্তির ভারে অবসন্ন হয়ে বিড় বিড় করে।—না,ভুল কথা বলছি। আমাকে ঘেন্না করে কথা বলতে তোমার এখন কোন অসুবিধে নেই। যে মেয়ে একটা বিজাতকে বিয়ে করতে পারে, সে অনায়াসে তার বাপের বন্ধুকে অপমান করে কথা বলতে পারে। বাপের বন্ধুটা যে নিতান্ত একটা দেশী মানুষ। আমি আজ তোমার কাছে একটা বুড়ো নেটিভ ছাড়া আর কিছু নই।

তপতী—বিজাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, কাকাবাবু। এ বাড়িতে না, কোন বাড়িতেই না। আমিই শুধু চলে যাব।

—বিয়ে হবে না মানে?

—সে আমাকে বিয়ে করবে না।

—তবে বিয়ের তারিখ ঠিক হল কেন?

—বিয়ে হওয়াই ঠিক ছিল। কিন্তু···

—কি?

—আজই জানা গেল, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়।

—কি কারণে?

—সে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবে?

—এ সত্যটা কি আজই জানতে পেলে?

—হ্যাঁ।

—আগে কোনদিন সন্দেহ হয়নি?

—না।

—এমন অন্ধতাও তোমার হয়েছিল ?

—হয়েছিল।

—এখন ভুল ভেঙেছে ?

—ভেঙেছে।

—এখনও বিশ্বাস করতে পারছো কি, কেন ঐ ইংরেজটা তোমার ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ?

—বুঝেছি, শুধু ঘেন্না করে আর অপমান করে চলে যাবার জন্য।

—শুনে সুখী হলাম। কিন্তু তবে আর এ বাড়ির উপর অভিমান কেন ? কোথায় যেতে চাইছ তপতী ?

হরেনবাবুর গলার স্বর যেন হঠাৎ স্নেহাক্ত হয়ে গলে যায়।—অভিশাপ থেকে, মস্ত অকল্যাণ থেকে বেঁচে গেছে তপতী। ও-জাত কখনও তোমার জাতের আপনজন, আর তোমারও আপনজন হতে পারে না। বিয়ে যে হলো না তাতে আরও ভয়ানক অপমান থেকে বেঁচে গিয়েছ। ওদের ছায়ার কাছে যেতেও আমাদের ঘেন্না বোধ করা উচিত। ওদের রক্তের মধ্যে ক্লাইভ ডায়ার আর ড্রেক কিলবিল করছে। ওরা··· ।

হাঁপাতে হাঁপাতে কি একটা কথা বলতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যান হরেনবাবু, আর গলার স্বরটা যেন স্বপ্নে বোবায়-ধরা মানুষের গলার স্বরের মত গোঙিয়ে ওঠে।

—অ্যাঁ ? ও কি ? তুমি কি ভেবেছ তপতী ? টেবিলের মার্বেলের ওপর ওটা কি ?

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে একটা শিশির দিকে তাকিয়ে হরেনবাবুর চোখের দৃষ্টিটা যেন অসহায় কাঁদুনে শিশুর চোখের মত ছলছল করে।—তুমি কাকে শাস্তি দিতে চাইছো তপতী ?

—নিজেকে।

—কেন ?

টেবিলের মার্বেলের উপর কুঁকড়ে পড়ে থাকা নিরুদির চিঠিটাকে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে তপতী। —ভুল করেছি, আমি মানুষের চোখের ঘেন্না হয়ে গিয়েছি কাকাবাবু। আমাকে আশীর্বাদ করবার সাহস কারও নেই।

নীরুদির চিঠিটাকে চোখের কাছে তুলে ধরে, আর পড়া শেষ করে একেবারে ধীর-স্থির আর অবিচল একটা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন হরেনবাবু। মনে হয়, নীরুদির চিঠির কথাগুলি যেন হরেনবাবুর বুকের ওপর ফেটে পড়ে তাঁর প্রাণহীন একটা মৃতদেহকে শুধু দাঁড় করিয়ে রেখেছে, বজ্রপাতের আঘাতে কাটা-কাটা হয়েও তালগাছ যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। ভবতোষের মেয়েটা সত্যিই যে একটা সাদা বিজাতের লালসার বিষ খেয়েছে, জীবনের শুচিতার গায়ে নিদারুণ অপমানের কালি মাখিয়েছে। শেষজীবনে এরকম একটা অভিশাপের

জয়ধ্বনি শোনবার জন্যই কি হরেনবাবুর প্রাণটা আশি বছরের আয়ু পেয়েছিল ?

চেঁচিয়ে ওঠেন হরেনবাবু—খুব ভাল খবর। চমৎকার খবর। তুমি তোমার শখের ভুলে সারা দেশটাকে, সারা জাতটাকে, অসাদা মানুষের জগতটারই অপমান ঘটিয়েছ তপতী। তোমাকে ক্ষমা করবার সাহস আমার নেই। তোমাকে ক্ষমা করতে একটুও ইচ্ছে নেই। আমার গা ঘিনঘিন করছে তপতী।

চিঠির লেখাগুলির গায়ের উপর আশি বছর বয়সের চশমাপরা দৃষ্টিটাকে একেবারে ঝুঁকিয়ে দিয়ে আর একবার চিঠিটা পড়তে থাকেন হরেনবাবু। হরেনবাবুর কঠিন মূর্তিটা এইবার কাঁপতে থাকে, তারপর টলতে থাকে, তার পরেই চিঠিটাকে দুমড়ে আর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেন নিজের বুকের ভিতরের একটা হঠাৎ মাতাল অনুভবের সঙ্গে পাগলের মত বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে—ভুল। ভুলটা যে আমাদের ভবতোষের নাতি।

তারপরেই একেবারে অভিমানী শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন হরেনবাবু। আশি বছরের দুটো কঠোর গর্বের চোখ থেকে অঝোরে কান্নার জল ঝরে পড়তে থাকে।—ও-জাতের ওপর আমার বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেল তপতী। কিন্তু…তবু তোমাকে বিষের শিশি ছুঁতে দেব না, কখ্খনো না। তোমার এসব পাগলামির মতলব চলবে না। তোমাকে শাস্তি দেবার কোন অধিকার তোমারও আজ নেই।

শিশিটাকে তুলে নিয়ে জানলার বাইরে পাঁচিলটারও ওপারে বড় ড্রেনটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন হরেনবাবু।

—না, তোমাকে আর কিছু বলবার নেই, তপতী। তুমি শুধু বেঁচে থাক, এ ছাড়া তোমাকে অনুরোধ করবার আর কিছু নেই। আমি চলি।

তপতী—কিন্তু আর একটা কথা বলে দিয়ে যান কাকাবাবু।

—আর কি কথা জানতে চাও।

তপতী—আমি কি একটা বে-আইনী জীব হয়ে আর বে-আইনী একটা শিশুকে কোলে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবো ?

হরেনবাবু আবার থর থর করে কাঁপতে থাকেন।—না, এত বড় শাস্তি সহ্য করো না। হাসপাতালের কেবিন থেকে ভবতোষের নাতিকে আর এ-বাড়িতে নিয়ে এস না। ঐ যে…এখান থেকে বেশি দূর নয়—ঐ লিটল্ ফ্লাওয়ার্স অরফ্যানেজে তাকে দান করে দিও। ভবতোষের বাড়িটা জাতের অপমানের স্মৃতিসৌধ হয়ে পড়ে থাকুক।

লাঠি ঠুকে ঠুকে অন্ধের মত, দুর্ঘটনায় আহত একটা যন্ত্রণাক্ত মানুষের মত, যেন আশি বছরের গর্বের মেরুদণ্ডটা এতদিনে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে, আস্তে আস্তে পা চালিয়ে ড্রইংরুমের দরজা পার হয়ে চলে যেতে থাকেন হরেনবাবু।

গেটের কাছে গাড়ির হর্ন শুনেই বারান্দার উপর থমকে দাঁড়ান হরেনবাবু।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতবাবু এসে বারান্দায় উঠেই ব্যস্তভাবে হাসেন—আপনারা সবাই প্রস্তুত তো?

—পাঁচকড়ি! পাঁচকড়ি! আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ডাক দেন হরেনবাবু।—শিগগির এস পাঁচকড়ি, আমাকে হাত ধরে ফটকটা পর্যন্ত পৌঁছে দাও। আমি বোধহয় পড়ে যাব পাঁচকড়ি, আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

অজিতবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে হরেনবাবুর হাত ধরেন। —কোন ভয় নেই। পড়ে যাবেন কেন?

হরেনবাবু—আপনি নিশ্চয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অজিতেন্দু নাগ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তো আমাকে আগে কয়েকবার দেখেছেন।

হরেনবাবু—দেখেছি। মনে পড়েছে। আচ্ছা, মেনি থ্যাঙ্কস্, আমাকে এখন ছেড়ে দিন। আমি একাই চলে যেতে পারবো।

অজিতবাবু—আচ্ছা, আসুন তাহলে। কিন্তু দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।

—কেন?

—জর্জ ক্রিস্টফার আমাকে, এই তো দশ মিনিট হলো, টেলিফোনে জানিয়েছে যে, দশ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে। সুতরাং এখনি এসে পড়বে।

ড্রইংরুমের দরজার পর্দাটাই যেন উতলা হয়ে দুলে ওঠে। ঘরের ভিতর থেকে আতঙ্কিত বিস্মিত করুণ ও অসহায় একটা মূর্তির মত ছুটে বের হয়ে আসে তপতী—যাবেন না কাকাবাবু।

হরেনবাবুর মূর্তিটাও স্তব্ধ বিস্ময়ের মূর্তির মত বারান্দার সিঁড়ির উপর থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু কাঁপতে থাকে হরেনবাবুর গলার স্বর—জর্জ ক্রিস্টফার কেন আসবে? কিসের জন্য? কি উদ্দেশ্যে? কোন সাহসে?

অজিতবাবু অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে, আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাইছেন?

অজিতবাবু কিন্তু তাঁর এই বিস্ময়ের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর শুনতে পেলেন না। কারণ, হরেনবাবু কোন কথা বলবারই আর সুযোগ পেলেন না। গেটের কাছে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। তিনজন ইউরোপীয়ান যুবক হেসে হেসে আর কথা বলে বলে, সুস্মিত অথচ অনাড়ম্বর একটা প্রীতির মিছিলের মত স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসতে থাকে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর করে সেজেছে যে, যার ক্রীম রঙের সিল্কের স্যুট ও অদ্ভুত এক কোমলতার হাসি হেসে চিক চিক করছে, বুকের বোতামের ঘরে একটা হলদে গোলাপ গোঁজা আর গলাতেও বাদামবরণ একটি ফুরফুরে সিল্কের টাই, সেই যুবকটিই বারান্দায় উঠে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে—একটু দেরি হলো তপতী, কিন্তু সেটা আমার কোন ইচ্ছে-করা অন্যায় নয়।

তপতী শুধু বোবা বিস্ময়ের প্রতিমূর্তির মত, যেন শুধু দুটো অপলক চোখের চাহনি দিয়ে জর্জের এই বিচিত্র বাচালতার শব্দ শুনতে থাকে।

জর্জ হাসে—কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক তোমারই দেশের মানুষ, আর, তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থও নেই, শুনলাম তোমাকে বিয়ে করতেও সে রাজি হয়নি, তবু সে তোমার নামে অদ্ভুত সব অভিযোগের কথা আমাকেই শুনিয়ে দিলো। আরও বুঝলাম, সে-সব কথা আমাকে শোনাবার জন্য তিন'শ টাকা খরচ করে সে একটা চায়ের আসর ডেকে আমাকে অভ্যর্থনাও জানিয়েছে। মানুষের অনিষ্ট করবার জন্যে ভদ্রলোক শুধু টাকা খরচ করা কেন, বোধহয় শহীদের মত প্রাণ-পাতও করতে পারে।

—কার কথা বলছো? তপতীর বুকের স্তব্ধ বিস্ময়টাই যেন চমকে প্রশ্ন করে।

জর্জ হাসে—তার নাম সুধাময় রায়। লাভ নেই, স্বার্থ নেই, দেশের একটা মানুষ অপমানিত হবে, শুধু এই ভেবেই আনন্দিত। জানি না, এরকম চরিত্র পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও, জর্জ ক্রিস্টফারের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হরেনবাবুর চোখের তারায় যেন একটা চাপা আগুনের স্ফুলিঙ্গ চমকে ওঠে।

জর্জ হাসে—সে ভদ্রলোক আমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ভঙ্গিতে কতই না উপদেশ দিলো। তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে নিতান্ত অপমান; তোমার চরিত্র সন্দেহাতীত নয়; তুমি নাকি এক রহস্যময়ী ছলনা; সুতরাং, আমার নাকি মেরি কস্টেলোকেই বিয়ে করা উচিত। তাছাড়া ইণ্ডিয়া ছেড়ে দিয়ে, সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা যেন টেলঅভিভে গিয়ে হিব্রু নিয়ে আর মেরি কস্টেলোকে নিয়ে···বলতে বলতে হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে জর্জ। সঙ্গী বন্ধু দুজনও হেসে ফেলে।

জর্জ বলে—আমার দুই জার্মান বন্ধু।

—তপতী! চেঁচিয়ে, যেন দুর্বার একটা উৎসাহের আবেশে হঠাৎ ডাক দিয়েছেন হরেনবাবু। চোখের তারার সেই স্ফুলিঙ্গ নিভে গিয়ে চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তপতী শুধু একজোড়া হতভম্ব চোখ তুলে হরেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হরেনবাবু বলেন—জর্জকে আর ওর বন্ধু দু'জনকে ঘরের ভেতরে বসতে বলতে ভুলে যাচ্ছ কেন, তপতী?

বলতে বলতে হরেনবাবু নিজেই এগিয়ে আসেন। আর এগিয়ে এসেই যেন দুর্বার এক আগ্রহের ঝোঁকে অজিতবাবুর একটা হাত ধরে ফেলেন—আসুন, আর দেরি করবার কোন মানে হয় না।

ড্রইংরুমের ভিতরে ঢুকেই জর্জের কাছে এগিয়ে গিয়ে, আর জর্জের মুখটার দিকে যেন তীব্র তীক্ষ্ণ অথচ বিস্ময়ে অভিভূত একটা অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন হরেনবাবু।

তপতী জর্জের দিকে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি তুলে কথা বলে—হরেনকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বল, জর্জ।

হরেনবাবুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে জর্জ।—আপনি কবে এসেছেন কাকাবাবু? কী সৌভাগ্য, আজকের দিনে আপনি এসেছেন।

হরেনবাবু—তুমি সুধাময়ের কথা শুনেও আসতে পারলে কেমন করে?

জর্জ হাসে—সুধাময়ের কথা শুনে তপতীর জন্য আমার মায়া আরও বেড়ে গেল কাকাবাবু; তাই আরও খুশি হয়ে ছুটে এসেছি।

হরেনবাবু—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জর্জ, তুমি সুধাময়ের কথাগুলিকে এত সহজে তুচ্ছ করলে কেমন করে?

জর্জ—সুধাময়দের কথা তুচ্ছ করতে পারি বলেই আমি···শুধু আমি কেন, আমার দেশটাও নিজের ক্ষতি করবার অভিশাপ থেকে বেঁচে যায়। আপনার দেশ কিন্তু নিজেই নিজের ক্ষতি আর অপমান করবার জন্য অদ্ভুত একটা চেষ্টার আনন্দে···।

—চুপ চুপ। থাম জর্জ ক্রিস্টফার। এত গর্ব করে কথা না বললেও তোমাকে আমি সত্যবাদী বলে মনে করবো। কথাটা বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেও, হরেন-বাবুর গলার স্বরের ভিতরে লজ্জাতুর একটা আর্তনাদ শিউরে ওঠে। মাথাটা যেন হেঁট হয়ে যেতে চাইছে।

জর্জ বলে—তপতী একদিন রাগ করে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিল কাকাবাবু।

হরেনবাবু—কিসের তর্ক?

জর্জ—আমি বলেছিলাম, ক্লাইভ লোকটা খারাপ ছিল, কিন্তু তোমার দেশ তাকে আরও খারাপ করে দিয়েছিল।

হরেনবাবু—তার মানে?

জর্জ—তার মানে, সুধাময়ের চেষ্টা সফল হয়েছিল।

হরেনবাবু—তুমি আবার বড় বেশি গর্ব করে কথা বলছ জর্জ।

জর্জ—বলতে দিন কাকাবাবু। তপতীকে বুঝতে দিন, আমি ক্লাইভ দি অ্যাডভেঞ্চারার নই।

হরেনবাবু হাসতে চেষ্টা করেন—তপতী নিশ্চয় বুঝেছে।

জর্জ—আমি তপতীকে আর একটা সত্য কথা বলতে একটুও দ্বিধা করিনি কাকাবাবু।

—কি কথা?

—আমি আপনাদের দেশকে ভালবাসতে পারিনি, কিন্তু আপনাদের মেয়েকে ভালবাসতে পেরেছি। আমি এদেশকে কোনদিন আপন করে নিতে পারবো না, কিন্তু তপতীকে আপনজন বলে মেনে নিতে পেরেছি।

—এদেশকে আপন বলে মেনে নিতে তোমার আজ বাধা কোথায়?

—বাধা আছে।

—কিসের বাধা? না, কোন বাধা নেই। তোমার একটা গর্বের বাধা ছাড়া কোন বাধা নেই।

—না কাকাবাবু। আমার একটা সন্দেহের বাধা।

—ভুল সন্দেহ।

—খুব সত্যি সন্দেহ। ইতিহাসের এই টিচার স্বীকার করবেন না জানি, কিন্তু আমি জানি,...কিন্তু আপনার সঙ্গে আজ তর্ক করা উচিত নয় কাকাবাবু।

অজিতবাবু হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।—এখন শুভ কাজ শুরু হলেই ভাল হয়।

বারান্দার উপর দু'জন নতুন আগন্তুকের সহাস্য কলরব বেজে ওঠে। হ্যাঁ, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মোনিকা রাসেল আর ডোরার বাবা মিস্টার ডানকানও এসেছেন।

—কিন্তু এ কেমন বিয়ে? তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিদারুণ একটা অখুশির মূর্তির মত চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করেন হরেনকাকাবাবু।

তপতীর মুখটা করুণ হয়ে যায়।—কি বলছেন কাকাবাবু? বুঝতে পারছি না।

—এটা কি বিয়ে করা হচ্ছে, না চুরি করা হচ্ছে? শুধু একটা খাতা সাক্ষী করে বিয়ে হবে কেন? এদেশে কি মানুষ নেই?

তপতী—নীরুদিরা কেউ তো আসবেন না।

হরেনবাবু—নীরুরা না এলেই কি তোমার বিয়েটা একেবারে ভীরু হয়ে যাবে? একটা শাঁখও না বাজিয়ে...ছিঃ, অসম্ভব, হতেই পারে না। এদেশটা তো আর জর্জের দেশ নয়।

অজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল আবেদনের মত স্বরে অনুরোধ করেন হরেনবাবু।—আপনি একটু সবুর করুন অজিতবাবু। আপনার কাজ ঠিকই নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে, সামান্য দুটো ঘণ্টার অপেক্ষা সহ্য করুন; প্লীজ, আমার অনুরোধ।

ব্যস্তভাবে ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে এসে, আর বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ডাক দেন হরেনবাবু—পাঁচকড়ি শিগগির এস।

—কি আজ্ঞা কর্তা? পাঁচকড়ি ব্যস্তভাবে ছুটে এসে হরেনবাবুর আদেশ শুনতে চায়।

—যাও, এখনি গিয়ে চক্রধরবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।

চলে যায় খানসামা পাঁচকড়ি। কিন্তু বারান্দার উপর লাঠি ভর দিয়ে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক ডাক করতেই থাকেন হরেনবাবু। —মালী কোথায় আছে? বেয়ারা যতীন কোথায়? কোথায় চুপ করে বসে আছে সবাই। এখনি এসে কথা শুনে যাও।

হরেনবাবু যেন একটা প্রতিজ্ঞার মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ভবতোষের বাড়িতে একটা আশার উৎসবের সোরগোল জাগিয়ে তুলতে থাকেন।

মালী আর যতীন বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে শুরু করে। পাঁচকড়ি ছুটে গিয়ে চক্রধরবাবুকে ডেকে আনে। চক্রধরবাবু আবার সেই মুহূর্তে চলে যান। দশ মিনিটের মধ্যে দশ-বারটি সধবা মহিলা, জন পনর ভদ্রলোক আর বিশ-ত্রিশটা ছেলে-মেয়ের ছুটোপুটি ব্যস্ততা আর সোরগোল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে হৈ হৈ করতে থাকে ভবতোষের বাড়িটা। বিয়ের কাজে খাটবার জন্ম হরেনবাবুর বাড়ির যত ভাড়াটে পরিবারের প্রায় সব মানুষ এসে পড়েছে। সবই হরেনবাবুর ইচ্ছার কাণ্ড।

হরেনবাবুর ইচ্ছা, বর বরণ করতে হবে। একেবারে খাঁটি বাঙালী মতে, বরণডাল সাজিয়ে, কুলোর উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে, খই ছুঁড়ে আর শাঁখ বাজিয়ে।

ট্যাক্সি নিয়ে বাজারের দিকে ছুটে চলে যান চক্রধরবাবু আর আধঘণ্টার মধ্যেই বর বরণের সব উপকরণ হাজির করেন।

—আলপনা দেওয়া হয়েছে? হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন হরেনবাবু।

চক্রধরবাবুর স্ত্রী এসে বলে যান—হ্যাঁ, আরতির মা আর টুলুর মা আলপনা দিতে শুরু করেছে।

—মার্কেট থেকে ফিরেছে কি পাঁচকড়ি? চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন হরেনবাবু।

—হ্যাঁ ফিরেছে। মালী ছুটে এসে জানিয়ে যায়।

—চায়ের জল চড়ানো হয়েছে?

—হয়েছে। যতীন বেয়ারা এসে জানিয়ে যায়।

—আর খাবার?

—হ্যাঁ, ও-বাড়ির মেয়েরা খাবার সাজাতে লেগেছেন।

—মেয়ের কাছে কেউ আছে তো?

চক্রধরবাবু হেসে ফেলেন—বাচ্চা-কাচ্চারা সবাই তো মেয়েকে ঘিরে রেখেছে।

বারান্দার একটা চেয়ারের উপর যেন একটা মুক্তিময় আনন্দের ভারে একেবারে অলস হয়ে বসে পড়েন হরেনবাবু। আর ব্যস্ত হতে কোন ইচ্ছে নেই। আর কোন চিন্তাও নেই। ভবতোষের বাড়িটা এবার নাতি-নাতনি নিয়ে…।

চোখ বুঁজে, আর যেন পরম আলস্যময় একটা তৃপ্তির ভারে নিঃস্পন্দ হয়ে চেয়ারের উপর অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকার পর হরেনবাবুর এই অদ্ভুত মূর্তির বুকটা হঠাৎ আবার একটা ডাক শুনে চমকে ওঠে।—কে? তুমি কে?

—আমি জর্জ।

চোখ টান করে তাকাতে চেষ্টা করেন হরেনবাবু।—কি ব্যাপার জর্জ? তুমি আবার ঘরের বাইরে এলে কেন?

জর্জ—আমার সন্দেহটা যে জব্দ হয়ে গেল।

হরেনবাবু—কি বললে?

জর্জ কুণ্ঠিতভাবে হাসে—আমাদের বিয়েটা যে সত্যিই একটা উৎসব হয়ে উঠলো কাকাবাবু?

—তা তো হবেই।

—সকলে এতে খুশি?

—নিশ্চয়।

—তবে আমাকে একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসতে অনুমতি দিন।

—কেন?

—আমার এই পোশাক এই উৎসবে একটুও মানাচ্ছে না। পোশাকটা বদলে আসি।

—কেন?

—এই উৎসবে ধুতি-চাদর ছাড়া আমাকে অন্য পোশাকে একটুও ভাল দেখাবে না।

—কে বললে?

—আমি বলছি। আমার এই সাজ যে নিতান্ত বিদেশী সাজ।

—তুমি কি তবে এদেশী সাজে···।

—নিশ্চয়, যে-দেশের এতগুলি মানুষ এত খুশির উৎসব দিয়ে আমাকে আপন করে নিতে চাইছে, সে-দেশে বিদেশী হয়ে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই, সাধ্যিও নেই।

জর্জ ক্রিস্টফারের একটা হাত কাছে টেনে নিয়ে সেই হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হেসে, যেন নিবিড় এক নিশ্চিন্ততার আবেশে কথা বলেন হরেনবাবু—তুমি ঘরে গিয়ে বসো। আমি এখনই তোমার জন্য চমৎকার এক সেট বরের সাজ আনিয়ে দিচ্ছি।

জর্জ—আপনি বিশ্বাস করুন, একটা ফর্মালিটির সঙ সাজবার জন্য নয়, আমি এ দেশের ঘরের মানুষ হয়ে যেতে চাই। আপনার ব্লেসিং চাই কাকাবাবু।

হরেনবাবু—আই ব্লেস ইউ।

জর্জ চলে যেতেই চেয়ারের উপরে একটু টান হয়ে নড়ে বসেন হরেনবাবু। শাঁখের শব্দ, পোড়া ধূপকাঠির গন্ধ আর খাবারের ঝুড়ি নিয়ে চক্রধরবাবুর দৌড়া-দৌড়ির মত্ততা, হরেনবাবুর প্রাণটাই যেন শিরদাঁড়া টান করে একটা জয়ের দৃশ্য দেখছে। কেন যেন মনে হয়, আর মনের এই অদ্ভুত অনুভবের সঙ্গে তর্ক করবার কোনও যুক্তিও খুঁজে পান না; যেন অনেক দিনের পুরনো একটা রোগের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে অদ্ভুত এক স্বস্তির সুখে তাঁর আশি বছর বয়সের প্রাণটা আজ ভরে গিয়েছে। জর্জকে একবার কাছে ডেকে নিয়ে এসে একটু ঠাট্টা করলে হয়—এবারের পলাশীর যুদ্ধে তুমি কিন্তু আমাদের হারিয়ে দিতে পারলে না জর্জ। মনে হচ্ছে, আমাদেরই জয় হয়েছে।

হরেনবাবুর জাগ্রত চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে যেন চকিত তন্দ্রার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেন দেখতে পাওয়া যায়, ভবতোষের মুখটা হাসছে। সেই কবেকার ভবতোষ, বাইশ বছর বয়সের কেরানী বাঙালী ভবতোষ; বড় সাহেবের

বাচ্চা মেয়েটাকে চুমো খাবার পর মেমসাহেবের ধমক খেয়েও হাসছে। হেসে হেসে সেই অদ্ভুত কথাটাই বলছে ভবতোষ, আমি কিন্তু মুখ মুছবো না হরেন। আঃ, কী শান্ত সুন্দর নির্বিকার আর নীরোগ মানুষের হাসি।

—হ্যাঁ ভবতোষ, মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তোমার হাসিটারই জয় হলো। হরেনবাবর মুখটা বিড়বিড় করে না, কিন্তু সত্যই যেন শুনতে পাচ্ছেন, প্রাণটা কথা বলছে।

কিন্তু বর বরণ হবে কখন, আর কত দেরি?

শুনতে পান হরেনবাবু, অজিতবাবু কাকে যেন বলছেন—না না, আমার দেখতে খুব ভাল লাগছে। আমি আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করতে রাজি আছি। আগে আপনাদের দেশী মতে সব অনুষ্ঠান হয়ে যাক্, তারপর আমার খাতা।

মনে হয় চক্রধরবাবু উত্তর দিলেন—আর আধঘণ্টার মধ্যে সব হয়ে যাবে স্যার।

না, হরেনবাবুর আর ব্যস্ত হয়ে ওঠবার কোন দরকার নেই। আজকের আকাশের তৃতীয়ার চাঁদটাই যেন শুভকাজের সব দায় স্বীকার করে নিয়েছে।

তাইতো, আবার যে একটু ব্যস্ত হতে ইচ্ছে করে।—তপতী তুমি কোথায়? ডাক দেন হরেনবাবু।

তপতী কাছে এসে প্রণাম করতেই তপতীর মাথায় হাত রাখেন হরেনবাবু। আর যেন একটা নিবিড় বিশ্রান্তির সুখে হরেনবাবুর চোখের পাতা নেতিয়ে পড়ে।

আর কোন কাজ নেই হরেনবাবুর। না, মনে পড়ে গিয়েছে, আরও একটা ইচ্ছার কাজ বাকি আছে।—সেই অ্যালবামটা একবার দাও তো তপতী। ভবতোষের নাতি-নাতনিগুলোকে একটু ভাল করে দেখি। সেদিন ভাল করে দেখতেই পাইনি।

চাদরের খুঁট দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে হরেনবাবু আবার যেন একটা ইচ্ছার সাড়া পেয়ে চমকে ওঠেন।—হ্যাঁ, আরও একটা ইচ্ছার কাজ বাকি আছে তপতী, এক শীট কাগজ আর একটা পেন নিয়ে এস।

—কিসের কাজ কাকাবাবু?

—পূর্ণিমার আলোর ট্রাস্ট ডীডের ভাষার ভুলটা একটু শুধরে দিই। খসড়াটা এখনই ক'রে রাখি। আর সময় পাব কি পাব না, কোন ঠিক তো নেই।

—কাকাবাবু! কি যেন বলতে চায় তপতী।

হরেনবাবু হাসেন—আর দেরি করিয়ে দিও না তপতী। আমি এবার মনের সুখে ভবতোষের সঙ্গে একটু গল্প করতে চাই।

এসো পথিক

এসো পথিক

আজ এই মানুষটিকে দেখে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারবে যে, ইনিই এককালে আট ক্রোশ পথ একটানা হেঁটে পার করে দিতে পারতেন? বললেও কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, ইনিই একদিন রাগ করে রেল-লাইনের একটা লেভেল ক্রসিং-এর তালা-বন্ধ বেড়া-গেট এক লাথিতে ভেঙে খুলে দিয়েছিলেন। গেট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল গেটম্যান; এদিকে আষাঢ় মাসের ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যাটাও ঘনিয়ে উঠেছিল। দুটো গোরুর গাড়িতে বসে বর ও বরযাত্রী আট-দশটি মানুষ ছটফট করছিল। এখনও যদি গেট না খোলে, যদি ক্রসিং পার হয়ে ওদিকের পথে উঠতে না পারা যায়, তবে শীতলদীঘির নন্দীবাড়িতে ওরা পৌঁছবে কখন? মাঝ রাতে? না, শেষ রাতে? কিন্তু বিয়ের শেষ লগ্ন যে রাত ন'টার মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। আর, এই একুশে আষাঢ়ই তো এই মাসের মধ্যে শুভবিবাহের শেষ দিন।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ছটফট করেনি বর ও বরযাত্রীর দল। দুই গোরুর গাড়িকেও আর বেশিক্ষণ হতাশ হয়ে থমকে থাকতে হয়নি। হঠাৎ চমকে উঠেছিল আর খুশির চোটে হেসেও ফেলেছিল বর ও বরযাত্রীর দল। কে এক ভদ্রলোক, বছর ত্রিশ বয়স হবে, সাইকেল থেকে নামলেন। বন্ধ গেটের দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর গেটের গায়ে একটা লাথি মারলেন। তালাটা খুলে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল! সেই গেট পার হয়ে, আবার ওদিকের গেটের কাছে গিয়ে ঠিক এই রকমই একটা কাণ্ড করলেন সেই ভদ্রলোক, গেটের গায়ে নিদারুণ এক পদাঘাত। ঝিঁঝি ডাকা আষাঢ় সন্ধ্যার অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে ওঠবার আগেই তরতর করে খোলা গেট পার হয়ে চলে গেল দুই গোরুর গাড়ি, আর বরযাত্রীর খুশির হল্লা। তখন নয়, সেদিনও নয়, অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিল শিমুলডাঙ্গার বর ও বর-যাত্রীর দল, আর শীতলদীঘির নন্দীবাড়ি, ওই ভদ্রলোকের নাম লোকনাথ রায়, রায়-গঞ্জ হাই স্কুলের মাস্টার। কিন্তু ভদ্রলোকের পা দুটো কি লোহার পা?

সেই লোকনাথ রায়, সেদিন যাঁর বয়স ছিল তিরিশ, আজ তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সের একটি অনড় ও অক্ষম দেহ। দুই পায়ে বাত, একটি পঙ্গু মানুষ। মালিশের তেল খেয়ে খেয়ে পা দুটো যেমন চকচকে, তেমনিই কালো হয়ে গিয়েছে।

লোকনাথ রায়ের জীবনে আজ আর সেই রায়গঞ্জ নেই, সেই মাস্টারিও নেই। পঁচিশ বছর আগের সেই জীবনের ঠিকানা যেন ক্ষয়ে মুছে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জের সেই বাড়ি, রায়গঞ্জের ধানক্ষেত আর কেশে ঘাসের সেই জংলা মাঠ তাঁর কাছে একটা স্মৃতিমাত্র, একটা পুরনো স্বপ্নের ছায়াও বলা যায়।

কলকাতার ভবানীপুরের গলিতে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। সাত নম্বর হরি দত্ত লেন। নিচে দুটো, উপরে একটি ঘর। উপরে সেই ঘরের কোণে একটা খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকা এই জীবন যে একটা আধা-কবর, কিংবা জীবন্ত সমাধির মত

একটা জীবন, সেটা খুবই বোঝেন লোকনাথ রায়। কারণ, বুঝিয়ে দেবার মত একটা প্রাণের নিঃশ্বাস এখনও তাঁর এই জিরজিরে বুকের ভিতরে ছটফট করে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বুকের ভিতরে সেই নিঃশ্বাস যখন একটু বেশি ছটফট করে, তখন হাতের উপর ভর দিয়ে ও কোমরটাকে শক্ত করে থিতিয়ে দিয়ে শরীরের ওপর অর্ধেকটাকে কোনমতে খাড়া করে খাটেরই উপর বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে বসিয়ে রাখতে পারেনও। তারপর হাত দিয়ে পা দুটোকে টিপে টিপে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

কী ছাই আর বুঝবেন। শুধু মনে পড়ে যায়, এই তো সেই দুটি পা। রায়গঞ্জ থেকে সদরের কাছারিতে বেলা দশটার সময় পৌঁছতে হলে সূর্য ওঠবার আগে শেষ রাতে রওনা হওয়া উচিত। লোকনাথ রায় কিন্তু সূর্য ওঠবার পর, জবাকুসুম সঙ্কাশ ক'রে স্নান সেরে নিয়ে, পাঁচটি পাকা কলা দিয়ে দুধ-মুড়ি খেয়ে নিয়ে তারপর রওনা হতেন।

পথে যেতে বুড়ো বুড়ো কত বটের ছায়া পাওয়া যেত। কিন্তু কোন ছায়াতে এক মিনিটের জন্যও জিরোতেন না লোকনাথ রায়, জিরোবার কোন দরকার আছে বলে বোধ করতেন না। কারণ, সেই দুই পায়ে কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ ছিল না। মরা নদীটার কাছে পৌঁছলেই দেখতে পাওয়া যেত, শিবমন্দিরের সামনের চাতালের উপর শুয়ে পড়ে আর গা এলিয়ে দিয়ে পথহাঁটা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে হাটে যাবার হাটুরে মানুষগুলিও; চোখে পড়তেই হেসে ফেলতেন লোক-নাথ রায়, আর ডাক দিয়ে বলতেন, কী ব্যাপার হে কৈলাসচন্দ্র, এক ক্রোশ পথ হেঁটেই পা ধরে গেল নাকি?

সেই কৈলাস আজ এখন কোথায়? সে কি এখন সেই শিবমন্দিরের চাতালের উপর গা এলিয়ে দিয়ে আর দুই পা দুলিয়ে দুলিয়ে পথচলা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে? শিবমন্দিরটাও কি আছে? বুনো কাঁটালতায় মন্দিরের সারা গা ছেয়ে গিয়েছিল, আর মস্তবড় ফাটলের ভিতরে শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে বাসা বেঁধেছিল দুটো বড় বড় পাখি। লোকে বলতো, ওরা ধনঞ্জয় পাখি। ওদের মধ্যে পুরুষ পাখিটা একেবারেই অন্ধ, সেটা বাসাতেই থাকে। শুধু মাদি পাখিটা উড়ে উড়ে বাইরে যায় আর আসে।

দুই হাতে কিছুক্ষণ দুই পা টিপে নেবার পর, আর ছোট জানালা দিয়ে পাশের পড়ো বাড়িটার আঙিনাতে জংলা সূর্যমুখীর ঝোপের উপর নতুন ফড়িং-এর ফুর্তির খেলা দেখতে দেখতে পঙ্গু লোকনাথ রায়ের দুই চোখ যখন অদ্ভুত হয়ে চক চক করে ওঠে, তখন একবার ভিতরের দরজার দিকে তাকান। শিবমন্দিরের গায়ের ফাটলের বাসিন্দা সেই পুরুষ পাখিটা, সেই অন্ধ ধনঞ্জয়টা চোখে দেখতে পেত না। কিন্তু লোকনাথ রায়ের চোখে তো এখনও দৃষ্টি আছে। জীবন্ত দৃষ্টি। সেই চোখে দেখবার আশাটাও তো জীবন্ত। তাই আশা করেন, তাই দরজার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতেও ইচ্ছা করেন। আর মনে হয়, হ্যাঁ, এইবার বোধহয় নীরজা

আসবে। কোন কাজ না থাকুক, দরকার না থাকুক, তবু এঘরে একবার আসবার কথা কি ভুলেই যাবে নীরজা?

ঘুম ভেঙেছে ভোর পাঁচটায়, তারপর পুরো দু'টি ঘণ্টা ধরে লোকনাথ রায়ের এই পঙ্গু শরীরটা যে কাণ্ড করেছে, সে কাণ্ড চোখে দেখতে পেলে দেহতত্ত্বের বড় ডাক্তার চমকে উঠবেন, আর কসরতের পাকা মানুষেরও দুই চোখ কুঁচকিয়ে করুণ হয়ে যাবে। খাটের পাশের দেয়ালের গায়ে লোহার গজালের সঙ্গে বাঁধা একটা দড়ি ছাদের ওদিকের একটা ছোট্ট ঘরের ভাঙা দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পায়ের জোর তো প্রায় মিথ্যে হয়েই গিয়েছে, কিন্তু হাতের জোর আছে। রামদয়ালবাবু বলেন— লোকনাথের হাত দুটো কিন্তু এখনও লোহার হাত। প্রায় ঝুলে ঝুলে, হাতেরই জোরে পঙ্গু শরীরটাকে গড়িয়ে সরিয়ে ও টেনে-টেনে ছাদের ওই জায়গাটাতে ওই ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন লোকনাথ রায়। তারপর ফিরে এসে যদি দেখতে পান যে, ঘরের ভিতরে ও দরজার কাছেই রাখা বালতিটাতে জল আছে, তার মানে, বুড়ি ঝি সময় মত মনে করে আর কষ্ট করে জল রেখে দিয়ে গিয়েছে, তবে ঘটি দিয়ে সেই জল মাথাতে ও গায়ে ঢালেন। আকাশে সূর্য না থাকুক, তবু বিড় বিড় করে জবাকুসুম সঙ্কাশ করেন। আর ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়ও পরেন। কারণ, হাতে জোর আছে।

কে রেখে দিয়ে গিয়েছে এই জল? নীরজা? না, নীরজা নয়। নীরজা যদি এ ঘরে জল রেখে দিয়ে যেত, তবে তো বুঝতেই পারতেন লোকনাথ। নীরজার হাতের চুড়ির শব্দটা টুং টাং করে বুঝিয়ে দিত, আর কেউ নয়, সেই নীরজা এসেছে। যন্ত্রণাটা যত দুঃসহ হোক না কেন, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে থাকলেই বা কি? আর ঘরে আলো না থাকলেও কি বা আসে যায়? নীরজার চুড়ির শব্দ শুনতে পাবে না লোকনাথ, এমন ব্যাপার হতেই পারে না। কিন্তু না, নীরজা আসে না। বুড়ি ঝি, যার নাম রাজুর মা, সে-ই জল রেখে যায়। ভাতের থালাও পৌঁছে দিয়ে যায় রাজুর মা।

আজ থেকে দশ বছর আগে, যেদিন রায়গঞ্জ ছেড়ে কলকাতার ভবানীপুরের এই বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন লোকনাথ রায়, সেই দিন এরা সবাই তো বলতে গেলে নিতান্ত ছেলেমানুষ আর শিশু ছিল। বড় ছেলে সুকুর বয়স তখন পনর বছর, বড় মেয়ে টুনির তের বছর, আর ছোট মেয়ে টুসির এগার।

রায়গঞ্জ হাই স্কুলের মাস্টারি, জীবনটা খুব সুখের না হলেও কম আনন্দের জীবন ছিল না। মাস্টারির মাইনের পঞ্চাশটা টাকা খুব বড় সম্বল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সে-জন্য খুব দুশ্চিন্তা করবার তেমন কোন ভয় ছিল না। বাড়িটা তো নিজেরই বাড়ি। তিন পুরুষ বাস করেছে যে বাড়িতে সেই বাড়ির ঠাকুরঘরের ভিতের গায়ে সাদা পাথরের ফলকে কালো অক্ষরে তিন পুরুষ আগের শ্রীরঘুনাথ রায় দাসস্য একটি আশার নিবেদনও সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে লেখা আছে, যার অর্থ: পণ্ডিতেরা বলেন লক্ষ্মী চঞ্চলা; কিন্তু নারায়ণের ইচ্ছায় এই গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বিরাজ করবেন।

বাড়িটা খুব বড় নয়, কিন্তু বাগানটা আর পুকুরটা বেশ বড়। কলকাতার পাইকার এসে সেই বাগানের জামরুল আর বাতাবী লেবু গো-গাড়িতে বোঝাই করে দেবীনগরে রেল স্টেশনে নিয়ে যেত আর কলকাতায় চালান দিত। ওই নন্দী-গ্রামের জমিদারবাড়ির এক বিয়েতে কাজের জন্য লোকনাথ রায়ের সেই পুকুর থেকে একবার একুশটি আধমনী চিতল তোলা হয়েছিল। কাজেই সেই লোকনাথ রায় যখন জগদ্ধাত্রী পুজোতে অনেক ঘটা করতেন, আর গাঁয়ের সব মানুষকে কাঁচা-পাকা দু রকমের প্রসাদ পেট ভরে খাওয়াতেন, তখন তাঁকে টাকা ধার করতে হতো না। ধানজমির আয়, আর ওই বাগান ও পুকুরের আয়ের টাকায় জগদ্ধাত্রী পুজোর ঘটা খুব ভাল করেই কেটে যেত।

হ্যাঁ, সে-সব দিনের ছবি যেন কুয়াশার সঙ্গে উড়ে যাওয়া একটা জীবনের ছবি। দশ বছর আগে যেদিন নিজেই শখ করে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে ঘরে ফিরলেন লোকনাথ স্যার, সেদিন হঠাৎ বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কোমরে যেন অদ্ভুত রকমের একটা ব্যথা সিরসির করে কাঁপছে। একদিন দু'দিন তারপর তিন মাসের মধ্যেও যখন ব্যথাটা একটুও সারলো না, বরং আরও কনকনে হয়ে কষ্ট দিতে শুরু করলো, তখন ওই নীরজাই খুব রাগ করে একদিন ঝগড়া করেছিল—না, তোমার আপত্তির কোন কথা আর শুনবো না।

হেসেছিলেন লোকনাথ রায়—কোন আপত্তি করছি না। তবু আর একটা-দুটো মাস একটু ধৈর্য ধরে···।

নীরজা—না; যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে।

তার মানে, কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। নিতাই কবরেজের ওই ছাই পাঁচন আর-বেশি খেলে, আর ওই কালো ঘি আর-বেশি মাখলে পঙ্গু হয়ে যেতে হবে। যাদবপুরের সুধাদি বার বার অনেক চিঠিতে বেশ কড়া করে অনেক কথা লিখেছেন। কলকাতায় এসে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে এক মাসের মধ্যেই ওই রোগ একেবারে সেরে যাবে। কিন্তু দুটো পয়সার মায়া করে যদি তোমরা গাঁয়ের কবরেজী খপ্পরে পড়ে থাকতে চাও, তবে তাই কর। আমি আর তোমাদের ভালর জন্যে চিন্তা করতে পারবো না।

রায়গঞ্জ থেকে চলে আসবার দিন নিতাই কবরেজও দেখা করতে এসেছিল। কেঁদে ফেলেছিল নিতাই কবিরাজ। আজও নিতাই কবিরাজের মুখের সেই চেহারাটা লোকনাথ রায়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিতাই কবিরাজের আদুড় গায়ের উপর একটা ময়লা উড়ুনি; সেই উড়ুনির খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে নিতাই কবিরাজ—আমি আবারও বলছি, কলকাতায় যাবেন না রায়মশাই। আমি আবার বলছি, আর বড় জোর তিনটে চারটে মাস লাগবে, আমার ওষুধেই আপনার কোমর-ব্যথা চিরকালের মত সেরে যাবে।

কলকাতায় এসে থাকবার ও চিকিৎসা করবার জন্য কিছু টাকা চাই। ত্রিশ বিঘে

ধানজমি বেচে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করা হয়েও গেল। কিন্তু তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন লোকনাথ যে, সব ধানজমি বেচে দেবার দরকার হবে? পারেন নি। সব ধানজমি বিকিয়ে যাবার পরেও কি সামান্য একটু সন্দেহও করতে পেরেছিলেন যে, পুকুর আর বাগানটাকেও বেচে দিতে হবে? পারেননি। ভবানীপুরের সেই বাসাবাড়িতে একটানা দশটা বছর পার হয়ে যাবার পর একদিন ভয়ানক কর্কশ স্বরের একটা ধমকের ভাষা চিৎকার করে বুঝিয়ে দিল, এই রোগটা ঠিক পায়ের বাত ব্যথার রোগ নয়, এটা তাঁর ভাগ্যেরই একটা ক্ষয় রোগ। সাত মাসের বাড়িভাড়া বাকি, তাই বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ান এসে চিৎকার করছে—হয় এখনি বকেয়া ভাড়ার সব টাকা মিটিয়ে দাও, নয় এখনই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

সেদিন মনে মনে একটা হিসাবও করেছিলেন লোকনাথ। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনটাকে পুষতে গিয়ে মোট ছাপ্পান্ন হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে শুধু এক তারক ডাক্তারকেই প্রায় সাতটি হাজার টাকা দিতে হয়েছে। খুব ভাল ও খুব নামকরা ডাক্তার তারক সেন, নীরজার ওই সুধাদির কেমন-যেন দেবর হয়। আর, সুধাদির দেবর বলেই, কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক আছে বলেই, তাছাড়া সুধাদি একটু বলে দিয়েছিলেন বলেই, তারক ডাক্তার নাকি তাঁর প্রাপ্য ফী-এর মাত্র অর্ধেকটুকু নিয়েছেন।

আরও একটা হিসাব করেছিলেন লোকনাথ। রায়গঞ্জে থাকতে তিন মাসে নিতাই কবিরাজের পাঁচন কিনতে খরচ পড়েছিল একুশ টাকা। ঠিক কথা, কোমরের কনকনে ব্যথাটা সারাতে পারেনি নিতাই কবিরাজের সেই একুশ টাকার পাঁচন; কিন্তু তবু তো সেদিন এই দুই পায়েরই জোরে পথ হেঁটেছিলেন লোকনাথ। স্টেশন যাবার পথে শিবমন্দির পর্যন্ত হেঁটেই চলেছিলেন, তারপর গো-গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ কোথায় গেল সেই পাঁচনখাওয়া শরীরের দুটি খোঁড়া পায়ের সেই জোর? দেখলে আজ নিতাই কবিরাজ বোধহয় ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলবে, এ কী হলো রায়মশাই? আপনার পা দুটো যে শুকিয়ে সরু লাঠির মত হয়ে গিয়েছে।

সুধাদি বলেন, গাঁয়ের কবরেজ আপনাকে কবেই মেরে ফেলতো রায়মশাই! আজও যে আপনি বেঁচে আছেন, সেটা আমাদের তারক ডাক্তারের চিকিৎসার দয়া বলে জানবেন।

—হতে পারে। বলতে গিয়ে সুধাদির সামনে সেদিন যেমন হেসেছিলেন লোকনাথ, তেমনই আরও অনেকবার হেসেছেন; যখনই মনে পড়েছে, তখনই।

কিন্তু তারপর? চৌধুরীবাবুর দারোয়ানের ধমক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর কলকাতায় থাকা চলবে না। থাকতে হলে আরও টাকা চাই। কোথা থেকে আসবে টাকা? এখন তো সেই রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাড়িটা অবশ্য এখনও আছে; কিন্তু সেই বাড়ির অন্তঃসারহীন শূন্যতার মধ্যে বেঁচে থাকার অনেক অসুবিধেও আছে। তবু চৌধুরীবাবুর দারোয়ানের তো সেখানে গিয়ে ধমক দেবার আর চিৎকার করবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ সুধাদি এসে, আর সত্যিই যেন চিৎকার করে হেসে উঠলেন—ওরে নীরু, তোদের রায়গঞ্জের বাড়িটার ভিতের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় কী যেন লেখা আছে? লক্ষ্মী নাকি সে-বাড়িতে চিরকাল অচলা হয়ে বাস করবেন?

নীরজা হাসে—হ্যাঁ বড়দি। সত্যি তাই লেখা আছে।

সুধাদি আরও হাসেন—কী চমৎকার সত্যি কথাই না লেখা আছে। যাক্ সে-সব কথা, এখন আসল কথা হলো, বাড়িটাকে শিগ্‌গির বেচে দেবার ব্যবস্থা কর।

নীরজা—আমি তো তাই ভাবছি।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা জলজলে আভা দপ্ করে চমকে ওঠে। প্রদীপে তেল নেই, পলতেও পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু যেন একটা জ্বালা জ্বলছে, সেই রকম বাতির মত চোখ। লোকনাথ বলেন—না, তা হয় না। কখ্‌খনো না।

সুধাদি—কেন?

লোকনাথ—আমি জানি, আমাকে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতেই হবে।

সুধাদি হাসেন—আপনি তাহলে স্বপ্নই দেখছেন।

হাসতে হাসতে চলে গেলেন সুধাদি।

॥ দুই ॥

ঠাট্টা করে কথাটা বলেছেন সুধাদি, কথাটা যেন ধারাল ছুরির মত লোকনাথের বুকের ভিতরে একটা খোঁচাও দিয়েছে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে, আমি স্বপ্ন দেখছি না, সুধাদি।

রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুকে কবেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে রেখেছেন, হ্যাঁ, বাড়ির নিচের তলার বারান্দা আর তিনটে ঘর জেলা বোর্ডের প্রাইমারি স্কুলের জন্য ভাড়া দিতে পারি। আর, পুবদিকের দালানে যদি আলুর হিমঘর করবার জন্য দাসবাবু ভাড়া নিতে চান তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আর কোন ঘর নয়। আমি শিগ্‌গির দেশে ফিরবো।

হ্যাঁ, রায়গঞ্জের সেই মরা নদী, বোশেখ মাসে যার পাঁক শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়, আর আষাঢ়ের প্রথম জলের ঢল গড়িয়ে যেতেই যার উপর ডিঙি ভাসিয়ে মালোপাড়ার ছেলের দল কাছিম শিকার করে বেড়ায়, তারই ভাঙা ঘাটের চাতালের উপর বসে আজও কি গান গায় না শীতলদীঘির বিশু বৈরাগী? উপরতলায় দক্ষিণ-দিকের ঘরের জানলার কাছে রাতের বেলায় দাঁড়ালে আর মাঠের দিকে তাকালে সেই ভোলা ভাগ্নের মত দুঃসাহসী ছেলের গা'ও ছমছম করতো; মাঠের উপর আলেয়া দৌড়চ্ছে। রামদয়ালবাবুর বাড়ির বকুলবাগান নিশ্চয় এখনও আছে। সেই বকুলের বাতাস মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে একেবারে হর্ষনগর পর্যন্ত চলে যায়। রাজেশ্বর ঘোষের পুকুরকিনারার সেই জবাগাছ, বারোমাস যার গায়ে শুধু পাতা ধরে আর ঝরে, তার একটি ডালে শুধু একটি ফুল ফুটবে ঠিক সেদিন, যেদিন শ্যামাপূজা। সেই-বছর একবার যে-রাতে হৃদয় সরকারের বাড়িতে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন চলছিল,

ফাল্গুন পূর্ণিমার সেই রাতে স্কুলবাড়ির খেলার মাঠের পাশে সেই কদম গাছের কাছে কী দেখেছিলেন রতনমণির মা? চুপটি করে কে-যেন দাঁড়িয়ে আছে, তার গলায় বনফুলের মালা। কিন্তু শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র, আর তাকে দেখা গেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বুঝতে পারেন লোকনাথ, একা তিনি ছাড়া এ-বাড়ির আর কেউ দেশে ফিরে যেতে রাজী নয়। ভবানীপুরে এই বাসাবাড়ির জীবনটারও স্বপ্ন আছে, আর সে যে কী চমৎকার একটি রঙিন স্বপ্ন, তাও জানেন লোকনাথ। ধানজমি-বেচা আর বাগান-বেচা ছাপ্পান্ন হাজার টাকার মাত্র সাত হাজার টাকা তারক ডাক্তারের চিকিৎসার দয়া কিনতে খরচ হয়েছে, কিন্তু বাকি উনপঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে, এই দশ-বছর ধরে সত্যিই একটা স্বপ্ন কেনবার চেষ্টা হয়েছে। সুখে থাকবার স্বপ্ন। কলকাতার জীবনের যত চমৎকার ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে আর রঙিন হয়ে থাকবার স্বপ্ন। সাজে আর আসবাবে এই বাসাবাড়ির একটা ঘর যেন সুধাদির যাদবপুরের বাড়ির নিচতলার ছোট ঘরটার একেবারে ট্রু-কপি। সোফাতে ঠিক সেইরকম চকচকে কালো পালিশ আর লাল ভেলভেটের গদি। জানালাতে লেসের পর্দার রঙও ঠিক তেমনই আসমানী নীল। এ-বাড়ির ঘরে যে রেডিও বাজে, তার গড়ন আর চেহারাও ঠিক সুধাদির বাড়ির জাপানী রেডিওটার মত, যেন ছোট্ট একটি খেলনা জাহাজ নীল সাগরের জলের উপর ভেসে রয়েছে। খাঁটি বর্মা সেগুনের একটা আলমারি এ-বাড়ির এই ঘরেও আছে। সুধাদি বলেছিলেন, তিনি ওই আলমারি পার্ক স্ট্রীটের যে দোকান থেকে কিনেছিলেন, তার নাম নিউ মডার্ন ফার্নিশার্স। নীরজাও একদিন সেই নিউ মডার্ন ফার্নিশার্সের দোকানে গিয়ে আর বেছে-বেছে ঠিক ওই রকমের এই আলমারি কিনেছিলেন। ছেলে আর দুই মেয়েও নীরজার সঙ্গে গিয়েছিল। এই আলমারিতে যে-সব খেলনা আর পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে-সবও সুধাদির বাড়ির ওই আলমারির পুতুল আর খেলনাগুলির মত। রঙিন ঝিনুক দিয়ে তৈরি একজোড়া ফুলদান, কাশ্মীরের আখরোট কাঠের পাখি, স্পঞ্জের কুকুর-ছানা, সাদা পাথরের হাত-কাটা ভেনাস আর প্লাস্টিকের আঙুর-থোকা। সুধাদির বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের মত এ-বাড়ির এই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার বর্ডারও পল-তোলা।

এই দশ বছরের মধ্যে রায়গঞ্জের কোন আলো-বাতাসের ছোঁয়া অবশ্য লোক-নাথের এই জীবনের গায়ে লাগেনি, কিন্তু রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুর সঙ্গে অনেকবার কথা বলবার সুযোগ হয়েছে। রামদয়ালবাবু তাঁর কারবারের দরকারে মাঝে-মাঝে যখন কলকাতায় আসেন, তখন পুরনো বন্ধু লোকনাথের সঙ্গে একবার দেখা করে যান। যেদিন আসেন রামদয়াল সেদিন লোকনাথের প্রাণে যেন রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের উৎসব মেতে ওঠে। কত গল্প, কত হাসি, পুরনো ঘটনার কথা নিয়ে কত তর্ক আর মন কষাকষি। রামদয়াল বলেন, না, তুমি খুব ভুল বুঝেছো লোকনাথ, আসল দোষ গগন সামন্তের নয়, ওর দ্বিতীয় পক্ষের মানুষটির। লোকনাথ বলেন,

আমি জোর করে বলতে পারি, আর একশোবার বলবো, গগন সামন্ত মিথ্যে সন্দেহের বাতিকে বউটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলেই···। রামদয়াল চেঁচিয়ে ওঠেন—ভুল ভুল, তুমি বুঝতে খুব ভুল করেছো।

রামগঞ্জের জীবনের প্রায় কুড়ি বছর আগের একটি জীর্ণ-পুরাতন ঘটনার কথা, কিন্তু দুই বন্ধুর বাদ-প্রতিবাদের শব্দ শুনে মনে হবে, যেন আজই এই কিছুক্ষণ আগে গগন সামন্তর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি চলে গেল। গগন সামন্তের উপর লোকনাথের মনের সব রাগ বিরক্তি আর তিক্ততা যেন টাটকা ক্ষতের জ্বালার মত কটকট করে জ্বলে উঠেছে।

রামদয়াল বলেন—কিন্তু তুমি দেশে ফিরছো কবে?

লোকনাথ—এই এবার; আর তো এখানে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। কোন দরকারও নেই।

রামদয়াল—হ্যাঁ, যে জন্যে এখানে আসা, সেটাই যখন একটা···।

লোকনাথ—কী?

রামদয়াল—একটা প্রবঞ্চনা হয়ে গেল, তখন আর এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

লোকনাথ—ঠিকই বলেছো রাম; আজ বুঝতে পারছি, সেদিন নিতাই কেন কেঁদেছিল।

রামদয়াল—সে প্রবঞ্চনা তো আছেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা বোধহয় তোমার এই···। হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে রামদয়াল বলেন—ওই ঘরে এখন এত জোরে রেডিও বাজাচ্ছে কারা?

লোকনাথ হাসেন—যারা বাজায় তারাই বাজাচ্ছে। ওরা আছে ওদের স্বপ্ন নিয়ে।

রামদয়াল—তোমার জমিবেচা বাগানবেচা আর পুকুরবেচা টাকার সবই কি তাহলে···।

লোকনাথ—না সব নয়। বেশির ভাগ ওদের ওই স্বপ্নের দরকারে খরচ হয়েছে।

রামদয়াল এইবার ভ্রুকুটি করে কথা বলেন—খুবই অদ্ভুত কাণ্ড বলতে হবে। এরকমটি কখনও দেখিনি। চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতাম না যে, এরকমটি কখনও হতে পারে। আমার সন্দেহ হয় লোকনাথ, তুমি যদি আরও দু'এক বছর চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় থাক, তবে তোমার এই বাড়ির ওই ঘরে হয়তো একটা টেলিভিশন সেট এসে পড়বে।

লোকনাথ—অন্তত একটা রেফ্রিজারেটর যে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রায়ই শুনছি, ওরা বলাবলি করছে, আর যাদবপুরের সুধাদিও এসে অভিযোগ করছেন, একটা রেফ্রিজারেটর না হলে আর মানায় না।···যাই হোক, আমি কিন্তু এবার তৈরি হয়েই আছি রামদয়াল। আর এখানে নয়। এবার সন্ধ্যা-বেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

প্রবঞ্চনার চেহারা দেখে ভয় পেয়েছেন লোকনাথ। সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শুনলেই তাঁর বুকটা ভয় পেয়ে দুরুদুরু করে। তারক ডাক্তারের নাম শুনলেই চোখের তারা দুটো যেন সাদা হয়ে যায়। কিন্তু তবু এই দশ বছরের মধ্যে দশবার প্রতিজ্ঞা করেও শেষ পর্যন্ত রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের কাছে চলে যেতে পারেননি লোকনাথ। কারণ, ওই একটি বাধা। নীরজার দুই চোখের অদ্ভুত সেই ছলছল সজলতা। নীরজার সেই চোখের জল বড় বড় ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে না; চোখের কোণে লেগেই থাকে আর চিকচিক করে। মনে হয়, নীরজার বুকের ভিতরে একটা স্তব্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন পাথর হয়ে আটকে রয়েছে; তাই কোন কথা বলতে পারে না নীরজা, শুধু লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ, যেন তাঁর প্রতিজ্ঞার সব কঠোরতা এক মুহূর্তে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। নীরজাকে অসুখী করে, নীরজার দুই চোখ জলে ভরিয়ে দিয়ে রায়গঞ্জে ফিরে গেলেই বা কী হবে? লোকনাথ কি সুখী হতে পারবেন? অসম্ভব।

কিন্তু মাঝরাতে আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন হঠাৎ একটা ঢিল কোথা থেকে ছুটে এসে আচমকা তাঁর বুকের পাঁজরের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে রামদয়ালবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছেন লোকনাথ; তাই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। রামদয়াল বলছেন—তুমি এত জোরগলায় আমাকে যে কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিলে, সে-কথা তবে নিতান্ত একটা কথার কথা।

—কী বলেছি তোমাকে?

—বলেছো, যদি রাধানাথের ভোগের একবাটি খিচুড়ি রোজ জুটে যায়, তবে তোমার বাকি জীবনটা সুখেই কেটে যাবে। তোমার কাছে নাকি রাধানাথের প্রসাদের চেয়ে বড় সুখ কিছু নেই।

—হ্যাঁ, তা তো বলেছি।

—ঠিক বিশ্বাস করে বলেছো কি?

—নিশ্চয়, ওই বিশ্বাসটুকু ছাড়া আমার জীবনে এখন তো আর কোন সম্বলও নেই। ওই বিশ্বাসের জোরেই তো বেঁচে আছি।

—তবে তোমার নীরজার চোখের জলের মায়া ছেড়ে দিয়ে রাধানাথের কাছে আজও চলে আসতে পারছো না কেন? কাজের বেলায় তো দেখা যাচ্ছে যে, তোমার কাছে নীরজার মুখের হাসিই তোমার সবচেয়ে বড় সুখ।

নিতান্তই তর্ক, তাও আবার স্বপ্নের মধ্যে। তবু বুকের ভিতরটা এমন করে চমকে আর ছটফটিয়ে ওঠে কেন? ঘুম ভেঙে যায় কেন? রোগে ভুগে ভুগে আর নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে মনটা খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে, তাই কি? কিন্তু খুব সত্যি কথা, দেবতার কাছে মনের ফাঁকি লুকিয়ে রাখা যায় না। রায়গঞ্জের মন্দিরের রাধানাথ, যাঁর শাসনে দামোদরের পাগল বেনোজল রায়গঞ্জের ক্ষেতের ধান ভাসিয়ে ও পচিয়ে দিতে পারে না, তাঁর কাছে তো কিছুই অজানা নেই। কলকাতায় আসবার পর, এই

দশ বছরের মধ্যে নীরজা বোধহয় একটি দিনও ঠিক লোকনাথের কথা মনে করে লোকনাথের কাছে এসে বসেননি। হ্যাঁ, কতবার এসেছেন বসেছেন ও কত কথা বলে চলে গিয়েছেন নীরজা; কিন্তু সবই তো এই কলকাতার জীবনের যত দরকারের কথা। সুধাদি বলে দিয়েছেন, কোন্ দোকানে শাড়ি কেনা উচিত, এ সপ্তাহে কোন্ ছবি দেখা উচিত, আর মেয়েদের বাড়িতে পড়াবার জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট মাস্টার চাই। দরকারের কথা বলে দিয়েই ব্যস্ত হয়ে চলে যান নীরজা। ব্যস্ত না হয়ে আর ওভাবে চলে না গেলেই বা চলে কী করে? নীরজাকেই তো দরকারের সব দাবি সামলাতে আর মেটাতে হয়।

॥ তিন ॥

পাশের ঘরে বসে কথা বলছেন যাদবপুরের সুধাদি: যে সংসারের পুরুষ মানুষ পঙ্গু আর অকর্মণ্য, সে সংসারে মেয়ে-মানুষকেই সাহস করে সব দায় নিতে হয়। তোর জামাইবাবুর বন্ধু প্রফেসর শশীবাবু বলেন, এ যুগ আর আগামী যুগটাও মেয়েদের যুগ, বউদি। সে কথা তো বাড়িয়ে বলা কথা নয়। এই ধর আমারই কথা; আমি যদি নিজের হাতে না চালাতুম, তবে কি তোর ওই জামাইবাবুর বিদ্যে-বুদ্ধিতে তিনতলা বাড়ি আর দুটো গাড়ি করা সম্ভব হতো।

ঠিক কথা। নীরজাও সে-সব কথা জানেন। ছোটমামার বড় মেয়ে সুধাদি, তাঁর স্বামী কমলবাবু কখনও কলেজে পড়েননি, কোন পাস-টাস করেননি। কোনদিন কোথাও বড়-রকমের কোন চাকরি-বাকরি করেছেন, এ কথাও কখনও শোনা যায় নি। সুধাদির শ্বশুরবাড়ি বলতে মানকরে যে বাড়িটার অনেক কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলেন নীরজা, সে বাড়িকে কোন বড়লোকের বাড়ি বলে মনে করাই যায় না; বরং বেশ খারাপ রকমের একটা গরিব বাড়ি বলে মনে করতে হয়। টিনের চালা আর মাটির দেয়াল, সেই বাড়ির কর্তা তাঁর বড় ছেলের বিয়ে দেবার এক মাস পরে সাপের কামড়ে মারা গেলেন। পুরো পাঁচটি বছর মানকরে ওই বাড়িতে দুঃখের নরকযন্ত্রণা সহ্য করবার পর সুধাদি একদিন নিজের বুদ্ধিতে কমল-বাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। হ্যাঁ, সুধাদিই কমলবাবুকে নিয়ে এসেছিলেন। কমলবাবু তো ওই টিনের চালার বাড়ি থেকে নড়তেও চাননি। সুধাদির অনেক অনুরোধ, অনেক সাধাসাধি বকাবকি ও ধমক-ধামকেও কোন ফল হয়নি। তারপর, সুধাদি যখন একাই হাঁটা দিলেন, তখন কমলবাবুও পিছু পিছু চলে এলেন।

সকলেই জানেন, নীরজাও জানে, সুধাদিই কমলবাবুকে শিখিয়ে বুঝিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। কমলবাবুর সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের সাত-আট জন অফিসারের অন্তরঙ্গ মেলামেশা আছে। অন্তত সাত-আটটা হেড অফিসে কমল-বাবুর যাতায়াত আছে। নিজে কোন অফিসের কেষ্ট-বিষ্টু অবিশ্যি হতে পারেন নি কমলবাবু, কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হয়নি। তাঁর ভাগ্যটা সাত-আট বছরের মধ্যেই সুখের তিনতলায় উঠে গিয়েছে। আজ আর শুধু একা সুধাদির হাতের

আঙুলে নয়, তাঁর তিন মেয়ের আঙুলেও হীরের আংটি ঝিকঝিক করে হাসে। সুধাদি এই সেদিনও হাসতে হাসতে বলেছেন—ভদ্রলোককে একবার জিজ্ঞেস কর তো নীরু, কে প্রথম বুদ্ধিটা দিয়েছিল? কে প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, দু'চার জন বড় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, বড়-বড় অফিসে যাওয়া-আসা করতে হয়। তা না হ'লে ভাগ্যি খোলে না। মানুষটাকে শুধু এইটুকু বোঝাতেই আমার ছ'মাস লেগেছিল, এমনই অদ্ভুত নিরেট মানুষ।

সুধাদির ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যটার তুলনা করতে গিয়ে অনেকবার মনে মনে কেঁদেও ফেলেছেন নীরজা। আবার ফিরে যেতে হবে সেই রায়গঞ্জে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই শেয়াল ডাকে, আর কালাচাঁদের বউ বিশ্রী একটা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে যখন-তখন এসে ছাই-ভস্ম যত বাজে ব্যাপারের খবর শোনায়। ভট্টাচার্যের মেয়ের নাকি এরই মধ্যে সাত মাস, অঘ্রাণে যার বিয়ে, বোশেখ না পেরোতেই তার সাত মাস হয় কী করে? হয় হিসেবের ভুল, না হয় মেয়েরই ভুল। দেখা যাক, আর দু'টো মাস পার হলেই যা বোঝবার তা ঠিকই বোঝা যাবে।

এমন এক রায়গঞ্জের জন্য কেন যে ছটফট করছেন ভদ্রলোক, সত্যি কিছু বুঝে উঠতে পারেন না নীরজা। আজ না হয় কাল, সুকুর একটা চাকরি হয়েই যাবে। তিনবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারেনি সুকু; দোষই বটে। আজ ওর বয়স পঁচিশ বছর; কিন্তু সেজন্যে তো একেবারে হতাশ হয়ে পড়বার কোন মানে হয় না। সুকু গাইতে পারে ভাল। সুধাদি বলেছেন, আজ না হয় কাল, না হয় আরও কিছুদিন লাগবে, সুকু কি কোন ছবিতে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে যাবে না? আর একটু নাম করে নিতেও পারবে না? এই তো, এই পাড়াতেই থাকে ছেলেটি, যার নাম মন্টু, কেরানী বলাইবাবুর ছেলে। মন্টুও লেখাপড়া তেমন কিছু শেখেনি। কিন্তু কে না জানে, সিনেমা-ছবির মন্টু এখন মাসে অন্তত তিন-চার হাজার টাকা রোজগার করে।

লোকনাথ কোন খোঁজ-খবরের ধার ধারেন না, তাই জানেন না যে, টুনি আর টুসি, দুই মেয়ের নামও বদলে গিয়েছে। টুনির নাম এখন আর প্রতিভা নয়, মিতালী রায়। টুসির নামও এখন আর বিজয়া নয়, পিয়ালী রায়। কলকাতার জীবনে যে নাম মানায়, সেইরকমই দুটি নাম নিয়েছে ওরা। সুধাদি বলেন—খুব সুন্দর নাম হয়েছে। আর একটা বছর পার হলেই মিতুর বি-এ পরীক্ষা। আর পিয়ার হবে ক্লাস টেন। কিন্তু ছেলে আর মেয়েদের জীবনের জন্য বাপের মনে সত্যিই কোন দরদ আছে কি? দরদ থাকলে কি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা কেউ বলতে পারে? কী আশ্চর্য, দশবছর ধরে চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েও ভবানীপুরের এই বাসাবাড়ির জন্য সামান্য একটু মায়া করতে পারলেন না ভদ্রলোক। সত্যি খাঁটি রায়গঞ্জের মানুষ বটে। দেখে কতবার আশ্চর্য হয়েছেন নীরজা, মিতু আর পিয়ার খোঁপার দিকে কী বিশ্রী রকমের চোখ ক'রে তাকিয়ে দেখছেন ভদ্রলোক। উনি চান, ওরা যেন কালাচাঁদের বউ-এর মত ঝিঁড়ে খোঁপা

বেঁধে চিরটা কাল রায়গঞ্জের টুনি আর টুসি হয়েই থাকে।

সুকু, মিতু আর পিয়া অবশ্য নীরজাকে অনেকবার বলেছে—তুমি মিছিমিছি কেন এত আশ্চর্য হও, আর কেনই বা বিরক্ত হও, মা? বাবাকে বাবার যুগে পড়ে থাকতে দাও। বাবার কোন কথা কানে তোলবার দরকার নেই।

নীরজা হাসেন—কিন্তু তোমাদের বাবা যে রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি করে দিতে রাজী নন।

সুকু চেঁচিয়ে ওঠে—তার মানে?

নীরজা—তার মানে, কলকাতার এই বাসা ভেঙে দিয়ে সবাইকে আবার সেই রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

মিতু হেসে ফেলে—সবাইকে যেতে হবে কেন? আমরা যে এখানেই থাকবো, সে-কথা কি বাবা জানেন না?

যেন সৌভাগ্যের একটা নতুন সঙ্কেতের দিকে তাকিয়ে আর হাস্যময়ী হয়ে কথা বলছে মিতু। নীরজাও সেটা বুঝতে পারেন। তাই নীরজাও হাসেন—না, জানেন না।

পিয়া হাসে—বাবা কি শোনেন নি যে, আমি নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

নীরজা—না, শোনেননি।

দাদা আর দুই বোন এইবার একসঙ্গে হাসে—বাবাকে কিছুই বলবার দরকার নেই।

সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শোনা যায়। সুকু বলে—বড়মাসি অনেকদিন পরে দয়া করলেন।

নীরজা—হ্যাঁ, কে জানে, কিসের জন্য এতদিন আসতে পারেননি।

মিতু বলে—বড়মাসিকে আমাদের ঘরের আসল কথাটা এখনই বলবার দরকার নেই।

পিয়া বলে—হ্যাঁ, বড়মাসির সব ভাল, কিন্তু কেমন-যেন একটু··· ।

মিতু হাসে—বলেই ফেল না।

পিয়া—বড়মাসির ধারণা, উনি অনেক বড়, আর আমরা কিছুই নই।

মিতু—হ্যাঁ, বড়মাসির ধারণা, শেষ পর্যন্ত আমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে; আর আমাদের আবার বনের পাখি হয়ে রায়গঞ্জের বনে ফিরে যেতে হবে।

নীরজা হাসেন—চুপ কর।

—দার্জিলিং-এ একটা বাড়ি কিনতে হলো, নীরু। তাই এই একটা মাস বড় ব্যস্ত ছিলাম। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন সুধাদি।

আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে সুধাদি একটু অদ্ভুত ভাবে সবারই মুখের দিকে তাকান।—কী খবর? রায়মশাই কী বলেন?

নীরজা—যা বলবার, তা তো সেদিনই বলে দিয়েছেন।

সুধাদি—বললেই হলো। রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রি না করে এখন উপায় কী?

বলতে বলতে উঠে গিয়ে দোতলায় গেলেন সুধাদি।—আয় নীরু, আর এক-

যার বলে দেখি।

লোকনাথের ঘরে ঢুকেই বেশ চমৎকার ঝংকারের মত স্বরে গলা বাজিয়ে প্রশ্ন করেন সুধাদি—আপনার রায়গঞ্জের ওই অদ্ভুত লক্ষ্মীমন্ত বাড়িটাকে কি আপনি সত্যিই বিক্রি করবেন না বলে ঠিক করেছেন?

লোকনাথ—আমি এ-বিষয়ে আপনাদের কাছে আর কোন কথা বলতেই চাই না; মাপ করবেন। দুই চোখ বন্ধ ক'রে পাশবালিসটাকে জড়িয়ে ধরেন লোকনাথ; আর কোন কথা বলেন না।

এই নীরবতাও যেন একটা কঠোর অবজ্ঞা, সুধাদির পাউডারমাখা মুখের অদ্ভুত হাসিটাকে এখনি এখান থেকে সরে যেতে বলছে। ঠিক কথা, সুধাদির এই পাউডার মাখা মুখের হাসিটাকে শুধু ভয় করেন না লোকনাথ, ঘেন্নাও করেন। ষাট বছর বয়স হয়েছে, তবু কী আশ্চর্য। তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য, নীরজাও মুখে পাউডার মাখবার অভ্যাস ধরেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন কী লজ্জাই না পেয়েছিলেন লোকনাথ, যেদিন নীরজা একটা ঝলমলে রঙিন শাড়ি পরে আর মুখে পাউডার মেখে ওইখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, আর রামদয়ালের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভুলতে পারেন না লোকনাথ, রামদয়ালের দুই চোখ যেন কাঁটার খোঁচা লেগে কুঁচকে গিয়েছিল। রামদয়াল তো কখনও স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারে না যে, রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের স্ত্রী, যার বয়স হয়েছে পঁয়তাল্লিশ, সে মানুষ কখনও মুখে পাউডার মাখতে আর রঙিন সাজে সাজতে পারে। সুধাদি সত্যিই একটি অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া।

দুই চোখ বন্ধ করে আর বালিস আঁকড়ে এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতেই বুঝতে পারেন লোকনাথ, সুধাদি চলে গেলেন। সুতরাং, এই ঘরের ভিতরে এখন একমাত্র যে-জন বসে আছে, সে হলো লোকনাথ রায়ের জীবনের সেই নীরজা, যার চোখে জল দেখলে লোকনাথ রায়ের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ব্যথা পেয়ে উতলা হয়ে যায়। নীরজা যদি অসুখী হয়, তবে লোকনাথ রায় কিসের স্বামী? কিসের পুরুষ? পঁচিশ বছর আগের রাজপুরের একটি উৎসবের ঘরে, বাসরজাগা বাতির আলোতে যে মেয়ের ভিজে চোখ দেখতে পেয়ে লোকনাথের বুকটা ব্যথায় ভরে গিয়েছিল, সেই বিশ বছর বয়সের মেয়েটিই তো আজকের ওই নীরজা। সেই ভিজে চোখ চুমো দিয়ে মুছে দিতে গিয়ে যে লোনা স্বাদের মায়া লেগেছিল আর ভিজে গিয়েছিল লোকনাথেরই ঠোঁট, সেই স্বাদ যে আজও বুকের ভিতরে তিনি অনুভব করতে পারেন। যে বাতের রোগে পঙ্গু হয়েছে তাঁর দুই পা, সেই রোগের উপর তাঁর রাগের কারণ শুধু এই নয় যে, রোগটা বড়ই কষ্ট দেয়; নীরজা হতাশ হয়, নীরজার জীবনটা অসুখী হয়ে গিয়েছে. নীরজার চোখে দুশ্চিন্তার কষ্ট মাঝে মাঝে ছলছল করে কাঁপে, তাই রোগটার উপর এত বেশি রাগ হয়।

ঘরে এখন আর কেউ নেই, শুধু একা নীরজা। কিন্তু চোখ খুলে নীরজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও পারছেন না লোকনাথ। ভয় হয়, সেই ভয়। নীরজার

চোখে সেই করুণ অভিমান বোধহয় আবার ছলছল করে কাঁপছে। সেদিন রাজপুরের সেই উৎসবের রাতে সেই বাসর ঘরে নীরজা স্বীকার করেনি, আজও নিশ্চয় স্বীকার করবে না, এই অভিমান হলো ভাগ্যেরই সঙ্গে একটা অভিযোগের নীরব বিলাপ। ত্রিশ বছর বয়সের স্বামী, গাঁয়ের স্কুলের মাস্টার সেদিন চন্দনের লবঙ্গ-ছাপ দিয়ে আঁকা একটি মুখের সুন্দর ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি করে বলবে, তোমার চোখে জল কেন? আমাকে খুবই গরিব ঘরের মানুষ বলে মনে হয়েছে, তাই কি? নীরজা বলেছিল—না। কথা শুনে সেদিনের লোকনাথের ত্রিশ বছর বয়সের বুকটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল, চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। বলেছিলেন লোকনাথ—তবে আমিও বলছি, আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে অসুখী হতে দেব না।

তাই ভয়, চোখ মেলে তাকালেই হয়তো দেখতে পাবেন লোকনাথ, নীরজার দুই চোখ ভিজে গিয়েছে। সেই ভিজে চোখ যেন হতাশায় অপলক হয়ে দুঃসহ একটা দুর্ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—নীরু। ডাক দিয়ে মুখ ফেরান আর চোখ খোলেন লোকনাথ।—নীরু তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস কর, এখন রায়গঞ্জে ফিরে গেলে আমাদের সবারই ভাল হবে।

চমকে ওঠেন লোকনাথ। কই? নীরজার চোখে তো কোন করুণ অভিযোগ নেই, অভিমানও নেই। ভিজে চোখ নয়, শুকনো খটখটে চোখ। বরং মনে হয় নীরজার এই চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে হাসছে।

লোকনাথের মুখের দিকে নয়, দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নীরজা তাকিয়ে আছে নিচের তলার ঘরের কোন একটা চমৎকার বস্তু কিংবা ঘটনার দিকে; তা না হলে অমন করে উজ্জ্বল হয়ে হাসবে কেন নীরজার দুই চোখ?

—কী হলো? কী দেখছো নীরু? লোকনাথের মুখের ভিতরটা যেন দুঃসহ একটা বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরজা কি শুনতে পেল সেই মুখরতার কোন শব্দ?

না, নীরজার কানে বোধ হয় লোকনাথের এত ব্যস্ত জিজ্ঞাসার কোন শব্দ পৌঁছয়নি। জবাব দেন না নীরজা। চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন আর নিচের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। সে হাসির সঙ্গেও অদ্ভুত একটা মায়াময় তৃপ্তির ঝংকার। এমন ক'রে, এত অদ্ভুত সুরেলা শব্দ করে নীরজাকে কোনদিন হাসতে দেখেননি লোকনাথ।

রায়গঞ্জে কতবার দেখেছেন লোকনাথ, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ কেটে গিয়ে যখন আধখানা চাঁদের আভা ফুটে উঠতো, তখন রাধানাথের মন্দিরের কাছে কদম গাছের মাথায় ঘুমন্ত কাক উসখুস ক'রে জেগে উঠে ডাক শুরু করে দিত। কী অদ্ভুত খুশির ডাক, যেন ভোর হয়েছে।

নীরজার প্রাণটাও কি তেমনি কোন আধখানা চাঁদ হঠাৎ দেখতে পেয়ে হঠাৎ

ভেকে উঠেছে? হাতের জোরে শরীরটাকে হঠাৎ টান ক'রে আর কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসেন লোকনাথ। ডাক দেন—একটা কথা শোন, নীরু।

আবার চমকে ওঠেন লোকনাথ। শূন্য গুহার কাছে কথা বললেও সাড়া পাওয়া যায়, প্রতিধ্বনি বাজে। কিন্তু লোকনাথ যেন নিতান্ত একটা শূন্যতার কাছে কথা বলছেন। নীরজা কোন সাড়া দিলেন না। আরও আশ্চর্য হয়ে, আর চোখ বড় করে তাকাতে গিয়ে শুধু দেখতে পেলেন লোকনাথ, নীরজা ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

কিসের ব্যস্ততা?

॥ চার ॥

ভিতরে ঘরের ওদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল যে আগন্তুক, যার সঙ্গে আস্তে-আস্তে হেসে হেসে কথা বলছিল বড় মেয়ে মিতালী রায়, তারই দিকে তাকিয়ে-ছিলেন নীরজা। এবং তাই তাঁর চোখ দুটো এত উজ্জ্বল হয়ে হাসছিল।

মিতালী আর সেই আগন্তুক ছেলেটি, দু'জনে কথা বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে গেল, আর রেডিওর গানের শব্দটা আরও জোরাল হয়ে উঠলো; তাই এবার ঘরের ভিতর এগিয়ে গেলেন নীরজা। তখনই ডাক দিলেন—পিয়ালী, তুই কোথায়?

—আমি এখানে আছি।

—না, এখানে চলে আয়।

পিয়ালীর হাতে রঙিন কাগজের একটা বাক্স, তার মধ্যে এক ডজন রুমাল। চৌরঙ্গীর এক কাশ্মীরীর দোকান থেকে কেনা কাশ্মীরী রেশমের রুমাল। রুমালের গায়ে ডাল হ্রদের একটি পদ্মবন, তার গায়ে লেগে ভেসে রয়েছে লাল রঙের শিকারা। পিয়ালী বলে—সত্যি কথা, দেবুদা কোন কথা একটুও ভুলে যায় না। কবে বলেছিলাম, নতুন রকমের রুমাল এনে দিতে পারেন? সে কথা দেবুদার ঠিক মনে আছে। এই দেখ, কী সুন্দর ছবিতোলা কাশ্মীরী রুমাল।

পিয়ালী বোধহয় বুঝতে পারেনি যে, এই ঘরের ভিতরে একটা খাটের উপরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে এই বিকালে এখনও শুয়ে রয়েছে যে, সে সত্যি ঘুমিয়ে পড়েনি। বুঝতে পারলে এত চেঁচিয়ে কথা বলতো না পিয়ালী।

মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুকুমার কথা বলে—গোটা তিনেক রুমাল আমাকে দে।

চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে পিয়ালী—দাদাকে একটু লোভ সামলাতে বল, মা। আমি এই রুমালের একটাও কাউকে দেব না।

সুকুমার হাসে—একটা অন্তত দে।

পিয়ালী—কেন?

সুকুমার—দরকার আছে।

পিয়ালী হাসে—সত্যি করে বল তো, কার জন্যে দরকার? তোমার নিজের

জন্তে, না তাঁর জন্তে ?

লজ্জা পেয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে সুকুমার—মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছিস কেন ? যখন সন্দেহ করেই ফেলেছিস, তখন আর…।

ঠিক কথা। যাকে এইরকম একটি রুমাল উপহার দিতে পারলে সুখী হবে সুকুমার, তারই জন্ম অন্তত একটি রুমাল সে পেতে চায়। নীরজা জানেন, মিতালী আর পিয়ালীও জানে, সুধাদি তো জানেনই, শুধু এক লোকনাথ জানেন না, কার দরকারের জন্ম এইরকম একটি কাশ্মীরী রুমাল আজ সুকুমারের দরকার হয়েছে।

বড় শান্ত ও লাজুক স্বভাবের মেয়েটি, নাম তার বীণা, সুধাদিরই এক দেবরের মেয়ে। সুধাদি বলেন, মেয়েটার বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখন ওর মা ইচ্ছে করে বিষবড়ি খায়। আত্মহত্যার কারণ, স্বামীর উপর রাগ। সেই যে সাত বছর আগে মেয়েটার জন্মের ঠিক এক মাস আগে কাউকে না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেল তাঁর সেই দেবর, তার পর আর ফিরে এল না। এক বছর পরে খবর পাওয়া গেল, জার্মানীতে আছে বীণার বাবা, সুধাদির সেই দেবর শ্রীঅমল সেন। ঠিকানাও পাওয়া গেল। সাত বছরে কম করেও তিনশো চিঠি লিখেছিল বীণার মা, ফিরে আসবার জন্ম কত অনুনয় আর আবেদন। জবাবে মাত্র সাতটি চিঠি এসেছিল ; অমল সেন শুধু একটি কথাই বার বার লিখে জানিয়ে দিয়েছিল, এ জীবনে সে আর দেশে ফিরবে না। সেই অমল সেন এখনও জার্মানীতেই আছে, কিন্তু জানে না বোধহয় যে, তাঁর স্ত্রী আর এ-জগতে নেই। কিন্তু বীণা নামে তার যে একটি মেয়ে এ-জগতেই আছে, সে-কথাও বোধহয় জানে না। কারণ, চিঠি দিয়ে মেয়ের সামান্ত একটু খোঁজখবরও করেনি অমল সেন ; জানেও না যে, ওই মেয়ের বয়স এখন কুড়ি বছর পার হতে চললো আর বিয়ে দিয়ে দেবার দরকারও হয়েছে।

সুধাদিরই বাড়িতে, সুধাদির কাছে থেকে বড় হয়েছে বীণা। কিন্তু শুধু চেহারাতেই বড় হয়েছে, শিক্ষাতে নয়। সুধাদির তিন মেয়েই শিক্ষিতা। বড় মেয়ে অঞ্জলি, মেয়ে স্কুলের টিচার, চিরকুমারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে বলে পণ করেছে, কে জানে কেন এমন পণ ; তাই সে সুধাদিরই কাছে থাকে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে যে দুই মেয়ের, তারাও সুধাদির কাছে থাকে। এক জামাই থাকেন হাভার্ডে, আর এক জামাই গ্লাসগোতে। পড়া আর ট্রেনিং শেষ করে জামাইদের দেশে ফিরতে নাকি এখনও ছয়-সাত বছর বাকি।

সুধাদি বলেন—বীণার জন্যেও যে বিলাত-ফেরত বর তিনি আনতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু ভালবাসার দামটাও তো তুচ্ছ করা উচিত নয়। বীণা যখন সুকুকে ভালবাসে, আর সুকুও বীণাকে ভালবাসে, তখন সুকুর সঙ্গেই বীণার বিয়ে হলে তিনি সুখী হবেন।

কিন্তু……নীরজার এই কিন্তু-কিন্তু ভাবের আসল কারণটা কী, তাও জানেন সুধাদি। জানা কথা, আপত্তি করবেন লোকনাথ। তিনি বলবেন, যে ছেলে পঁচিশ

বছর বয়সের একটা জোয়ান হয়েও এখনও রোজগারের কোন কাজ ধরতে পারলো না, তার কি বিয়ে করা উচিত? কখনই নয়। তা ছাড়া, এমন নিরোজগেরে ছেলের সঙ্গে কোন্ ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন? কেউ না। সুধাদি কিন্তু বলেছেন, সব সময়েই বলেন: আমি কিন্তু সব জেনে শুনেও তোমাদের ঘরে আমার বীণাকে দিতে চাই, নীরু। আমার কোন আপত্তি নেই। সুকু এখনও রোজগারের কোন কাজ ধরতে পারলো না ঠিকই. লেখাপড়াও শিখলো না, কিন্তু তবু মানুষ তো, আর মানুষের ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

আজ কিন্তু নীরজার মনে কোন কিন্তু নেই। আজ তিনি আশা করতে পারছেন, এইবার সুকুর বিয়ে হয়ে যাবে, মিতুর কলেজে পড়া চলতেই থাকবে, আর পিয়ার অনেক দিনের ইচ্ছার সেই বস্তুটা, একটি গীটারও এসে যাবে।

সুকু বলেছে, দেবু আমার একটা কাজ যোগাড় করবার জন্যে ভয়ানক চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, মা। পিয়া বলেছে, দেবুদা আমার গীটার শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মা। শেখাবেন ধরণীবাবু, সেই ধরণীবাবু, কালীঘাটের জলসাতে সেদিন যাঁর গীটার শুনেছিলে। সপ্তাহে একদিন আসবেন, মাসিক মাইনে নেবেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। দেবুদা বলেছে,সে-টাকার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আর মিতু বলেছে যে-কথা, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর বিস্ময়ের কথা। কথাটার সবটুকু ঠিক ভাল করে আর স্পষ্ট করে বলতেও পারেনি মিতু। বলতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে মুখ রাঙাও করেছে। দেবু বলেছে, আমি থাকতে তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—আর কি বলেছে? প্রশ্ন করতে গিয়ে নীরজার দুই চোখের তারা যেন আশ্চর্য হবার সুখে চিকচিক করে।

মিতু—আর কি বলবে? যা বলবার ছিল সবই বলেছে।

—তুই কি বললি?

—আমি বললাম, পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, পাস করি, তারপর যেদিন ইচ্ছে···।

—তারপর? দেবু কি বললে?

—দেবু বলেছে, তাই ভাল। আর একটা বছর অপেক্ষা করতে তার একটুও আপত্তি নেই।

সুকু আর প্রিয়া রুমাল নিয়ে বকাবকি আর হাতাহাতি করতে থাকে। আর নীরজা টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে স্টোভ ধরান। চা করতে হবে। নীরজা জানেন, দেবু যখন-তখন চা খায়। চায়ে দুধ ভালবাসে না দেবু; দেবুর চায়ে লেবুর রস দিতে হয়। নীরজা বলেন—বকাবকি রেখে এখন একটা লেবু কেটে দে, পিয়া।

॥ পাঁচ ॥

পাশের ঘরের দরজার পর্দাটা দুলছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকেন নীরজা। পাশের ঘরে এখন মিতুর সঙ্গে কথা বলছে যে দেবু, সে দেবু সত্যিই একটি বিস্ময়। একটা

আশা করেননি নীরজা। দেবু যেন এ-বাড়ির ভাগ্যের মেঘলা আকাশে একটি জলজলে তারা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই তো, মাত্র তিন মাস আগে, কোথায় যেন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দেবুর সঙ্গে প্রথম দেখা আর আলাপ হলো সুকুর, আর চা খাওয়াবার জন্যে দেবুকে এ-বাড়িতে নিয়ে এল। তখন তো একটুও বুঝতেও পারেননি নীরজা যে, দেবু নামে সেই ছেলেটির প্রাণের ভিতরে এত মায়া আছে। ইচ্ছে করে, আজ এখনই দেবুকে নিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জের ভদ্রলোকের চোখের সামনে একবার দাঁড় করিয়ে দিতে আর শুনিয়ে দিতে, দেখে নাও, তোমার রায়গঞ্জ সাতজন্ম তপস্যা করলেও যে ছেলে পাবে না, সে হলো এই দেবু, এই কলকাতারই ছেলে। দশ টাকা ধার দিলে এক বছরে আট টাকা সুদ নিয়ে থাকেন তোমারই বন্ধু, রায়গঞ্জের রতনবাবু, যিনি তমসুকের বোঁচকা বুকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারেন না। আর, কলকাতার এই দেবু তার সামান্য ক'দিনের চেনা এক বন্ধুর বাপ-মা-বোন সবাইকে সুখী করে বাঁচিয়ে রাখবার সব খরচের দায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। তোমার রায়গঞ্জের একশো আষাঢ়ে গল্পের মধ্যেও কি দেবুর মত একটি মাণিক খুঁজে পাওয়া যাবে?

কিন্তু লোকনাথের কাছে গিয়ে এই শুভ বিস্ময়ের কোন কথা নিয়ে আলোচনা করতে চান না নীরজা। আলোচনা করে কোন লাভ হবে না। দেবুর কথা তাঁকে আজ এখনই জানিয়ে কিংবা শুনিয়ে দেবারও কোন দরকার নেই। তাঁকে শুধু এটুকু জানিয়ে দিলেই হবে যে, রায়গঞ্জে এখন আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না; কোনদিন ফিরে যেতে হবেও না। রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রী করা হোক বা না হোক, সেজন্য এ-বাড়ির সুখশান্তির কোন সমস্যা আর হবে না।

ভাবতে বেশ আশ্চর্যই বোধ করতে হয়, রায়গঞ্জ বলতে কিংবা দেশের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে বাত-পঙ্গু মানুষটির মনে যেন দশ ভাবের দশা দেখা দেয়। কখনও হেসে ফেলেন, কখনও চেঁচিয়ে ওঠেন, কখনও বা চোখ মুছে মুছে বিড়বিড় করেন। কখনও বা রাগ ক'রে অভিযোগ করেন, কলকাতার নাম করতে তুমি তো ভাবে বিভোর হয়ে যাও নীরু। কিন্তু কী আছে কলকাতায়? বড় বড় চমৎকার ফাঁকি ছাড়া আর কিছু আছে কী? মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করেন, তোমার কাছে কলকাতা মানে সুধাদি, আর সুধাদি মানে কলকাতা। নীরজা ভাবছেন, আজ কিন্তু এখনি রায়গঞ্জের মানুষটিকে শুনিয়ে দিতে পারা যায়: শুধু এক সুধাদিকে দেখছো কেন, দেবু নামে একটি ছেলেকেও দেখতে পার; সে ছেলে এই কলকাতারই ছেলে।

দোষ ধরলে আর খুঁত বের করতে হলে তোমার রায়গঞ্জেই বা কোন মহিমার পরিচয় পাওয়া যাবে? মিথ্যে মামলা করে তোমারই রাজেনকাকা যে তোমার ত্রিশ বিঘে ধানজমি কেড়ে নিয়েছেন, সে-কথা কি ভুলে গিয়েছ? সেকেণ্ড মাস্টার অনাদি-বাবু কী নীচতার কাণ্ড করেছিলেন, তাও কি মনে নেই? ইন্সপেক্টরের কাছে তোমার নামে মিথ্যে অপবাদের কথা বলে তোমার কী ক্ষতি করেছেন অনাদিবাবু, সে-কথা তুমি তো এই সেদিনও রামদয়ালবাবুর কাছে বলছিলে। তবে আর কলকাতার

নামে এত ভয় আর ঘেন্না কেন ? রামদয়ালবাবুও বলেছেন, অনাদিবাবু ওই নীচতার কাণ্ডটি না করলে তুমিই হেড মাস্টার হতে। তোমার ওই রায়গঞ্জের কাঁকড়া বিছার কামড়ে তোমার সবচেয়ে আদুরে গরুটি মরে গেল, মনে আছে কি ? রায়গঞ্জের নাম করে গর্ব করবার কিছুই নেই। আর খুশি হবারই বা কি আছে ? আশা করবারই বা কি আছে ? রায়গঞ্জে থাকলে কি তোমার ছেলের জন্যে বীণার মত মেয়ে তুমি পেতে ? না, তোমার মেয়ের জন্য দেবুর মত ছেলে পাওয়া যেত ? সুকুর অবিশ্যি ভাগ্য খারাপ, কলকাতায় থেকেও লেখাপড়া ভাল শিখলো না।

রায়গঞ্জে থাকতেই বা লেখাপড়ার কোন্ উন্নতি দেখাতে পেরেছিল সুকু ? তুমিই জান, তোমার ছেলে বলেই সুকুকে পর-পর তিন বছর প্রমোশন দিয়েছিলেন হেডমাস্টার ; পরীক্ষায় ফেল করাই তো সুকুর নিয়ম ছিল।

রায়গঞ্জে থাকলে মিতু আর পিয়ারও বা কী দশা হতো ? দুই মেয়ের কারও কপালে কলেজে পড়বার সৌভাগ্য হতো না। আজও স্মরণ করতে পারেন নীরজা, রায়গঞ্জে থাকতে লোকনাথ প্রায়ই তাঁর এক ভাল ছাত্রের কথা বলতেন। সে ছাত্রের নাম সুদেব। সুদেবের বাবা সনাতন সরকার শহরে মোক্তারি করেন। মিতুর বয়স তখন দশ বছরও হয়নি। লোকনাথ তখনই সুদেবের সঙ্গে মিতুর বিয়ের কথা কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। বার বার বলতেন, আমি ভাবছি নীরু,সনাতনবাবুর সঙ্গে কথাটা এখনই একটু আলোচনা করে রেখে দিই।

ওই তো, ওই সুদেব, রায়গঞ্জে থাকলে মিতুর জীবনের ভাগ্যটা ওই সুদেব পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারতো, তার বেশি নয়। রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের কল্পনা করবার, আশা করবার, কিংবা বিশ্বাস করবার শক্তিও ছিল না যে, তাঁর মেয়ে মিতুর সঙ্গে দেবুর মত ছেলের বিয়ে হতে পারে।

রামদয়ালবাবুর সঙ্গে গল্প করবার সময় কথায় কথায় অদ্ভুত রকমের একটা অহংকারের কথাও বলেন লোকনাথ। সে কথা শুনে নীরজার হাসি পায়, দুঃখও হয়। 'রোগে আমার পা দুটোকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে রামদয়াল, কিন্তু আমি পঙ্গু হইনি।' রামদয়াল বলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, খুব ঠিক কথা। লোকনাথের অহংকার এইবার যেন হেসে হেসে ঝলসে ওঠে।—লোহারামের ব্যাকরণ পড়ে মানুষ হয়েছি, রাম, প্রাণের মধ্যে সেই লোহার কিছুটা আজও আছে।

পাশের ঘরে বসে আর শুনতে পেয়ে হেসে ফেলেছিল সুকু—বাবা যে একজন লৌহমানব, সে কথা কি তুমিও জানতে, মা ?

নীরজা হাসেন—চুপ কর। রোগী মানুষ, অনেক দুঃখে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই ওরকম অদ্ভুত কথা বলেন।

হেসে হেসে সুকুকে চুপ করিয়ে দিলেও মনে মনে স্বীকার করেন নীরজা, মানুষটার প্রাণে সত্যি লোহার মত কোন বস্তু আছে। ভয়ানক শক্ত একটা বিশ্বাসের লোহা। বিশ্বাস করেন লোকনাথ, রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে রাধানাথের প্রসাদ খেতে পারলে একমাসের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। বিশ্বাস করেন,

নিতাই কবিরাজের পাঁচন খেয়েই তাঁর রোগ সেরে যাবে। বিশ্বাস করেন, রাধানাথ শিগগিরই তাঁকে কাছে ডেকে নেবেন। বিশ্বাস করেন, তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সবাই সুখী হবে, যদি এখনও কলকাতা ছেড়ে রায়গঞ্জে গিয়ে আবার সেই পুরনো বাড়িতে ঠাঁই নেওয়া হয়। বিশ্বাস করেন, মোক্তার সনাতন সরকারের ছেলে সুদেবের সঙ্গে তাঁর মেয়ে মিতুর বিয়ে হলে খুব ভাল হয়।

কিন্তু এই অদ্ভুত বিশ্বাসের লোহা যে কোন কাজের বস্তু নয়, এই সত্যটি তাঁকে বুঝিয়ে দেবে কার সাধ্যি? উনি বলবেন, পরের কাছ থেকে উপকার নেবার লোভ হলো ভয়ানক লোভী একটা পাপ। উনি বলবেন, তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। উনি বলবেন, কলকাতাতে সুধাদির মত মানুষকেই ভাল মানায়, তোমাদের একটুও মানায় না।

কাজেই, এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাবুঝির চেষ্টা করবার আর কোন অর্থ হয় না। উনি ওঁর প্রাণের লোহা নিয়ে পড়ে থাকুন। কিন্তু...।

চায়ের জল ফুটতে শুরু করেছে, কেটলিটাকে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কিন্তু সুকু, তোর বাবা যদি জেদ না ছাড়ে, যদি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা আবার তোলে, তবে কী হবে?

সুকু বলে—তাহলে বলতে হবে, তুমি একাই রায়গঞ্জের বাড়িতে থাক। আমাদের পক্ষে এখন রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

নীরজা—কিন্তু সেটা কী ভাল দেখাবে?

সুকু—ভাল দেখাবে না ঠিকই, কিন্তু উপায় কী? বাবা যে আমাদের ভাল কিসে, সেটা একটুও বুঝতে পারছেন না।

নীরজা—সেই তো আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ।

পাশের ঘর থেকে ডাক দেয় মিতালী—চা হয়েছে নাকি, পিয়ালী?

—হ্যাঁ, হয়েছে। চেঁচিয়ে জবাব দেয় পিয়ালী।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে চা তৈরি করে নীরজা। সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সেই ক্ষণিক বিষাদের চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। হ্যাঁ, দুঃখ বটে, সে দুঃখের জন্য মনের ভিতরে একটা অস্বস্তিও বোধ করতে হয় বটে, কিন্তু আর তো ভয় করবার কিছু নেই। রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে না, দৈববাণীর মত একটা আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে দিয়েছে ওই দেবু, দেবকুমার দত্ত, কলকাতার কলেজের প্রফেসর, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, শ্যামবাজারে যার বাড়ি; নিজেরই বাড়ি।

নীরজা বলেন—তুই ওখানে চা পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি, পিয়ালী। একটুও দেরি করবি না, বুঝলি?

পিয়ালী হাসে—হ্যাঁ মা বুঝেছি, আর বেশি বলতে হবে না।

॥ ছয় ॥

এত গরম চা, তবু তিন চুমুকেই সেই চা খেয়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়ায় দেবু—আমি এবার যাই, মিতু।

মিতালী আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কেন ? কিসের এত তাড়া ?

দেবু—সত্যি, আমার খুব লজ্জা করে, মিতু।

মিতালী—কিসের লজ্জা ?

—সবাই দেখছেন, আমি এ-ঘরে তোমার কাছে এতক্ষণ বসে আছি।

—কেন বসে আছ, সেটা তো সকলেই জানে।

—হ্যাঁ, সেই জন্তেই তো বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

মিতালী হাসে—তোমার মা জানেন তো ?

—নিশ্চয়। আমি নিজেই তোমার ফটো মা'কে দেখিয়েছি, তোমাদের সব কথা বলেছি।

—কী বললেন, মা ?

—বললেন, খুব ভাল মেয়ে, খুব সুন্দর মেয়ে।

—আর কিছু বলেননি ?

—বলেছেন, তবে আর দেরি কেন ? বিয়েটা হয়ে গেলেই তো হয়।

—তুমি কী বললে ?

—তুমি যা বলেছো, তাই বললাম। আর একটা বছর পরে। তোমার বি-এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বিয়ে হবে।

—মা কী বলেন ?

—মা বলেন, তবে তাই হোক্, ভালই তো।

—অ্যাঁ ? তবে তো বলতে হয়, তোমার মা সত্যিই খুব সাধাসিধে সরল মনের মানুষ।

—হ্যাঁ, মিতু। আমার মা'র মত শান্ত মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটা মজার গল্প শুনবে ?

—বল।

—একদিন দুপুরবেলায় একটা চোর ঘরে ঢুকে মা'র একটা কাপড় চুরি করে পালিয়েছিল। পাশের বাড়ির ঝি চেঁচিয়ে উঠেছিল, ও মা, দেখতে পাচ্ছো না, চোর যে তোমার কাপড় নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর দুঃখ করলেন, চোরটা একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে চলে গেল রে, দেবু।

—তার মানে ?

—তার মানে, মা বলতে চান, চোর একটা ভাল কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেলে ভাল হতো।

হেসে ফেলে মিতালী।—অদ্ভুত মায়ার মানুষ।

দেবু—হ্যাঁ। একটা কথা, তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝলে না তো?

—কেন, কিসের জন্য কী ভুল বুঝবো?

—এই যে আমি, বলেছি যে, তোমাদের বাড়ির দরকারের সব খরচের দায় আমিই নিলাম, তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—এ কী কথা বলছো তুমি? তুমি আমাদের যে উপকার করলে, সে উপকার এ পৃথিবীতে কে কার জন্যে করতে পারে?

—তোমার বাবা আর মা জানেন?

—হ্যাঁ। আমি সব বলে দিয়েছি। বাবা অবিশ্যি কিছুই জানেন না, বাবাকে কিছু বলবার দরকারও হয় না।

—ওঁরা কেউ ভুল বুঝলেন না তো?

—কেউ না। মা বরং বলেছেন, দেবু আমাদের সৌভাগ্য।

—তবে আমার সঙ্গে একটু এস।

—কোথায়?

—চল, তোমার বাবা আর মাকে প্রণাম করে আসি।

হেসে ওঠে মিতালী—এঃ, তুমিও দেখছি তোমার মা'র মত নিতান্ত সাধাসিধে মানুষ।

—না মিতালী, আমি ওঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি বাইরের মানুষ নই, আমি এ-বাড়ির একজন আপন মানুষ।

—একথা এ-বাড়ির কে না বুঝেছে?

—তবু…।

—তবে চল।

ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসে মিতালী; হাসতে গিয়ে মাথা হেঁট করে।—শোন মা, দেবু কী বলছে।

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যান নীরজা—কী?

মিতালী—দেবু তোমাকে আজ প্রণাম করতে চায়।

প্রণাম করে দেবু। নীরজা যেন হঠাৎ এক অদ্ভুত মুগ্ধতার আবেশে অভিভূত হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন—বেঁচে থাক, সুখে থাক বাবা।

মিতালী—বাবাকে প্রণাম করবে দেবু।

চমকে ওঠেন নীরজা—অ্যাঁ, উনি তো খুবই অসুস্থ, হয়তো এখন ঘুমিয়ে আছেন। আজ বরং…।

দেবুর মুখের লাজুক হাসিটা আরও নিবিড় হয়ে যেন থমথম করে।—ঘুমিয়ে থাকলে আমি না হয় কিছুক্ষণ বসে থাকবো। যখন জাগবেন, তখন…।

নীরজা—তা হয়তো হতে পারে; কিন্তু, আচ্ছা, এস তবে।

ঘুমিয়ে নয়, জেগেই বসেছিলেন লোকনাথ। নীরজা বলেন—খুকুর বন্ধু দেবু তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—আঁ্যা ? সুকুর বন্ধু ? আমাকে প্রণাম করতে চায় ! লোকনাথের গলার স্বরে যেমন বিস্ময়, দুই চোখেও তেমনই একটা বিস্ময় উথলে ওঠে। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনে কেউ কোনদিন লোকনাথকে প্রণাম করতে আসেনি। এমন কি সুধাদির তিন মেয়ের কোন মেয়েও না। লোকনাথ শুধু জানেন, রায়গঞ্জের এক পঙ্গুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, এমন মানুষ এই কলকাতাতে থাকে না, থাকতে পারে না।

প্রণাম করে দেবু। দেবুর মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করেন লোকনাথ—সুখে থাক, বেঁচে থাক।

দেবু বলে—আজ এখন চলি। আমার আবার একটা কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাশ করতে হয়।

নীরজা বলে—দেবু হলো কলেজের প্রফেসর। এম-এ পরীক্ষাতে সোনার মেডেল পেয়েছিল।

লোকনাথ—বাঃ, সুন্দর। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ, তোমার সবরকম কল্যাণ হোক, বাবা। এস।

নীরজা হাসতে হাসতে ডাকেন—এস, দেবু। ওরা সবাই তোমাকে কী যেন বলবার জন্যে মতলব এঁটেছে ; তোমাকে আটক করে ধরবে বলে সবাই নিচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, চলুন। দেবুও এগিয়ে আসে, আর নীরজার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যায়।

দেবু ? কে এই দেবু ? দেবুর পায়ের শব্দ শুনতে থাকেন লোকনাথ, আর দুঃসহ একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা যেন তাঁর দুই চোখের সুস্থির দৃষ্টিটাকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। ইচ্ছা করে, ডাক দিয়ে এখনই জিজ্ঞাসা করেন, কী দেবু ? সুকু কী করে তোমার মত সোনার মেডেল এম-এ ছেলের বন্ধু হয় ? সুকু যে ক্লাশ নাইন থেকে ক্লাশ টেনে উঠতে পারেনি।

কিন্তু দেবু এখন সত্যিই নিচের তলার বাইরের বারান্দায় যেন মায়াবন্দী মুগ্ধ হরিণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে সুকু, হাসছে পিয়ালী, একটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে মিতালীও হাসছে। নীরজা বলেন—ওরা আজ তোমাকে এখনই ছেড়ে দেবে না, দেবু।

—কেন ?

নীরজা—ওদের ইচ্ছে, তুমি এবেলা এখানেই থাকবে, খাবে, বিকাল হবার পর যাবে।

ঠিকই, নিচের তলার বাইরে বারান্দাটাকে এখন সিনেমা-ছবি তোলবার একটা ফ্লোর বলে মনে হবে। কিন্তু মুগ্ধ হরিণকে যারা ঘিরে ধরেছে, তাদের দেখে কারও মনে হবে না যে, ওদের মুখের হাসিতে ব্যাধ-ব্যাধিনীর উল্লাস আছে। বরং মনে হবে, সুন্দর-সুন্দর কৃতজ্ঞতা যেন পরম এক উপকারের চারদিকে দাঁড়িয়ে প্রাণের

অভ্যর্থনা নিবেদন করতে চাইছে।

নীরজা বলেন—সুধাদির বাড়িতে সেদিন কোন্ হোটেল থেকে খাবার কিনে আনা হয়েছিল, নামটা কি মনে আছে, সুকু ?

পিয়ালী বলে—হ্যাঁ ; পার্ক স্ট্রীটে মিসেস কার্ভালো'স কিচেন।

মিতালী—হ্যাঁ, চীনে রান্নার চেয়ে গোয়ানীজ রান্না অনেক অনেক ভাল।

নীরজা—তবে তাই কর, সুকু। কার্ভালোর কিচেন থেকে খাবার নিয়ে আয়।

দেবু যেন চমকে ওঠে, কিন্তু গলার স্বর তবু একটু ভীত হয়ে আপত্তি জানায়—না, না, মাপ করবেন। আমি ওসব খাবার খাই না, খেতে ভাল লাগে না।

সুকু—এঃ, তুমি দেখছি নেহাতই অর্থভক্ত।

মিতালী মুখ টিপে হাসে—একেবারে পরমার্থভক্ত। ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতে না পারলে মনে করেন যে, দিনটা বৃথাই গেল।

দেবু কুণ্ঠিতভাবে হাসে—না না, সেরকম কিছু নয়।

পিয়ালী—দেবুদার লজ্জাটা কিন্তু সত্যই পরমার্থভক্ত। দিদির সঙ্গে সিনেমাতে যেতে লজ্জা, জাহাজঘাটায় বেড়াতে যেতে লজ্জা, একসঙ্গে ফটো তোলাতে লজ্জা।

নীরজা—কিন্তু তুমি কথা দিয়ে যাও দেবু, মাঝে মাঝে নিজেই আসবে, মনে করিয়ে দিতে হবে না।

দেবু—নিশ্চয়।

শব্দ করে ছুটে আসে একটা স্কুটার। বারান্দার কাছে এসে থেমেই হাত তুলে একটা আবছা প্রীতির সঙ্কেত জানায়। পিয়ালীর সারা শরীরটা দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাক দেয়—চলে এস, মোহন।

ছেলেটি বলে—না, এখন সময় নেই। কাল সকালে আসবো ; যদি ডায়মণ্ড হারবারের হাওয়া খেতে চাও, তবে তৈরি থেক।

শব্দ করে চলে যায় স্কুটার। দেবুর দিকে তাকিয়ে নীরজা বলেন—কার সাধ্যি বলবে, ছেলেটা বাঙালী নয়।

দেবু—বাঙালী নয় ?

নীরজা—না। ওর নাম মোহন খোসলা। ওর বাবার মেশিন টুলের কারখানা আছে। শিগগির বিলেত যাবে মোহন, নতুন মেশিনের কাজ শিখতে।

সুকু বলে—বেচারা দেবুকে এখন তবে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

ঘরের ভিতরে চলে যান নীরজা আর সুকু। পিয়ালীও দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে রেডিওর চাবি আঁকড়ে ধরে। চলে যাবার জন্য বারান্দার সিঁড়িতে একটা পা নামিয়ে দিয়েই থমকে যায়, আর মুখ ফিরিয়ে তাকায় দেবু। শুনতে পেয়েছে দেবু, দরজার কাছে যেন একটা অভিমানী নিঃশ্বাসের ব্যথার শব্দ করুণ হয়ে ডুকরে উঠছে। ঠিকই, ছলছল করছে, মিতালীর চোখ। কী অদ্ভুত মায়া প্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে আঁকা দুটি চোখ। ওই মিতালী যে সেদিনও দেবুর হাত ধরে বলেছে, তুমি আমাকে ভালবাস, এ সৌভাগ্য যে আমি স্বপ্নেও আশা করতে পারিনি।

দেবু বলেছিল—ও কথা বলো না। আমি জানি, তুমি আমার কে? তোমার জন্তে আমি সব করতে পারি।

হেসে ওঠে মিতালীর ভিজে চোখ।—একথা আমি বিশ্বাস করি।

মিতালীর দুই চোখে আর কোন ব্যথা কিংবা অভিমানের ছায়া নেই। টলমল করছে মিতালীর কালো চোখের মায়া; তার উপর যেন ভোরের আলোর আভাও ছড়িয়ে পড়েছে। দেবু বলে, আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি যে, তোমার মত এত সুন্দর মেয়ে আমার মত মানুষকে এত ভালবাসবে।…আচ্ছা, আসি।

॥ সাত ॥

প্রশ্নটা লোকনাথের বুকের ভিতরে তখনও ছটফট করছে—কে এই দেবু? ডাক দিলেন লোকনাথ—নীরু, একবার ওপরে এস।

নীরজা আসেন। মুখে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বলতার হাসি, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা বিরক্ত অস্বস্তির ছায়া ছটফট করছে। নীরজা বলেন—আমার কাজের সময়ে এত ডাকাডাকি করো না।

লোকনাথ—কাজ?

নীরজা—হ্যাঁ, অনেক কাজ।

—কিসের কাজ?

—মার্কেট যেতে হবে। দরকারের অনেক জিনিসপত্তর কিনতে হবে।

—টাকা?

—টাকা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কে দিল টাকা?

—দেবু।

—কেন?

—দেবু আমাদের পর নয়। দেবু এখন আমাদেরই ছেলের মত।

—তার মানে?

—দেবুর সঙ্গে মিতুর বিয়ে হবে।

—কিন্তু দেবু টাকা দেয় কেন?

—দেবে না কেন? দেবু তো তোমার সনাতন সরকারের ছেলেটির মত একটা সেকেলে সামান্য মানুষ নয়।

—দেবুর টাকা নিও না।

—কেন?

—এরকম টাকা নেওয়া পাপ।

—তোমার মতে, তাই।

—আমার মতে নয়, নিরু। এই সংসারের নিয়মের মতে, মানুষের জীবনের

মতে ওটা পাপ।

—তুমি রুগী মানুষ, কেন এসব কথা নিয়ে মিথ্যে চিন্তা করছো।

—আমার প্রাণটাও কি রুগী হয়ে গিয়েছে।

নীরজা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন—সেটা তুমি বুঝে দেখ।

—কিন্তু জেনে রাখ নীরু। বলতে বলতে বিছানার উপর উঠে বসেন লোকনাথ। হ্যাঁ, উঠে বসবার ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, রায়গঞ্জের লোকনাথের শুধু হাত দুটোতে নয় বুকের ভিতরেও লোহা আছে।—খুব ভুল করছো, নীরু।

নীরজা—তুমি কী করে একথা বলতে পার, অশ্চর্য।

—তার মানে?

—তুমিই তো সারাটা জীবন ভুল ক'রে সবাইকে দুঃখ দিলে। এখনও রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে সবাইকে আরও দুঃখের মধ্যে ফেলতে চাইছো। এতদিন তোমার ইচ্ছেয় সব হয়েছে, কিন্তু আর নয়।

—এবার থেকে তবে তোমারই ইচ্ছায় সব চলবে?

—অগত্যা, তোমার যখন কিছু করবার ক্ষমতাই নেই, তখন তোমার এত কথা আর এসব কথা শোনাবার কোন মানে হয় না।

লোকনাথ—ভাল কথা। তবে আমাকে একাই রায়গঞ্জে চলে যেতে হয়।

নীরজা—তোমার ইচ্ছা। আমি হ্যাঁ বলবো না, না'ও বলবো না।

চমকে উঠলেন লোকনাথ। যেন তাঁর ফুসফুসটা হঠাৎ একটা ছুরির খোঁচা খেয়ে ফুটো হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর আর কেউ নয়, সেই নীরজাই কথা বলছে। নীরজার জীবনে রায়গঞ্জের লোকনাথ আজ আর কোন সত্য নয়। লোকনাথ কাছে না থাকলেও নীরজার জীবনের কোন ভয় আর নেই। এ কেমন করে সম্ভব?

বুঝতে পারেননি লোকনাথ, কখন চলে গিয়েছেন নীরজা। ভবানীপুরের সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের বাড়িটার নিচের তলায় যেন খুশি কলরবের ঝড় ছুটোছুটি করছে। সবই শুনতে পাচ্ছেন লোকনাথ। কিন্তু মনে হয়, যেন ভয়ানক এক কাল-বোশেখী পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে; গাছ-পালা, ঘরের চালা, বাগানের গাছ, সবই উপড়ে ও ছিঁড়ে লুটিয়ে দিচ্ছে। শুনতে পাওয়া যায়, বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ানকে ধমক দিচ্ছে সুকু—বাজে কথা বলবে তো চাবুক মেরে তোমার চামড়া কাটিয়ে দেব। দাও তোমার বিল, আর টাকা নিয়ে সেলাম করে চলে যাও।

বাঃ, এ যে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প। শ্বেতহস্তী হঠাৎ এসে এ বাড়ির ভাগ্যটাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। বিছানার ওপর স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকতে অনেক চেষ্টা করেন লোকনাথ, কিন্তু মাঝে মাঝে ছটফট করে এপাশ-ওপাশ করেন, যেন তাঁর বুকের পাঁজরগুলো আগুনের আঁচ লেগে পুড়ছে।

নীরজার চোখে-মুখে ওই উজ্জ্বলতার হাসি; এর চেয়ে দুঃসহ ভয়ের ছবি কোন দুঃস্বপ্নেও দেখেননি লোকনাথ। না, এ-জীবনে নীরজার আর সেই ছলছল ভিজে চোখ দেখতে পাবেন না লোকনাথ, যে চোখের মায়া তুচ্ছ করে আজও তিনি চলে

যেতে পারেননি, রায়গঞ্জের রাধানাথের বিগ্রহের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারেননি।

কিন্তু আর তো দেরি করবার কোন মানে হয় না। শুধু একবার রায়গঞ্জকে একটা খবর দেওয়া, যেন কাউকে পাঠিয়ে দেয়। লোকনাথকে রায়গঞ্জে নিয়ে যায়।

রায়গঞ্জের বাড়ি আর রাধানাথের মন্দির, মাঝখানে শুধু বাঁশের একটি বেড়া। সেই বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কদম, যার ছায়ার মত মিষ্টি ছায়া এ পৃথিবীর কোন গাছতলায় আছে কিনা সন্দেহ। সেই ছায়াতে একটি মাদুর পেতে সকাল-সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ে থাকলে মন্দ কী? সেইখানে বসে রাধানাথের প্রসাদ খেয়ে প্রাণটাও কি জুড়িয়ে যাবে না? তারপর যেদিন রাধানাথের ইচ্ছা হবে, সেদিন ওই কদমতলাতেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেই হলো।

সিঁড়ি ধরে পায়ের শব্দ উপরে উঠছে। চমকে ওঠেন, কান পেতে শুনতে থাকেন লোকনাথ। কী আশ্চর্য, সত্যিই যে রামদয়াল এসেছে।

—আমি একাই রায়গঞ্জে চলে যাব, রাম। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও।

রামদয়াল—কেন?

সব কথা শোনার পর রামদয়ালও স্বীকার করেন—হ্যাঁ, অগত্যা তোমার এখানে আর না থাকাই ভাল।

আরও আশ্বাসের কথা বলেন রামদয়াল—রায়গঞ্জে থাকতে তোমার এখন তেমন কিছু অসুবিধে হবে না। নিচের তিন চারটি ঘর ভাড়া দিয়ে দিলে আশি-পঁচাশি টাকা পাওয়া যাবে। তাছাড়া কালাচাঁদ আছে, সে তোমার সব রকম যত্ন নেবে। তার উপর, নিতাই কবিরাজ আছে, রতন ভট্টাচার্য আছে, বীরু আর হর্ষনাথ আছে। সবাই, সবাই তোমার দেখাশোনা করবে। চিন্তা করবার কিছু নেই, কোন অসুবিধে নেই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রামদয়াল।—আমি আজই রায়গঞ্জে গিয়ে হর্ষনাথ আর বীরুকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তোমার হাতে এখন টাকা না থাকলেও ভেব না। আমি দেব টাকা। পরে শোধ করে দিও।

সিঁড়ির কাছে এসেই লোকনাথের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় রামদয়াল।—কী বলছো?

লোকনাথ—সত্যিই কি আমার এখন রায়গঞ্জে চলে যাওয়াই ভাল?

রামদয়াল তাঁর সাদা মাথাটাতে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটাও যেন করুণ হয়ে গিয়ে ছল-ছল করে—যেতে ইচ্ছে করছে না, না?

লোকনাথ—না।

রামদয়াল—কেন আর কিসের জন্য, লোকনাথ?

কথা বলেন না লোকনাথ। দুই চোখ বন্ধ করে যেন নিজেই একটা অন্ধকারের মধ্যে রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

লোকনাথের গায়ে হাত বুলিয়ে লোকনাথের একটা হাত ধরে রামদয়াল আবার প্রশ্ন করেন—কার জন্য মন কাঁদে, লোকনাথ?

লোকনাথ—বুঝতেই তো পারছো।

রামদয়াল—নীরজার জন্য?

লোকনাথ—হ্যাঁ। সংসারের বিপদ-আপদের হাজার উৎপাতের মধ্যে ওকে এখানে ফেলে রেখে, আমি যে রায়গঞ্জের রাধানাথের কদমতলাতে পড়ে থেকেও কোন শান্তি পাব না, রাম।

রামদয়াল—তাহলে থাক, রাধানাথের যা ইচ্ছে, তাই হবে।

॥ আট ॥

পাড়ার লোকে বলে, সাত নম্বরের গা ঘেঁষে ওই যে পুরনো পড়ো বাড়িটা, যার ছাদ আর দেয়াল ফুঁড়ে ছোট ছোট অশ্বত্থের শিকড় ঝুলছে, অনেক রাতে সেই বাড়ির উপরতলার ঘরের ভাঙা জানলাতে ছায়া-ছায়া চেহারা কাদের যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শব্দ করে না, খুব বেশি নড়া-চড়াও করে না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের কাক ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ছায়াশরীর যেন এই পড়ো বাড়ির বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

সাত নম্বরের লোকনাথ রায় যখন মাঝরাত পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকেও ঘুমোতে পারেন না, বিছানার ওপর উঠে বসেন, আর জানলা দিয়ে পড়ো বাড়ির ছাদের দিকে তাকান, তখন তাঁরও মনে হয়, ওই তো ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আর আশ্চর্য হয়ে বিছানায় বসা এই লোকনাথ রায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকনাথের তখন নিজেকে ওদেরই জগতের একটি ছায়া-মানুষ বলে মনে হয়।

পঞ্জিকা দেখে হিসেব করলে বোঝা যায়, একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আর কপালে হাত বুলিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করলে মনে হয়, এক বছর হতে পারে, আবার পাঁচ বছরও হতে পারে। পা দুটো আরও সরু হয়েছে, মাথার চুল আরও সাদা হয়েছে। রামদয়াল কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে এই একবছরের মধ্যে তার একটা চিঠিও এল না কেন?

নিচের তলার দুটো ঘরের জীবন যে এই এক বছরে কত রঙিন হয়ে গিয়েছে, সে সত্য চোখে দেখে জানবার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করেননি লোকনাথ। চেষ্টা করবার কথাও নেই। সে সংসারে নীরজাই রাজেশ্বরী। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ের যে জীবন রায়গঞ্জের অভিশাপ কাটিয়ে সুখে থাকবার এক অদ্ভুত সৌভাগ্যের নাগাল পেয়েছে, সে তো নীরজারই প্রতিজ্ঞার জয়। সুধাদিকে আজকাল প্রায়ই একটা কথা শুনিয়ে দেন নীরজা—আমার অন্য এক জামাই যে বিলেতে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সুধাদি।

সুধাদি হাসেন—যাবেই তো, যদি বুদ্ধি ঠিক রেখে চলতে পারিস, তবে আমার মত তোরও দুই জামাই বিলেত যাবে।

হ্যাঁ, একটি রেফ্রিজারেটর কিনে ফেলা হয়েছে। সুধাদির বাড়িতে যে রেফ্রিজারেটর আছে, ঠিক তেমনটি। সুকু বলেছিল—দেবু কিন্তু আপত্তির একটিও কথা বলেনি, মা। একটা রেফ্রিজারেটর কেনা দরকার, শুধু এইটুকু বলেছি, অমনি দেড় হাজার টাকার একটা চেক লিখে আমার হাতে তুলে দিল।

সুধাদি একবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ মিতু আর পিয়া দুজনে সেদিন সুধাদির দুই মেয়ে জনা আর লীনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছিল। মিতু বলেছিল, যাই বলুন জনাদি, আপনার ওই খোঁপার স্টাইল কিন্তু খুবই সেকেলে।

—তার মানে?

প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেয় পিয়া—আপনার ওই খোঁপাটা হলো, জারিনা খোঁপা। ওটা আজকাল কেউ পছন্দ করে না।

লীনা—আজকালের পছন্দটা কি?

পিয়া—এই যে, আমার খোঁপা; ক্যাথরিন হেপবার্ন স্টাইল।

জনা—কোথায় শিখলে এই স্টাইল?

মিতু—রীতিমত টাকা খরচ করে শিখতে হয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের বিউটিসিয়ান পামেলা হ্যারিসনের নাম শোননি?

জনা—না।

মিতু—তারই সেলুনে গিয়ে হেপবার্ন স্টাইলের খোঁপার কাজটা শিখে নিয়েছি।

সুধাদি হঠাৎ এসে দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন, আর বেশ একটু ঝংকার দিয়ে কথা বলেন—ঠিকই তো, নীরুর হাতে যখন এত টাকা এসেছে, তখন মেয়েদের শখের জন্যে এরকম দু-চারটে বড়-খরচ তো হবেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, টাকা এল কোথা থেকে?

মিতু—সেকথা জিজ্ঞেস করবার কোন মানে হয় না, মাসিমা।

সুধাদি—কেন?

পিয়া—আমরা তো কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি, আপনার হাতে এত টাকা এল কোথা থেকে?

সুধাদি ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকেন—সত্যি, এই এক বছরে তোরা খুব কথা বলতে শিখেছিস। ভাল।

মাস ছয় আগে হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলায় এই ঘরের ভিতরে তন্দ্রার মধ্যে নীরজার গলার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন লোকনাথ। নীরজা ডাকছেন—এই দেখ, কে এসেছে।

—কে? কে? দুই চোখ টান করে দেখতে থাকেন লোকনাথ। লোকনাথের বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে একটি মেয়ে। টুনি আর টুসির সঙ্গে তুলনাই চলে না, রূপসী মেয়ে নয়, নিতান্ত সামান্য সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। মুখে কিন্তু বেশ শান্ত একটি হাসি আর চোখের তারা দুটোও খুব কালো।

নীরজা বলেন—ওর নাম বীণা, সুধাদির এক দেবরের মেয়ে, সেই দেবর

জার্মানীতে থাকে। তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—প্রণাম? আমাকে? বলতে বলতে আশ্চর্য হয়ে উঠে বসেন লোকনাথ।

নীরজা হাসেন—হ্যাঁ, ও যে আমাদের সুকুর বউ।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা জ্বালার শিখা ধিকধিক করে কাঁপে—কবে সুকুর বিয়ে হলো?

নীরজা—আজ।

—কেমন বিয়ে?

—আজকাল যেমন হয়, রেজিস্টারি করে।

—হোক, কিন্তু আজকাল কি বিয়েতে শাঁখ বাজে না?

নীরজা মুখে আঁচল দিয়ে হাসেন—হ্যাঁ, রায়গঞ্জের বিয়ের মত বিয়ে হলে শাঁখ বাজে।

—তবে রায়গঞ্জের মত প্রণাম করাবার জন্য এই মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল না।

নীরজা—ঠিক, যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো। সুকুও ঠিক বুঝেছে, তুমি এসব কথা বলবে বলেই সুকু এখানে আসতে চাইলো না।

লোকনাথ—ভালোই করেছে। বুঝতে পারছি না, সুকুর বউ বা কেন আসে? আমাকে প্রণাম না করলেও তো বেশ চলে যাবে, চলে যাচ্ছেও।

বীণা কিন্তু তখনি লোকনাথের দুই সরু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম করে ফেলে। লোকনাথ বলেন—কী বলবো, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, সুখে থাক।

চলে যায় বীণা। নীরজাও তখনি চলে যেতেন, কিন্তু কথা বলে বাধা দিলেন লোকনাথ—সুকু বিয়ে করলো কেন?

নীরজা—এ আবার কেমন কথা? বিয়ের বয়স হয়েছে। একটি মেয়েকে ভাল লেগেছে। তাই তাকে বিয়ে করেছে। এর মধ্যে আবার কেন কিসের?

লোকনাথ—সুকু কি কোন কাজকর্ম করে?

—হ্যাঁ।

—কিসের কাজ?

—একটা কারখানায় কাজ করে, দেবু পাইয়ে দিয়েছে এই কাজ। মাইনে সামান্য, একশো দশ টাকা মাত্র।

—সুকুর এখন বিয়ে না করাই ভাল হতো।

—কেন?

—কলকাতার মত জায়গায় ওই রোজগারের ভরসায় কারও বিয়ে করা উচিত নয়।

—শুধু রোজগারটাই বড় করে দেখছো কেন? একটা ছেলের জীবনে ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

—আছে নিশ্চয়, কিন্তু সত্যিই যদি ভালবাসা হয়।

—এসব কথা রামদয়ালবাবুকে শোনাবে; আমাকে শোনাবার কোন মানে হয় না।

—তোমাকেও শোনাবার দরকার আছে নীরু, তোমারও শোনবার দরকার আছে।

—আমার তো মনে হয়, কোন দরকার নেই।

—তুমি একটু একলা মন নিয়ে, সুধাদির বাড়িতে যাওয়া একটা মাস বন্ধ রেখে আর পার যদি রায়গঞ্জের রাধানাথের মূর্তিটাকে একটু স্মরণ করে একবার ভেবে দেখ, তবেই বুঝতে পারবে, এমন করে সব কিছু উল্টে-পাল্টে দিতে নেই।

নীরজা—এই জন্যেই সুকু তোমার কাছে আসতে চাইলো না।

—কী জন্যে?

—যা বোঝ না, তাই নিয়ে খামকা যত আপত্তির ধর্মকথা বলো না। তুমি তো কাউকে সুখে রাখতে পারলে না, আমরা যা-হোক নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টাতে সুখে থাকবার একটু চেষ্টা করছি। এর মধ্যে তুমি যে কী ভুল দেখলে, কী অন্যায় দেখলে, তা তুমি জান, আর তোমার রায়গঞ্জের রাধানাথ জানেন।

—নীরু! চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ।

—কী বল? চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা।

—রাধানাথ সত্যই জানেন। বলতে গিয়ে পঙ্গু লোকনাথের গলার স্বর যেন একটা গর্জন হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে নীরজার দুই চোখ। আমি আসছি, বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যান নীরজা।

এই রকম এক-একটি ঘটনা; এই এক বছরের এক-একটি আচমকা বিস্ময়ের মত লোকনাথের পঙ্গু জীবনের অনেক মুহূর্তকে চমকে দিয়েছে, কখনো কখনো ব্যথা দিয়ে, বা ভয় পাইয়ে দিয়ে। সবচেয়ে বেশি উল্লাস নিয়ে যে-কথাটা বলেন নীরজা, সেটা হলো দেবু নামে সৌভাগ্যের কথা। দেবু আমার ছেলের মত নয়, ছেলের চেয়েও আপনজন। দেবু থাকতে আমার কোন চিন্তা নেই। দেবু ছিল বলেই তো মিতু আর পিয়া দুই বোনে শখ করে একবার শিলং বেড়িয়ে আসতে পেরেছে। শিলং-এ যাবার প্লেনের ভাড়া, শিলং-এর হোটেলে এক সপ্তাহ থাকবার খরচ, সবই দেবু দিয়েছে।

একদিন পিয়ালীর গলার স্বর শুনে লোকনাথের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। পিয়ালী এসে বলে গেল, আমি নাচের ডিপ্লোমা পেয়েছি, বাবা। মণিপুরী আর কথাকলি খুব ভাল শিখেছি। মোহনের বোন রেণু খোসলা বলেছে, এইবার পোলকা আর বুগি-উগি শিখিয়ে দেবে।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ।

মিতু এসে একদিন বলে গিয়েছে—আমি পাস করেছি, বাবা। ডমেস্টিক সায়েন্সে আর-একটু হলে লেটার পেয়ে যেতাম। ভাবছি, এম-এ পড়বো কিনা।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ। এসব যেন এক অকরুণ জগতের যত

কলরব, তার অর্থ কিছুই স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন না লোকনাথ। শুধু বুঝতে পারেন না, তিনি হার মেনে যেখানে একবার থেমে গিয়েছেন, সেখানে এরা কেউ হার মানেনি, থেমেও যায়নি, সবাই চলেছে, এগিয়ে যাচ্ছে। রায়গঞ্জ ওদের কাছে এখন একটা মিথ্যা বিভীষিকা মাত্র।

আজ সকাল থেকে এই সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের নিচের তলার দুটি ঘরে যে উৎসবের মুখরতা উতরোল হয়ে বাজছে, সে উৎসবেরও কোন খবর রাখেন না লোকনাথ। শুধু জানেন, ওদের জীবনে নিশ্চয় কোন নতুন সুখের হাসি ফুটে উঠেছে। তাই এই উৎসব।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বীণা সেদিন এসে বলে গিয়েছিল, মিতুর চাকরি হয়েছে, বেশ ভাল চাকরি। মাইনে প্রায় তিনশো টাকা। সেই জন্য শিগগির একদিন খাওয়া-দাওয়ার একটা উৎসব করা হবে।

ঠিকই বুঝেছেন লোকনাথ। আজ এই বাড়ির জীবনে একটা নতুন উৎসবের সাড়া জেগেছে। মিসেস কার্ভালোর কিচেন থেকে অনেক খাবার এসেছে। শুধু জানেন না যে, যাকে প্রীতি আর কৃতজ্ঞতার ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করবার কথা, সে মানুষটি এরই মধ্যে এই সকালেই এসে নিচের তলার একটি ঘরে বসে আছে।

দুপুর হলো, উৎসবের হর্ষ মৃদু হতে হতে নীরবও হয়ে গেল। বোঝা যায় না, নিচের তলার ঘরে কেউ আছে কিনা। কিন্তু সিঁড়িতে আগন্তুক পায়ের মৃদু শব্দ বাজে। দেবু উঠে এসে লোকনাথের ঘরে ঢোকে, আর বিছানার কাছে গিয়ে ডাক দেয়—কেমন আছেন?

—কে তুমি? ও তুমি! তাই বল! চমকে উঠলেও বেশ উদাস স্বরে, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলেন লোকনাথ।

—হ্যাঁ, আমি। হাসতে থাকে দেবু।—ওরা আমাকে নেমন্তন্ন করেনি, তবু আমি এসেছি। শুধু আপনাকে একটু দেখে যাবার জন্য।

লোকনাথ—তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি, তবে কাকে নেমন্তন্ন করলো?

দেবু হাসে—সুললিতের নেমন্তন্ন ছিল। সে-ই এসেছিল।

—সুললিত? সে কে?

দেবু—সুকুর বন্ধু সুললিত সরকার। চমৎকার মানুষ। সুললিতের বাবা খুব বড় অ্যাটর্নি, চারটে চা-বাগান আছে। বাপের একমাত্র ছেলে সুললিত। কাজেই, সুললিতের জীবনে টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই।

লোকনাথ—বুঝলাম। কিন্তু সুললিতের নেমন্তন্ন কেন?

দেবু—সুললিতের সঙ্গে আপনাদের মেয়ে মিতালীর বিয়ে হবে। সুললিতই চেষ্টা করে মিতালীর চাকরি যোগাড় করে দিয়েছে।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো দেবু। হতে পারে না, অসম্ভব। তুমি ভুল করে এসব কথা বলছো।

দেবু—না, ভুল করে নয়। আপনি মুকুকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

দেবুর মুখের দিকে দুই চোখের স্তব্ধ সাদাটে দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ। দেবু বলে—আপনি কিন্তু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অভিযোগ করতে আসিনি।

—তোমার কোন অভিযোগ নেই?

—না।

—তুমি কি এই একটা বছর এই বাড়ির সব দরকারের টাকা যোগাওনি?

—হ্যাঁ, টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

—তোমার সঙ্গেই তো মিতুর বিয়ে হবে বলে কথা ছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেসব কথা আমি এখন মনে আনি না।

—এজন্য তোমার মনে কোন রাগ নেই?

—না।

—এদের ওপর একটু ঘৃণা হয় না?

—না।

—কেন?

—মিতালী সুখী হয়েছে, ব্যস্, আমার তো আর কিছু জানবার দরকার হয় না।

—তার মানে?

—মিতালী সুখী হলেই আমি সুখী।

দুই হাত দিয়ে দেবুর একটা হাত আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ—তোমাকে চিনলাম দেবু। রাধানাথ তোমাকে সুখে রাখুন।

দেবু—নিশ্চয়, আপনার আশীর্বাদ যখন আছে, তখন আমি সুখে থাকবোই।

লোকনাথ—তুমি তো এই কলকাতার ছেলে? শ্যামবাজারে থাক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আর শ্যামবাজারে থাকবো না।

—কেন?

—বাড়ি বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

—এ-বাড়ির সুখের দাবি মেটাবার দায়ে? তাই না?

—এসব কথা তুলবেন না। যা হলো ভালই হলো, এ বিশ্বাস আমার আছে।

চোখে হাত বুলিয়ে চোখ মোছেন লোকনাথ।—দেবু?

—বলুন।

—তুমি এরপর কোথায় থাকবে? আমাকে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও।

—যে আজ্ঞে।

পকেট থেকে কাগজ বের করে ঠিকানা লেখে দেবু।—যাচ্ছি দমদমের বসাক-বাগানে একটি ভাড়া-বাড়িতে। মন্দ নয় বাড়িটা। আশি টাকা ভাড়া।

লোকনাথ—আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও, দেবু।

—বলুন।

—আমি যদি কখনও তোমাকে ডাকি, তবে তুমি আসবে ?

—নিশ্চয় আসবো। সে কথা কি বলতে হবে ?

লোকনাথ—এস তবে। তুমি যদি বয়সে আমার চেয়ে এত ছোট না হতে, তবে আমি আজ তোমার পা ছুঁয়ে…।

—ছি-ছি! ও কথা বলতে নেই। বলতে বলতে লোকনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দেবু। চলে যায় দেবু।

॥ নয় ॥

নীরজা বলে—কী হয়েছে ? তখন থেকে এত চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছো কেন ?

লোকনাথ বলেন—একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি।

নীরজা—বল।

লোকনাথ—দেবুর ঠিকানা আমার কাছে আছে। হয় তুমি, নয় স্কু, কিংবা টুনি একবার দেবুর কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এস।

নীরজা—কেন ? কী অপরাধ করলাম যে মাপ চাইতে হবে ?

লোকনাথ—ফুলকে ছিঁড়লেও পুজোর থালায় রাখতে হয়, কাদার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় না।

—এ-কথার মানে ?

—দেবুকে তুচ্ছ করো না।

—তুচ্ছ তো করছি না। মিতু বলেছে, দেবুর উপকারের সব টাকা একদিন শোধ করে দেওয়া হবে।

—টাকা শোধ হতে পারে বটে কিন্তু দেবুব উপকার শোধ করা সম্ভব নয়।

নীরজা হাসেন—মানুষের মন কী লোহা, যে বদলাবে না ?

—কী বলছো তুমি ? বুঝতে পারছি না।

—মিতুর যদি মনে হয় যে, দেবুর চেয়ে ললি অনেক—

লোকনাথ—ললি কে ?

নীরজা—আমাদের সুললিত। মিতু যদি বিশ্বাস করে যে, ললির সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মিতু, তবু কি দেবুকেই বিয়ে করবে মিতু ? এটা কি আত্মবঞ্চনা নয় ? শুধু এক বছর আগের একটা কথার জন্য নিজের জীবনটাকে ঠকাবে মেয়েটা ? ছি ছি, এমন কথা বলতে তোমার একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

লোকনাথ—লজ্জা পাচ্ছি না, কিন্তু বেশ একটু ভয় পাচ্ছি নীরু। এরকম করে সব উল্টে-পাল্টে দিও না।

নীরজা—এই জন্যেই স্কু আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছে, বাবাকে কোন কথা বলো না, মা। বাবা শুধু বাধা দিতে আর আপত্তি করতে জানে। আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

লোকনাথ—ঠিক কথা। ঠিকই বলেছে স্কু। তবু আমি বলছি, দেবুকে তুচ্ছ করো না।

নীরজা—দেবুকে তুচ্ছ করবার কোন কথাই নেই। দেবুও ভালই জানে, ললির তুলনায় সে কিছুই নয়।

লোকনাথ—কিন্তু এই সুললিত কি দেবুর মত মায়া নিয়ে…।

—তার চেয়ে বেশি মায়া নিয়ে ললি আমাদের কাছে এসেছে! দেবু তো তোমার মেয়েকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে যেত।

—সেটাই তো নিয়ম। তাতে রাগ করবার কী আছে?

—মানুষ কি নিয়মের চাকর? না, নিয়ম হলো মানুষের চাকর?

—তুইই সত্যি।

—না, আমাদের দরকারে যে নিয়ম সাজে, আমরা সেই নিয়ম মানবো।

—তার মানে, সুললিত তোমাদের ঘরজামাই হবে।

—রায়গঞ্জের ভাষায় কথা বলতে হলে তাই বলতে হয়। কিন্তু ঘরজামাই নয়; ললি আমার কাছে ছেলের মত। তাই বা বলি কেন? ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের ছেলে তো আজ পর্যন্ত নিজের টাকায় নতুন বউকে একটা শাড়ি কিনে দিতেও পারলো না। কিন্তু ললি এরই মধ্যে তোমার ছেলের বউকে সোনার হার দিয়েছে। মিতু আর পিয়াকে দুটি জড়োয়া সেট দিয়েছে।

লোকনাথ—আর শুনতে চাই না।

নীরজা হাসেন—তবে চুপ করে শুয়ে থাক আর ঘুমোও।

—ললিদা! ললিদা এসেছে। শুনতে পেয়েছেন নীরজা, চেঁচিয়ে কথা বলছে পিয়া। ললির গাড়ির হর্নের শব্দও বেজে উঠলো।

নীরজা ব্যস্ত হয়ে নিচে নেমে আসেন। আর পিয়া ব্যস্ত হয়ে সুললিতের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে, পিয়ার দুরন্ত উল্লাসের শরীরটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে; হাসতে হাসতে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় সুললিত।

নীরজা হাসেন, সুকুও হাসে, আর পিয়াও ছটফট করে হাসে—আমাকে ছেড়ে দিন, ওই ঘরের ভিতরে যান।

এই তো মাত্র তিন মাস আগে, দেবুর কলেজের কমনরুমে সুকুর সঙ্গে এই সুললিতের প্রথম দেখা আর আলাপ। এক বন্ধুর ছোট ভাইকে কলেজে ভর্তি করবার জন্য এসেছে সুললিত, দেবুরই ছাত্র-জীবনের বন্ধু সুললিত। সুকুর সঙ্গে সুললিতের পরিচয় তো দেবুই করিয়ে দিয়েছিল। আর সুকু নিজেই উৎসাহিত হয়ে সুললিতকে তখন চা খেতে নেমন্তন্ন করে সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আর মিতুও নিজেই চা নিয়ে সুললিতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মিতুর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অপলক হয়ে গিয়েছিল সুললিতের দুই চোখ। যেন অনেকদিনের হারানো একটা সুস্বপ্নকে আজ হঠাৎ ভাগ্যক্রমে আবিষ্কার করতে পেরেছে সুললিত। সুললিতের চোখে বিস্ময়, আর বিস্ময়ের মধ্যেও অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা।

চা খাওয়া শেষ হতেই সুললিত বলে—ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রথম যখন মেরিকে দেখলেন, তখন তাঁর কী মনে হয়েছিল, জানেন তো ?

মিতু হাসে—জানি না। আমি ইংলিশে অনার্স নিইনি।

সুললিত—ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনে হয়েছিল, মেরি যেন ফ্যান্টম অব ডিলাইট।

মিতু—আমাকে দেখে কোন বোকা ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনেও এরকম কোন ধারণা হবে না।

সুললিত—জানি না, তবে আপনার সঙ্গে আমি কোন তর্ক করবো না।

সুকু—ওকে আপনি আবার আপনি করে বলছেন কেন ?

সুললিত—বেশ তো, আর কখনও বলবো না।

সেদিনই সুললিতের চলে যাবার সময় মিতু বলেছিল—আবার কবে আসছেন ?

সুললিত—আমাকে ওরকম আপনি করে বললে কোনদিনও আসবো না।

মিতু সঙ্গে সঙ্গে বলে—কবে আসবে বল ?

সুললিত—তুমি আসতে বলছো ?

মিতু—হ্যাঁ।

সুললিত—তবে কালই একবার আসবো।

সুললিত চলে যাবার পরে সেদিনই এ-বাড়ির সবাই বুঝতে পারে, এই সুললিত যেন একটি আশ্চর্যের রূপকথা। শুধু চা বাগান থেকেই বছরে আয় হয় প্রায় এক লাখ টাকা। সুকু বলে—দেবু নিজেই সুললিতের অবস্থার অনেক কথা বলেছিল। ওই সুললিত বাপের একমাত্র ছেলে। বেহালাতে তিনতলা বাড়ি আছে। শুধু হাত খরচের জন্য বাপের কাছ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা পায় সুললিত। কিন্তু বেঁচে থাকতে ছেলের প্রতি এর চেয়ে বেশি কোন উদারতা আর দেখাবেন না অ্যাটর্নি পিতা, পি এন সরকার, প্রিয়নাথ সরকার। বাপের সঙ্গে ছেলের একটা মন-কষাকষির ব্যাপার আছে। পি এন সরকারের ইচ্ছা, তাঁর কুটুম্ববন্ধু নরেন দত্তের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক্। কিন্তু সে মেয়ে সুললিতের একটুও পছন্দ নয়। সে মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু গ্ল্যামার বলে কিছু নেই। সে মেয়ে রাঁধে ভাল, গান করে ভাল, এম-এ পড়ে, কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা আবার গীতা পড়ে।

হেসে ফেলেন নীরজা। মিতু আর পিয়াও হাসে। সুকু বলে—আমার ধারণা মিতুকে সুললিতের চোখে খুবই চার্মিং বলে বোধ হয়েছে।

ভুল ধারণা করেনি সুকু। দশটি দিন এ-বাড়িতে যাওয়া-আসা করবার পর সুললিত নিজেই একদিন বুঝিয়ে দিল যে, মিতুকে সুললিত ভালবেসেছে। দরজার পর্দা সরিয়ে দিতে গিয়ে সে দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল পিয়া ওই ঘরের ভিতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিতুকে দুই হাতে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখে, মিতুর কপালে চোখে ও মুখে চুমোর বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়েছিল সুললিত। ফুঁপিয়ে উঠেছিল মিতু, তোমার পায়ে পড়ি ললি, আর আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখো না।

—মিথ্যে ? সুললিত আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

মিতু—তবে এখনও স্পষ্ট করে বলছো না কেন?

—এই কথা। হেসে ফেলে সুললিত, আর মিতুর হেপবার্ন খোঁপার সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে দিয়ে প্রাণের ভিতরে চাপা একটা স্বপ্নের ভাবা উথলে দেয়—তবে মিতু, আমার সবার আগের কাজ হবে, বাবাকে জিজ্ঞেস করা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বাবা রাজী আছেন কিনা। যদি তিনি রাজী না হন, তোমাকে যদি আমি বেহালার বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারি, তবে আমাকেই তোমাদের এই বাড়িতে এসে থাকতে হবে।

মিতু—আসল কথাটাই তো বাদ দিলে।

সুললিত—বিয়ে? সে তো এর মধ্যে যে-কোন একটি দিন হয়ে যেতে পারে। যেদিন বলবে, সেদিনই।

সুললিতের পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়ে, এক হাতে সুললিতের কপালে রুমাল বুলিয়ে দিতে থাকে মিতু। সত্যিই যে ললির নিঃশ্বাসটা বড় উষ্ণ, কপালে কুচি-কুচি ঘামের ফোঁটাও চিকচিক করছে। মিতু বলে—কিন্তু তোমার বাবা যদি রাগ করেন তবে তোমাকে তো দুশ্চিন্তায় পড়তে হবে।

—কিসের দুশ্চিন্তা?

—দার্জিলিংয়ের চা বাগান, বেহালার বাড়ি, তোমার বাবা তাঁর এসব সম্পত্তি কি কোনদিন তোমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইবেন?

—এই কথা। হেসে ফেলে সুললিত।—সে জন্যে আমার কোন ভাবনা নেই, মিতু। আমি জানি, উইল করে সব সম্পত্তি আমাকেই দিয়েছেন বাবা; কোন দাতব্য সেবার মিশনকে দেন নি? তাছাড়া, বাবার রাগ। সে তো পদ্মপত্রনীর। রাগের পরে দু'চার দিন মেজাজ গরম করে রাখবেন, তারপর একদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন, তারপর সেই রাগ টুপ করে ঝরে পড়ে যাবে।

ভাগ্যিস এসব কথা কান পেতে শুনতে পেয়েছিল পিয়া, তাই নীরজা আর স্বকুও জানতে পেরেছে। কিন্তু এ ছাড়া আর যা দেখেছিল, এবং আর যে-কথা শুনেছিল পিয়া, তার সবই একটা নতুন প্রাণের জগতের বিস্ময় হয়ে পিয়ার চোখ দুটোতে চমৎকার একটা সুখের বেদনা ভরে দিয়ে নিবিড় করে দিয়েছিল। জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি পিয়া। সত্যি, এই ললিদা যেন চুমো-খাওয়া আর জড়াজড়ি করা একটা উৎসবের হিরো। ভালবাসার অনেক নাটক-নভেল পড়েছে পিয়া কিন্তু তার মধ্যে ললিদা'র মত কোন হিরোর সাক্ষাৎ পায়নি। সেই গোবেচারা দেবুদা, মিতুদির সঙ্গে এক সোফায় বসতে যার শরীরটা লজ্জায় কুঁকড়ে যেত, তার সঙ্গে এই ললিদার কত তফাৎ। ঢিপ ঢিপ করছে পিয়ার বুকটা, তবু জানালার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি। কী আশ্চর্য, মিতুদি যে একটি বারও 'না' বলে সামান্য একটা আপত্তিও করলো না। হেপবার্ন খোঁপার ছাঁদ খুলে গিয়েছে, যেন এলোমেলো ফুলের গুচ্ছের মত ভাঙা-ভাঙা হয়ে সোফার উপর পড়ে গেল মিতুদি। কী অদ্ভুতভাবে আর কত শক্ত ক'রে মিতুদির ওই নরম

শরীরটাকে আঁকড়ে ধরলেন ললিদা। না, ললিদা সত্যিই অদ্ভুত চমৎকার সুন্দর সাহসের আর আনন্দের মানুষ।

সেদিন শুধু একা পিয়ালীই বুঝতে পেরেছিল, ললিদার সঙ্গে মিতুদির বিয়ে তো হয়েই গিয়েছে, বাকি কিছু নেই, শুধু বাকি আছে একদিন বিয়ের রেজিস্টারের কাছে যাওয়া, আর খাতায় সই করা।

আর তিনমাস পরে, যেদিন মিতালীর পাশের খবর বের হলো, সেদিন নয়; আরও একমাস পরে, যেদিন মিতালীর একটা চাকরি হলো, সেদিনই বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্টারের সামনে যখন দু'জনে বসেছিল, তখন সুললিতের জামার বুকের বোতামঘরে মস্তবড় একটি লাল গোলাপ পরানো ছিল, আর মিতালীর হেপবার্ন খোঁপার সঙ্গে একটি হলদে গোলাপ।

শাঁখ বাজেনি, তবে রায়গঞ্জের মানুষটি বুঝবেন কি করে যে, এ-বাড়িতে দুই-জীবনের মিলনের উৎসব হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পুত্রবধূ সেই বীণা, যার মুখে সদা-সর্বদা একটা অদ্ভুত শান্তির হাসি লেগে থাকে, সে-ই উপরতলার ঘরে এসে রায়গঞ্জের রুগ্ন মানুষটিকে জানিয়ে দিল, সুললিতবাবুর সঙ্গে আজ মিতুর বিয়ে হয়ে গেল।

চমকে উঠলেন না লোকনাথ, বন্ধ চোখ দুটোকে খুলে একবার তাকালেনও না; একটি কথাও বললেন না।

হ্যাঁ, মিতু আর সুললিত একবার উপরতলার ঘরে এসে লোকনাথের খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই আগমন আর উপস্থিতির কোন সাড়া লোকনাথের গভীর ঘুমটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারেনি। মিতু শুধু বলে—বাবা ঘুমোচ্ছেন, ভালই। ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই।

মিতু আর সুললিত চলে যাবার পর চমকে ওঠেন, ধড়ফড় করেন, আর চোখ মেলে তাকান লোকনাথ। বোধহয়, কোন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। ঠিকই, অনেকদিন পরে পুত্রবধূ বীণার কাছে একটা স্বপ্নের গল্প বলেন লোকনাথ। স্বপ্নে দেখা গেল, একটা শ্মশানের মাঠ, রাতের অন্ধকারে সেই মাঠের বুকে অনেক আলেয়া দৌড়চ্ছে। আলেয়াগুলো যেন ঝকঝকে ও সুন্দর এক-একটা হাসিমুখের জ্বলন্ত ছবি। শ্মশানের মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আলেয়াগুলো যেন কানা নদীর একটা কাদাড়ের উপরে গিয়ে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়লো।

বীণা বলেছে, তাই জানতে পেরেছেন লোকনাথ, টুনি এখন চাকরি করছে। আর টুনির স্বামী সুললিত এখন এই বাড়িতেই থাকে।

নীরজা কি উপরতলার এই ঘরে আজকাল আর আসেন না? আসেন বইকি। মাঝে মাঝে আসেন। একদিন এসে খুশির আবেগে নিজেই বলে গিয়েছেন—ললির চেষ্টাতেই মিতুর চাকরিটা হয়েছে। ললির এক সিন্ধী বন্ধুর কারবারের অফিসে কাজ পেয়েছে মিতু। অফিসের গাড়ি মিতুকে নিয়ে যায়, আবার অফিসের গাড়ি এসে মিতুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। মিতু বলে—কাজ বলতে তো ওই কাজ, দুটো-তিনটে যোগ আর বিয়োগ, বাস্। বস্ মিস্টার বাসবানি বলেন, মিতালী সরকার

আমার অফিসের শুধু একজন অ্যাসিস্টেন্ট নন, উনি আমার অফিসের নতুন চার্ম অ্যাণ্ড বিউটি।

শুনতে শুনতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন লোকনাথ, তাই কোন কথা বলেন নি। আর নীরজাও সেই অদ্ভুত অসাড়তার কাছে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনেক কাজ বেড়েছে নীরজার। বীণা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না কিংবা ভুলেই যায় যে, সকাল দশটায় ললিকে আর একবার কফি দেওয়া দরকার। সকাল ন'টার সময় কারখানার কাজে যায় সুকু, তারপরেই যেন আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বীণা। হুঁস থাকে না যে, দশটা বাজতে চলেছে। নীরজা তাই মাঝে মাঝে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে বীণাকে ডাক দেন—কী গো মেয়ে, সুকুর লুচি তৈরি করে দিয়েই কি সব কাজ হয়ে গেল মনে কর? ললির জন্য কফি তৈরি করতে হবে না?

ঠিকই বলেছেন নীরজা। সুকুর কারখানার কাজে যাবার আগে, ঠিক সকাল ন'টার সময় সুকুর জন্য আট-দশটা লুচি ভেজে দেবার পরেই যেন হাঁপিয়ে পড়ে বীণা। হঠাৎ উদাস হয়ে যায়, চুপ করে বসে থাকে।

নীরজা মাঝে মাঝে আরও স্পষ্ট করে এ-বাড়ির জীবনের বাস্তব সত্যটাকেও বুঝিয়ে দেন—যার জন্যে এ-বাড়ির সবাই সুখে আছে, তারই কথা ওরকম ভুলে গেলে চলবে কেন, বীণা? বুঝতে পেরে বীণা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে সুললিতের জন্য কফি তৈরি করতে থাকে।

অনেকদিন পরে একদিন, সেদিন সকাল থেকেই ঝুরঝুর করে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সে বৃষ্টি আর থামছে না। লোকনাথের ঘুমের ঘোর আর স্বপ্নের ঘোর দুই-ই যেন একটা শব্দের আঘাত পেয়ে ভেঙে গেল। নড়ে উঠেছে লোকনাথের খাট, খাটের নড়বড়ে পায়াটাও ঘষা খেয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করেছে।

—কে? কে? চমকে ওঠেন আর প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

বীণা বলে—ছাদের ফাটল দিয়ে জল ঢুকে আপনার বিছানাটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, তাই খাটটাকে টেনে একটু সরিয়ে দিলাম।

শুধু ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ। বাড়িটার কোন ব্যস্ততার সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। বীণা বলে—আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

লোকনাথ—বল।

বীণা—আমি আর এ-বাড়িতে থাকতে পারবো না, থাকবো না।

—কেন?

—আপনাদের জামাই আমাকে তাঁর একজন সেবাদাসী বলে মনে করেন।

—তার মানে?

—মিতু যখন অফিসে যায়, পিয়া কলেজে যায়, আর মা যাদবপুরে বেড়াতে যান, যখন বাড়িতে কেউ থাকে না, তখনই সুললিতবাবু আমাকে তাঁর ঘরে যেতে ডাক দেন।

—কেন ?

—তাঁর মাথায় পাখায় বাতাস দিতে বলেন।

—তুমি কী বল ?

—আমি বলেছি, আমার দ্বারা ওরকম ছোটলোকের কাজ সম্ভব নয়।

—সুকুর মা কি এসব কথা জানে ? তাকে বলেছো ?

—জানেন, বলেছি।

—কী বলেন সুকুর মা ?

—উনি আমারই ওপর রাগ করেন। উনি বলেন, আমারই মনটা ছোটলোকের মন হয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ হয়েছে। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলেন নীরজা। চমকে ওঠে বীণা। কে জানে কখন, বোধহয় এইমাত্র যাদবপুর থেকে উনি ফিরেছেন।

বীণা বলে—তাই যদি মনে করেন, তবে আমাকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে বলুন।

নীরজা—হ্যাঁ, তাই বলছি। তুমি ললিকে যদি অপমান কর, তবে এ-বাড়িতে তোমার ঠাঁই হতে পারে না।

বীণা—তবে তাই হোক, আমি আজ এখনই চলে যাব।

লোকনাথের ধোঁয়াটে চোখের চাহনিটা জলজল করে, আর নীরজার দুই চোখের তারা যেন রুষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকে। কারণ,দুজনেই দেখতে পেয়েছেন বীণার মুখের ওই শান্ত হাসিটা যেন আগুনের শিখা হয়ে দাউ-দাউ করে জলছে।

সুকুমার আসে, আশ্চর্য হয়ে তাকায়—এখানে কিসের এত হল্লা ?

নীরজা বলেন—তোমার বউ আর এ-বাড়িতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তবে তুমিও···।

সুকু—তুমি আমাকেও চলে যেতে বলছো ?

নীরজা—তোমাদের মনে যদি ল।লর মান সম্মানের জন্য কোন দরদ না থাকে, তবে তোমাদের এখানে থেকে লাভ কি ?

সুকুর ভীরু চোখ দুটো অদ্ভুত হয়ে কাঁপতে থাকে।—আমি তো তোমারই জন্যে, তবু আমাকেই চলে যেতে বলছো ?

নীরজা—আপন ছেলে হয়েও তুমি আজ পর্যন্ত মা বাপ বোনের জন্য কোন্ সুখের কাজটা করতে পেরেছো ? আপন ছেলেও আপন নয়, যদি সে সংসারের কোন কাজে না আসে। আর পরের ছেলেও আপন হয়, যদি সে আপনজনের মত কাজ করে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুকু—এরপর আমি আর কী বলতে পারি ?

সুকুর গলার স্বরে যেন জলে ডুবে যাওয়া মানুষের আর্তনাদের বুদ্বুদের মত ক্ষুদ্র করুণ শব্দ। বীণা এগিয়ে এসে সুকুর হাত ধরে টান দেয়—চল।

সুকু ক্যালক্যাল করে তাকায়—অ্যাঁ ? সত্যিই যাবে ?

—হ্যাঁ।

বৃষ্টি থামেনি; কিন্তু আর দেরি করে না বীণা। সুকুর একটা হাত ধরে রেখে আর টান দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যায়। তারপর ওদের আর দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। নীরজার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন লোকনাথ—এইবার একটা বাজ পড়লেই ভাল হয়।

নীরজা—তুমি যেন আমাকে ঠাট্টা করছো বলে মনে হচ্ছে?

লোকনাথ—ঠাট্টা নয়, ঠাট্টা করবারও শক্তি আমার নেই। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই…।

—কী?

—শত হোক, সুকু তোমারই ছেলে। পাগল হোক ছাগল হোক, ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না।

—কিন্তু ললি কি আমার কাছে ওই ছেলের চেয়েও বেশি আপন ছেলে নয়?

—রাধানাথ জানেন।

—তবে তুমি আর কথা বাড়িয়ো না।

॥ দশ ॥

অনেক শিখিয়ে আর বুঝিয়ে দিলেও রান্নার কানা ঠাকুরটা কফি তৈরি করতে পারে না। অগত্যা নীরজা নিজেই সকাল দশটার কফি নিজের হাতে তৈরি করেন।

সারাদিন ঘরেই থাকে ললি, শুধু সন্ধ্যা হলে এক-একদিন বালিগঞ্জের ক্লাবে তাস খেলতে যায়।

ললির বাড়ির গাড়ি এ-বাড়িতে আর আসে না। কারণ, বিয়ের পর যেদিন এ-বাড়িতে এসে নতুন জীবনের নীড় বেঁধে ফেলেছে ললি, সেদিন থেকে বেহালার বাড়ি থেকে গাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে।

ললির বাবা অ্যাটর্নি প্রিয়নাথ রায়, সত্যিই একটু বেশি কড়া স্বভাবের মানুষ, তা না হলে এরকম কাণ্ড করবেন কেন? ভাবতে গিয়ে নীরজা প্রায়ই মাঝে মাঝে বেশ অপ্রসন্ন হয়ে যান।

ললির মনে কিন্তু বাপের উপর একটুও অপ্রসন্নতা নেই। নীরজা কথাটা ওঠালেই হেসে ফেলে সুললিত।—আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরুন। দেখতেই পাবেন, বাবার চিঠি এসে আমাকে ডাকছে। সত্যি, বাবার বাইরেটা যতই কঠোর হোক, ভেতরটা খুবই নরম। আমাদের বাড়িতে আমার বাবা-মা'র যত ফটো আছে, তার সব-গুলিতেই দেখতে পাবেন, আমি মায়ের কোলে, নয় বাবার কোলে বসে আছি।

বাবার কাছ থেকে প্রতিমাসে যে একটি হাজার টাকা সুললিত তার হাত-খরচের জন্য পেত, সে টাকাও আর সুললিতের হাতে আসে না। টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন প্রিয়নাথবাবু।

কিন্তু আর কতদিন? বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সুললিত। বিশ্বাস করুন, এক-

দিন মা-মরা ছেলের জন্যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবেন পিতা, আর লোকের হাতে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

নীরজা হাসেন—সে কথা আমি খুব বিশ্বাস করি।

মিতুও একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে। সুললিতের মুখের দিকে বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায় মিতু, আর হাসতে থাকে।

সুললিত—হাসছো কেন?

মিতু—একটা ম্যাজিক বলে মনে হচ্ছে, তাই হাসছি।

সুললিত—কিসের ম্যাজিক?

মিতু—আমি তো স্মিথের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করি, কোন দেশী তেল আমি মাথায় মাখি না।

সুললিত—তার মানে?

মিতু—তার মানে, আমার বালিশে চামেলী আতরের গন্ধ এল কি করে? মোহন খোসলা তো পিয়াকে চামেলী তেল উপহার দিয়েছে; পিয়া আজকাল ওই তেলই মাথায় মাখে।

সুললিত হাসে—হ্যাঁ, ম্যাজিকই বটে। তবু মনে হয়, আমি যখন পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, তখন বোধহয় তোমার ছটফটে স্বভাবের বোনটি এই ঘরে এসে আর বিছানায় গড়িয়ে পড়ে তোমার বালিশে মাথা রেখেছিল।

মিতু—তাই হবে।

সন্ধ্যা হতেই যখন তাস খেলতে বালিগঞ্জের ক্লাবে চলে যায় সুললিত, তখন চেঁচিয়ে ডাক দেয় মিতু—ওরে পিয়া, একবার এঘরে আসবি?

—যাই।

পিয়ালী ঘরে ঢুকতেই এক হাত দিয়ে মুখের হাসিটাকে চাপা দিয়ে কথা বলে মিতু—কী করছিলি?

—শুয়েছিলাম।

—কেন?

—খুব ক্লান্ত, তাই।

—ক্লান্তই বা কেন? আজ তো কোন জলসাতে তোর নাচের প্রোগ্রাম ছিল না?

—না।

—তবে?

—এমনি।

—না, এমনি নয়। নিশ্চয় ললির সঙ্গে অনেক গল্প করেছিস।

—হ্যাঁ।

—তাই আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলি।

—আঁ্যা? হ্যাঁ।

—তাই তোর ললিদা খুব মায়া করে তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ।

—তাই তোর ঠোঁটের কোণটা এখনও লালচে হয়ে ফুলে রয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তাই তোর ঘাড়ের ওখানে দাঁতের মতো একটা দাগ এখনও বসে আছে।

—কী যে বলছো, কিছু বুঝতে পারছি না।

—তোর ললিদার অভ্যেসটা তো আমার জানতে বাকি নেই। এইবার তুইও জানলি, তাই না?

মুখ ফিরিয়ে আর বিড়বিড় করে কথা বলে পিয়া—হ্যাঁ, ললিদা বার বার ডাকেন, না গিয়ে উপায় কি?

মিতু—আজ প্রথম ডেকেছিল?

পিয়া—না, আরও অনেকবার ডেকেছে। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করছো কেন?

মিতু—তোর ওপর একটুও রাগ করছি না। শুধু জেনে নিলাম।

জেনে নেবার পর মিতালীর দুই চোখের হাসি আরও দুরন্ত হয়ে ছটফট করে। আজ মাইনে পেয়েছে মিতালী। নীরজার কাছে গিয়ে, নীরজার হাতের কাছে মাইনের টাকার প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—আমি এখনই একবার বের হব, মা?

—কেন? কোথায় যাবি?

—একটা পার্টি আছে। তাতে আমারও নেমন্তন্ন আছে। মিস্টার বাসবানি আমাকে অনেক করে বলেছেন, আমি যেন অবশ্যই যাই।

নীরজা হাসেন—তবে যা, এ তো ভাল খবর। শুনতে পেয়ে কত খুশি হবে ললি।

সন্ধ্যাবেলা তাসের ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে খবরটা শোনবার পর সত্যিই খুশি হয় ললি। কী আশ্চর্য, রাত বারোটার পর যখন বাসবানির গাড়ি মিতালীকে পৌঁছে দিয়ে গেল, তখনও খুশি হলো ললি। গাড়ি থেকে নেমে মিতালী বাড়ির বারান্দাতে উঠতেই ললি যেন নতুন সুরে ও স্বরে একটা স্বাগত সম্ভাষণের বাণী শোনায়—ওয়েল ডান; আমি জানতাম, বাসবানি একদিন তোমাকে পার্টিতে ডাকবেনই আর তুমিও কোন আপত্তি করবে না।

নীরজা বলেন—কিন্তু পিয়াটা কোথায় গেল?

মিতু—পিয়া বাড়িতে নেই?

নীরজা—না।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রশ্ন করে সুললিত—মোহন খোসলার স্কুটারের শব্দ শোনেননি?

নীরজা—হ্যাঁ, শুনেছি।

সুললিত—তবে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, মোহনের সঙ্গে বের হয়েছে পিয়া।

নীরজা—কিন্তু কোথায়?

সুললিত—পিয়ারও নিশ্চয় একটা প্রোগ্রাম আছে।

নীরজা—কিসের প্রোগ্রাম?

সুললিত—কোন অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ নাচতে গাইতে হবে, এই আর কী।

না, বাড়ি ফিরতে খুব দেরি করেনি পিয়া। মোহনের স্কুটার বাড়ির সামনে এসে থামে আর চলে যায়। পিয়া এসে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।—উঃ, পুলিশ সার্জেন্টটা কী বদমাস! প্রায় একটি ঘণ্টা পথের উপর আটক করে রাখলো, আর পুরো দশটি টাকা ঘুস নিয়ে তারপর ছেড়ে দিল। নইলে, আরও কত আগে বাড়ি পৌঁছে যেতাম।

না, আর বেশিক্ষণ নয়। সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের বারান্দা নীরব হয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, দোতলার ঘরে একজন ঘুমন্ত মানুষের নাক-ডাকার শব্দ, আর পাশের পড়ো বাড়ির আঙ্গিনাতে নিমগাছের মাথায় পেঁচার ডাকের শব্দ।

॥ এগার ॥

রিক্শা থেকে নামলেন যে মহিলা, তাঁর দিকে নীরজার দুই চোখ যেন একটু অখুশি হয়ে তাকিয়ে থাকে। মহিলাকে দেখে চিনি-চিনি মনে হয়, কিন্তু ঠিক স্পষ্ট করে চিনতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, এই মহিলা কলকাতার সুখী জীবনের কেউ নন। খুব সম্ভব, ইনি কলকাতারই কেউ নন। শাড়ির চেহারা ও শাড়ি পরবার ভঙ্গি দেখে বরং মনে হয়, ইনি বোধহয় রায়গঞ্জের কেউ হবেন। তা না হলে, দুই পায়ে অন্তত ছেঁড়া-ময়লা একজোড়া সস্তা জাতের চটিজুতো থাকতো।

আগন্তুকা মহিলার হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিফিন-ডিবে। কে জানে কী বস্তু আছে ওই ডিবের মধ্যে। রিক্শাওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে মহিলা নীরজার দিকে তাকালেন। হেসে উঠলেন, যেন জীবনের একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে আনন্দের ও তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—কেমন আছ গো বড়বউ?

চমকে উঠলেন নীরজা। রায়গঞ্জের মুখের ভাষা দিয়ে কথা বলছে, কে এই মহিলা! বড়-বউ বলে ডাক দিয়ে কথা বলতো যে জগতের মেটে ঘরের যত মোটা-মোটা শাঁখাপরা বটার-মা ও ছকুর-পিসী, তাদের চেহারার ছবি নীরজার স্মৃতি থেকে একরকম মুছেই গিয়েছে। স্পষ্ট করে মনে পড়লেও তারা আজ নীরজার কাছে নিতান্ত অর্থহীন স্মৃতির ছায়াজীব বলে বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, সেই-রকম কোন ছায়াজীব আজ নীরজার নতুন জীবনের ঘরের রঙিন পর্দাওয়ালা দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে কেন? কী উদ্দেশ্য?

সন্দেহ হয় নীরজার, এই মহিলা নিশ্চয় পুরনো কোন সম্পর্কের ছুতো করে

বিশ-পঁচিশ টাকার সাহায্য চাইতে এসেছে। নীরজার গলার নতুন সোনার-চেনের ঝকঝকে লকেটের দিকে তাকিয়ে হয়তো একশো টাকার সাহায্য চেয়ে বসবে। নীরজার দুই চোখের ভুরু বেশ অপ্রসন্ন হয়ে একবার শিউরে ওঠে আর কুঁচকে যায়।

আগন্তুক মহিলা বলেন—কী ভাগ্যি, কী ভাগ্যির কথা, রায়গঞ্জের মামাবাবুর লেখা একটা চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম, তোমরা এই ঠিকানাতে এখানে আছ। ওঃ, সেই কবে, সেই ভয়ানক আশ্বিনে ঝড়ের বোধহয় দু'তিন বছর আগে তোমাদের মায়া কাটিয়ে রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় চলে এলাম।

নীরজা—আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

মহিলা—আমাকে চিনতে পারছো না। সে কী গো! আমি যে তোমাদের রায়গঞ্জের মাসী, বোসবাড়ির মেয়ে।

হেসে ফেলেন মহিলা—তবে আর-একটু খুলেই বলি।—আমি হলাম লোকনাথের পুঁটুমাসী। লোকনাথের মা আমাকে পুঁটু বলে ডাকতেন। ওঃ, তোমার শাশুড়ি আমাকে কী ভালই না বাসতেন। আমার বিয়ের সময় তোমার শাশুড়ি, আমার সেই পারুলদি, একা একশো জনের রান্না রেঁধে দিয়েছিলেন! তুমি তো দেখনি, আমি দেখেছি, তোমার শাশুড়ির চোখ দুটো ছিল ঠিক যেন মা-দুর্গার চোখ। তাই…।

মহিলা বলেন—তাই তোমাদের একবার দেখতে এলাম। রক্তের সম্পর্ক নাই বা থাক, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলো প্রাণের সম্পর্ক। বিয়ের পর সেই যে কলকাতা চলে এলাম, তারপর আর রায়গঞ্জ যাবার ভাগ্যি হয়নি, এমনই অদ্ভুত ভাগ্যি! চিঠি পড়ে একদিন জানতে পেলাম, লোকনাথের বিয়ে হবে। দু'দিন দু'রাত কেঁদেছিলাম। যেমনই তোমাদের মেসোটি তেমনই তাঁর খুড়ি, দু'জনেই আপত্তি করলেন, না এ-মাসে ঘরের বউয়ের পক্ষে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া নিয়ম নয়; শাস্ত্রে নিষেধ আছে, পঞ্জিকাতেও নিষেধ আছে। তাই লোকনাথের বিয়ে দেখবার ভাগ্যি আর হয়নি। শুনেছিলাম, লোকনাথের বউ খুবই সুন্দর। তাই তো দেখছি। আহা, তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর গো বড়-বউ।

মহিলার মাথার সাদা চুলের মধ্যে সিঁথির রেখাটা সিঁদুরের মোটা প্রলেপ নিয়ে যেন রঙিন হাসি হাসছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, লোকনাথের অদ্ভুত মেসোটি বেঁচে আছেন।

লোকনাথের অদ্ভুত মাসী এই পুঁটুমাসী এইবার একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন—কথাটা বলতে আমার একটু ভুল হয়ে গিয়েছে বড়-বউ?

নীরজা—কী বললেন?

পুঁটুমাসী—তোমাকে আগে কখনও দেখিনি, অথচ জিজ্ঞাসা করে বসলাম, যে আমাকে চিনতে পারছো কিনা। দুঃখ পেয়ে পেয়ে আর হাজার রকমের যত জ্বালা সয়ে সয়ে আমার মাথার বুদ্ধিসুদ্ধিও গোলমেলে হয়ে গিয়েছে।

মনে মনে একটু সাবধান হতে থাকেন নীরজা। ইচ্ছে করে তাঁর চোখের দৃষ্টিটাকে আরও উদাস করে দিলেন। সন্দেহ হয় নীরজার, এই অদ্ভুত পুঁটুমাসীর দুঃখ আর জ্বালার কারণটা নিশ্চয় টাকার অভাব, বিদ্‌ঘুটে একটা দারিদ্র্য। সন্দেহ হয়, এইবার টাকার সাহায্য প্রার্থনা করে বসবেন পুঁটুমাসী।

ঠিক সন্দেহ। পুঁটুমাসী বলেন—একযুগ ধরে এই কলকাতাতে চাকরি করছেন তোমার মেসো। মাইনে সেই শুরুর ত্রিশ টাকা থেকে এখন তেষট্টি টাকায় পৌঁছেছে। তোমার মেসো বলেন, তেষট্টি টাকার খোরাকে তিনটে কুকুরের পেট চলে না, তিনটে মানুষের পেট চলবে কেমন করে? কাজেই···।

নীরজা—আপনার খুড়শাশুড়ি কি এখনও বেঁচে আছেন?

পুঁটুমাসী—হ্যাঁ গো, বয়স হয়েছে ছিয়ানব্বই। তবু দরিদ্র সংসারটার জন্যেই এখনও কী খাটুনিই না খাটেন আমার এই খুড়শাশুড়ি। তোমাদের মেসো এখন আর আপিস-খাটুনি খাটতে পারেন না। শুধু দু'বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা পান। এদিকে আমরা দু'জনে, ছিয়ানব্বই বছর বয়সের ওই বুড়ি আর সত্তর বছর বয়সের এই পুঁটুবুড়ি, দু'জনে মিলে ঠোঙা তৈরি করে মাসের মধ্যে আরও বিশ-পঁচিশ টাকা পাই। খুড়শাশুড়ি রাত জেগে ঠোঙা তৈরি করেন, আর আমাকে ধমক দিয়ে বলেন—খবরদার, তোমাকে রাত জেগে ঠোঙা তৈরি করতে হবে না। আমি কত করে বলি—আপনি এই বয়সে রাতজেগে কাজ করবেন না। উনি বলেন—কেন? তাতে ভয় কিসের? আমি বলি—তাহলে আপনার এই রোগা শরীর আর টিঁকবে কতদিন? উনি বলেন—আর না টিঁকলেই তো ভাল। কিন্তু সত্যি কথাটা তুমি জান না তো বড়-বউ, উনি মরতে চান না। উনি বলেন, ইচ্ছে করলে তো নারায়ণের নাম করে সাতটা দিন উপোস দিয়ে মরে যেতে পারি। কিন্তু তোমাদের সংসারের বিশ পঁচিশ টাকার আয়ও যে আমার চিতেটার মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেটা কী ভাল হবে?

নীরজা বলেন—আচ্ছা, এখন দয়া করে আমাকে একটু রেহাই দিন। আমার কাজ আছে। ইচ্ছে করেন আর-একদিন আসবেন।

পুঁটুমাসী চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—কেন তোমাকে রেহাই দেব? আমার সামনে বসে তোমরা দু'জনে খাবে। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখবার ভাগ্যি কখনও হয়নি। আশা ছিল তোমাদের বিয়ের সময় রায়গঞ্জে যেতে পারবো, কিন্তু কপালে তা লেখা ছিল না।

পুঁটুমাসী তাঁর হাতের ডিবের ঢাকনা খুলে ভিতরের বস্তুগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন আর কথা বলেন—নারকেল পুলি। আজই সকালবেলাতে অনেক তাড়াহুড়ো করে করেছি। ভাল হয়েছে কি না জানি না। যাই হোক্‌···চল বড়-বউ, ভেতরে যাই।

নীরজার সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে আর সাদা মাথাটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উপরতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটুমাসী। ডাক দিলেন—ওরে

লোকু, তাকিয়ে দেখ, কে এসেছে।

—কে? দরজার দিকে তাকিয়ে উৎসুকভাবে প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

—আমি তোর পুঁটুমাসী এসেছি।

চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ।—কাছে এসো পুঁটুমাসী, বিছানার উপর উঠে বসো।

বিছানার উপর উঠে বসতেই পুঁটুমাসীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন লোকনাথ। লোকনাথের গলার স্বরে যেন নিবিড় এক মায়ার আর আনন্দের আবেশ টলমল করে।

—আমি, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো পুঁটুমাসী? তুমি কি সত্যিই এসেছো পুঁটুমাসী?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। এসেছি বৈকি। ঠিকানা পেলাম, তাই দেখা করতে চলে এলাম।

এইবার লোকনাথের মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলেন পুঁটুমাসী—তোর সংসার বড় সুখের হয়ে উঠেছে লোকু। দেখে প্রাণটা আনন্দে ভরে গেল। শুধু তোকে দেখতে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছে। ভাবতে পারিনি যে,আমাদের সেই ডানপিটে লোকুর শরীর কোনদিন এরকম পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। ও বড়-বউ, কাছে এস, এই নাও দুটো পুলি তুমি হাতে তুলে নিয়ে খাও; লোকু, তুমি দুটো পুলি তুলে নিয়ে খাও।

নীরজা—আমি খাব না।

পুঁটুমাসী—সে কী? খেয়ে দেখ, খেতে একটুও খারাপ লাগবে না।

নীরজা—না।

নীরজার সন্দেহ, দরিদ্র সংসারের পুঁটুমাসীর বুদ্ধিটা একটুও দরিদ্র নয়। টাকা বাগাতে হবে, তার আগে একটা অন্তরঙ্গতার হাওয়া তৈরি করে নিচ্ছে এই পুঁটুমাসী। এই নারকেল পুলি হলো পুঁটুমাসীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আঁচলে বাঁধা ঘুস।

লোকনাথের চোখে যেন অদ্ভুত এক স্বপ্নের আবেশ থমথম করছে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন পুরনো রায়গঞ্জের মায়া এসে লোকনাথ আর নীরজার মাথার কাছে কুলোর প্রদীপ দুলিয়ে দিয়ে হাসছে। কবেকার সেই পুঁটুমাসী, যে মানুষ আজ লোকনাথের কাছে অতীতের একটা হাসিখুশির গল্প মাত্র, তাকেই কাছে দেখতে পেয়ে লোকনাথের প্রাণটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছে।

পুঁটুমাসী বলেন—হলামই বা মাসী। আমার মতলব ছিল, লোকুর বিয়েতে যদি রায়গঞ্জে যেতে পারি, তবে ফুলশয্যার ঘরে আমিও রগড় মাতিয়ে তুলবো। মতলব করেছিলাম, নতুন বউকে জোর করে ঠেলেঠুলে বরের কোলে বসিয়ে দেব। কিন্তু শুধু মতলব করাই সার হলো। চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন পুঁটুমাসী।

পুঁটুমাসীর হাতের ডিবে থেকে দুটি পুলি তুলে নিয়ে খেতে থাকেন লোকনাথ। তাকের উপরে রাখা একটা বাটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—পুঁটুমাসী, আপনি এখন বাকি পুলি দুটোকে এই বাটিতে রেখে দিন। ওর যখন ইচ্ছে হয় খেয়ে নেবে।

—তাই ভাল, তাই ভাল। তাকের বাটিতে দুটো পুলি রেখে দিয়ে পুঁটুমাসী যেন একটা খুশিভরা নিঃশ্বাস ছাড়েন।—রায়গঞ্জের বোসবাড়ির কেউ আজ আর

বেঁচে নেই। এদিকেও মেসোর গুষ্টির কেউ কোথাও নেই। কী চমৎকার ভস্মমাখা কপাল, এমন কপাল বোধহয় বনবাসী সাধু-সন্ন্যাসীরও হয় না। এদিকে আমি কারও মা নই, খুড়ি নই, জেঠী নই, পিসী নই। ওদিকে আমি রায়গঞ্জের কারও দিদি নই, মাসী নই। আমাকে মাসী বলে ডাকতে শুধু একজনই আছে, সে হলো তুমি। নারায়ণ বোধহয় আর বেশিদিন আমাকে এ সংসারে রাখবেন না। তাই ইচ্ছে হলো, লোকু যখন কলকাতাতে আছে, তখন তাকে একবার দেখে আসি, তার মুখের পুঁটুমাসী ডাক একবার শুনে আসি।

নীরজা বলেন—আমি যাই, আমার অনেক কাজ আছে।

পুঁটুমাসী বলেন—আমিও যাই। যদি বেঁচে থাকি তবে আবার আসবো রে লোকু।

কেঁদে ফেলেন লোকনাথ। পুঁটুমাসী বলেন—ষাট, কাঁদিস কেন? কাঁদতে নেই।...চলি বড়-বউ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন পুঁটুমাসী। তারপর সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নেমে গেলেন।

লোকনাথ এইবার নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন। না, ভর্ৎসনা নয়। লোকনাথের ভিজে চোখের তারা দুটো আর জ্বলে উঠতে চায় না।

নীরজা বলেন—যাক্‌,বাঁচা গেল। তোমার পুঁটুমাসী সত্যি টাকা চেয়ে বসলেন না তবু মনে হচ্ছে, রিক্‌শা-ভাড়াটা দিয়ে দিলে ভাল হতো।

লোকনাথ—না, তুমি বরং আমার ইচ্ছের একটা কথা শোন।

নীরজা—বল।

লোকনাথ—তুমি এখনই যাও, নিচে গিয়ে পুঁটুমাসীকে প্রণাম কর।

নীরজা—প্রণাম করবার কোন দরকার তো নেই।

লোকনাথ—দরকারের জন্যে প্রণাম নয়, প্রণামই একটা দরকার। যাও, শিগ-গির যাও, পুঁটুমাসী বোধহয় এখনও রিক্‌শার আশায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

নীরজা—আছেন, কিন্তু তুমিই বল না কেন, পুঁটুমাসীর মত মানুষকে প্রণাম করে আমার মত মানুষের কী লাভ হবে?

লোকনাথ—লাভ হবে। মস্ত বড় লাভ। সে লাভ আজই চোখে দেখতে তুমি পাবে না বটে, কিন্তু একদিন দেখতে পাবে।

নীরজা হাসেন।—পুণ্যি হবে বোধহয়?

লোকনাথ—হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস, সে পুণ্যির জোরে তুমি তোমার জীবনের কোন মহাভয় হতে রক্ষা পেয়ে যাবে।

নীরজা—আমার আবার ভয় কিসের?

লোকনাথ—সাপের কামড়ের ভয়।

নীরজা—বুঝলাম না। আমি তো আর রায়গঞ্জে ফিরে যাচ্ছি না। আমাকে

কোন্ বনবাদাড়ের সাপে কামড়াবে ?

লোকনাথ—কলকাতাতেও সাপ থাকে।

নীরজা—হেঁয়ালি করে কথা বলছো কেন ? স্পষ্ট করে বল।

লোকনাথ—আর বেশি বলবো না। তুমি পুঁটুমাসীকে একবার প্রণাম কর।

নীরজা—বেশ, তাই করবো। কিন্তু এরপর পুঁটুমাসী যেন আর আমার এখানে না আসেন।

নিচে চলে গেলেন নীরজা, লোকনাথ কান পেতে শুনতে থাকেন, নীরজা ডাক দিয়ে বলছে।—একটু থামুন পুঁটুমাসী। আপনাকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছি। একটু থামুন।

এরপর শুধু একটা নিরেট স্তব্ধতার গুমোট। আর কোন কথা শুনতে পান না লোকনাথ।

টুং টুং টুং। একটা রিক্শা চলে গেল। দুই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ মোছেন লোকনাথ, যেন একটা সুস্বপ্নের ছবিকে ইচ্ছে করে মুছে দিচ্ছেন লোকনাথ।

॥ বার ॥

কী আশ্চর্য, পড়ো বাড়ির আঙ্গিনাতে সেই নিমগাছের পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আজ একটা কোকিল ডাকছে। পঞ্জিকা হাতের কাছে না থাকলেও বুঝতে পারেন লোকনাথ, সেই যে কবে, রামদয়াল যেদিন শুকনো মুখ নিয়ে আর দুঃখিত হয়ে চলে গেল, তারপর প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। বেঁচে আছে কী রামদয়াল ? বেঁচে থাকলে একটা চিঠিও দেয় না কেন ?

বীণা চলে যাবার পর থেকে এই বাড়ির নিচের তলার দুটি ঘরের কোন নতুন খবর শুনতে পাননি লোকনাথ। আর নতুন করে জানবারই বা কী দরকার আছে! বুঝতেই পারা যায়, আজ এই সকালবেলাতে নিচের তলার ঘরে যে উচ্ছল হাসি আর কলরব এখন উথলে উঠছে, সেটা নীরজারই স্বপ্নের জয়ধ্বনি। তবে সত্যিই কি নীরজার চোখের জল আর কোনদিনও দেখতে পাওয়া যাবে না ? অদ্ভুত আশা, অদ্ভুত কল্পনা। লোকনাথ মনে করে, অভিশাপে জ্বলে যাওয়া জীবনের আশা আর কল্পনা এরকমই হয়ে থাকে।

নিচের তলার ঘরে চায়ের টেবিল ঘিরে তর্ক গল্প আর ঠাট্টার যে হর্ষ মেতে উঠেছে, সে হর্ষের ভাষা লোকনাথের কানে পৌঁছয় না ঠিকই, তবু বুঝতে পারেন, এটা নীরজার নিজের হাতে গড়া একটি সুখী সংসারের হর্ষ।

আনন্দের কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন নীরজা—শত্তুরে কী না বলে ? যত ছাই আবোলতাবোল মিথ্যে কথা।

হ্যাঁ, কে এক ক্ষিতীশ বিশ্বাস নীরজার কাছে একটি চিঠি লিখেছেন : খুব জানবেন, অ্যাটর্নী প্রিয়নাথ রায় তাঁর একমাত্র ছেলেকে তাঁর বাড়ি গাড়ি ও টাকার কিছুই দেবেন না। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সব সম্পত্তি

তাঁর ছেলে সুললিতই পাবে।

নীরজা বলেন—মিথ্যুকের হাতের লেখাটা, কী আশ্চর্য, অনেকটা ললির হাতের লেখার মত।

সুললিত—এই ক্ষিতীশ বিশ্বাস হলেন আমার আপন মামা। কিন্তু ওরকম একটি হিংসুকে শত্রু মামা বোধহয় পৃথিবীর কোন ভাগনের নেই।

নীরজা—চিঠিটাকে আমি ঘেন্না করে আর একেবারে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

হাসে সুললিত—চিঠিটার উপর এত রাগ করবার কোন মানে হয় না। যাই হোক, তবু আসল সত্যটা তো আর লুকোয় নি। বাবার সব সম্পত্তি একদিন যে আমি পাব, ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে গেলেও সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন মামা।

পিয়ালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আর ফিসফিস করে কী যেন বলে সুললিত। পিয়ালী ভ্রুকুটি করে হাসে আর সুললিতের পিঠের উপরে আস্তে একটা চাপড় মারে।—দুষ্টু!

—কী হলো? নীরজা প্রশ্ন করতে গিয়ে হেসে ফেলেন।

সুললিত—পিয়ালীকে ওর গ্র্যাণ্ড সাকসেসের জন্য কনগ্র্যাচুলেশন জানালাম।

উঠে দাঁড়ান নীরজা—আমি হলাম রায়গঞ্জের সেকেলে গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এত ইংরেজী কথার মানে বুঝি না। দেখি, কানা ঠাকুরটা আবার পাতি লেবুর চচ্চড়ি চড়িয়ে দিল বোধহয়।

চলে যান নীরজা। মিতালী আরও চা খায়; মিতালীর কপালের উপর আস্তে আস্তে দুলছে আর কাঁপছে চুলের যে কার্ল, সেটাকে হাতের আঙুল দিয়ে টানে আর ছাড়ে, ছাড়ে আর টানে মিতালী। কী যেন ভাবছে মিতালী।

সুললিত বলে—মিতু, বাসবানির ওই পার্টিতে কি কোন দেশী মানুষ ছিল?

মিতালী—মাত্র একজন, আর সবই বিদেশী।

সুললিত—তাদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, বাসবানি?

মিতালী—হ্যাঁ।

সুললিত—ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় তোমাকে নেমন্তন্নও করে রেখেছে।

—হ্যাঁ।

—কবে?

—এ মাসের শেষে গ্লাসগো থেকে মেশিন টুল ইণ্ডাস্ট্রির এজেন্ট হয়ে এসেছেন যে মিস্টার ডেভিস, তিনি এ মাসের শেষে বোম্বে থেকে কলকাতা ফিরবেন। তখন বাসবানি আমাকে জানিয়ে দেবে, কবে নেমন্তন্ন হবে।

পিয়ালীর পিঠে একটা চিমটি কাটে সুললিত—তুমি তাহলে কলেজে আর যাবে না বলেই ঠিক করেছ?

পিয়ালী—হ্যাঁ।

সুললিত—কেন?

পিয়ালী—বাংলার কৃষ্ণাদি রোজই খোঁটা দিয়ে একটা কথা শোনাচ্ছেন। কাজেই··· ।

সুললিত—কী কথা ?

পিয়ালী—কৃষ্ণাদি বলেন, আমার সাজ দেখে ক্লাসের মেয়েরা সবাই নাকি মুগ্ধ হয়ে শুধু আমারই দিকে তাকিয়ে থাকে। কৃষ্ণাদির লেকচারে কেউ কানও পাতে না, শোনেও না।

মিতালী—ওই খোঁটা আমাকেও কত শুনতে হয়েছিল।

সুললিত—কোথায় আর কিসের প্রোগ্রাম তোমার ছিল, পিয়ালী ?

পিয়ালী হাসে—বলবো না।

সুললিত—বলো না। তবে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। বেশ গোল-গাল মোটা-সোটা চেহারার এক গোয়ানীজ কালো-সাহেব, চমৎকার বেহালা বাজাতে পারেন। একটা হোটেলের তিনতলায় একটা ঘরের ভিতরে স্টেজের এককোণে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন ওই কালো সাহেব ডিক্রুজ; আর কারা যেন স্টেজের উপর দুলে দুলে নাচছে। আর··· ।

—তোমার স্বপ্নের নিকুচি করি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর লাফিয়ে চলে যায় পিয়ালী।

মিতালী বলে—তুমি দেখছি সব খবরের রয়টার।

সুললিত—তা বলতে পার।

মিতালী—পিয়ালীর প্রোগ্রামের এই খবরগুলো কোথায় পেলে ?

সুললিত হাসে—স্বয়ং ডিক্রুজই আমাকে বলেছে। একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছে, ওর নাইট ক্লাবের আসরে এখন সবচেয়ে চমৎকার স্ট্রিপ করতে পারে একটি নতুন রিক্রুট, একটি বাঙালী মেয়ে, নাম তার পিয়ালী রায়। ফিরিঙ্গী মেয়েগুলো ওদের শেষ পোজে তবু একটু ঢাকাঢুকির বালাই রাখে, ছোট্ট প্যাণ্টিটা থাকে। কিন্তু নতুন রিক্রুট নাকি তার শেষ পোজে ছবির ভেনাসের চেয়েও বেশি আদুড় হয়ে, শুধু ছোট্ট একটি জাপানী পাখার ছায়া দিয়ে কায়ার মায়াটিকে সামান্য একটু ঢাকেন।

—আমি যাই। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মিতালী।—এখন আমি অন্তত পুরো পাঁচটি ঘণ্টা ঘুমোব।

সুললিত—ঘুমোও। হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। তুমি আর পিয়ালী, দুজনে কখনও একই দিনে কোন পার্টি বা প্রোগ্রাম রাখবে না।

মিতালী—কেন ?

সুললিতের দুই চোখে একটা কঠোর দাবীর জ্বালা জ্বলজ্বল করে।—আমার বড় অসুবিধে হয়। একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হয়।

একদিন খাবার টেবিলের কাছে এসেই মীরজাকে আরও একটা কষ্টের কথা বলেছিল সুললিত।—অন্তত দুপুরের খাওয়াটার এমন দুর্দশা হলে তো চলবে না।

নীরজা—অ্যাঁ! দুর্দশা?

সুললিত—হ্যাঁ, না আছে চিকেন, না আছে পুডিং, না আছে এক-আধটুকু বিরিয়ানী পোলাউ।

নীরজা লজ্জিত হয়ে হাসেন—ঠিকই বলেছো। কিন্তু।...

সুললিত—আর তো কোন কিন্তু নেই। আপনাদের তো এখন টাকার কোন অভাব নেই।

নীরজা—অভাব আছে বৈকি। হ্যাঁ, ভাগ্যের জোরে আর নিজের গুণে মেয়ে দুটো মাঝে মাঝে এক আধটা প্রোগ্রাম পায়, তাই চলে যাচ্ছে।

সুললিত—আপনি তো জানেন, মিতু খাঁটি পার্লের দুটো নেকলেস কিনেছে। পিয়ালীও আধ ডজন বালুচর কিনে ফেলেছে।

নীরজার গলার স্বর এইবার বেশ মৃদু হয়ে ও কুণ্ঠিত হয়ে যেন মার্জনা চায়—আমি খুব বুঝতে পারছি বাবা, তোমার মত মানুষের এ রকম কানা ঠাকুরের রান্না খুবই খারাপ লাগে।

গম্ভীর সুললিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন নীরজার গলার স্বরটা যেন একটু সাহস পেয়ে কথা বলে—তোমার বাবার কাছ থেকে কোন সাড়া তো এখনও পাওয়া গেল না, ললি।

—কিসের সাড়া?

—তোমাকে আর টাকা পাঠালেন না, নিজের কাছে ডাকলেনও না, একবার তাঁর গাড়িটাকেও এখানে পাঠালেন না।

—সে জন্য আপনার দুশ্চিন্তা কেন? যখন সময় হবে, তখন সবই হবে। অন্তত এটুকু বিশ্বাস করতে তো কোন অসুবিধে নেই যে, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি আমিই পাব। মামার লেখা চিঠিটা তো পড়েছেন। তবু—

—না না, কোন সন্দেহ করছি না।

—মামার হাতের লেখা ঠিক আমারই হাতের লেখার মতো। কিন্তু সেজন্যে যদি সন্দেহ করেন যে...

—না, না, একটুও সন্দেহ নেই।

—তবে বিশ্বাস করুন, বাবার সব সম্পত্তি আমিই পাব।

—তাই তো বিশ্বাস করতে চাই।

—বিশ্বাস করতে চাই নয়, বিশ্বাস করতে হবে।

—তুমি বাবা একদিন নিজেই যাও।

—কোথায়?

—তোমার বাবার কাছে যাও, সব কথা তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল।

—সেটা সম্ভব নয়।

—কেন?

—আমার অসম্মান।

—সেটা বুঝি। তবু…।

—আবার তবু কিসের ?

—তবু, তোমার সম্মানের কথাটাই ধর না কেন, তোমার তো তবে একটা ভাল রোজগারের কাজ ধরা উচিত।

—না।

—বাবার কাছে যাবে না, কোন কাজও ধরবে না, এটা কী একটা কথা হলো।

—ওরকম তর্ক আমার সঙ্গে করবেন না। শুনে নিন তবে, আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকবো। আমি নড়বো না।

পাশের ঘর থেকে মিতালী আর পিয়ালী দু'জনেই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে, যেন ভীরু দুটি গুঞ্জনের স্বর চেপে দিয়ে আর জোর ক'রে হেসে-হেসে কথা বলে—তুমি মিথ্যে কেন এসব তর্ক করছো, মা। কোন দরকার নেই। মিস্টার সুললিত সরকার হলেন কড়া মেজাজের একটি ঔরঙ্গজেব।

সুললিতের হাতের কাছে ক্ষীরের বাটি এগিয়ে দিয়ে নীরজা আবার হাসতে চেষ্টা করেন—বেশ তে', আর তর্ক করবো না। কিন্তু কী এমন বাজে কথা বলেছি যে, ললি এত রাগ করবে।

সুললিতও এইবার হাসে—এই তো আবার তর্ক শুরু করলেন।

পাশের ঘরে মিতালী আর পিয়ালী দুজনে একসঙ্গে এইবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।—ড্রপ সীন! ড্রপ সীন নামাও এবার।

হ্যাঁ, ড্রপ সীনই পড়ে গেল। নীরজার হাত থেকে ক্ষীর তোলবার চামচটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর কাঁচের গেলাসে লেগে ঝনঝনে আর্তনাদের মত অদ্ভুত একটা শব্দ করে বেজে উঠলো। আর কোন কথা বলেন না নীরজা।

॥ তের ॥

রাত কত ? দশটারও বেশি হবে। কী সাংঘাতিক ঝড় বৃষ্টিও চলছে। হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের সব জানালা কাঁপছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু ঘরের একটা দরজা খোলা রেখে, আর দরজার কাছে বারান্দার উপর একটা চেয়ার রেখে, তার উপর বসে আছে সুললিত। কত শক্ত হয়ে, যেন পাথরের মূর্তিটি হয়ে বসে আছে সুললিত।

নীরজা এসে বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করেছেন, কফি তৈরি করে দেব ?

সাড়া দেয়নি সুললিত। তবু আবার এসে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কফি খাবে ?

সুললিত—না। কফির চেয়ে ভাল জল খেয়েছি। কফির দরকার নেই।

চমকে ওঠেন নীরজা।—তবে এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়।

সুললিত—না।

সুললিতের গলায় এই 'না' শব্দটা যেন একটা গর্জন।

নীরজা—তুমি রাগ করেছো মনে হচ্ছে।

সুললিত—কেন রাগ করবো না? আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা দুজনে কখনও একই দিনে কোন প্রোগ্রাম রাখবে না। তবু আমার কথা অমান্য করে আজ ওরা দুজনেই বাইরে বের হয়েছে।

নীরজা—একটু পরে ওরা বাড়িতে ফিরবেই। তোমার কথার অমান্য কেন হবে?

সুললিত—না, ওরা আজ ফিরবে না।

নীরজা—ফিরবে না? এ কি রকমের কথা।

সুললিত—হ্যাঁ, এই রকমই কথা। একজন গিয়েছেন ডেভিসের সঙ্গে টাটানগর। আর-একজন গিয়েছে মোহন খোসলার সঙ্গে, দীঘা।

নীরজা—এ তো বড় বেশি দুঃসাহসের কথা।

সুললিত—কল গার্ল দুঃসাহসী হবে না তো কি ঝি রামুর মা দুঃসাহসী হবে?

নীরজা—কল গার্ল? তার মানে?

সুললিত—কল গার্ল। তারা রূপসী মডার্নিটি হয়ে পয়সাওয়ালা মানুষের ফুর্তির সহচরী হয়, তার সঙ্গে রাত কাটায়, আর টাকা নিয়ে ফিরে আসে।

সুললিতের মুখে হাসি। বার বার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলেই সুললিতের মুখের হাসিটাকে দেখতে পাচ্ছেন নীরজা। কিন্তু দেখতে পেয়েও যেন অন্ধের মত তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নীরজার কাছে এগিয়ে আসে সুললিত। নীরজার একটা হাতও ধরে ফেলে। আর-এক হাতে নীরজার গলাটাকে জড়িয়ে ধরে।—এস আমার ঘরে এস।

—এ কী সর্বনেশে কথা। চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা। যেন অজগরের পাকে জড়ানো একটা ভীরু হরিণের যন্ত্রণার চিৎকার।

পাশের পড়ো বাড়ির আঙিনার নিমগাছে কোন পেঁচা আর ডাকে না। ঝড়ের ভয়ে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাত নম্বর হরি দত্ত লেনের দোতলায় ওঠবার পুরনো সিঁড়ি ধরে দুড়দাড় একটা শব্দের আছাড় যেন মরিয়া হয়ে উপরে উঠতে থাকে। অনেক চেষ্টা ক'রে অজগরের পাক থেকে শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন নীরজা।

—কে? কে? শব্দ শুনে চমকে উঠলেন পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়। সত্যিই যে খুবই অদ্ভুত শব্দ। কে যেন দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলো, আর লোকনাথের রোগশয্যার খাটটাকে ছুঁয়ে লোকনাথের মাথার কাছে ঘরের মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়লো।

—কে তুমি? আবার ডাক দিলেন লোকনাথ।

—আমি। যেন হাঁসফাঁস করে, একটা বোবা নিঃশ্বাস কোন মতে কথা বলে জবাব দেয়।

—তুমি নীরু?

—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার?

—ভয় পেয়েছি।

—ভয়?

—হ্যাঁ।

—তবে শিগগির আলো জ্বালো, তোমার হাতের কাছেই দেয়ালে সুইচ আছে।

আলো জ্বেলে দিয়ে আবার লোকনাথের খাট ছুঁয়ে মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়েন নীরজা।

—কিন্তু, কিসের ভয় নীরু? খাটের উপর উঠে বসেন, আর নীরজার সেই যন্ত্রণাভীরু মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ।

নীরজার চোখে জল, কিন্তু চোখ লুকোন না নীরজা, চোখের জলও মোছেন না। নীরজার হাতটা থরথরিয়ে কাঁপছে, যদিও নীরজার সেই হাত খাটটাকে খুব শক্ত করে ধরে রয়েছে।

সর্বনাশ! আবার চমকে ওঠেন আর ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন নীরজা। এই ঘরেরই ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে সুললিত। কী শান্ত, কত শক্ত, আর কী দুঃসাহসী সুললিত। পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়কে বোধহয় একটা মরা টিকটিকির চেয়েও নির্জীব অস্তিত্ব বলে মনে করে সুললিত। শুধু একা সুললিত কেন? নীরজাও জানেন, রায়গঞ্জের এই লোকনাথ রায় আজ একটি পঙ্গু অক্ষম ও অশক্ত রোগী মাত্র। নইলে এঘরে এসে লোকনাথ রায়েরই শিয়রের কাছে মেঝের উপর বসে, আর লোকনাথের খাট এত শক্ত করে ধরে থেকেও এত ভয় পাবেন কেন নীরজা?

নীরজার দিকে তাকিয়ে আর হাত তুলে ইসারায় ডাক দেয় সুললিত—চলে এস! ঘরের দেয়ালের গায়ে সেই ইসারার ছায়াটা নড়ছে ও দুলছে—যেন অতিকায় এক দানবের হাতের ছায়া।

নীরব স্তব্ধ ও নিঃসাড় লোকনাথ। লোকনাথ তাঁর খাটের উপর বসে শুধু দেখছেন, নীরজার চোখে জল। কিন্তু কী আশ্চর্য, পঙ্গু লোকনাথের দুই অপলক চোখে যেন খুশি জ্যোৎস্নার আভা চিকচিক করছে।

দু পা এগিয়ে আসে সুললিত। এইবার শুধু হাতের ইসারাতে নয়, চাপা ধমকের মত ভঙ্গিতে গলার স্বর বেশ তীব্র করে নিয়ে ডাক দেয়—চলে এস বলছি।

দুই চোখ বন্ধ করে মাথাটাকেও খাটের শক্ত কাঠের উপর নামিয়ে দিয়ে কাঁপতে থাকেন নীরজা।

—মনে হচ্ছে, হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে তুমি আসবে না। বলতে বলতে নীরজার কাছে এসে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায় সুললিত, আর পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিজেরই হাতের পাঞ্জার উপর ঠুকতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুললিতের হাত থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেট। পঙ্গু লোকনাথের দুটি হাত, কী ভয়ানক শক্ত হাত, সত্যি যেন লোহা আছে সেই হাতে, সুললিতের গলা টিপে ধরেছে। দুই হাত ছুঁড়ে, বার বার লোকনাথের

বুকটাকে ধাক্কা দিয়ে, লোকনাথের হাতের সাঁড়াশি থেকে গলাটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সুললিত। লোকনাথের সাঁড়াশি হাত কিন্তু একটুও কাঁপে না। লোকনাথের মুখে কী ভয়ানক এক সুখের উল্লাস কাঁপছে। লোকনাথের দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সাদাটা ঠিকরে পড়ছে, যেন একটা জন্তুর হিংস্রতা ঝকঝক করছে।

সুললিতের দুই চোখের তারা উল্টে গিয়েছে। মুখের দুই কষ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা লালচে লালা ঝরে পড়ছে। এইবার খাটেরই কাঠের উপর সুললিতের মাথাটাকে চেপে ধরেন, আবার ঠুকতেও থাকেন লোকনাথ। সুললিতের গোঙানির শব্দটা এইবার আরও অদ্ভুত হয়ে যায়। যেন মাথা ঠুকছে একটা বোবার আর্তনাদ।

হঠাৎ ঝুপ ক'রে মেঝের উপর পড়ে গেল সুললিতের শরীর। লোকনাথের সাঁড়াশি হাতের পেষণ থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল সুললিতের গলা। বোধহয় সুললিতের গলার ঘামে পিছল হয়ে গিয়েছে লোকনাথের হাত—তাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুললিতের সেই পতিত দেহটার একটা হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ।—জানোয়ারের সব পাঁজরা গুঁড়ো করে দেব।

সুললিত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এখনই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সুললিতের হাত ছেড়ে দিলেন লোকনাথ। খুব জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

॥ চৌদ্দ ॥

আর ঝড় নেই, বৃষ্টিও নেই। হরি দত্ত লেনের রাত একটার অন্ধকারের গায়ে তবু করুণ গুঞ্জনের মত একটা শব্দ কোথা থেকে এসে যেন লুটিয়ে পড়ছে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কে কাঁদে? দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এসে আর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যিনি একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা চিৎকার করে শোনালেন ও পাড়া জাগিয়ে তুললেন, তিনি হলেন অন্নপূর্ণার বাবা, অর্থাৎ সামনের বাড়ির মহীতোষবাবু।

ওদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন রমেশবাবু—কী ব্যাপার, মহীদা?

মহীতোষ—এই সাত নম্বর বাড়িতে একটা ব্যাপার হয়েছে। মনে হচ্ছে, এক-জন মহিলা কাঁদছেন।

পাড়ার জিতেন একটা টর্চ হাতে নিয়ে ছুটে আসে—হ্যাঁ, মহীকাকা, আমিও শুনেছি।

মহীতোষ—কিন্তু কিছু দেখছো কি?

জিতেন—না।

মহীতোষ—আমি দেখেছি। একে তো আমার চোখে অনিদ্রা রোগ, তার ওপর

রাতের অন্ধকারেও চোখের দৃষ্টি বেশ ভালই চলে। তার ওপর কানেও একটু বেশি শুনি। রাতের বেলা পাড়ার ভেতরে একটা বিড়াল দৌড়ে গেলেও আমি শব্দ শুনতে পাই।

জিতেন—কী দেখেছেন বলেই ফেলুন না।

মহীতোষ—তখন থেকে দেখছি আর শুনছি, এই সাত নম্বরের ভেতরে যেন একটা ভূতের কাণ্ড ছুটোছুটি করছে। এই কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ির জামাইবাবু একটা বাক্স হাতে নিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

একে একে আরও অনেকে আসেন। প্রদীপবাবু, জয়ন্তবাবু, আর হেম, বিনয় ও চারু সরকার। সাত নম্বরের বাড়ির সামনে সাত-আট জন প্রতিবেশী মানুষের উৎকণ্ঠ ভিড়টা এইবার বেশ আশ্চর্য হয়, বাড়ির তিনটি দরজাই খোলা। জিতেন বলে—ডাকাতি।

চারু সরকার—পারিবারিক কলহ।

প্রদীপবাবু—শোকের ব্যাপারও হতে পারে।

বলতে বলতে সকলেই একটু ব্যস্ত হয়ে সাত নম্বর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রদীপবাবু—আমি ঠিকই অনুমান করেছি, শোকের ব্যাপার।

মহীতোষবাবু—আমার সন্দেহ হয়, ফাউল প্লে।

হেম—তবে তো পুলিশে খবর দিতে হয়।

বিনয়—একটু সবুর কর।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন নীরজা, সেই সঙ্গে কান্নার সব শব্দও স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহীতোষবাবু এইবার নীরজার স্তব্ধ চেহারাটার দিকে এবং বেশি বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—আপনার তো চুপ করে থাকলে চলবে না।

নীরজা—বলুন, কী বলবো?

মহীতোষ—এই রুগী ভদ্রলোক কি জ্ঞান হারিয়েছেন, না মরেই গিয়েছেন?

নীরজা—দেখুন আপনারা।

জিতেন খাটের কাছে এগিয়ে যায়, আর লোকনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—এঃ, মরেই গিয়েছেন।

মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—মনে হয় এ নিশ্চয়ই মার্ডার, প্রদীপবাবু? রুগী ভদ্রলোককে কেউ খুন করেছে। কিন্তু খুন করবে কে?

প্রদীপবাবু—মহিলাকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন।

নীরজার দিকে হাত তুলে আর কড়া শাসানির একটা ভঙ্গি থরথর ক'রে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন মহীতোষ—আপনি বলুন, কে খুন করেছে? আপনি?

নীরজা—হ্যাঁ।

চমকে ওঠে পাড়ার মানুষের সেই উৎকণ্ঠ ভিড়। প্রদীপবাবু সেই মুহূর্তে কাঁপতে

কাঁপতে সিঁড়ি ধরে নেমেই চলে যান।

মহীতোষ ছটফট করেন—আপনারা সবাই এবার বলুন তাহলে, অগত্যা কী করা উচিত। পুলিশ ডাকবেন?

হেম হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—এই মহিলার কথাই বা চট্ করে বিশ্বাস করে ফেলতে হবে কেন? হতে পারে শোকে মাথা খারাপ হয়েছে, তাই ওরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলছেন।

বিনয়—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

জয়ন্তবাবু—সবার আগে একজন ডাক্তার ডেকে আনা উচিত।

হেম—আমি যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকেন, ডাক্তার সুমন্তদা। ডাকলেই আসবেন, যত রাত হোক না কেন।

হেমের পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে দুমদাম করে নিচে নেমে যায়। মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—শুনছেন আপনি?

নীরজা—হ্যাঁ।

মহীতোষ—আমাদের কথার জবাব দিন।

নীরজা—বলুন।

মহীতোষ—আপনার ছেলে কোথায়?

—জানি না।

মহীতোষ—আপনার জামাই বা এই রাতে হঠাৎ ওভাবে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলে গেল?

—জানি না।

—আপনার মেয়েরা কোথায়?

—জানি না।

জয়ন্তবাবু বলেন—থাম মহীদা, আর জেরা করে লাভ নেই। আমি বলি- মহিলার কেউই যখন এখানে এখন নেই, তখন সৎকারের ব্যবস্থা আমরাই করি। চাঁদা করে সকলেই কিছু কিছু দিলে···।

বিনয়—তুমি একবার দেখ তো জিতেন, ভদ্রলোকের বিছানার ওপর ওই পঞ্জিকাটার ভেতরে কারও ঠিকানার কাগজ-টাগজ আছে কিনা।

পঞ্জিকা হাতে তুলে নিয়েই জিতেন বলে—আছে। দেবকুমার দত্ত, বসাক বাগান লেন, দমদম। অ্যাঁ! এসব আবার কী লেখা রয়েছে: যদি খবর পাও তবে অবশ্যই তুমি একবার আসিবে, দেবু। অনুরোধ, তুমি আমাকে লইয়া গিয়া রাধানাথের চোখের কাছে কদমকুঞ্জের ছায়াতে রাখিয়া দিবে।

জয়ন্তবাবু—বাঃ, চমৎকার। এ যে খুব ধার্মিক মানুষের কথা বলে মনে হচ্ছে।

মহীতোষ বলেন—এঁদের আর-একজন কুটুম্ব আছেন, যাঁর গাড়ি এ-বাড়িতে প্রায়ই আসতো।

জয়ন্তবাবু—কে?

মহীতোষ—যাদবপুরের কমল সেন।

বিনয় হাসে—বলুন, কমল দালাল।

জয়ন্তবাবু—তবে আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি এখনই ফোন করে কমলবাবুকে চলে আসতে বল। আর, আমারই গাড়ি নিয়ে বসাক বাগান চলে যাও। কুইক। দেরি করো না।

বিনয়ের পায়ের শব্দ দুড়দাড় করে বাজতে বাজতে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যায়।

ভোর হয়ে এসেছে। পড়ো বাড়ির আঙিনার নিম গাছে ঘুমভাঙা কাক আস্তে আস্তে একটা ডাক ছেড়েছে। ডাক্তার এসে মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছেন—হঠাৎ হার্ট ফেল ক'রে মৃত্যু।

পাড়ার মানুষেরা এখন আর উপরতলার ঘরে নয়, নিচের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে যেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি, তেমনই একটা অদ্ভুত ক্লান্তিও বোধ করছেন।

আবার সাড়া জাগে। পর পর দুটো গাড়ি এসে সাত নম্বর বাড়ির স্তব্ধতার কাছে থামতে গিয়ে মিছামিছি গজরাতে থাকে। হ্যাঁ, দেবু দত্ত এসেছে, যাদবপুরের সুধাদি ও তাঁর স্বামী কমল সেনও এসেছেন।

দেবু বলে—সব খরচ আমার, আমিই ওঁকে ওঁর দেশে রায়গঞ্জে নিয়ে যাব। আপনারা শুধু তাড়াতাড়ি একটা লরি যোগাড় করে দিন।

দশ মিনিটের মধ্যে লরি নিয়ে আসে হেম। কে জানে পাড়ার কোন্ ঘুমন্ত বাড়ির বাগান ভেঙে দশ মিনিটের মধ্যে একঝুড়ি টগর নিয়ে আসে বিনয়। আর, অন্নপূর্ণার মা পনর মিনিটের মধ্যে চন্দন আর তুলসীপাতা পাঠিয়ে দিলেন।

—এইবার লরিতে একটা ধোওয়া সাদা চাদর বিছিয়ে দাও। ওরে অন্নপূর্ণা, মা'কে বল একটা সাদা চাদর এখুনি পাঠিয়ে দিক। চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন মহীতোষ।

তারপর আর পাঁচ মিনিটও দেরি নয়। রায়গঞ্জের পঙ্গু লোকনাথের দেহটাকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে এসে লরির উপর তুলে দিল হেম, বিনয় আর জিতেন।

—চলুন। লরির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে কথা বলে দেবু। জয়ন্তবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—আরে আরে, ও কী? থামুন একটু। মহিলাকে আসতে দিন।

দেবু—মহিলা আসবেন না। তাঁর আসবার কোন কথাও নেই।

জয়ন্তবাবু—তার মানে? উনি কি তাহলে এখানেই একা-একা…।

উচ্চকিত শব্দ তুলে, লরিটা যেন জয়ন্তবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটাকে হঠাৎ ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

হাঁক ছাড়েন জয়ন্তবাবু—মহীদা, আমি এবার চলি।

হেম—আমিও যাই।

জিতেন—আমিও।

কিন্তু ও কী, কখন্ নেমে এসেছেন মহিলা? বারান্দার লাগা ঘরের দরজার কাছে বসে কপাটের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখছেন না কিছু; চোখ বন্ধ করে রয়েছেন।

সুধাদির দিকে তাকিয়ে মহীতোষ চেঁচিয়ে ওঠেন—এই যে, আপনি এসেছেন? আপনি তো এ-বাড়ির একজন আত্মীয় মহিলা।

সুধাদি—হ্যাঁ।

মহীতোষ—তবে এতক্ষণ শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কিছু বলছেন না কেন।

সুধাদি—কী বলবো?

মহীতোষ—এই মহিলা কি এখানেই এভাবে পড়ে থাকবেন?

কমল সেনের মুখের দিকে তাকান সুধাদি। কমল সেন তখনই সুধাদির একেধারে কাছে এসে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে-আস্তে ফিসফিস করে কথা বলেন—তোমার রান্নার লোকটা, কী যেন নাম?

সুধাদি—গুরুচরণের মা।

কমল সেন—তিন মাস হলো সে তার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছে, সে কি আর আসবে?

সুধাদি—না। চিঠি লিখেছে তার শরীর একটুও ভাল নয়। আর কাজ করতে পারবে না।

কমল সেন—তবে?

সুধাদি মাথা নাড়েন—হ্যাঁ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে আর ব্যস্তস্বরে ডাক দেন সুধাদি—চলে আয় নীরু। আমার সঙ্গে চল।

উঠে দাঁড়ালেন নীরজা। সুধাদির পিছু-পিছু হেঁটে গাড়ির ভিতরে উঠলেন ও বসলেন।

যাদবপুরের সুধাদির গাড়িটা ছুটে চলে যেতেই মহীতোষ একটা হাঁক ছাড়লেন—এর পর আর কী করবার আছে রে জিতেন?

জিতেন—কিছু না। শুধু ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটাকে বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিন।

কালকেতু

কালকেতু

প্রায় রোজই সন্ধ্যায় যে মোটর গাড়িটা দমদমের এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে একেবারে থেমে যায়, সেটা খুবই চমৎকার ও চকচকে একটা ক্যাডিলাক। ফটকের আলোর আভা লেগে ক্যাডিলাকের বডির পালিশ আরও চকচক করে।

বাড়ির নাম 'নিরঞ্জন', যদিও বাড়ির চেহারাটি অনেক রঙে রঞ্জিত। যাঁরা ভাষার অর্থ টেনে মহিম বসুর এই বাড়ির নামের ভুল ধরেন আর একটু হাসা-হাসিও করেন, তাঁরা জানেন না যে, বাড়ির নামটি মহিম বসুর বাবার নাম। নিরঞ্জন বসু আজ আর বেঁচে নেই। চল্লিশ বছরেরও বেশি হবে, তিনি নানারকমের জ্বরজালায় ভুগে ভুগে, বলতে গেলে একরকমের বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়েছেন। যাবার আগে একমাত্র ছেলে মহিমের জীবনটার জন্ম একমাত্র যে বিষয়-সম্বল রেখে গিয়েছিলেন, সেটা হলো জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছে বন্ধকে বাঁধা একটি গ্রাম্য বাড়ি। বিশ বছর বয়সে নৈহাটির এক জুট-মিলের সাতাশ টাকা মাইনের কেরানী হয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু। চল্লিশ বছর বয়সে নানা রোগের কারণে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যখন কেরানীগিরির কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তখন মাইনে ছিল তেত্রিশ টাকা। তারপর পাঁচ বছর ধরে শূন্য রোজগারের জীবন। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার গ্রামের বাড়ির আশ্রয়ে ফিরে এলেও দুশ্চিন্তার কঠোর প্রশ্নটা একটুও নরম হয়নি। পাঁচটি জীবনের বেঁচে থাকবার আশা কোথায়, আর উপায়ই বা কী? কাজেই অসহায় আর নিরন্ন ভাগ্যটার পেটের খোরাক যোগাবার জন্য বাড়িটাকে বন্ধক দিতে হয়েছিল।

বাড়ি বন্ধক দিয়ে কত টাকা পেয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু? আড়াই হাজার টাকা। এই আড়াই হাজার টাকার একটি পয়সাও তিনি ওষুধ কিনতে খরচ করেননি। ওষুধ কেনবার জন্য বার বার অনেক পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছেন মহিমের মা। বড়ছেলে মহিমও রাগ করে অনেক চেঁচামেচি ও ঝগড়া করেছে। তবু নিরঞ্জন বসুর ওষুধ-বিরোধী প্রতিজ্ঞাটাকে একটুও টলাতে পারেনি। মাত্র দেড় টাকা খরচ করলে শম্ভু কবিরাজের পাচন কিনে আনতে পারা যায়। যে পাচন দিনে দু'বার করে খেলেও সাতটা দিন চলে যায়। কিন্তু না, কিছুতেই না। নিরঞ্জন বসু কোন ওষুধের ছিটেফোঁটাও মুখে দেবেন না।

এইভাবে পাঁচটি বছর চলবার পর, বড়ছেলে মহিমের বয়স যখন সাড়ে-উনিশ বছর, তখন একদিন হঠাৎ দাওয়ার উপর বসে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন নিরঞ্জন বসু। সেই অদ্ভুত হাসির অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠলেন মহিমের মা।—কী হলো?

নিরঞ্জন বসু সেইভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন—সবই ফুরিয়েছে, মাত্র দশ টাকা দশ আনা আছে। দাহ করবার খরচ ওতেই হয়ে যাবে মনে হয়।

কী আশ্চর্য, সেই রাত্রিতে সারা আকাশ ভরে কোটি কোটি তারা যখন হীরের কুচির মতো ঝিকঝিক করছে, তখন খুবই শান্ত ও মৃদুস্বরে মহিমকে নাম ধরে ডাক দিয়েই মরে গেলেন নিরঞ্জন বসু।

সেই নিরঞ্জন বসুর সেই বড়ছেলে মহিমই হলেন আজকের এই মহিম বসু, রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর, যাঁর বাড়ির গ্যারেজের দুটি গাড়ির চেহারা কোন ক্যাডিলাকের চেহারার চেয়ে কম চকচক করে না। মহিম বসুর ছোটভাই ধীরেন বসু এখন লণ্ডনের ডাক্তার; বোন দীপালি এখন মীরাটের ইরিগেশন-ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার গুহ-রায়ের গৃহিণী। দীপালির বিয়ের দু'বছর পরে, মহিমের বিয়ের তিন বছর আগেই মা মরে গেলেন। মহিমের বিয়ের শুভদিনের উৎসবটাকে কল্পনা করে ছেলের বউয়ের সুন্দর একটি মুখও কল্পনা করেছিলেন মা! সেই মুখের শোভার সঙ্গে চমৎকার মানাবে, এরকম লতাফুল ডিজাইন নিজেই ভেবে নিয়ে মুক্তোর একজোড়া দুল গড়িয়ে রেখেছিলেন। ব্যস্, ওই পর্যন্ত, ধীরেনের বউয়ের জন্যও একজোড়া মুক্তোর দুল এখনই গড়িয়ে রাখলে ভাল হয় বলে মনে করে যখন তিনি ডিজাইন ভাবতে শুরু করেছিলেন, তখন বুকের ভিতরের ব্যথাটা বেশ জোরে জোরে টোকা দিয়ে তাঁর নিঃশ্বাসের স্বস্তি ও শান্তি ধড়ফড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। তাই আর সময় পাননি মা। দেয়ালের গায়ে নিরঞ্জন বসুর ছোট্ট পুরনো ফটোর সামনে যে আসনটি সব সময় পাতা থাকে, একদিন তারই উপর বসে অনেকক্ষণ জপ করবার পর শুয়ে পড়লেন মা। ঘুমিয়েও পড়লেন, কিন্তু আর জাগলেন না।

দমদমের এই বাড়ির শুধু চেহারাটা দেখে প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা মহিম বসুকে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাঁরা খুবই ভুল করেন। তাঁরা জানেন না, তাঁদের জানবার কথাও নয় যে, ষাট বছর বয়সের এই মানুষটি, যিনি প্রতিবছর গ্রীষ্মের সময় সিমলাতে চলে যান, আর বাড়িতেও ধুতি-জামার বদলে সাহেবী কেতায় গাউন-প্যাণ্টালুন পরে বসে থাকতে ভালবাসেন, তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের একটি রোগা মানুষের গেঞ্জি-পরা চেহারার ফটোর কাছে দাঁড়িয়ে এখনও মাঝে মাঝে অভিমানী ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ওঠেন আর চোখের জল মোছেন। আর-একটা যে অভিমানের ব্রত মহিম বসুর জীবনে আজও আছে ও চলছে, তার খবর মহিমবাবুর স্ত্রী হেমলতা ছাড়া আর কেউ জানে না। দুধ খান না মহিমবাবু, এমন কী তাঁর চায়েতেও দুধের কোন ছোঁয়াচ থাকে না। এটা হলো সাড়ে-উনিশ বছর বয়সের মহিম বসুর একটি অভিমানের জের। বাবা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন সকালবেলাতে এক বাটি দুধ নিয়ে বাবাকে অনেক সাধাসাধি করেছিল মহিম—কবরেজমশাই বলেছেন, তোমাকে দুধ খেতেই হবে। নিরঞ্জন বলেছিলেন—না রে বাবা, কবরেজ বললেও আমি একটা রাক্ষস হয়ে যেতে পারি না।

—কী বললে?

—বলছি, সামান্য এই দুধটুকু যদি আমিই খেয়ে ফেলি তো ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।

চেঁচিয়ে ওঠে মহিম।—বাজে কথা বলবে না। ভগবান তোমার মত বোকা নয় যে, ক্ষমা করবেন না।

খুব রাগ করে জবাব দিয়েছিলেন নিরঞ্জন বসু।—না। ভগবান বলবেন, তুই বেটা তোর রোগা-রোগা ছেলেমেয়েদের রক্ত খেয়েছিস্।

তারপরেই বেশ শান্ত হয়ে আর মহিমের পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলেছিলেন সেই রুগ্ন আর জীর্ণশীর্ণ মূর্তির মানুষটি—আরে বোকা ছেলে, বুঝিস না কেন? আমিই যদি এই দুধটুকু খেয়ে ফেলি তো দীপু আর ধীরু কি খাবে? দুধটা ওদের দরকার, আমার নয়।

আশে-পাশে যত বাড়ি আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মাথাউঁচু বাড়ি হলো মহিম বসুর এই রঙিন 'নিরঞ্জন'। বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে, এটা বেশ বড় রকমের এক বড়লোকের বাড়ি। প্রতিবেশীদের অনেকের ধারণাতে একটা সন্দেহের প্রশ্নও আছে: এত টাকা কি এমনিতেই কখনও হতে পারে রে, বাবা? বেশ একটু এথি-ওথি না করে, বেপরোয়া হয়ে দু'চারটে দাঁও না মেরে, রাতারাতি পাগড়ী বদল না করে, পাঁচরকমের কারসাজির করিৎকর্মা না হয়ে কেউ কি কখনও টাকার মালিক হতে পেরেছে?

হেমন্তবাবু কিন্তু কিছু খবর রাখেন। তাই শুধু তিনিই পাড়ার পরিচিত ছেলে-দের চাকরীহীন জীবনের বিষাদ ও বিমর্ষতার নিন্দা করে মাঝে মাঝে অনেক উৎসাহের কথাও বলেন: এই যে মহিম বসু, তিনি যে একদিন কানপুরের এক পাঞ্জাবী ঠিকেদারের কাঠের গোলাতে বিশ টাকা মাইনের মুনশির কাজ করে-ছিলেন, সেকথা কি তোমরা জান? জান না। তাই তোমরা হা-হুতাশ করে ঘুরে বেড়াও। শুধু চেষ্টা খাটুনি আর প্রতিজ্ঞার জোরে, বাধাবিপত্তি আর পরীক্ষার অনেক আঘাত সহ্য করে, লাইন মেরামতের কুলীসর্দারীর অবস্থা থেকে উঠতে উঠতে শেষে একদিন রায়না নদীর ব্রিজের মতো অত বড় একটা ব্রিজ তৈরির কণ্ট্রাক্টর হয়েছিলেন মহিমবাবু। আজ দেখ, যে মহিমবাবু একদিন মহাজনের কাছ থেকে ধার-করা সামান্য টাকার পুঁজি নিয়ে রেলওয়ের ঠিকেদারী কারবার শুরু করেছিলেন, তিনি এখন কী বিরাট একজন ধনী মানুষ। কী সুখের সংসার! রূপে-গুণে শিক্ষায় যেমন তাঁর ছেলেটি, তেমনই তাঁর মেয়েটি, দু'জনেই কত সুন্দর, কত চমৎকার! তোমরা মনে কর: মহিমবাবুর ছেলে ওই বিকাশ শুধু চকচকে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে ছুটোছুটি করে। তোমরা জান না যে ওই বিকাশ মাসের মধ্যে সাতদিন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের ভিতরে নতুন লাইন তৈরির কাজে যখন তাঁবুর ভিতরে থাকে, তখন শুধু শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে একটানা সাতটা দিন পার করে দেয়। রান্না-করা একথালা ডাল-ভাতও কপালে জোটে না। আর, ওই যে মেয়ে, মহিমবাবুর একমাত্র মেয়ে সুপ্রভা, যার পিয়ানোর শব্দ তোমরাও শুনেছো, তার সম্বন্ধে তোমরা বোধহয় শুধু এইটুকু জান যে, সে মেয়ে ফিলসফিতে এম-এ পাস করে এখন শুধু পিয়ানো বাজায়। একবার তোমাদের মাসিমাকে জিজ্ঞাসা

করবে, তবেই জানতে পারবে, সুপ্রভা তোমাদের পাড়ার ওইসব গীতা আর মিতাদের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি কাজের মেয়ে। রান্নার লোক থাকলেও বাড়ির দু'বেলার জলখাবার নিজের হাতে তৈরি করে সুপ্রভা। উচ্ছের সুক্তো থেকে শুরু করে দোগোস্তা কারি আর বিরিয়ানি-পোলাও পর্যন্ত সবই রান্না করতে জানে, পারে, আর করেও থাকে ওই পিয়ানো-বাজানো মেয়ে। তোমাদের মাসিমা নিজের চোখে দেখেছেন, প্রায় বিশরকমের আচার ও মোরব্বা তৈরি করে আর বয়ম-ভরতি করে আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছে সুপ্রভা। মহিমবাবুকে যে শাল গায়ে জড়িয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তোমরা দেখতে পাও, সেই শালের ওপর রেশমীসুতোর নকশাগুলি সুপ্রভারই হাতের কাজ। আর দু'মাস ধরে প্রায় রোজই যে চমৎকার একটি ক্যাডিলাক মহিমবাবুর বাড়ির ফটকে এসে থামে, সেটা যে…।

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন হেমন্তবাবু। ছেলেদের সঙ্গে ওই চমৎকার ক্যাডিলাকের কথা আলোচনা না করলেও চলে, না করাই উচিত।

ওই ক্যাডিলাক রোজই সন্ধ্যায় কোথা থেকে আর কতদূর থেকে এখানে আসে আর চলে যায়, সেটা অবশ্য প্রতিবেশীদের কেউই জানেন না। শুধু হেমন্তবাবু জানেন যে, বালিগঞ্জ থেকে আসে। কোন্ বাড়ির গাড়ি, কাদের গাড়ি, তাও তিনি জানেন। কিন্তু কারও কি বুঝতে কিছু বাকি আছে? সকলেই বুঝেছে, মহিম বসুর মেয়ে সুপ্রভার ভালোবাসার টানে গাড়িটা আসে। গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে আসে যে, যার বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বলে মনে হয়, তার নাম কেউই জানে না, হেমন্তবাবু অবশ্য জানেন। তাকে যেদিন প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালা, সেদিন তিনি বেশ বিগলিতস্বরে তাঁর বিস্ময়ের কথাটা বলেই ফেলেছিলেন।—এ যে সত্যিই একটি রূপকুমার।

নিজেরই বাড়ির ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের সেই দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছিলেন শৈলবালা। বিকালবেলা চকচকে একটা গাড়ি এসে মহিমবাবুর 'নিরঞ্জনের' ফটকের কাছে থেমেছে, একজন বিধবা মহিলা গাড়ি থেকে নামছেন। খুব হাসি-খুশি দুটি চোখ, বেশ সুদর্শন একটি ছেলেও গাড়ি থেকে নামলো। মহিমবাবুর স্ত্রী হেমলতা এগিয়ে এসে মহিলাকে প্রণাম করতেই হেমলতাকে জড়িয়ে ধরলেন সেই বিধবা মহিলা।

এরা কি মহিমবাবুর কুটুম্ব? কিংবা নিতান্ত নিমন্ত্রিত দুটি মানুষ? সেই প্রথম দিনে এরকমের দুটি একটি প্রশ্ন হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালার মনে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু আজ আর ওরকমের কোন প্রশ্ন নেই। আজ শুধু প্রশ্ন, বিয়েটা কবে হবে?

বিয়ে এখনও হয়নি, শুধু মেলামেশা চলছে, এরকমের একেলে অতিরুচির কাণ্ড-কারখানা যাঁর চোখে ঘোর অনাচার বলে বোধ হয়ে থাকে, তিনিও অর্থাৎ চারু ডাক্তারের মা'ও চকচকে ক্যাডিলাকের দিকে রাগের চোখ নিয়ে তাকাতে

পারেন না। তিনি বলেন, সুপ্রভার মতো মেয়ের সঙ্গে এরকমের সুন্দর ছেলেকে যে খুবই ভাল মানায়, সেটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ? তুমিও না, আমিও না।

দমদমের মহিম বসুর মেয়ে সুপ্রভার সঙ্গে বালিগঞ্জের চমৎকার ছেলে সন্দীপ রায়ের মেলামেশা আর কথাবার্তার যে আনন্দ এই 'নিরঞ্জন'-এর ড্রইং-রুমের ভিতরে রোজ সন্ধ্যায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, সে আনন্দ সৌভাগ্যের আকস্মিক দান বলে মনে করেন মহিমবাবু, মনে করেন হেমলতা। সুপ্রভার দাদা বিকাশও তাই মনে করে। সন্দীপের বাবা মাধব রায় আজ আর বেঁচে নেই। তিনি বিগত হয়েছেন আজ থেকে প্রায় ন'বছর আগে। মাধব রায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা করুণ ছবির মতো এখনও মাঝে মাঝে মহিমবাবুর মনের ভিতরে ভেসে ওঠে।

মাধব রায় নিজের গুণে ও কৃতিত্বে একটা দুঃস্থ লোন অফিসকে বিশ বৎসরের মধ্যে সুস্থ ও সম্পন্ন করে বিপুল আমানতের যে ব্যাঙ্কটি গড়ে তুলেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কেরই অফিস থেকে একদিন টেলিফোনে মহিমবাবুকে তিনি ডেকেছিলেন— 'আপনি আজ বিকেলের মধ্যে একটু সময় করে নিয়ে আমার অফিসে একবার আসুন। সামান্য পরিচয়ের জোরেই এত বড় একটা অনুরোধ করে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না। আপনার কাছে আমি কাজ-কারবারের কথা বলবো না, টাকা-পয়সার কথাও বলবো না। আমি আপনার কাছে শুধু আমার একটা আশার কথা বলবো।' ব্যাঙ্কের অফিসে মাধব রায়ের চেম্বারে ঢুকেই দেখতে পেয়েছিলেন মহিমবাবু, টেবিলের উপর নীরব ও নিস্পন্দ মাধব রায়কে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার এসে দুঃখিতস্বরে বললেন, প্রাণ নেই।

মহিমবাবু সেদিনও হেমলতার কাছে পূর্বস্মৃতির নানা কথা বলতে গিয়ে মাধব রায়ের কথাও বলেছেন—আমার ষাট বছরের জীবনে আমি সন্দীপের বাবা মাধব রায়ের মতো সৎ ও সজ্জন মানুষ খুব কমই দেখেছি। আমি এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, মাধব রায় তাঁর কোন্ আশার কী কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলেন ?

সন্দীপের মা চারুশীলাও হেমলতার কাছে নিতান্ত অজানা কোন নতুন মানুষ নন। হেমলতা যখন বেথুনে আই-এ পড়তেন, চারুদি তখন বি-এ পড়তেন। কী সুন্দর গান গাইতেন চারুদি। কিন্তু সেজন্য চারুদির মেজাজে সামান্য একটুও অহংকার ছিল না। বললেই গান শুনিয়ে দিতেন।

এই তো সেদিন, বেলুড়ের উৎসব দেখতে গিয়ে চারুদির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সৌভাগ্যের কোন ইঙ্গিত না থাকলে এক যুগ আগের দেখা ও চেনা চারুদিকে আবার হঠাৎ দেখতে পাওয়া যাবে কেন ? শুনে আশ্চর্য হলেন আর খুশি হয়ে বললেন চারুদি—তুমিই মহিমবাবুর গৃহলক্ষ্মী ?

হেমলতা বলেন—আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলের বিয়ে হয়নি, মেয়েরও বিয়ে হয়নি।

চারুশীলার দুই চোখ যেন হঠাৎ-আলোর আভা লেগে হেসে ওঠে।—মেয়ে নিশ্চয় তোমার মতো সুন্দর?

হেমলতা—আপনার মতো সুন্দর নয়।

চারুদির হাত ধরে অনুরোধ করেছিলেন হেমলতা—কথা দিন, আমাদের বাড়িতে একদিন আসবেন। তবে বিশ্বাস করবো যে, আপনি সত্যিই আমাদের সেই চারুদি।

কথা দিয়েছিলেন চারুশীলা। আর, বোধহয় সেই কথারই মান রাখবার জন্য দু'দিন পরে এবাড়িতে এসে হেমলতাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু সুপ্রভার মুখের দিকে তাকাতেই তাঁর খুশি-চোখের দৃষ্টিটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন তাঁর মনের ভিতরে একটা প্রশ্নের গুঞ্জন শুনছিলেন—এ কী সত্যিই একটা সৌভাগ্যের ইঙ্গিত?

চারুশীলা বলেছিলেন—আমি তো আর গাইতে পারি না, হেম। আমি বরং তোমার মেয়ের গান শুনবো।

'তোমারই রাগিনী জীবনকুঞ্জে', সুপ্রভার গান শুনে খুব খুশি হলেন চারুশীলা—তোমার কি মনে পড়ে হেম, শকুন্তলাদির কেয়ারওয়েল সভাতে আমি এই গানটি গেয়েছিলাম।

হেমলতা—খুব মনে পড়ে।

সন্দীপকে দেখে হেমলতার চোখের বিস্ময়টাও কিছু কম নিবিড় হয়ে ওঠেনি। সুপ্রভার জন্য এইরকম একটি পাত্রই তো আশা করেন হেমলতা। মহিমবাবুর মনেও নিশ্চয় এইরকম আশার গুঞ্জন জেগেছিল, নইলে তিনি কেন সন্দীপের হাত ধরে বাগানের গাছপালার কাছে ঘুরে বেড়িয়ে এত গল্প করলেন?

সন্দীপের মুখের দিকে না তাকিয়ে, সন্দীপের দু'চারটে কথার জবাব দিতে গিয়ে সুপ্রভার মুখটা বার বার লালচে হয়ে উঠেছিল। সেদিন স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে না পারলেও, আজ খুবই স্পষ্ট করে বুঝতে পারে সুপ্রভা, তার আশার লজ্জাটাই সেদিন ধরা পড়ে যাবার ভয়ে শিউরে উঠেছিল।

পরের দিন সন্ধ্যা হতেই সন্দীপের ক্যাডিলাক যখন এসে বাড়ির গেটের কাছে থেমেছিল, তখন সুপ্রভার ভীরু আশার বুকটা আর-একবার শিউরে উঠেছিল। কী আশ্চর্য! সত্যিই তো, সন্দীপবাবু এসেছেন। কেন এসেছেন? বাবার সঙ্গে ব্যাঙ্কের অবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য? চারু-মাসিমার কাছ থেকে নেমন্তন্নের কোন চিঠি নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক? বাবা আর মা, দু'জনের কেউই তো এখন বাড়িতে নেই। কী বিপদ, কে এখন সন্দীপবাবুর সঙ্গে কথা বলবে?

কিন্তু বিপদ কাটাবার তো কোন উপায় নেই। লজ্জা-ভীরু প্রাণটাকে একটু সাহসী করে নিয়ে আর হেসে হেসে এগিয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ায় সুপ্রভা।—আসুন, কিন্তু মাসিমা এলেন না কেন?

সন্দীপ হেসে ফেলে—আপনার মাসিমার তো আসবার কোন কথা ছিল না।

সুপ্রভাও হেসে ফেলে—আপনারও আসবার কোন কথা ছিল না।

—না, কিন্তু না এসে পারলাম না। আসতে বাধ্য হলাম।

—কেন?

—তোমাকে আর-একবার দেখবার জন্য।

চমকে ওঠে সুপ্রভা। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। কোন কথা আর বলতে পারে না সুপ্রভা। একটা বোবা মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্দীপ হাসে।—ড্রইং-রুমের ভিতরে কি আমার প্রবেশ নিষেধ?

—না না, সে কী কথা? আপনি ভুল বুঝবেন না। বদ্ধ নিঃশ্বাসটাকে মুক্ত করে দিয়ে কথা বলে সুপ্রভা।

ড্রইং-রুমের ভিতরে ঢুকেও দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। কোচের উপর বসে না। সুপ্রভা বলে—বসুন।

সন্দীপকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুপ্রভা হাসতে চেষ্টা করে।—অন্তত ততক্ষণ বসুন, যতক্ষণ না আমি চা নিয়ে আসি।

সন্দীপ—ভাল কথা, বসছি।

চা নিয়ে আসে সুপ্রভা। চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ—তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, যদি ভাল না লাগে, তবে এখনই বলে দাও সুপ্রভা।

সুপ্রভা—কী বললেন?

সন্দীপ—তুমি যদি মনে কর যে, আমার আর আসা উচিত নয়, তবে আমি কোনদিনও আসবো না।

সুপ্রভা—সে কথা আমি বলতে পারি না। আমি বরং বলবো যে…।

সন্দীপ—বল।

সুপ্রভা—আপনি যদি মনে করেন যে, এখানে আপনার আসা উচিত, তবে আসবেন।

সন্দীপ—আমি তো মনে করি আসা উচিত।

সুপ্রভা আবার মাথা হেঁট করে, কার্পেটের নকশার ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে কথা বলে—তবে আসবেন।

—তোমার আপত্তি নেই?

—না।

সেদিন সন্দীপ চলে যাবার পর ড্রইং-রুমের দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে, অনেকক্ষণ এক-ঠাঁই দাঁড়িয়ে যেন মনের ভিতরের একটা উতলা আবেগের ভার সহ্য করবার চেষ্টা করেছিল সুপ্রভা। বুঝতে তো কিছু আর বাকি নেই, কেন এখানে আসতে চায় সন্দীপ। আর সুপ্রভাকে দেখবার জন্য সন্দীপের ইচ্ছাটাই বা এত আকুল হয়ে উঠেছে কেন? আর বেশি প্রশ্ন না করে ভালই করেছে সুপ্রভা। কুয়াসা সরে গিয়েছে, ভোরের আকাশের আলো বেশ স্পষ্ট করে

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে আর কিসের প্রশ্ন।

ভদ্রলোক বোধহয় কিছু রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারেন না। ভদ্রলোকের ইচ্ছার ভাষাটা বড় বেশি স্পষ্ট। হলোই বা, সেজন্য এত চমকে ওঠবার কোন মানে হয় না। ভালবাসার প্রাণ অনেক হিসেব করে, অনেক দেরি করে আর রেখে-ঢেকে কথা বলবে, এরকম কোন নিয়ম আছে কি? সবারই জীবনেরই সাধ-অসাধ কি একই নিয়মে চলে?

গল্প শুনেছে সুপ্রভা, ব্যাধের বাঁশীর শব্দ শুনে বনের হরিণ মুগ্ধ হয় আর ছুটে আসে। কিন্তু সন্দীপের কথাগুলিকে ব্যাধের বাঁশীর শব্দ বলে সন্দেহ করবার তো কোন মানে হয় না। সন্দীপ যে-ঘরের ছেলে, সে-ঘর মাধব রায়ের মতো সৎ ও সজ্জন মানুষের স্মৃতি দিয়ে আর চারু মাসিমার মত মানুষের সরল মনের মায়া দিয়ে তৈরি-করা ঘর। বাবা আর মা যে তাঁদের মেয়ের জীবনের জন্য এইরকম একটি ঘর পছন্দ করেন, সেটা বাবা আর মার কথাবার্তার ভাষাতে বার বার অনেকবার শুনতে পেয়েছে সুপ্রভা। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে বাবা আর মার চোখে খুশির উচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পেরেছে সুপ্রভা, সন্দীপকে তাঁরা পছন্দ করেই ফেলেছেন।

নিজের ইচ্ছাটাকেও কি চিনতে আর বুঝতে কিছু বাকি আছে? না, একটুও না। সেদিনই, প্রথম দেখার দিনেই মনে হয়েছিল সুপ্রভার: এইরকম একটি মানুষ যদি অন্তত মুখের দুটো কথা দিয়ে সুপ্রভাকে ভালবাসে, তবে সুপ্রভা তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসবার সাহস পেয়ে যাবে। তাই তো হলো। সন্দীপ যে-ভাষায় যতটুকু কথা বলেছে, তাই যথেষ্ট। সুপ্রভার প্রাণটা এখন নির্ভয়ে, নির্ভয়ে কেন, অনেক সাহস নিয়ে সন্দীপকে যদি ভালবাসতে পারে, তবে ভালই হবে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে, তারপর হেসে ফেলে সুপ্রভা। বাবা আর মা ফিরেছেন। ভেলভেটের পর্দাটাকে হাতের দোলায় দুলিয়ে দিয়ে কথা বলে সুপ্রভা।—সন্দীপবাবু এসেছিলেন, এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন।

হেমলতা—কী আশ্চর্য, সন্দীপ সত্যিই তবে এসেছিল।

মহিমবাবু—সন্দীপ একাই এসেছিল?

সুপ্রভা—হ্যাঁ।

হেমলতা—চা খেয়েছে সন্দীপ?

সুপ্রভা—হ্যাঁ।

হেমলতা—চারুদি ভাল আছেন?

সুপ্রভা—সে কথা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

মহিমবাবু হাসেন—জিজ্ঞাসা করতে হয়।

সুপ্রভা—বলে গেলেন, আবার আসবেন।

হেমলতা—আসুক না। ভালই তো। শুধু আমরা কেন, সবাই বলবে, ভালো হলো। কিন্তু তোর কি কোন আপত্তি আছে?

সুপ্রভা—না।

সুপ্রভার পিঠে হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হেমলতা। তারপর সুপ্রভার কপালে একটা চুমো খেলেন।

॥ দুই ॥

ছোট্ট স্প্যানিয়েলের বকলসের ঘুঙুর টুং-টুং করে বাজে। ক্যাডিলাকের হর্নের শব্দ শুনলেই ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে আসে। গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর সন্দীপের আগে-আগে গুট-গুট করে হেঁটে আবার ফিরে আসে, ড্রইং-রুমের ভিতরে ঢোকে। তারপর সুপ্রভার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চলে যায়।

সন্ধ্যা হতেই, আর সন্দীপের এসে পৌঁছবার সময় হবার আগেই, ড্রইং-রুমের ভিতরে এসে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকতে গিয়ে সুপ্রভার মুখে যে-হাসি আর যে-লজ্জার আবেগ ফুটে ওঠে, ছোট্ট স্প্যানিয়েল যেন তারই ছবির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর খুশি হয়ে চলে যায়।

একদিন, দুদিন, পর-পর চারদিন স্প্যানিয়েলের উৎসাহের রকম দেখে আরও লজ্জা পেয়েছিল সুপ্রভা। মুখের ওপর রুমাল চেপে ধরেও সেই লজ্জার হাসিটাকে লুকোতে পারেনি। দেখে ফেলেছিল সন্দীপ। খুব খুশি হয়ে সন্দীপও হেসেছিল। —বাঃ, তোমাদের স্প্যানিয়েলকে বেশ জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু শুধু সেই চারটে দিন, তারপর আর নয়। এই দু'মাসের মধ্যে আর কোন একটি সন্ধ্যাতেও না। ক্যাডিলাকের হর্ন বেজে উঠলেও ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়নি এই স্প্যানিয়েল। একবারও, একটু উঁকি দিয়ে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ।

সন্দীপ জিজ্ঞাসা করেছে—কই, জ্ঞানী ব্যক্তিটি কোথায় গেল? আর দেখতে পাই না কেন?

সুপ্রভা বলেছে—বোধহয় বাবার ঘরের ভিতরে বসে আছে।

সন্দীপের কথার জবাব দিতে গিয়ে আজ যেন বেশ জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। সেই প্রথম দিনে কিন্তু কোন চেষ্টাই করতে হয়নি। স্প্যানিয়েলের কাণ্ড দেখে সেদিন যেন সুপ্রভার জীবনের রঙিন আশার হাসিটা মুক্ত ফোয়ারার মতো স্বচ্ছন্দে উথলে উঠেছিল। কিন্তু আজ…।

সন্দীপ নিশ্চয় ভুলে গিয়েছে, ঠিক কবে আর কখন ড্রইং-রুমের ভিতরে হঠাৎ ঢুকে, আর সুপ্রভার কোলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে সুপ্রভার গম্ভীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো ছোট্ট স্প্যানিয়েল। তারপর সেই যে তিনটে লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল তো চলেই গেল, আর ফিরে এল না। সন্দীপ থাকতে আর কোনদিন ফুর্তির টুং-টুং শব্দ বাজিয়ে ড্রইং-রুমের ভিতরে ঢোকেনি ওই স্প্যানিয়েল।

এই বাড়ির উদার অভ্যর্থনার অতিথি সন্দীপ রায় যে তিন সন্ধ্যে না

সুযোগেই এরকম একটা অদ্ভুত কথা এত স্পষ্ট করে এই বাড়ির মেয়েকে শুনিয়ে দিতে পারে, এ সন্দেহ সুপ্রভার ধারণা-কল্পনার একটা অন্ধকার কোণের মধ্যেও ছিল না।

হঠাৎ বলে উঠেছে সন্দীপ—যাই মনে কর সুপ্রভা, একটা সত্য কথা আমি বেশ স্পষ্ট করে বলে দেব, তোমরা মনে-প্রাণে কিন্তু খুবই সেকেলে মানুষ।

চমকে ওঠে সুপ্রভা, মুখের হাসিটা ফিকে হতে হতে শেষে একেবারেই মিলিয়ে যায়।

কোন কথা বলে না সুপ্রভা। সন্দীপ কিন্তু কথা বলতেই থাকে—ভাল বল আর মন্দ বল, আমি কিন্তু দেহে-মনে-প্রাণে এক আস্ত একেলে।

সুপ্রভার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দীপের সুন্দর মুখের উজ্জ্বল দুটি চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে।—তাই বলে আমাকে একটা রহস্য-মানুষ বলে মনে করো না। আমিও মানুষকে ভালবাসতে পারি। শ্রদ্ধা মায়া মমতা আর কৃতজ্ঞতা, আমারও প্রাণে আছে। কিন্তু সেগুলি আমার নিজের যুক্তি বুদ্ধি বিশ্বাস আর অভিরুচির জিনিস। তোমরা যাকে মায়া বল, আমার মায়া ঠিক সে-রকমটি না হতেও পারে।

মনে আছে সুপ্রভার, তখনই কোথা থেকে ছুটে এসে ছোট্ট স্প্যানিয়েল ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। বেশ কিছুক্ষণ সুপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চলে গেল। তখনো কথা বলেই চলেছে সন্দীপ। হঠাৎ, কী আশ্চর্য, কথা বলতে গিয়ে সন্দীপের গলার স্বর বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে।—এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন সুপ্রভা? কোন কথাও বলছো না কেন? আমার কথাগুলি শুনতে তোমার বোধ হয় খারাপ লাগছে।

সুপ্রভা—বুঝতে পারছি না, আপনি কী বোঝাতে চাইছেন।

সন্দীপ হাসে।—শুধু এইটুকু বোঝাতে চাইছি যে তুমি ভুল করে আমাকে যেন ভুল বুঝে না ফেল।

—একথা আপনার মনে হলো কেন?

—এটা আমার ঠিক মনের কথা নয়, সুপ্রভা, এটা আমার মনের একটা ভয়ের কথা। আমার ভয়, তুমি হয়তো আমাকে ভুল বুঝে ফেলবে, বুঝতে ভুল করবে, আর সন্দেহ করবে যে, সন্দীপ রায় বোধহয় একটা খুব অদ্ভুত মানুষ, কিংবা একটা হামবাগ।

সুপ্রভা—না, আমি ওরকম সন্দেহ করি না।

সন্দীপ—ব্যস, তোমার এই সামান্য একটু অঙ্গীকারই আমার কাছে যথেষ্ট। আমার আশা ছিল, তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনটা তোমার কাছ থেকে সেই সান্ত্বনা পেয়ে যাবে, নিশ্চয় পাবে; যে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য ঘুমের মধ্যে আমার স্বপ্নও ছটফট করে।

কথা থামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। সুপ্রভা বলে—একটু বসুন।

এখনই যাবেন না। আমি চা নিয়ে আসি।

—না। চায়ের জন্য আমি এখন তেমন-কিছু তৃষ্ণার্ত নই। আমাকে এখনই যেতে হবে চক্রবর্তীর আর্ট-এগজিবিশন দেখতে। আমি এখন একটু মিষ্টি চিত্র-রসের জন্য তৃষ্ণার্ত।

সুপ্রভা—আসুন তবে।

সন্দীপ—আসুন বলো না। বল, চলুন।

সুপ্রভা—ঠিক বুঝতে পারছি না, কী বলছেন।

সন্দীপ—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

সুপ্রভা—না।

সন্দীপ—কেন?

—না, তা হয় না।

—ছবি দেখতে কি তোমার ভাল লাগে না?

—ভাল লাগে বৈকি।

—তবে আপত্তি করছো কেন!

সন্দীপের প্রশ্নের উত্তর দেয় না সুপ্রভা। হেসে ফেলে সন্দীপ।—এইবার বুঝতে পারছো, কেন আমি বলেছি যে, তোমরা মনে-প্রাণে সেকেলে, যদিও তোমাদের বাড়ির দোতলার ঘরে একটা পিয়ানো আছে।

সুপ্রভা—শুধু আছে বলছেন কেন? পিয়ানোটা বাজেও তো।

—হ্যাঁ জানি, সে পিয়ানো তুমিই বাজাও। কিন্তু কী সুর বাজাও? নারদ মুনির তৈরি যত বিটকেলেমির রামকেলি আর টোড়ি কিংবা নোটন-নোটন-পায়রাগুলি। এই তো।

—আপনি পিয়ানো বাজালে কী সুর বাজাবেন?

—পিয়ানো বাজাতে আমি জানি না। জানলে হয় একটা মুনলাইট-সোনাটা, নয়তো স্ট্রাউসের ব্লু-ডানিউব বাজাতাম।

হেসে ফেলে সুপ্রভা—জানলে খুব ভাল করতেন।

—কিন্তু, তুমি কি সত্যিই আমার সঙ্গে যাবে না?

—না।

—কেন?

—সেটা তো আপনি জেনেছেন।

—অ্যাঁ? কী জেনেছি?

—আমরা মনে-প্রাণে সেকেলে।

—হ্যাঁ, কিছু মনে করো না, আমার মনে এরকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি…

কথা থামিয়ে আর গলার রঙিন-টাইয়ের নিখুঁত গেরোটার উপর হাত বুলিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ। ঠিকই, সন্দীপের মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ-জ্যোৎস্নার

ঝলকের 'মতো উথলে উঠেছে, আর চোখদুটোতে নিবিড় এক মায়ার আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। নারী হোক বা পুরুষ হোক, যে-কেউ মানুষ এখন সন্দীপের এই সুহাসিত মুখের ছবিটাকে দেখলে মনে করতে পারে, এই চমৎকার সুন্দর চেহারার মানুষটি তার বুকের ভিতরে বুঝি একটা চাঁদ পুষে রেখেছে। এই মানুষ যদি বনের একটি হরিণ হতো, তবে তার দুই চোখের এই জ্যোৎস্নাময় আবেশের কাছে কোন হরিণী বোধহয় আত্মহারা না হয়ে পারতো না।

সন্দীপ বলে—আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই ডাকছি, চল। একবার মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে চক্রবর্তীর আঁকা ছবির এগজিবিশন দেখে নিয়ে, তারপর সোজা খিদিরপুর ডক। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে, জলের উপর জাহাজের ছায়া পড়ে কী অদ্ভুত ইলিউশন সৃষ্টি করেছে। মনে হবে, ওই জাহাজটা যেন একটা মিথ্যে মায়া, আর ছায়াটাই সত্যিকারের একটা জাহাজ।

দেখতে পায় সন্দীপ, দুই চোখ অপলক করে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সুপ্রভা। আবার হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরায় সন্দীপ, যেন একটা পুলকিত ব্যস্ততার আবেগে ছটফট করে। —চল, আর দেরি করা উচিত নয়। যদি ইচ্ছে কর, তবে তোমার বাবা আর মাকে একটু বলে এসো। আমি বলি, এত বলাবলিরই বা কী দরকার? তুমি তো একটা বাজে অন্ধকারের হাত ধরে আরও বাজে অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি করবার জন্যে যাচ্ছো না। যাচ্ছ, আমার সঙ্গে, আমার হাত ধরে, জীবনের একটা আনন্দ আর আলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে।

সুপ্রভা বলে—না।

সন্দীপ—তুমি তো ফিলসফি নিয়ে এম-এ পাস করেছো।

—হ্যাঁ।

—তবে তোমাদের ইণ্ডিয়ান ফিলসফির কিছু থিওরির কথা নিশ্চয় পড়েছো?

—কিছু কিছু।

—তোমাদের উপনিষদ কি একথা বলে যে, আকাশে যদি আনন্দ না থাকতো, তবে কে আকাশকে চাইতো?

—হ্যাঁ, বলেছে।

—তবে?

—তবে কী?

—তবে, একথাও কি বলা যায় না যে, যদি আকাশের চারিদিকে পাঁচিল থাকতো, তবে আকাশকে কে চাইতো?

—বলা যেতে পারে।

—তবেই বোঝ। জীবনের চারদিকে যদি পাঁচিল থাকতো, তবে জীবনকে কেউ চাইতো না। ঠিক কথা কি না?

—ঠিক কথা বলেই তো মনে হয়।

—তাই বলছি, ঘরের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে নেই। চল, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

—না, তা হয় না।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সন্দীপ। —আচ্ছা। তোমার যখন এতই আপত্তি, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। আমি এখন চলি।

চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়ে সন্দীপ। সিগারেটের ধোঁয়ার একটা ফুরফুরে কুণ্ডলী হেলেদুলে বাতাসে ভাসছে; তারই দিকে তাকিয়ে আর খুব মৃদুস্বরে, যেন নিজেরই মনের কাছে একটা ব্যথার বিস্ময় নিবেদন করে। —আমার নিজের জন্যে নয়, তোমারই জন্যে আমি তোমাকে একটা আনন্দের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

সুপ্রভা কিন্তু একেবারে নীরব আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্দীপও বোধ হয় বুঝতে পারে যে, না, ওই স্তব্ধতা কোন আবেদনের কোন করুণতায় বিচলিত নয়। পিয়ানো-বাজানো এই মেয়েকে সেকেলে ভীরুতার একটি নিরেট মূর্তি বলে মনে হয়। সন্দীপের মতো একেলে অভিরুচির মানুষ, তার ভালবাসার আশার পথে এরকম একটি মূর্তিকে দেখতে পাবে বলে বোধহয় কোনদিনও কল্পনা করেনি। সন্দীপের এতগুলি কথার কোন একটি কথার আবেদনেও কি সাড়া দিল সুপ্রভা? সন্দীপের ইচ্ছা ও চেষ্টায় সব ভাষা, সব চমক আর সব কৌতুক ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তবু, সন্দীপ যেন আজই এই মুহূর্তে সব শূন্য করে দিতে চায় না। তার আশার স্বপ্নটাকে এখনও ধরে রাখতে চায়। সহজে শিথিল ও অলস হয়ে যাবে, এমন ধাতু দিয়ে তৈরি হয়নি সন্দীপের প্রাণ।

সন্দীপ বলে—গ্রীক গল্পের সেই গালাশিয়া জীবন্ত নারী নয়, আইভরির তৈরি একটি নারীমূর্তি, নিতান্ত একটি জড়বস্তু; সেও পিগম্যালিয়নের ব্যাকুল আবেদনের কথায় সাড়া দিয়ে কথা বলেছিল। তুমি কিন্তু আর একটিও কথা বলছো না সুপ্রভা। আমি চলে যাচ্ছি দেখেও কি আমাকে একটি কথা বলবার দরকার তোমার নেই?

সুপ্রভা—কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারছি না, আমি আপনাকে কী কথা বলতে পারি।

সন্দীপ—বেশ তো, আজ এখনই না বলতে পার, কাল বাদে পরশু তো বলতো পারবে? আচ্ছা, আসি এখন।

॥ তিন ॥

দেখে আশ্চর্য হয়েছে সুপ্রভা, নিয়মিতভাবে একটি সন্ধ্যা বাদ দিয়ে ঠিক পরের সন্ধ্যায় বালিগঞ্জের ক্যাডিলাক ঠিক সময়ে এসে ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রভারই ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, সত্য হয়েছে সন্দীপের কথা। সন্দীপ এসেছে।

এই দুমাসের মধ্যে এইভাবে কতবারই তো এসেছে আর চলে গিয়েছে সন্দীপ। কিন্তু ড্রইং-রুমের ভিতরে দু'জনের মেলামেশার যে-কে-সেই অবস্থার বিশেষ কিছু নড়চড় হয়নি। দৃশ্যের মধ্যে নতুন কোন আলো বা ছায়ার সম্পাত ঘটেনি। সন্দীপ অবশ্য অনেক নতুন কথা বলেছে, তার প্রায় সবই একটা স্বপ্নময় আকুলতার কথা। বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেনি সন্দীপ : তুমি দূরে সরে যেতে চাইলেও আমি দূরে সরে যেতে পারবো না। আমি আসবোই, না এসে পারবো না।

শুনে চমকে উঠেছে সুপ্রভা। নীরব আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারলেও, সুপ্রভার বুকের ভিতরে যেন একটা ভয়ের ছায়া চমকে ওঠে। মা আর বাবা, দু'জনের কেউই এখনও জানেন না যে, সন্দীপ রায়ের জন্য তাঁদের মেয়ের মনে এখন কোন অভ্যর্থনার ছিটেফোঁটাও আর নেই। তাঁরা এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের প্রাণের বাতাসের মধ্যে উৎসবের শঙ্খধ্বনি শুনছেন।

বিশ্বাস ছিল সুপ্রভার, সন্দীপ আর আসবে না। একটা স্তব্ধ ও নিরেট লোহার কপাটের উপর শতবার মাথা ঠুকলেও সেই কপাট যে কখনও খুলবে না, এই সত্যটুকু কি জানেন না, কিংবা বুঝতে পারেন না এমন একজন মডার্নিস্ট জ্ঞানী, যাঁর নাম সন্দীপ রায়? ধারণা হয়েছিল সুপ্রভার, বুঝতে পেরেছেন ভদ্রলোক, বেশি কথা না বললেও সুপ্রভা তার আপত্তি আর অনিচ্ছার 'না' কথাটাকে খুবই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। তবে আর কেন? প্রত্যাখ্যানের পর আবার এসে অনুরোধ করলে যে মাথা নিচু করা হয়, নিজেকেই অপমান করা হয়, এই বোধটুকুও কি ভদ্রলোকের চিন্তায় আর চরিত্রে নেই?

ভয় হয়, এরকম অদ্ভুত মানুষ, এই সন্দীপ রায় চিরকাল এখানে আসতেই থাকবে। ক্লান্ত হবার কিংবা ক্ষান্ত হবার মতো মানুষ হলে এই কদিনের মধ্যে সুপ্রভার গম্ভীর মুখের আর উদাস চোখ দুটোর নীরব তাড়নায় ভদ্রলোকের মনে এ-বাড়িতে আসবার দুরন্ত উৎসাহ ক্লান্ত কিংবা ক্ষান্ত হয়ে যেত। সন্দীপ রায় যেন তার মনগড়া আমিত্বের একটা ভাষ্য শোনাবার জন্য একজন সহিষ্ণু শ্রোতা খুঁজ-ছিলেন। মহিম বসুর মেয়েকে সেইরকম শ্রোতা বলে মনে করে সন্দীপ রায়। সব কথার মধ্যে শুধু আমি আর আমি। একদিনও আর ভুলেও জিজ্ঞাসা করেনি, তোমার বাবা আর মা কেমন আছেন? এ-বাড়ির মহিম বসু আর হেমলতা বসু যেন সত্তাহীন দুটো ছায়া, দুটো নাম মাত্র। সন্দীপ কোনদিনও বললো না, চল সুপ্রভা উপরতলার ঘরে একবার যাই, তোমার বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তা হলে বলতে পারতো সুপ্রভা, আপনি বসুন, আমি বাবা আর মাকে ডেকে নিয়ে আসছি। সন্দীপের একেলে সৌজন্যের শাস্ত্রটা বোধহয় মনে করে যে, সুপ্রভা যেন জগৎছাড়া একটা একলা-জীবনের মেয়ে, এই ড্রইং-রুমের ভিতরে বসে শুধু সন্দীপের জন্য অপেক্ষার তপস্যা করছে।

যেমন রোজ, তেমনই আজও জিজ্ঞেস করে সুপ্রভা—চারুমাসিমা কেমন আছেন?

সন্দীপ হাসে।—তোমার অনর্থক জিজ্ঞাসার এই বাঁধা গৎ রোজই কেন শোনাও ?

এরকম অদ্ভুত পাল্টা প্রশ্ন শুনতে হবে, এরকম ভয় সুপ্রভার কল্পনাতে ছিল না। প্রশ্ন শুনে সুপ্রভার মনের গম্ভীরতা হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে মুখর হয়ে ওঠে।—বাঁধা গৎ হতে পারে, তবু তো এটা একটা ভদ্র জিজ্ঞাসা।

—হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু আমি আজ আর আমার জবাবের বাঁধা গৎ তোমাকে শোনাবো না। বলতে পারতাম, যেমন এতদিন বলে এসেছি, তিনি ভাল আছেন; কিন্তু সেকথা না বলে শুধু একটা অনুরোধের কথা বলবো, তুমি আর ওকথা জিজ্ঞাসা করবে না।

—কেন ?

—তোমার চারু-মাসিমা যেমন থাকেন, তেমনই আছেন। এর মধ্যে জিজ্ঞাসা করার কী আছে ?

সুপ্রভা—এরকম কথা আপনার কাছ থেকে শুনতে পাব বলে কল্পনাও করতে পারিনি। পারলে, জিজ্ঞাসা করতাম না।

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমার মা কিংবা বাবার সম্পর্কে তোমার মনে জিজ্ঞাসার কথা থাকলেও আমাকে বলো না।

সুপ্রভা—কেন ?

সন্দীপ—ওঁরা আমার পিতামাতা আর আমি ওঁদের ছেলে, ব্যস্, এছাড়া আমার জীবনের মধ্যে কোন মাধব রায় কিংবা চারুশীলা রায় নেই।

চমকে ওঠে সুপ্রভা। চোখের তারা দুটো ছটফট করে—কিন্তু আপনার বাবার সম্পত্তিটাও কি আপনার জীবনের মধ্যে নেই ?

—আছে। সেজন্য আমি আমার বাবার সম্পত্তির কাছে কৃতজ্ঞ। বাবার কাছে নয়।

—একথার মানে ?

—বাবার কাছ থেকে আমি শুধু টাকাই পেয়েছি, আর কিছু পাইনি।

—আর মার কাছ থেকে ?

—বড়মাসি বলেন, আমি মার চোখ দুটো পেয়েছি।

—আর কিছু পাননি ?

—না, কিছু না। বাবার কাণ্ডজ্ঞান আমি পাইনি, মার ধর্মজ্ঞানও পাইনি। ওঁদের জীবন থেকে আমি কোন শিক্ষাই পাইনি।

—আপনার দুর্ভাগ্য।

—আমার সৌভাগ্য।

—কেন ?

—মাধব রায়ের কাণ্ডজ্ঞান এমনই অদ্ভুত ছিল যে, তিনি তাঁর টাকার বারো আনা ভাগ হাসপাতালে দান করে দিলেন, আর খুব পুণ্যি লাভ করলেন। কিন্তু

হা অদৃষ্ট, সে পুণ্যি এমনই পুণ্যি যে, হার্ট-স্ট্রোক হয়ে ব্যাঙ্কের অফিস ঘরেই মরে যেতে হলো।

সুপ্রভার চোখের চেহারা কত কঠোর হয়ে উঠেছে, সেটা দেখতে পেয়ে আর বুঝতে পেরেও সন্দীপের মুখরতা একটুও মৃদু হয়ে যায় না। বরং আরও উদ্দীপ্ত স্বরে কথা বলে সন্দীপ।—আর, চারুশীলা রায়ের ধর্মজ্ঞান এমনই অদ্ভুত যে তাঁর ঠাকুরঘরের ফুল-বাতাসাকে আমি একটা আবর্জনা বলে মনে করি বলে তিনিও আমার টাকাকে আবর্জনা বলে মনে করেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমার টাকায় কেনা চাল-ডালের একটা দানাও ছোঁবেন না। কোন্নগরে থাকেন তাঁর এক উকিল ভাই, কীর্তন শুনে ভাবাবেশে যিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তাঁরই কাছ থেকে প্রতি মাসে পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে তোমার চারু-মাসিমা তাঁর আতপচাল-মার্কা জীবনযাপন করেন।···কী ? কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও ?

—হ্যাঁ।

—বল।

—চারু-মাসিমা তবে আপনার গাড়িটাকে ছুঁলেন কেন ? তিনি সেদিন তো আপনারই গাড়িতে চড়ে এখানে এসেছিলেন।

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ। গাড়িটা কিন্তু তাঁরই। মাধব রায় ওই গাড়ি তাঁর স্ত্রীর নামে কিনেছিলেন।

—বাড়িটাও কি···।

—হ্যাঁ, ঠিক সন্দেহ করেছো। বাড়িটাও চারুশীলা রায়ের বাড়ি। পুণ্যাত্মা মাধব রায়ের দানের দাপট থেকে রক্ষা পেয়ে সামান্য কয়েক লাখ টাকার শেয়ার আর ডিবেঞ্চার আমার কপালে জুটেছে। বিশ্বের ইতিহাসে মাধব রায়ের উইল হলো দ্বিতীয় ম্যাগনাকার্টা।···ও কী! তুমি হাসছো বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় তোমার মনে হয়েছে যে, লোকটা প্রলাপ বকছে। তা নয়। আমি স্পেডকে স্পেড বলি। বিন্দুকে সিন্ধু বলি না।

গল্প শুনেছিল সুপ্রভা, কোন এক পাগলা পুরুত মঙ্গলঘটের উপর কুলো চাপিয়ে দিয়ে কুলোর পুজো করেছিল—কুলায় নমঃ, কুলায় নমঃ। সুপ্রভার আশার ভাগ্যটাও যেন কুলোচাপা সেই মঙ্গলঘটের মতো মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ভালবাসার ছোঁয়া আছে, এমন একটি কথাও এই ড্রইং-রুমের বাতাসে বেজে উঠলো না। শুধু মতামতের তর্ক আর তর্ক। সেই পাগলা পুরুতের কুলোপুজোর মন্ত্রের মতো যত অবান্তর আর লক্ষ্যভ্রষ্ট মুখরতা। কিন্তু কুলোপুজোর এই মুখরতার শেষ হবে কবে ? সহ্য করবার শক্তি ফুরিয়ে আসছে সুপ্রভার।

সন্দীপ রায়ের স্বপ্নে স্বভাবে ও শখে একেলে কোন্ মহত্ত্বের কী বস্তু আছে, কিছুই বুঝতে পারে না সুপ্রভা। সন্দীপ রায়ই জানে, একেলে বলতে সে কী বোঝে। এটুকু অবশ্য খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে, নিজেকে একেলে বলতে বেশ গর্ব বোধ করেন ভদ্রলোক।

সন্দীপের সব কথার শেষে ওই একটি ভণিতা থাকে, সেটা একবার বলে নিতে কোনদিনও ভুলে যায় না সন্দীপ।—চল, বাইরে যাই, একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়িয়ে আসবার কত না সুন্দর বিচিত্র আর বিমুক্ত জায়গার নাম বলেছে সন্দীপ। ময়দান, রেড-রোড আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সিঁড়ি। মিস সিরাজীর হনি-বার, যেখানে রঙিন-মোমবাতির রঙিন-আলোর কাছে, দোলনা চেয়ারের ভেলভেটের উপর বসে, আর সামান্য একটু চেরি মধু খেলে জীবনটাকে মধুময় বলে মনে হবে। তার চেয়ে ভাল, ডিং-ডং কাফে, যেখানে আলোর ফোয়ারার সঙ্গে আদুড় গায়ের থরথর শিহর মিশিয়ে দিয়ে রূপসী মেয়েরা নাচে, আর প্রিয়দের পাশে প্রিয়ারা বসে মাশরুম-সুপ খায়। সমস্তক্ষণ একটা চমৎকার ঘণ্টাধ্বনির মিউজিক বাজতে থাকে। যে যার মনের কথা মুখ খুলে মনের মানুষটির কাছে বলতে পারে। অন্য কেউ, তৃতীয় কোন একলা অভাজন কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলেও সে-সব কথার কিছুই শুনতে পায় না। ডিং-ডং কাফের বাতাসে শুধু মিউজিক নয়, ম্যাজিকও আছে।

বলতে বলতে যেন একটা ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে যায় সন্দীপের গলার স্বর। অনুরোধ করে সন্দীপ—তুমি একবার দেখবে চল, সুপ্রভা।

প্রাণের এইসব আবেগের কথা শুনে সুপ্রভার বুঝতে কিছু কি আর বাকি আছে, কেমনতর জীবন ভালোবসেন এই ভদ্রলোক? ঘরের বাইরে এইসব আলো ছায়া হাওয়া আর ফোয়ারার কাছে সন্দীপের হাত ধরে আর হেসে-হেসে ছুটো-ছুটি করবে এক সঙ্গিনী, যার প্রাণ কখনও ক্লান্ত হবে না, যার বুকটা কখনও হাঁপাবে না। বার বার ওই একটি দুর্মর অনুরোধের কথা বলে সন্দীপ এ-বাড়ির ভীরু মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, এই হলো একেলে ভালবাসার জীবন। সে জীবনের কাছে ঘরের বাতির আলোর চেয়ে বাইরের আতসবাজির আলোটাই বেশি দরকারের আর বেশি দামের বস্তু।

বেশ তো, সন্দীপ রায় এবার সরে পড়লেই তো পারে। মিছিমিছি তার একেলে অভিরুচির গর্বটাকে এখানে নিয়ে এসে সময় নষ্ট করে কেন? সন্দীপ রায় কি মনে করেছে যে, এইভাবে এসে এসে বিদ্যাবুদ্ধি ও কাল্‌চারের চমক দেখিয়ে, চমৎকার এক কুহক সৃষ্টি করে মহিম বসুর মেয়েকে মুগ্ধ করে ফেলবে? আতস-বাজির আলোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে সুপ্রভার সাবধান প্রাণ?

কিন্তু সুপ্রভা কেন তার চিন্তার মধ্যে এত সব গবেষণা পুষে রেখে আর এত কষ্ট করে সন্দীপ রায়ের এই অসাধ্যসাধনের চেষ্টা সহ্য করছে? আজই তো স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে সুপ্রভা, আপনি এখানে আর আসবেন না।

কী আশ্চর্য, সুপ্রভা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সব কথা খুব গম্ভীর হয়ে আর খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলেও ওই একটি কথা আজও বলে দিতে পারলো না। সন্দীপ এসে পৌঁছবার আগে সুপ্রভার প্রতিজ্ঞার মধ্যে কথাটা বেশ মুখর হয়ে বাজতে থাকে। কিন্তু সন্দীপ চলে যাবার পরেই বুঝতে পারে, কথাটা আজও বলা

হলো না। ভদ্রতার সংস্কারে বাধে, অভ্যাসের নিয়মে বাধে, ভাষাতে আর রুচিতেও বাধে নিশ্চয়—তা না হলে সন্দীপ রায়কে স্পষ্ট কথা বলে এখানে আসতে নিষেধ করে দিতে পারছে না কেন সুপ্রভা? সত্যিই তো, ওরকম একটা কঠোর ভৎর্সনার কথা সুপ্রভার মুখে আসতে পারে না। সন্দীপ রায় নামে এই ভদ্রলোক যাচ্ছেতাই খামখেয়ালের যেমনতর মানুষ হোক না কেন, তার নিজের কাছে তো নিজের একটা সম্মান আছে। নির্বোধ মানুষ ভিখিরীকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু ওরকম নির্বোধের কাণ্ড কি সুপ্রভার মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া, সন্দীপ রায়কে একটা ভিখিরী বলে মনে করা সুপ্রভার মতো মেয়ের কোন অহংকারের সাহসেও সম্ভব নয়।

তবে কি মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিদ্যুতের মতো কোন আশার বিদ্যুৎ সুপ্রভার এই উদাস গম্ভীরতার মধ্যে ধৈর্য ধরে লুকিয়ে রয়েছে? সত্যিই সেদিন বিকেল থেকে আকাশের মেঘ খুব কালো হয়ে ঘনিয়ে উঠেছিল, যদিও মাসটা ফাল্গুন। কিন্তু প্রথম বিদ্যুৎ চমকে উঠলো অনেক পরে, সন্ধ্যাটা যখন বেশ ঘনিয়ে উঠে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন। জানলার কাচের গায়ে বিদ্যুতের ক্ষণচমকের আভা হঠাৎ শিউরে উঠতেই, সুপ্রভার মাথাটা যেন ভয়-পাওয়া লজ্জার আঘাতে ঝুঁকে পড়ে। কারণ, ভয়-পাওয়া এই লজ্জাটা যে একটা গোপন আশার হঠাৎ-বিদ্যুতের চমক। আসুক না সন্দীপ, এসে এসে একদিন তো সত্যিই বলে উঠতে পারে: আমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে তোমার ছুটোছুটি করবার কোন দরকার নেই সুপ্রভা। ওতে কী আর এমন আনন্দ আছে? আজ এখানেই বসে সারা সন্ধ্যাটা তোমার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

বাঃ, কী অদ্ভুত ধৈর্যধরা আশা? রুমাল দিয়ে চোখ মোছে সুপ্রভা। কপালটাকেও এক হাতে শক্ত করে টিপে ধরে। জাগা মনের কাছে ঘুমন্ত মনের আশাটা ধরা পড়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা কষ্টও ছটফট করছে। সাবধান মনের ভিতরে এমন অদ্ভুত ভুল কবে আর কেমন করে ঢুকে পড়েছে, ভগবান জানেন।

উঠে গিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে আকাশ-ভরা অন্ধকারের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। বৃষ্টি পড়ছে। ঝড়ও শুরু হয়েছে। দমকা বাতাসের দাপটে জাপানী চামেলীর লতাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া হয়ে লনের ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে। সন্দীপ বোধহয় আজ আর আসবে না।

ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে সুপ্রভা। দু'মাস আগেও এই ড্রইং-রুমের ভিতরে একলা হয়ে বসে থাকার শান্ত জীবনের কোন সন্ধ্যাতেও সুপ্রভা কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে এরকম একটা জটিল অদৃষ্টের সমস্যা তার চোখের এত কাছে এসে দাঁড়াবে? কী চমৎকার সমস্যা! একজনের আশা, সুপ্রভা একদিন খুশি হয়ে আতসবাজির আলোর কাছে গিয়ে ছুটোছুটি করতে রাজি হয়ে যাবেই যাবে, কোন আপত্তি করবে না। আর-একজনের আশা, সন্দীপ একদিন এসে, ড্রইং-

রুমের এই জয়পুরী বেলোয়ারীবাতির আলোর কাছে বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে, আর উঠতেই চাইবে না। সময়টা যেন দু'জনের দুই আশার লটারির ড্র। বলে ফেলবে সন্দীপ: তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটোছুটি করবার কোন সাধ আমার নেই। এখানে তোমার কাছে এসে বসে থাকতে ভাল লাগছে।

ক্যাডিলাকের হর্নের শব্দ বেজে ওঠে। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে গাড়ির হর্নের শব্দটা যেন একটা মায়াবাঁশির উতলা স্বরের মতো বেজে উঠেছে। সুপ্রভার দুই চোখের তারায় জয়পুরী-বেলোয়ারীবাতির আভাও ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে। আজ আর একটুও গম্ভীর হতে পারে না সুপ্রভা। স্বপ্নময় আশার আবেশ সত্যিই সুপ্রভার এই জাগা চোখের দৃষ্টিটাকে নিবিড় করে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকেই হেসে ওঠে সন্দীপ।—আমি ঝড়-বৃষ্টি একটুও পছন্দ করি না।

সুপ্রভাও হাসে।—ঝড়-বৃষ্টি তো আপনার একটুও ক্ষতি করতে পারেনি।

সন্দীপ—কী বললে?

—আপনি তো গাড়িতে এসেছেন, বৃষ্টিতে ভিজতে তো হয়নি।

—কিন্তু গাড়িটাতে স্পীড দিতে পারিনি, বড়ই অসুবিধে হয়েছে। প্রায় শম্বুকগতির মতো খুবই আস্তে আস্তে আর থেমে-থেমে আসতে হয়েছে।

—বসুন।

—হ্যাঁ, বসবো বটে। এসেছি যখন, তখন কিছুক্ষণ তো বসতেই হবে। তবে বেশিক্ষণ নয়।

—কোন কাজের তাড়া আছে?

—না, একটুও না। আমার কাজের সব তাড়া বিকেলের আগেই ফুরিয়ে যায়। টাকা-পয়সার হিসেবের কোন কাজ আমি সন্ধ্যেবেলা কিংবা রাত্তেরবেলার জন্য রেখে দিই না। অবাধ সন্ধ্যার অবাধ আনন্দ, এ না পেলে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

—আপনার বিরুদ্ধে আমাদের সবারই কিন্তু একটা অভিযোগ আছে।

—অ্যাঁ? অভিযোগ? কী অপরাধ করেছি যে অভিযোগ থাকবে?

—আমাদের এখানে আপনি শুধু এক কাপ চা ছাড়া সামান্য একটু খাবার খেতেও আপত্তি করেছেন। আজ কিন্তু খেতে হবে।

—কী খাওয়াবে? চিংড়ি কাটলেট?

—না, মা আজ নিজের হাতে ক্ষীর-সন্দেশ তৈরি করেছেন। বলেছেন, সন্দীপকে আজ ক্ষীর-সন্দেশ খেতেই হবে।

—মাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। সেকেলে মধুরতার এসব জিনিস খেতে মন্দ নয় বটে, দুঃখের বিষয়, তবু আমি এসব জিনিস খেতে পছন্দ করি না।

—কী খেতে পছন্দ করেন, বলুন।

—যদি বলি, ইংলিশ-স্টেক পছন্দ করি, তবে? তবে ও জিনিস আমাকে

এখনই খাওয়াতে পারবে ?

—পারবো। তবে এই মুহূর্তে নয়, এক ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু বলুন তো, ইংলিশ-স্টেক কি খুব একেলে জিনিস ? আমি তো জানি, রাজা আর্থারের এক রাঁধুনে চাকর প্রথম এই ইংলিশ-স্টেক তৈরি করে রাজার পাতে দিয়েছিল। খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন রাজা আর্থার। সে তো পাঁচশো বছরেরও আগের ব্যাপার।

সন্দীপ—তার মানে···অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে···

সুপ্রভা—আমি বলতে চাই, ইংলিশ-স্টেক বয়সের হিসেবে আমাদের ক্ষীর-সন্দেশের চেয়ে কম বুড়ো আর কম সেকেলে নয়।

—তার মানে, তুমি আজও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।

—যাব না বটে, কিন্তু···।

—কিন্তু আজ নয়, এই তো ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন ?

—ভাল দেখায় না।

—তোমার মনের মধ্যে সেকেলে কূপের একটা মণ্ডুক না থাকলে, তুমি এরকম অদ্ভুত কথা বলতে পারতে না। যাই হোক, আমার কথা শুনে তুমি আজ রাগ করতে পারো, কিন্তু একদিন তোমার ভুল ভাঙবে।

হাতঘড়ির দিকে তাকায় আর উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ।—যা-ই হোক, আজ তোমাদের ক্ষীর-সন্দেশ খেলাম না বলে কিছু মনে করো না। আমি তো আবার আসবোই, না এসে পারবো কেন ? তুমি আমাকে শত ভুল বুঝলেও আমাকে তোমারই কাছে আসতে হবে।···হ্যাঁ, বেশ সুন্দর একটা বিলিতী গল্পের ছবি এসেছে। আমার মনে হয়, গল্পটা শুনলে তোমার এখনি গিয়ে ছবিটা দেখে আসতে ইচ্ছে করবে। গল্পটা শুনবে তো বলি।

—বলুন।

—বিখ্যাত এক ডাক্তারের সঙ্গে পার্কের ভিতরে রোজই ঘুরে বেড়াতো একটি তরুণী। এই তরুণী হলো বিখ্যাত ডাক্তারের বিখ্যাত হাসপাতালের মেজে মোছবার একজন মেড, তার মানে ডাক্তারেরই বেতনভুক্ এক চাকরানী। ডাক্তারের সময় কম, কাজের অন্ত নেই, তাই পার্কের ভিতরে বেড়াবার সময়টুকুর মধ্যেই কিছু কথা বলে ওই মেড-মেয়েটিকে কালকের মত ধোয়া-মোছার কাজের হিসেব বুঝিয়ে দিতেন। ওই পার্কে লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরাও বেড়াতো। ডাক্তারের সঙ্গে মেড-মেয়েটিকে রোজ বেড়াতে দেখে সবারই ধারণা হয়ে গেল যে, মেয়েটি ওই বিখ্যাত ডাক্তারের বাঞ্ছিতা প্রেমিকা। ডাক্তার যেদিন কাজের ডাকে শহরের বাইরে যান, কী আশ্চর্য মেড-মেয়েটি সেদিনও পার্কে একলা বেড়াতে আসে। লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরা তাকে দেখে খুব সৌজন্য আর সম্মানের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে আর হেসে-হেসে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু একদিন ওই মেড-

মেয়েটির কাজের একটা ভয়ানক ভুলের জন্য রুষ্ট হয়ে ডাক্তারমশাই তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। পরদিন পার্কে বেড়াতে এসে ডাক্তার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মেড-মেয়েটি এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি বলছে: আমি চাকরি চাই না, মাইনে চাই না। শুধু আপনার সঙ্গে বেড়াতে চাই। ডাক্তার ভ্রূকুটি করেন—কেন? মেয়েটি বলে, লর্ডদের আর নাইটদের মেয়েরা আমাকে আপনার প্রিয়া মনে করে খুশি হয়েছে আর অভিনন্দন জানিয়েছে। আমি আমার এই সম্মানটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ডাক্তার বললেন—সেটা তো নিতান্ত মিথ্যে সম্মান, ওদের একটা ভুল ধারণার দেওয়া সম্মান। মেয়েটি বললে—আমার জীবনে ওই ভুল সম্মান তো কোন নির্ভুল সম্মানের চেয়ে কম সত্য নয়। ওদের ভুল ধারণার সঙ্গে যে আমার জীবনের আনন্দ বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

—তারপর কী হলো?

—ডাক্তার এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। বেশ দুঃখিত হয়ে আর চোখের জল মুছে মেয়েটি চলে গেল। সেদিন চলে গেল বটে, কিন্তু একদিন ফিরে এসে ভয়ানক প্রতিশোধ নিল।

—প্রতিশোধ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার পার্কে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আর মেঝে মোছবার বুরুশ হাতে নিয়ে মেয়েটি সেই ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়ালো। চমকে উঠলো লর্ডদের ও নাইটদের পার্কচারিণী মেয়েরা। ছি, ছি, এই ডাক্তার যে একটা চাকরানীর সঙ্গে প্রেম করেছে! সবাই ডাক্তারের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়। ডাক্তারের সম্মান চুলোয় গেল।—গল্পটার আসল তত্ত্বটা বুঝতে পারছো তো?

সুপ্রভা—না।

সন্দীপ—বাইরের সত্যটাই জীবনের আসল সত্য, ভিতরে যত মিথ্যে থাকুক না কেন।

—তার মানে?

—তার মানে লোকে যদি মনে করে যে তুমি একজন মস্তবড় বিদুষী, তবেই তুমি সত্যিকারের একজন বিদুষী—তোমার মনের ভিতরে সামান্য অ-আ-ক-খ থাকুক বা না-থাকুক। আর, আমার পেটের ভিতরে দশটা প্লেটো আর অ্যারিস্ট-টলের পাণ্ডিত্য গিজগিজ করলেও লোকে যদি সেটা দেখতে না পায়, তবে আমি কিসের পণ্ডিত? লোকে তো আমাকে গণ্ডমূর্খ বলেই জানবে। তাই বলছিলাম…।

আবার ব্যস্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ, বেশ ব্যস্ত স্বরে কথা বলে। —তাই বলছিলাম, মানুষের ভালবাসার জীবনও এই নিয়মে চলে। লোকে যদি জানে, দেখে, দেখে খুশি হয় আর মনে করে যে, অমুক শ্রীমান ও অমুক শ্রীমতীর মধ্যে ভালবাসা হয়েছে, তবে—তবে তার চেয়ে বেশি আর-কিছু হলো না বলে একেবারে অখুশি হবার তো কোন কারণ থাকতে পারে না।

কথার আবেগ হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে সুপ্রভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। বোধহয় হঠাৎ চোখে পড়েছে সন্দীপের, সুপ্রভার চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছে।

ঠিকই দেখেছে আর বুঝেছে সন্দীপ। ভয় পেয়েছে সুপ্রভা। এইবার স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে, কী চায় সন্দীপ। সন্দীপের একেলে জীবনতত্ত্বের সারকথার নিদারুণ শব্দটা এতদিনে স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল।

সন্দীপ বলে—আমার ভয় হয়, আমার কথাগুলি তুমি ভুল বুঝে আমাকেও ভুল বুঝবে।

সুপ্রভা বলে—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করবো না। কিন্তু আপনি নিজেই একদিন ঠিক বুঝবেন যে, আপনি আজ অনেক ভুল কথা বলে ফেলেছেন।

হাসতে থাকে সন্দীপ।—বেশ তো, যদি আজ বুঝিয়ে দিতে পার যে, আমি ভুল কথা বলেছি, তবে তো ভালই হয়। তোমার ভাল, আর আমারও ভাল... আচ্ছা, আজ তবে চলি।

সুপ্রভা—আসুন।

সন্দীপ—কাল কিন্তু আমি তোমার কোন আপত্তির কথা শুনবো না। আমি আজই ফোন করে হাউসের বক্স রিজার্ভ করে রাখবো। তোমাকে যেতেই হবে, ছবিটাকে একবার দেখতেই হবে।

বৃষ্টি নেই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখে একটা ঝাপসা দৃশ্য দেখতে থাকে সুপ্রভা। চলে যাচ্ছে সন্দীপ। একটা আশাহত শূন্যতার মধ্যে সুপ্রভার আত্মাটাকে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সন্দীপ রায়। যাক্, আবার তো আসবে।

॥ চার ॥

দমদমের রঙিন 'নিরঞ্জন'-এর লনের পাশে জাপানী চামেলীর লতা সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসে যখন দুলতে শুরু করেছে, আর ড্রইং-রুমের একটি কোচের উপর বসে একমনে একটা তার-ছেঁড়া গীটারের নতুন তার বাঁধছে সুপ্রভা, তখন দমদম থেকে অনেক দূরে কালীঘাটের এক ক্লাবের গানের জলসাতে গান শুনছে সন্দীপ রায়। সন্দীপের পাশের চেয়ারে বসে গান শুনছে এক তরুণী, রাসেল স্ট্রীটের মিস ডি'-সিলভার বিউটি সেলুনে প্রায় রোজই গিয়ে হেয়ার-ডু সেরে আসে কালীঘাটের যে মেয়ে, যার নাম সিপ্রা। ইস্পাতের প্লেট দিয়ে তৈরি দুটো বিরাট আকারের ইংরেজী হরফ, দুটো 'টি' পাশাপাশি বসানো আছে যে বাড়ির পোর্টিকোর মাথার উপর, সেটা ট্র্যাক্টর ট্রেডার্স-এর মালিক অনাথ চৌধুরীর বাড়ি। এই অনাথ চৌধুরীর মেয়ে সিপ্রা চৌধুরী। আজ সিপ্রা চৌধুরীর মাথাতে যে খোঁপা দেখা যাচ্ছে, সেটার নাম শাহাজাদী খোঁপা। কাল ছিল একটা গেইশা খোঁপা, পরশু দিন ছিল লায়লা খোঁপা।

জলসার আসরের ওদিকে একদল ছেলে মুখ টিপে-টিপে হাসে আর ফিসফিস

স্বরে বলাবলি করে: উনি তো ওঁর খোঁপা দেখাবার জন্য গানের জলসাতে এসেছেন। উনি গানের ধার ধারেন না। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ আবার ওঁর খোঁপা দেখবার জন্য গানের জলসাতে আসেন।

এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন—আস্তে। বড় গণ্ডগোল হচ্ছে।

ছেলের দল আরও আস্তে, আরও চাপা স্বরে কথা বলাবলি করে: ওই যে, যে ভদ্রলোক এখন সিপ্রা চৌধুরীর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে কথা বলছেন, তিনি তো পরশু দিন এই জলসাতে এসে সিপ্রা চৌধুরীর খোঁপার দিকে তাকালেন আর গলে গেলেন।

একটু বেশি রস করে কথাগুলি বললেও ফিসফিসে স্বভাবের ওই ছেলের দল মিথ্যে কিছু বলেনি, খুব বাড়িয়েও বলেনি। ক্লাবের অনেক অনুরোধের চাপে পড়ে শেষে রাজী হয়েছিলেন সন্দীপ রায়, মাত্র সাতটার সময় দশ মিনিটের জন্য এসে জলসার শুধু উদ্বোধন করে দিয়েই সে চলে যাবে। এরকম গানের তীর্থে ধৈর্যের কাকের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে সে পারবে না। সময়ও নেই, রুচিও নেই।

জলসার উদ্বোধনের কাজটা সেরে দিয়ে, অর্থাৎ প্রকাণ্ড একটা পিতলের পিল-সুজের দশটা পলতে জ্বালিয়ে দিয়ে, আসরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, একটু হেসে আর আবছা নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে যখন চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সন্দীপ, তখন এই সিপ্রা চৌধুরী এগিয়ে গিয়ে সন্দীপের কাছে দাঁড়িয়েছিল আর হেসেছিল। সন্দীপ বলেছিল—আপনি বোধহয় আমাকে কোন কথা বলতে চান।

সিপ্রা—হ্যাঁ। আমি এই ক্লাবের মিউজিক-সেকশনের সেক্রেটারি সিপ্রা চৌধুরী।

উৎফুল্ল হয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ।—বাঃ, আপনার খুব সাহস আছে বলে মনে হচ্ছে।

—একথা কেন বলছেন ?

—নইলে এরকম একটা সাংঘাতিক কর্তব্যের সেক্রেটারি হতে পারবেন কেন ?

—না, একটুও সাংঘাতিক কর্তব্য নয়। যা কিছু দরকার হয়, সবই হরেনদা করেন। আমি শুধু নামেই সেক্রেটারি।

—আপনি ভাল গাইতে পারেন নিশ্চয় ?

—না, না, গান-টান আমার আসে না। সবাই অবশ্য মনে করে যে, আমি খুব ভাল গাইতে পারি, গানও ভাল বুঝি।

—এরকম শখের সেক্রেটারি হবার শখ ছাড়া আর কোন শখ নেই ?

—না, একটুও না।

—আমি তো মুক্তচোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আছে।

—সে কী। কী আশ্চর্য। কী দেখতে পাচ্ছেন ?

—আপনার চমৎকার খোঁপার শখ আছে।

হেসে হাঁপ ছাড়ে সিপ্রা।—তাই বলুন। হ্যাঁ, খোঁপার শখ আছে।

সন্দীপ—ভাল শখ। আপনার সুরুচির প্রশংসা করতে হয়।

সিপ্রা—কিন্তু বড়পিসি তো একটুও প্রশংসা করেন না। বকে বকে কিছু আর রাখেন না।

—বড়পিসিরা ওরকম বকাবকি করবেনই। তাঁরা হলেন বিঁড়ে-খোঁপার সেই যুগের, খুব বিদ্‌ঘুটে না হোক বেশ ঘুটঘুটে সেই যুগের মানুষ।

—আমিও বড়পিসিকে প্রায় এরকম কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু শুনিয়ে দিলেই বা কী হবে? রেহাই নেই। বড়পিসি বকতেই থাকেন।

—কাকে বকেন? আপনাকে, না আপনার খোঁপাটাকে?

—আমাকে বকেন, খোঁপাটাকেও বকেন।

—খুব ভুল করেন বড়পিসি। বকাবকি না করে বরং আপনার হাতের কাজের প্রশংসা করা তাঁর উচিত ছিল।

—না, এটা আমার হাতের কাজ নয়, মিস ডি'সিলভার বিউটি সেলুনের হাতের কাজ।

এইবার বেশ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ—তাই বলুন। খোঁপাটার তাহলে একটা নাম আছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, এটা ইরানী স্টাইলের খোঁপা। নাম, লায়লা খোঁপা।

—বেশ সুন্দর নাম। লায়লা খোঁপা দীর্ঘজীবী হোক্।

—ঠাট্টা করছেন না তো?

—এই তো ভুল বুঝলেন। আমি একেবারে মন খুলে কথা বলি, তাই অনেকে আমাকে বুঝতে ভুল করে। ভাল কথা বললে ভয় পায়, আর ঠিক কথা বললে সন্দেহ করে যে, বেঠিক কথা বলছি। বিশ্বাস করুন, আপনার লায়লা খোঁপা সত্যিই সুন্দর খোঁপা, দেখতে আমার মতো বেরসিক ব্যাঙ্কার মানুষের চোখেও ভাল লাগছে।

উজ্জ্বল হয়ে হাসতে থাকে সিপ্রা চৌধুরীর চোখ দুটো।—বড়পিসি বলেন, লায়লা খোঁপা না ছাই, ময়লা খোঁপা!

সন্দীপ—বলতে দিন। ওসব কথা কানে তুলবেন না।

সিপ্রা—কিন্তু আপনি শুধু বাতি জ্বালিয়ে কাজ সেরে দিলেন, কিছু বললেন না কেন? সবাই আশা করেছিল, আপনি কিছু বলবেন।

—আজ কিছু বলবার ইচ্ছেই হলো না। যদি আবার একদিন আসি তবে বলবো।

—যদি নয়, বলুন আসবেন। এই গানের জলসার আয়ু সাত দিন। কথা দিন কাল আবার আসবেন।

—কাল নয়, পরশু দিন আসবো।

কথা রেখেছে সন্দীপ রায়। সিপ্রা চৌধুরীর কাছে দু'দিন আগের সেই উৎফুল্ল

অঙ্গীকারের মান রক্ষা করেছে।

বেশ নামকরা কয়েকজন গুণী ওস্তাদ এসেছেন। আসরের তানপুরার ভিড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওস্তাদেরা বসে আছেন। রামপুরের, লক্ষ্ণৌ-এর, আর গোয়ালিয়রের ওস্তাদ।

গান শুরু হবার আগে তানপুরার গুঞ্জন শুরু হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। গানের আসরকে লক্ষ্য করে চমৎকার এক অনুরোধের কথা বলে।—গুণীরা আমার জিজ্ঞাসার সাহস মাফ করবেন। আমি জানতে চাই, পরজ রাগের সঙ্গে শুদ্ধ মধ্যম মাঝে মাঝে লাগিয়ে দিয়ে বসন্ত রাগ কি গাওয়া যায় না? আমার ধারণা, গাওয়া যায়। এখন উপস্থিত গুণীজনদের কেউ যদি সেটা গেয়ে শোনাতেন, তবে সবাই শুনে সুখী হতো।

রামপুরের ওস্তাদ বলেন—হাঁ হাঁ, সো ভি হো সকৃতা।

হরেনদা চেঁচিয়ে ঘোষণা করেন।—আপনারা মন দিয়ে শুনুন, ওস্তাদজী বসন্ত রাগ গাইছেন।

সবারই উৎসুক চোখের দৃষ্টি যেন একটা চমকিত বিস্ময়ের আবেগে সন্দীপের মুখের দিকে ছুটে যায়। কে এই ভদ্রলোক? গানের এত গূঢ় তত্ত্বের খবর যিনি রাখেন, তিনিও নিশ্চয় একজন গুণী।

এদিকে-ওদিকে গুঞ্জন শোনা যায়।—এস-আর। এস-আর। বালিগঞ্জের সন্দীপ রায়। শুধু টাকাতে নয়, ইনি জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায় আর ট্যালেন্টেও বড়লোক।

শ্রীবিনায়ক হালদার, যিনি হরেনদার বিশেষ অনুরোধে গান শুনতে এসেছেন, আর তামাকের পাইপে কামড় দিয়ে প্রথম সারির একটা চেয়ারে বসে আছেন, তিনি তাঁর পাশের চেয়ারের অধ্যাপক ভদ্রলোককে বলেন—উনি একজন ইনটেলেক্‌চুয়াল। আপনাদের আলট্রা-মডার্ন হিমাদ্রি মিত্তিরের চেয়েও অনেক মডার্ন। যেমন আইডিয়াতে, তেমনই বাস্তব জীবনে।

এই সব গুঞ্জন আর মন্তব্যের শব্দ নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছে সন্দীপ। তার পাশে বসে আছে যে সিপ্রা চৌধুরী, সেও নিশ্চয় শুনেছে। যার নাম করে এত প্রশস্তি উপচে উঠেছে, তার চোখ দুটো যতটা উজ্জ্বল হয়ে হাসছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে হাসছে সিপ্রা চৌধুরীর দুই চোখ।

রামপুরের ওস্তাদ বসন্ত রাগের আলাপ শুরু করেছেন। সন্দীপ বলে—চলুন, সিপ্রা চৌধুরী।

চমকে ওঠে সিপ্রার শাহাজাদী খোঁপার মুক্তোর ঝালর।—সে কী, বসন্ত রাগ শুনবেন না?

—না।

—কিন্তু আপনিই তো অনুরোধ করলেন যে…।

—হ্যাঁ, আমিই বসন্ত রাগ গাইতে বলেছি। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। সাধ হয়েছিল, দুটো কথা বলি। বলে দিয়েছি, আমার সাধও মিটে গিয়েছে, আর এখানে বসে

থাকতে পারছি না। চলুন, বাইরে যাই।

—আমিও যাব ?

—নিশ্চয়। অবিশ্যি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে··· ।

—না না, আপত্তি কেন হবে ?

উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সিপ্রা। শ্রোতাদের প্রথম সারির দুটি চেয়ার খালি করে দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে বাইরে চলে যায়।

জলসার ভলান্টিয়ার ছেলেরা, যারা প্রবেশপথের মুখে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা হাঁকডাক করে।—এই যে, এদিকে, ওই যে আপনার গাড়ি, ওই ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সিপ্রা বলে—আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি তাই বোধহয় ইচ্ছা করে আমাকে দিয়ে কর্তব্যের কাজটা করিয়ে নিলেন।

সন্দীপ—কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

সিপ্রা—মান্য অতিথি যখন গানের সভা ছেড়ে চলে যান, তখন গান সেকশনের সেক্রেটারির কর্তব্য হলো, অন্তত গেট পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এসে তাঁকে বিদায় দেওয়া।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি ভুলেই গিয়েছি যে আপনি হলেন ক্লাবের গান সেকশনের সেক্রেটারি।

—যা-ই হোক, স্বীকার তো করবেন যে সেক্রেটারি তার··· ।

—স্বীকার করি, সেক্রেটারি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। এখন আমি আমার কর্তব্য পালন করবো। আপনাকে একটা ভাল ছবি দেখতে নিয়ে যাব।

সিপ্রার চোখে একটা বিস্ময়ের আবেশ টলমল করে। সে বিস্ময় যেন সিপ্রার মুগ্ধ প্রাণের একটা শিহরণ। কথা বলতে গিয়ে সিপ্রার গলার মৃদু স্বর যেন বিহ্বল হয়ে আরও মৃদু হয়ে যায়।—আমি ছবি দেখি বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়া···ভাবতে কেমন যেন লাগছে। এতটা কি এত শিগ্‌গির··· ।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় সিপ্রা। আর, সন্দীপ রায়ও হঠাৎ সিপ্রার একটা হাত ধরে ফেলে কথা বলে।—কী বললে ?

সিপ্রা—আপনার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজ এখনই কেন ?

সন্দীপ—আজই সকালে ছবির হাউসে আমি টেলিফোন করে একটা বক্স রিজার্ভ করে রেখেছি।

—তবে একবার বাড়িতে গিয়ে, বড়পিসিকে একটু বলে নিয়ে, তারপর না হয়··· ।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ—ছবির সময় হয়ে এসেছে সিপ্রা।

—কিন্তু ছবি শেষ হতে তো বেশ রাত হয়ে যাবে।

—রাত দশটা হয়ে যাবে।

—তবে ?

—এখানে গানের জলসা কি রাত দশটার আগে শেষ হবে ?

—না।

—তুমি কি গান শেষ না হবার আগেই বাড়ি চলে যেতে ?

—না।

—বড়পিসি কি জানেন না যে, তুমি গানের জলসায় এসেছো ?

—জানেন।

—তাঁকে কি এমন কোন কথা বলে এসেছো যে, তুমি রাত দশটার আগেই বাড়িতে ফিরবে ?

—না।

—তবে আজ এখনই আমার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে তোমার চিন্তা করবার তো কিছু নেই। কেউ তোমার কাছে কৈফিয়ত দাবি করবে না। করবে কি ?

—না।

—তবে চল।

—চলুন।

আজ এখানে এই গাঢ় সন্ধ্যায়, কালীঘাটের একটি কাদামাখা পথের উপর চাকার দাগ এঁকে দিয়ে চকচকে ক্যাডিলাক যখন সন্দীপ রায় ও সিপ্রা চৌধুরীকে নিয়ে নতুন উল্লাসের হর্ন বাজিয়ে ছুটতে শুরু করে, তখন এখান থেকে অনেক দূরে সেখানে দমদমের 'নিরঞ্জন'-এর গেটের কাছে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেয়ে সুপ্রভার মন থেকে অনেকক্ষণের অপেক্ষার সব অস্বস্তি ঝরে পড়ে যায়। ভদ্রলোক এতক্ষণে পৌঁছলেন। আগে কোন দিনও এত দেরি করে আসেননি।

ড্রইং-রুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে সুপ্রভা, না, সন্দীপ আসেনি। ক্যাডিলাক নয়, একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয়, হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে ট্যাক্সিটা। তাই বনেট তুলে দিয়ে ইঞ্জিনের কলকব্জার উপর ঠোকাঠুকি করছে ড্রাইভার।

ঘরে ঢুকে আবার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায় সুপ্রভা। না, আজ আর আসবেন না সন্দীপ রায়। কিন্তু কেন ? হঠাৎ কোন অসুখে পড়ে যাননি তো ?

তার-বাঁধা গীটারটাকে হাতে তুলে নেয় সুপ্রভা। কিন্তু গীটার যেন আনমনা সুপ্রভার অসাবধান হাতের একটা ধাক্কা খেয়েছে। মিথ্যে একটা ঝংকার তুলে নীরব হয়ে যায় গীটার।

কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে সন্দীপ রায়ের ক্যাডিলাক পার্ক স্ট্রীটের মোড় পার হয়ে গিয়েছে। সিপ্রা বলে—উঃ, এত জোরে গাড়ি চালাবেন না। আমার বেশ ভয় করছে।

সন্দীপ হাসে—আমি কোন কিছুই আস্তে চালাতে পারি না। আস্তে চলতেও পারি না। যেমন আমার এই গাড়িটা, তেমনই আমার জীবনটাও স্পীড

ভালবাসে।

সিপ্রা—তা আমি জানি।

সন্দীপ—তুমি কেমন করে জানলে?

—হরেনদার কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।

—নানা রকম ভয়ের কথা বোধহয়?

—না, একটুও ভয়ের কথা নয়। আমি কত কতবার ভেবেছি, যদি আপনাকে কোথাও দেখতে পাই, তবে একটু ভাল করে দেখবো।

এক হাত ষ্টিয়ারিং-হুইলের উপর রেখে অন্য হাতটাকে সিপ্রা চৌধুরীর কাঁধের উপর এলিয়ে দেয় সন্দীপ। —এ কথা বলে দিয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিলে, সিপ্রা।

—আপনিও কি একটি কথা বলে আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিতে পারেন না?

—পারি। কিন্তু তুমিই বল, কী কথা শুনতে চাও?

—আপনি বুঝে দেখুন, কী কথা শুনতে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—আমি রোজ তোমাকে দেখতে চাই। একটি দিনও বাদ দিতে চাই না। একথা শোনার পরেও যদি তোমার মনে কোন প্রশ্ন থাকে, তবে···।

ছবির হাউসের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দুরন্ত স্পীডের ক্যাডিলাক। সন্দীপ হেসে ফেলে। —এখন ছবিটাকে একটু ভাল করে দেখ। আমি একটুও হিংসে করবো না।

আলোয় ঝলমল সিনেমা নিকেতনের ভিতরে ছায়াবৃত হলের দর্শকমঞ্চের এক দিকে আরও ছায়াবৃত বক্স যেন একটি নিবিড় নিরালা। তারই ভিতরে সন্দীপ রায়ের পাশে বসে সিপ্রা চৌধুরীর প্রাণটা বোধহয় সব প্রশ্ন হারিয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। তবু সিপ্রার মনে হয়, সন্দীপের হাতটা এখনই এত উতলা না হয়ে একটু শান্ত হলে ভাল হতো। নইলে ঘুমিয়ে পড়বে সিপ্রা, ছবি দেখা আর সম্ভব হবে না। সিপ্রার গলাটাকে এভাবে এক হাতে জড়িয়ে ধরে থাকলে সন্দীপও কি ছবিটাকে ভাল করে দেখতে পারবে?

ছবিতে পার্কের ভিতরে ডাক্তারের পাশে পাশে হেঁটে ডাক্তারের অর্ডার আর উপদেশের কথা শুনছে হাসপাতালের মেড-মেয়েটি। মেয়েটির মুখে কী সুন্দর হাসি আর চোখে কী চমৎকার চাহনি! মুখে কোন কথা না বললেও বুঝতে পারা যায়, ওই মেয়ের প্রাণটা কী কথা বলছে।

চমকে ওঠে সিপ্রা। সন্দীপ বলছে—চল বাইরে যাই।

সিপ্রা—ছবি তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখনই চলে যেতে চাইছো কেন?

—ও ছবি এখন না দেখলেও চলবে।

—তবে চল।

ছবির ঘর থেকে বের হয়ে এসে, আর লাউঞ্জের সোফার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে যায় সন্দীপ, থেমে যায় সিপ্রা। সন্দীপই বলে—না, এখানেও নয়। চল,

একেবারে বাইরে চলে যাই।

একেবারে বাইরে এসে আর ফুটপাথের এদিক ওদিক দু'দিকে দু'বার ভ্রূক্ষেপ করেই সিপ্রার হাত ধরে সন্দীপ রায়।—এইবার আমরাই ছবি হয়ে একটু ঘুরে বেড়াই, কেমন?

সিপ্রা—আঃ, হাতটা ছাড়ুন।

সিপ্রার হাতটা ছেড়ে দিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।—তোমার মনে সেকেলে লজ্জার কালিঝুলি কিছুটা আছে মনে হচ্ছে।

—আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখবেন তো। কত লোক যাওয়া-আসা করছে, এর মধ্যে চেনা লোকও থাকতে পারে। কী মনে করবে তারা, যদি দেখতে পায় যে, অনাথ চৌধুরীর মেয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

—মনে করবে যে, অনাথ চৌধুরীর মেয়ে তার ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—সেটাই তো আমার ভয়।

—বুঝতে পারছি না, কী করে তোমার এই ভয় ভেঙে দেওয়া যায়।

—আজ এখন ফিরে চলুন।

—তারপর?

—কাল একবার হরেনদার কাছে বলুন, তারপর হরেনদা যেন একবার বড়-পিসির সঙ্গে কথা বলেন।

—কী কথা? কিসের কথা?

—তোমার ইচ্ছের কথা।

—আমার ইচ্ছের কথাটা তুমি বুঝেছ, এটাই কি যথেষ্ট নয়?

—আমার পক্ষে যথেষ্ট বৈকি। কিন্তু…কিন্তু কিছু মনে করো না, আজ আমার সত্যিই লজ্জা করছে। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর দেখবে, তোমার হাত ধরে চলতে আমার একটুও লজ্জা করবে না।

—বিয়ে যেদিন হবে, সেদিন তো হবেই। সেটা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। কিন্তু তার আগে কি আমি তোমাকে একটি দিনও দেখতে পাব না?

—পাবে বৈকি, নিশ্চয় পাবে। বলতে গিয়ে সন্দীপের হাত ধরে ফেলে সিপ্রা। —যদি কোন সোমবার রাসেল স্ট্রীটে মিসেস ডি'সিলভার স্যালুনের কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তবে আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাবে।

—বেশ, তোমার ভালবাসার এটুকু আত্মদানও আপাতত আমার কাছে যথেষ্ট। চল, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

—চলুন, কিন্তু আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন না। আমাকে ভবানীপুরের কোথায়ও, মার্কেটের কাছে কিংবা সিনেমা হাউসের কাছে নামিয়ে দেবেন।

।। পাঁচ ।।

রাসেল স্ট্রীটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষার যে নায়িকা, যার নাম সিপ্রা চৌধুরী, তার মন-প্রাণ শুধু একটি শব্দ শোনবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। সন্দীপের ক্যাডিলাকের সাইরেন-হর্নের শব্দ। শব্দটাকে মনে-প্রাণে চিনে ফেলেছে সিপ্রা। গাড়িটা চোখে পড়বার আগেই, শুধু হর্নের শব্দ শুনে বুঝে ফেলতে পারে সিপ্রা, সন্দীপ আসছে। মাঝে মাঝে অন্ত গাড়িও সাইরেন-হর্ন বাজিয়ে ছুটে যায়। সে গাড়িকেও চোখে না দেখে শুধু হর্নের শব্দ শুনেই বলে দিতে পারবে সিপ্রা, ওটা সন্দীপের গাড়ির সাইরেন-হর্নের শব্দ নয়, ওটা এক বুড়ো সাহেবের রেসিং-গাড়ির সাইরেন-হর্নের শব্দ। শব্দ শুনেই যখন বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক চঞ্চলতার ঝংকার শিউরে ওঠে, নিঃশ্বাসের বাতাস নিবিড় হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে সিপ্রা, এ নিশ্চয় সন্দীপের গাড়ির হর্নের শব্দ। এতক্ষণে সন্দীপ আসছে।

আজ সন্দীপকে বলতে হবে: এখানে এসে পৌঁছতে এত দেরি করে দাও বলেই তো ফিরতে এত দেরি হয়। রোজ রাত দশটায় বাড়ি ফেরবার কোন কৈফিয়ত বড়পিসি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। বড়পিসির বকাবকির দুরন্ত ভাষা যে চড়-চাপড়ের চেয়েও দুরন্ত হয়ে উঠেছে, সেটা তুমি কল্পনা করতে পার না বলেই আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করছো না, বাড়ি ফিরতে রোজই রাত করে দিচ্ছো। রোজই দশরকমের মিথ্যে কথা বলে বড়পিসির কাছে কৈফিয়ত দিতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

অনাথ চৌধুরীর মেয়ে সিপ্রা চৌধুরীর ঘরের জীবনে বড়পিসির বকুনি যেমন একটা ভয়, তেমনই একটি মায়াও বটে; মরুভূমিতে যেমন রুক্ষ খেজুর গাছের ছায়াও ছায়া। বাড়িতে আরও মানুষ আছে, কিন্তু কারও কাছ থেকে বকুনি শোনবার ভয় নেই সিপ্রার। বড়পিসি মাঝে মাঝে খুব রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন —হোটেলবাড়ি! হোটেলবাড়ি! কেউ যেন কারও কেউ নয়। মেয়েটাকে এক-বার কাছে ডেকে নিয়ে কেউ কোনদিন একটা মায়ার কথাও বলে না, কী অদ্ভুত বাড়ি রে বাবা!

বাপ অনাথ চৌধুরীর কাছে তাঁর কাজ-কারবার এমনই ধ্যানজ্ঞান আর তপস্যা যে, মেয়ের সঙ্গে পাঁচটা মিনিটও কথা বলবার সময় পান না। মাসের মধ্যে বড়জোর একটা-দুটো দিন, সিপ্রাকে চোখে পড়লে জিজ্ঞাসা করে ফেলেন— কেমন আছিস? সিপ্রা যদি বলে, কাল হঠাৎ খুব জ্বর হয়েছিল, তবু অনাথ চৌধুরীর মুখে দ্বিতীয় কোন প্রশ্নের কথা বেজে ওঠে না। তিনি ব্যস্ত হয়ে চার-পাঁচটা ফাইলকে বড় ফিতে দিয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে বাঁধতে থাকেন, জার্মানীর ক্রুপ্‌স্ হের্শেল আর মার্সিডিজের সঙ্গে তাঁর করেসপণ্ডেন্সের বড়-বড় ফাইল।

বড়পিসি রাগ চাপতে গিয়ে চাপাস্বরে গজ্‌গজ্‌ করেন—টাকাওয়ালা লক্ষপতির ঘরের চেহারা আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমনটি আর কোথাও

দেখিনি। মা-মরা মেয়ের এমন অনাদর, তাও আবার বাপের কাছে, কেউ কি কোথাও দেখেছে? আমি তো দেখিনি।

প্রতিবেশী নন্দবাবুর স্ত্রী যেদিন আসেন, সেদিন বড়পিসি বেশ গলা ছেড়ে তাঁর আক্ষেপের অনেক কথা বলেই ফেলেন: মেয়ের বাপ-ভাগ্যির ছিরি তো এই, দাদা-ভাগ্যির ছিরিটাই বা কী রকম? এক দাদা সপ্তাহের মধ্যে ছ'দিন শ্বশুরবাড়িতে থাকবার পর একদিন এসে এ-বাড়িতে থাকবেন। আর-এক দাদা মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সাহেবী হোটেলে থাকবার পর একদিন এসে এ-বাড়িতে থাকবেন। আমি ভাবি, ওরা একদিনের জন্যেই বা আসে কেন? না এলেই তো পারে।

নন্দবাবুর স্ত্রী হাসতে থাকেন।—তা বললে চলবে কেন দিদি?

বড়পিসি—জানি জানি, সবই বুঝি, ওরকম করে বাপের সম্পত্তিকে একটু ছুঁয়ে না থাকলে ওদের চলবে কেন? কিন্তু বোনটাকে একটু তো দেখবি। এক দাদা বোনকে শুধু একটি কথা বলেন: পড়ছিস, না, পড়া ছেড়ে দিয়েছিস? আর-এক দাদা শুধু বলেন—ইংরেজীটা খুব ভাল করে শিখে নিবি, নইলে কিস্‌সু হবে না। ব্যস্‌, ওই পর্যন্ত। দাদারা এই খবরটুকুও রাখেন না, কিংবা ভুলেই গিয়েছেন যে, বোনটা দু'বছর আগেই বি-এ পাস করেছে।

চলে যাবার জন্য নন্দবাবুর স্ত্রী উঠে দাঁড়াতেই বড়পিসির গলার স্বর যেন ফুঁপিয়ে ওঠে।—মেয়েটার জন্যে কেউ কিছু ভাববে না, শুধু আমি যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। একরোখা অবাধ্য মেয়েকে সামলে রাখতে আর চিন্তে করতে করতে আমার আয়ু যে ফুরিয়ে এল। আমি তবে কাশী যাব কবে?

সন্ধ্যাবেলা সিপ্রাকে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সাজতে দেখে বড়পিসির উগ্র মুখরতার স্বর হঠাৎ নরম হয়ে যায়: দেখতে সুন্দর, লেখাপড়া ভাল শিখেছে, সে মেয়ের জন্যে একটি সৎপাত্র পেতে কোনই অসুবিধে নেই। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা হবে, তবে তো! বাপ কোন চেষ্টা করবেন না, দু'দুটো দাদারও কোন চেষ্টা নেই। জলজ্যান্ত একটা বউদিও তো আছে। সেও কি একটু চেষ্টা করতে পারে না? ইচ্ছে করলেই পারে। কিন্তু ইচ্ছে করবে কেন? যে বউ পুজোর দিনেও শ্বশুরকে একটা প্রণাম করবার জন্যে আসে না, সে কি তার শ্বশুরের মেয়ের জন্য কোন দরদ বোধ করতে পারে? কখ্‌খনো পারে না। আমি জানতে চাই, এরা কি তবে সত্যিই মেয়েটাকে চন্দ্র-সূর্যের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছে?

সন্ধ্যা হতেই সিপ্রা যখন বড়পিসিকে ডাক দিয়ে বলে, আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি, তখন বড়পিসির আপত্তি আর অনিচ্ছার প্রাণটা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—শুধু ফ্যাশান আর ফাংশান—ফাংশান আর ফ্যাশান। ওই নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাস তো দে। আমি কিছুই বলবো না। আমি বলবার কে?

সিপ্রা হাসে।—তুমি না বললে কে আর বলবে?

বড়পিসি—আমি তবে স্পষ্ট করে বলছি, শুনে নাও মেয়ে। যদি এ-বছরেও তোমার বিয়ে না হয়, তবে আমি আর এখানে থাকবো না। আমি কাশী চলে

যাবই যাব।

রাসেল স্ট্রীটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে অনেক বিস্ময়ের কথা ভাবতে গিয়ে একটা নতুন বিস্ময়ের দৃশ্য কল্পনা করতে পারে সিপ্রা। আশ্চর্য হয়ে হরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন বড়পিসি। হরেনদা বলছেন: একজন খুব সৎপাত্র সিপ্রাকে পছন্দ করে ফেলেছে, এইবার বিয়ের একটা শুভদিন ঠিক করতে হবে। বড়পিসির এতদিনের রুষ্ট মেজাজের চোখ-মুখের উপর কী চমৎকার খুশির হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু সন্দীপ এসে গিয়েছে। হাসছে সন্দীপ। সন্দীপও কি সিপ্রার কল্পনার এই ছবিটাকে দেখে ফেলেছে? তাই তো মনে হয়। সন্দীপের মুখে এত সুন্দর হাসি ফুটে উঠতে কোনদিনও দেখেনি সিপ্রা।

সিপ্রা বলে—বোটানিকাল গার্ডেনে বেশ সুন্দর নিরালা জায়গা অনেক আছে।

সন্দীপ—নিরালা?

হাত দিয়ে মুখের হাসিটা চেপে নিয়ে সিপ্রা বলে—হ্যাঁ। কেউ দেখতে পাবে না।

সন্দীপ—কেউ যদি না-ই দেখলো, তবে কী আর হলো, কোন্ লাভটা হলো?

সিপ্রা—আমাদের দু'জনের লাভ হলো।

সন্দীপ—তাহলে তো বলতে হয়, অমাবস্যার রাতে একটা শ্মশানের বাঁশ-ঝোপের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকা আরও ভাল, কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।

সিপ্রা—লোকে না দেখলে কী আসে যায়?

সন্দীপ—সবই আসে যায়। লোকে না দেখলে, তোমার জীবনের কোন কিছুই সত্য হয়ে উঠতে পারে না।

সিপ্রা—কিছুই বুঝলাম না।

সন্দীপ—বেশি বোঝাতে হলে তো বেশি মুখ খুলতে হয়।

সিপ্রা—হ্যাঁ, বেশ তো, মুখ খুলেই বল না কেন? কোন্ কথাটাই বা মুখ খুলে বলতে তুমি বাকি রেখেছো?

সন্দীপ—বিয়ে ব্যাপারটা দু'জনের মধ্যে যে কী সম্পর্কের ব্যাপার, সেটা সকলেই জানে। তবু গায়ে হলুদ-টলুদ মেখে সেটা লোককে জানিয়ে আর বুঝিয়ে দিতে হয়। দুজনের ভালবাসার ব্যাপারটাকেও তেমনই লোককে জানিয়ে দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দিতে হয়।

সিপ্রা—বাঃ, খুব বললে! লোকে দেখলেই সব হয়ে গেল?

সন্দীপ—আসলটার সবই হয়ে গেল। লোকে যদি না-জানলো যে, তুমি আমাকে ভালবাসো, তবে আমি কী করে দেখবো জানবো আর বুঝবো যে, কে আমাকে হিংসে করছে আর কে-ই বা আশ্চর্য হচ্ছে। তা হলে আমিই বা কী করে কোন্ গর্বটা বোধ করবো?

সিপ্রা—সত্যি করে যদি ভালবাসা না থাকে, আর মেলামেশার ও ছুটোছুটির কাণ্ড দেখে লোকে যদি মনে করে ভালবাসা হয়েছে, তবে…।

সন্দীপ—একই ব্যাপার। সেটাও জীবনের একটা লাভ। ধর, কেউ ভুল করে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিল, সেজন্য মালাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না, আমার গলাটাও নয়।

সিপ্রা—বুঝলাম না।

সন্দীপ—এর মধ্যে না বোঝবার মতো কিছুই নেই। আমি খুবই সোজা সহজ সরল সত্য কথা বলছি।

সিপ্রা—আমার কথা শোন। সামনে একটা পুকুর, সে পুকুরের এক কোণে কেয়ার ঝোপ, পুকুরের জলে বড়-বড় পদ্মপাতা ভেসে রয়েছে। পেছনে আইভি লতার মস্ত বড় একটা মাচান। আর, দু'পাশে হাসনুহানার ঝাড়। এর মধ্যে বসে গল্প করতে কি তোমার ভাল লাগবে না?

সন্দীপ—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

—অন্তত দুটো ঘণ্টা তো বসে থাকা উচিত।

—না, ওরকমের নিরালা আর ওরকমের একঘেয়ে তপস্যা আমার ধাতে সইবে না।

—আমার সঙ্গে বসে দু'ঘণ্টা গল্প করলে কি একঘেয়ে তপস্যা করা হয়? তাহলে তো বলতে হয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার রোজই চার ঘণ্টা ধরে ছুটোছুটি করাও একটা একঘেয়ে তপস্যা।

মাথাটাকে হঠাৎ কাত করে দিয়ে, শাহাজাদী খোঁপার মুক্তাঝালর দুলিয়ে, মুখ টিপে হেসে, আর দুই চোখের কালো ভুরু দুটোকে বিলোল করে দিয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকায় সিপ্রা—মুখ খুলে বলতে লজ্জা করছে, তবু বলছি। চল, আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে আর চুপ করে বসে থাকবো। আর তুমি খুব আস্তে গুনগুন করে বসন্ত রাগ গাইবে। কেউ শুনতে পাবে না, শুধু আমি শুনবো।

—অ্যাঁ? কী বললে? বসন্ত রাগ?

—হ্যাঁ!

—সেটা আবার কিসের রাগ?

—মনে নেই? সেদিন গানের জলসাতে তুমিই তো বললে, কী করে বসন্ত রাগ গাইতে হয়।

—ও, হ্যাঁ। বলেছিলাম ঠিকই। বলবার দরকার ছিল, তাই বলেছিলাম।

—কিন্তু সে গান তুমি নিশ্চয় গাইতে জান, গাইতে পার।

—মোটেই জানি না, একেবারেই পারি না। গানের জলসার উদ্বোধন করতে হবে, তাই গান নিয়ে ভালমন্দ তর্কাতর্কির একটা বই থেকে ওই কয়েকটা কথা জেনে নিয়েছিলাম।…কী? কী ভাবছো?

—কিছু ভাবতে পারছি না।

—তুমি যেমন ক্লাবের গানের সেক্‌শনের সুগায়িকা-সেক্রেটারি, আমিও তেমনই গানের সুগায়ক-পণ্ডিত।

—ঠাট্টা করছো কেন? আমি গান শুনতে ভালবাসি, গান শোনা আমার একটা শখ। শুধু হরেনদার অনুরোধের চাপে পড়ে সেক্রেটারি হয়েছি। কিন্তু তুমি…।

—বল, মনে হচ্ছে আজ তোমার মুখে প্রশ্ন-সরস্বতী ভর করেছে।

—তুমি সেদিন নিজেই ভাল ছবি দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, আর আমাকেও সেই ছবি দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলে, কিন্তু…।

—এই রে। এ যে দেখছি সাদাসিধে প্রশ্ন-সরস্বতী নয়, কালো কুটিল সন্দেহ-সরস্বতী ভর করেছে।

—কিন্তু, তুমি তিনটে মিনিটও না ফুরোতে উঠে পড়লে।

—তোমাকে যখন কাছে পেয়ে গেলাম, তখন একটা ছবির কাছে আর বসে থাকবো কেন? তিন মিনিট ছবি দেখেছি, তাই যথেষ্ট। তার বেশি দেখা আমার সাধ্যিতে কুলোয় না।

—ছবিটাকে তাহলে তুমি আগে দেখনি।

—না।

—তবে কী করে বললে যে, এটা খুব ভাল ছবি।

—আমার বন্ধু বিনায়ক এই ছবির গল্পটা একদিন আমাকে শুনিয়েছিল।

—শুনতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগেনি?

—অ্যাঁ?—হ্যাঁ। যতদূর মনে পড়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি।

সন্দীপের দুই চোখের উচ্ছল উজ্জ্বলতার হাসিটা হঠাৎ যেন একটা ময়লা ধোঁয়ার ঝাপটা লেগে আহত হয়েছে। সিপ্রার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কথা বলে সন্দীপ।—ধান ভানতে এত শিবের গীত একটুও ভাল শোনাচ্ছে না, সিপ্রা।

সিপ্রা হাসতে চেষ্টা করে।—শিবের গীত বলছো কেন? আমি তো তোমারই গীত গাইছি।

—তুমি আমার কোন কথাই বুঝতে পারছো না, বার বার শুধু একই কথা বলছো। এটা কি আমার গীত হলো, না তোমার সন্দেহের গীত হলো?

—ছি ছি, ওকথা বলো না। বলতে নেই। আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই, আমি বরং নিজেরই উপর রাগ করছি, কেন তোমার সব কথা বুঝতে পারি না।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তোমার মনের সমস্যাটা কী?

—কী?

—তোমার মতো মেয়ের মনে যতটা একেলে রুচি থাকা উচিত ছিল, ততটা নেই। থাকলে আমাকে বুঝতে তোমার একটুও অসুবিধে হতো না।

—বুঝি না, একেলে রুচি বলতে তুমি কী বলতে চাইছো। পাড়াতে কেউ-কেউ আমার নিন্দে করে, অনেকে আবার প্রশংসাও করে যে, আমি বড় বেশি আপ-টু-ডেট মেয়ে।

—খুব ভুল কথা নয়।

—আমি যা-ই হই না কেন, আমি তো নির্ভয়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি যেখানে নিয়ে গিয়েছো, সেখানে গিয়েছি আর যতক্ষণ থাকতে বলেছো, ততক্ষণ থেকেছি। বড়পিসি রোজই ধমক দিয়ে বলেছেন, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস্? আমি স্পষ্ট করে বড়পিসিকে বলে দিয়েছি: যেখানে থাকতে ভাল লাগে, সেখানেই থাকি। এরপর যদি আমি সবচেয়ে আনন্দের কথাটা স্পষ্ট করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তবেই কি আমি একটা সেকেলে বস্তু হয়ে গেলাম?

সিপ্রা চৌধুরী তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সেই কথাটা আজ এত স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা না করলে, আজ এতক্ষণ ধরে রাসেল স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে দু'জনের মধ্যে এত কথা বলাবলির ব্যাপার হতো না।

সিপ্রা বলছে—আর দেরি করা কি ভাল দেখায়? আরও দেরি করবার কি কোন দরকার আছে? তুমি শুধু বলে দাও, বিয়েটা কবে হবে, কবে হলে ভাল হয়। আমি তাহলে তারিখটা হরেনদাকে একবার জানিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাব। তারপর যা-কিছু করবার, বড়পিসিকে আর বাবাকে জানিয়ে দেবার আর বুঝিয়ে দেবার সব দায় হরেনদাই বইবেন।

এতক্ষণ ধরে এত কথা বলাবলির পর আবার সিপ্রার এই জিজ্ঞাসার কথাটা ফিরে এসেছে। এর আগে দু'চারবার এই জিজ্ঞাসার আভাস সিপ্রার মুখের হাসিতে, চোখের কালো তারার চঞ্চলতায়, আর দু'চারটে লাজুক ভাষার শব্দে ফুটে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু আজ বড়ই স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে।

এই দুমাস ধরে, শুধু প্রতি সপ্তাহে একটি সোমবারে নয়, সব বারেই সন্দীপের ক্যাডিলাক তৃষ্ণার্ত হয়ে ছুটে এসেছে, অপেক্ষার নায়িকা সিপ্রা চৌধুরীকে বুকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। দুরন্ত হয়ে ছুটেছে। যেখানে মানুষের মেলা, যেখানে আলোর মেলা, যেখানে উৎসব আর এগজিবিশন, সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'চার মিনিট জিরিয়েছে ক্যাডিলাক, তারপর আবার ছুটেছে। দু'মাসের মধ্যে সন্দীপের সঙ্গে তিনবার এয়ারপোর্টে আর একবার হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও ঘুরে বেড়িয়ে এসেছে সিপ্রা।

ক্যাডিলাক একটুও ক্লান্ত হয়নি, ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু সিপ্রা চৌধুরী একটু ক্লান্ত না হয়ে পারেনি। আজও আবার ছুটোছুটি করবে নাকি? সিপ্রার মুখে এরকম প্রশ্ন শুনে সন্দীপেরও বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, এটা সিপ্রা চৌধুরীর ক্লান্তিরই প্রশ্ন। হেসে হেসে সিপ্রাকে বুঝিয়েছে সন্দীপ: ভালবাসা কখনো ক্লান্ত হতে পারে না সিপ্রা, ঝর্নার জল কখনো ক্লান্ত হয় না। কিন্তু সন্দীপের মুখের এ-ধরনের উপমাময় ভাষা শুনেও সিপ্রার মুখের হাসিটা ঝর্নার মতো কলস্বরে উচ্ছলিত হয়ে উঠতে পারেনি।

সন্দীপ বলে—তাহলে কি আজ এখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই হবে ?

সিপ্রা—তুমি তো এখনও স্পষ্ট করে কিছু বলছো না।

সন্দীপ—আমাকে কি একটু ভেবে দেখবার সময়ও দেবে না ?

সিপ্রা—ভেবে দেখবে ? এখনও··· ।

সন্দীপ—পাঁজির পাতা ওল্টাতে হবে না ঠিকই, তবু তো একটু ভাবতে হবে। যে-কোন দিনকে চট্ করে একটা শুভদিন বলে ধরে নেওয়া তো উচিত নয়।

হঠাৎ-জ্যোৎস্নার আলোর মতো একটা হঠাৎ-তৃপ্তির হাসি সিপ্রার মুখে চমকে ওঠে। সিপ্রার প্রাণের ভিতরে উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসাটার সব বিষাদ সেই আলোর ছোঁয়া লেগে এক মুহূর্তেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তার লোকের আর গাড়ির যাওয়া-আসার দৃশ্যটা যেন সিপ্রার চোখেই পড়ছে না। সন্দীপের গায়ের রঙিন ফ্লানেলের কোটের যে বোতামটা সন্দীপের বুক ছুঁয়ে রয়েছে, তারই উপর লুটিয়ে পড়ে সিপ্রার একটা হাত।—বেশ তো, একটু ভেবে নাও। একটা দিন ঠিক করবার জন্যে কতই বা আর ভাবতে হবে ?

সন্দীপ—ভাবতে এমনকিছু সময় লাগবে না। আজ কিংবা কাল কিংবা পরশু, এর মধ্যেই আমি ভেবে ফেলবো। কিন্তু আজ কি আমি এখান থেকেই চলে যাব ?

সিপ্রা—না, কখ্খনো না।

সন্দীপের একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে সিপ্রা বলে—চল, কী যেন নাম, কোন্ রেস্টুরেন্টে যাবে বলেছিলে ?

সন্দীপ—অরোরা ?

সিপ্রা—না, অরোরা নয়।

সন্দীপ—তবে কলরডো।

সিপ্রা—না-না, ওরকমের কোন নাম তো বলনি।

সন্দীপ—আমারও ঠিক মনে পড়ছে না। আমি বলি, আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

সিপ্রা—কিন্তু আজ যে সত্যিই···তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না···কেন আজ তোমার সঙ্গে ছুটোছুটি করতে এত ইচ্ছে হচ্ছে।

সন্দীপ হাসে—তবে চল, গাড়িটা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাই।

চকচকে ক্যাডিলাক ছুটতে শুরু করে বটে, কিন্তু তার সেই উদ্দাম বেগ আজ আর নেই। যেন একটু আনমনা হয়েছে দুরন্ত উল্লাসের ক্যাডিলাক। দিক্‌ভ্রান্তের মত কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে, ঘুরে এসে আবার সেদিকেই চলে যাচ্ছে।

আলিপুরের সড়কের একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ক্যাডিলাক।

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সড়কের পাশের একটা বাড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। বাড়ির লনের সবুজ ঘাস আর বারান্দার উপর টবে বড় বড়

ডালিয়ার উপর নকল জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে দিয়ে জলজল করছে ব্যালকনির উপর পূর্ণিমার চাঁদের মতো চেহারার একটা ল্যাম্প।

আবার ছুটতে শুরু করে ক্যাডিলাক। দশ মিনিটও লাগে না, হাজরা রোডের মোড়ের কাছে এসেই থেমে যায়, যেখানে চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করছে রজনীগন্ধার একটা ফেরিওয়ালা।

সিপ্রার চোখে একটা নিবিড় তৃপ্তির আলো যেন বিহ্বল হয়ে ভাসতে থাকে। —রজনীগন্ধা কিনবে বুঝি ?

সন্দীপ—কী বললে ?

সিপ্রা—ভালই হবে। তোমার দেওয়া রজনীগন্ধা আজ হাতে ধরে রেখেই বড়পিসিকে বলবো আজ তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। হরেনদা এসে তোমাকে বলবেন, এ রজনীগন্ধা কোথা থেকে এসেছে।

সন্দীপ—আমি তো রজনীগন্ধা কিনবো বলে এখানে থামিনি।

সিপ্রা—তবে এখানে থামলে কেন ?

সন্দীপ বলে—এটা হাজরা মোড়, যেখানে তোমাকে রোজই নেমে যেতে হয়।

—অ্যাঁ, তাইতো! বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে যায় সিপ্রা।

॥ ছয় ॥

দমদমের হেমলতার কাছে চিঠি লিখেছেন বালিগঞ্জের চারুশীলা রায়।—আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হলো, হেম। জানতে পেরেছি যে, সন্দীপ তোমার ওখানে যায় না। কিন্তু কোথায় যে যায়, তা জানি না। আমার বিশ্বাস ছিল, তোমাদের বাড়ির বাতাস গায়ে লাগলে আমার ছেলের সব বিকার শান্ত হয়ে যাবে। তোমার মেয়ে সুপ্রভা তো হীরের-টুকরো মেয়ে। তাই আশা করেছিলাম, সে-মেয়ের কাছে এসে কাচও কাঞ্চন হয়ে যাবে। তাই আমি ইচ্ছে করেই সেদিন সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। খুব ভুল করে ফেলেছি, হেম। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন।

দমদমের মহিম বসুর বাড়িতে সেই চকচকে মোটরগাড়ি আর আসে না। একটি মাস পার হয়ে গেল, তবুও আর এল না। তাই সন্দেহ করেছেন চারু উকীলের মা: এ কী রে বাবা, মেঘটা শুধু গর্জে গেল, বর্ষালো না।

হেমন্তবাবুর স্ত্রী শৈলবালার কাছে সন্দেহের কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন চারু উকীলের মা—বিয়ে হবে না।

শৈলবালা এরকম কোন সন্দেহ না করে, কিন্তু বেশ চিন্তিত হয়ে একদিন মহিমবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন, আর হেসে হেসে হেমলতার কাছে তাঁর আশার কথাটা বলেছিলেন: মনে হচ্ছে, আপনাদের এখানে শিগগিরই একটা শুভ ব্যাপার হবে।

হেমলতা বললেন—না।

—আপনি ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ।

—মহিমবাবু ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ।

—বিকাশ ভাল আছে ?

—হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি ভাল আছে।

—সুপ্রভা ভাল আছে ?

—হ্যাঁ।

—ওই যে চমৎকার ছেলেটি, যে আপনাদের এখানে প্রায় রোজই আসতো, সে এখন কোথায় ?

—জানি না।

—কিন্তু সে কি আর আসবে না ?

—না।

—সে কি এ-কথা নিজেই বলে দিয়ে গিয়েছে ?

—না, তার মা যে চিঠি লিখেছেন, সে চিঠি পড়ে বুঝেছি যে তাঁর ছেলের আর এখানে আসবার মন নেই।

হেমলতার শান্ত মুখটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, আর নিজেরই একটা করুণ নিঃশ্বাসের উচ্ছ্বাস সামলে নিয়ে চলে গেলেন শৈলবালা। তিনি জানেন যে, তাঁর একটা দুর্নাম আছে। তিনি নাকি বড়ই ছিঁচকাঁদুনে স্বভাবের মানুষ। লোকে বলে, ছিঁচকাঁদুনে শৈলদি।

হেমন্তবাবুর কাছে এসে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন শৈলবালা—বিয়ে হবে না।

হেমন্তবাবু—কেন ?

শৈলদি—ছেলের মা নিজেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রভাকে তাঁর ছেলের পছন্দ হয়নি।

হেমন্তবাবু—কী আশ্চর্য, নিজেকে কি একটা দেবতা বলে মনে করে বালিগঞ্জের মাধব রায়ের ছেলে ?

হেমন্তবাবুর মুখ থেকে সন্দীপের মা চারুশীলার এই চিঠির কথা শুনতে পেয়েছেন সেই ভদ্রলোক, কালীঘাটের গানের জলসাতে যিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন, হেমন্তবাবুরই ভাগ্নে বিনায়ক হালদার, যাঁর চোখে সর্বদা সোনার ফ্রেমের চশমা চিকচিক করে, যিনি সব সময় ধূমপানের একটি সুবঙ্কিম পাইপ কামড় দিয়ে ধরে রাখেন, সে পাইপের মধ্যে ধোঁয়া কিংবা তামাক থাকুক বা না থাকুক।

এই বিনায়ক হালদারের মুখ থেকে খবর শুনে সন্দীপ জানতে পেরেছে যে, মা একটি চিঠি লিখে দমদমের সেই অদ্ভুত বাড়ির কাউকে জানিয়ে দিয়েছেন যে,

বিয়ে হতে পারে না, হবেও না।

বালিগঞ্জের রায়ভবনের দোতলার একটি ঘরে বিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ, হাতের গেলাসের হুইস্কি উছলে ওঠে।—মাতৃদেবী তো জীবনে একটাও ভাল কথা বলতে পারলেন না, ভাল একটা কাজও করতে পারলেন না। এই প্রথম একটি ভাল কাজ করলেন। বেশ করেছেন, চিঠি দিয়ে সত্য কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন।

প্রতি সপ্তাহে রবিবারের সকালবেলাতে সন্দীপ রায়ের এই বাড়িতে একবার না এসে পারেন না বিনায়ক হালদার। সন্দীপ জানে, কথায় কথায় বিনায়ক সন্দীপকে জানিয়েও দিয়েছে, যে সন্দীপের ইন্টেলেক্ট আর পার্সোনালিটি বিনায়কের কাছে সত্যিই শ্রদ্ধাময় একটি বিরাট বিস্ময়। তিনি নিজেও স্বাধীন চিন্তার মানুষ, কিন্তু সন্দীপ রায়ের স্বাধীন চিন্তার অবাধ উদারতা তাঁকেও বিস্মিত করেছে। কোন ইনহিবিশন নেই, চিন্তায় ও আচরণে কোন পুরনো বিশ্বাসের উপদ্রব নেই, সন্দীপ রায়ের মতো দ্বিতীয় কোন বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ বিনায়কের চোখে কখনও পড়েনি।

সন্দীপও তাঁর ভক্ত এই বিনায়ক হালদারের একজন অনুরাগী বন্ধু। কোন রবিবারের সকালবেলাতে বিনায়ক না এলে সন্দীপের সকালবেলার প্রাণটা যেন দুঃসহ একটা শূন্যতা বোধ করে। সন্দীপেরই ইচ্ছার মমতায় সন্দীপের ব্যাঙ্কে একটি কাজ পেয়েছেন বিনায়ক হালদার। কাজটা কোন চাপ দিয়ে বিনায়কের স্বাধীন চিন্তার জীবনটাকে উৎপীড়িত করে না। যেদিন ইচ্ছে হয়, সেদিন একবার ব্যাঙ্কে যান বিনায়ক। অফিসের একটি কামরার নিভৃতে বসে এক পেয়ালা চা পান করেন আর চলে যান। ব্যাঙ্কের সকলেই জানে যে, বিনায়ক হালদার হলেন সন্দীপ রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিনা কাজের ও মোটা মাইনের একজন সম্মানিত পোষ্য।

এহেন বিনায়ক হালদার আজ তাঁর হাতের গেলাসে চুমুক না দিয়ে, আর একটু আশ্চর্য হয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকান।—আমি ভাবছি, ওখানে তোমার মেলামেশার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ম্যাচিওর করলো না কেন? হেমন্তমামার কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার তো মনে হয়েছে যে, সে মেয়ে সত্যিই চমৎকার মেয়ে।

সন্দীপ—তোমার এরকম মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়নি।

—কেন হয়নি, বলতে পার?

—পারি। সে মেয়ে হলো সেকেলে অভিরুচির একটি পুতুল।

—তাই বল। গেলাসে চুমুক দিয়ে নিয়ে হাঁক ছাড়েন বিনায়ক হালদার।

সন্দীপ বলে—তুমি তো জান, আমি আর যা কিছু সহ্য করতে পারলেও, সেকেলেপনা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

বিনায়ক—জানি, খুব জানি। ওটা সহ্য করা উচিতও নয়। কিন্তু…।

গেলাসে আর-একটা চুমুক দিয়ে বিনায়ক বলেন—কিন্তু এই যে সেদিন দেখলাম, যে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তুমি গানের জলসা থেকে চলে গেলে, যার সঙ্গে তোমার এখন মেলামেশা চলছে, সে মেয়েকে তো বেশ একেলে অভিরুচির মেয়ে বলে আমার মনে হয়েছে।

—খুব একেলে না হোক, খুব সেকেলেও নয়।

—আমার মনে হয়, মেলামেশার ব্যাপার ম্যাচিওর করতে খুব বেশি সময় না লাগলেই ভাল হয়।

সন্দীপ—তুমি কিন্তু খুবই অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছো বিনায়ক। ভালবাসা কি বাজপাখি? দেখবে আর সেই মুহূর্তে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে, এটা কি ভালবাসার নিয়ম?

বিনায়ক—না না, কখ্‌খনো না, হতেই পারে না।

বিনায়ক গেলাস রেখে দিয়ে আর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তেই, সন্দীপ বোতলটাকে বিনায়কের গেলাসের দিকে এগিয়ে দেয়।—আর একটু নাও।

বিনায়ক—হ্যাঁ, নেব। কিন্তু তুমি···যে সেই দুটি মাত্র চুমুক দিয়ে গেলাসটাকে রেখে দিয়েছো, আর তো একবারও তুলছো না দেখছি।

সন্দীপ—তুমি তো জান, আমি কোন অভ্যাসের দাস হতে পারি না। একেবারেই না। ওই যা-কিছু যেটুকু যতক্ষণ ভাল লাগে, ব্যস, তার বেশি আর নয়।

বিনায়ক—আমি দেখেছি, সবকিছুতে তোমার কেমন-যেন একটা অনীহা আছে।

সন্দীপ—আছে হয়তো। আমি সাঁতার দিতে ভালবাসি, ডুব দিতে ভালবাসি না। এটা যদি জলের প্রতি অনীহা হয়, তবে হলো।

—ওঃ ওঃ ওঃ। বিনায়ক হালদার বিহ্বল হয়ে বুকভরা শ্রদ্ধার উদ্‌গার তুলতে থাকেন।—ওঃ, তুমি কত সহজ করে জীবনের কত কঠিন রহস্যের তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পার, সন্দীপ। এ না হলে আমার মতো কট্টর-যুক্তিবাদী মানুষ কি তোমার কাছে আসতো, আর তোমার মুখের কথা শুনতে এমন দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করতো?

সন্দীপ—আমি কোন বই পাঁচ-পাতার বেশি পড়ি না, কোন ছবি তিন-মিনিটের বেশি দেখতে পারি না, কোন গান একমিনিটের বেশি শুনি না। যদি অমৃত পাই, তবুও আমি শুধু একটু সিপ করবো, তার মধ্যে নিজেকে চুবিয়ে দেব না। আমি বেশিক্ষণের কোন কিছুই চাই না, বিনায়ক।

বিনায়ক—খুব ভাল। সুন্দর ফুলটাকে একবার দেখলাম, বড় জোর আর একবার দেখলাম। তারপর আর তো কিছু করবার নেই। একঘেয়েমি জীবনের বিউটি নষ্ট করে।

সন্দীপ—সময়ের অপচয় আর অপমান করাই হলো সেকেলে মনোবৃত্তির সবচেয়ে বড় আনন্দ। কবি হতে হলে সারারাত চাঁদ দেখতে হবে, ধার্মিক হতে হলে

সারারাত চাঁদ দেখতে হবে, ধার্মিক হতে হলে দিনে পাঁচলক্ষ নাম জপ করতে হবে, পণ্ডিত হতে হলে একটা শ্লোককে রোজ একশোবার করে সারা বছর পাঠ করতে হবে, সেকেলে সাধের এই জঘন্য স্বভাবটা আসলে কিন্তু একরকমের কাঙালপনা।

বিনায়ক—নিশ্চয় নিশ্চয়, কাঙালপনা বৈকি?

সন্দীপ—এই কাঙালপনারই নানারকম গালভরা নাম আছে। নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা…।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন বিনায়ক। কৃতজ্ঞতা, লেগে থাকা, পড়ে থাকা। সবটুকু খাব, সবখানি নেব, শেষপর্যন্ত দেখবো, চিরকাল অপেক্ষা করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। ডুবে মরবার যত দড়ি-কলসী। আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ-দাদার কথা তোমাকে কোনদিন বলেছি কি?

সন্দীপ হাসে—না।

বিনায়ক—বাগবাজারের স্কুলমাস্টার হরলালের বড়দা, আমি তাঁর নাম রেখেছি স্থিতপ্রজ্ঞ-দাদা। উঃ, ভদ্রলোক একুশ বছর ধরে শুধু এক পাণিনি পড়েছেন।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সন্দীপ।—অর্থাৎ ব্যাকরণ-বিদ্যার একটি ঝাঁকামুটে হয়েছেন। বীভৎস। এটাই হলো সেকেলে স্কলারশিপ, যার মধ্যে ইনটেলেক্টের কোন কাজ থাকতো না। যা-ই হোক, আমি বলতে চাই, নিষ্ঠা-কিষ্ঠা সবই দরকার। কিন্তু তার একটা মাত্রা থাকা চাই।

বিনায়ক—নিশ্চয় চাই।

সন্দীপ—আমি বলতে চাই, কৃতজ্ঞতা ভাল, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বন্ধনটা ভাল নয়। নিষ্ঠা-কিষ্ঠা মন্দ নয়, কিন্তু নিষ্ঠার বন্ধন ভাল নয়।

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, তুমি সত্যিই…।

সন্দীপ—তুমি অভিযোগ করতে পার, সন্দীপ রায় নামে লোকটা বুঝি শখের-ভালবাসার একটা ভ্রমর। আজ এই ফুলে, কাল সেই ফুলে…।

বিনায়ক—না না না, এরকম কদর্য অভিযোগ আমি করতেই পারি না।

সন্দীপ—যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক ভয়, সেটা হলো ওই ভয়। ভুল করে যেন সেকেলে স্বভাবের কোন মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী না করে ফেলি। দোষ বল আর গুণ বল, আমি এই ভয়টাকে খুব ভয় করি।

বিনায়ক—এটা তোমার ভয় নয় সন্দীপ, এটা তোমার সৎসাহস।

সন্দীপ—আমি যা, আমি তা। আমি নিজেকে জানি। নিজের মনের সঙ্গে তো কোন ফাঁকি চলে না বিনায়ক। ভাল করে না বুঝে-সুঝে, একটু যাচাই না-করে কাউকে চট করে বিয়ে করে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা নিন্দে কর বা যা-ই কর।

বিনায়ক—[illegible] করবো কেন? কখ্‌খনো না। এটা তো আদর্শবাদী মানুষের সতর্কতা, সুরুচি।

ঘরের দরজার কাছে এক আগন্তুকের হাস্যময় মূর্তি দেখা দেয়। চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।—ওই দেখ বিনায়ক, যাকে দেখলে আমার এই সকালবেলার আনন্দ একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবে, তিনি এসেছেন।

খাকি-রঙের মোটা কাপড়ের শার্ট, আর খাকি-রঙের শক্ত জিনের ড্রিল-প্যান্টালুন, দু'তিন দিনের না-কামানো গালে ছাঁটা ঘাসের মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এইরকমের শ্রীসম্পন্ন একটি মূর্তি। সে মূর্তির হাতে কালো কাপড়ের একটা রুমাল।

বিনায়ক হালদার ডাকেন—এস মন্দার।

সন্দীপ—ঘেঁটু ফুলের নাম মন্দার!

কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘরের ভিতর ঢোকে মন্দার। ধপ্ করে সোফার উপর বসে। সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ তার হাতের সেই গেলাসটা মন্দারের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়, যে গেলাসে সন্দীপের দুই চুমুকের ছোঁয়া লেগে আছে।—নাও, গিলে ফেল।

মন্দারের মুখে অদ্ভুত এক নিবিড়-শান্ত হাসি ফুটে ওঠে। এক চুমুকে গেলাসের তরল অবদানের সবটুকু খেয়ে ফেলেই ঢেঁকুর তোলে মন্দার।—আজ ভেবেছিলাম, আসবো না।

সন্দীপ—সে কী? তুমি আসবে না, আমার এমন সৌভাগ্য কি কোনদিনও হবে?

মন্দার—আমাকে যদি একটা গরম কোট কিনে এনে না দাও, তবে এই মাঘের শীতের কোনদিনও তোমার এখানে আমার আসা সম্ভব হবে না, বন্ধু।

সন্দীপ—'কিনে এনে দাও' কথাটার মানে কী হয়, বন্ধু? আমি তোমার মাইনে-করা একজন চাকর নাকি, বন্ধু? আমি তোমার জন্যে গরম-কোট কিনবো, নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসবো, আর তোমার করকমলে সমর্পণ করবো, তুমি এতটা আশা কর কোন্ সাহসে, হে বন্ধু?

মন্দার হাসে।—তুমি তোমার বাঁ-হাতে কুড়িটা টাকা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো পার, বন্ধু। তা'হলেই আমি টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে আর গরম-কোটটা কিনে ফেলতে পারি, বন্ধু।

সত্যিই বন্ধু। সন্দীপের কলেজ জীবনের এক ক্লাসের বন্ধু। অতীতের সেই বন্ধুত্বের দাবিতে মন্দার আজ সন্দীপের এক গেলাসের বন্ধু হতে পেরেছে।

তিন বছর আগে, এই রকমই এক মাঘের শীতের সকালবেলাতে মন্দার দত্ত হঠাৎ এসে দাবি করেছিল।—আমাকে একটা চাকরি দিতেই হবে সন্দীপ। নইলে আমি একেবারে না খেয়ে মরে যাব।

সন্দীপ—কিন্তু চাকরি করবার কি তোমার সামান্য যোগ্যতাও আছে? আমি তো ভুলে যাইনি যে, তুমি অঙ্কেতে শূন্য পেয়েছিলে, ইংরেজীতে তিন আর বাংলাতে সাত।

—আমি কি তোমার জুতো মোছবার চাকরিটাও করতে পারবো না? নিশ্চয় পারবো।

—বাজে কথা বলো না।

—তাহলে তুমিই একটা কাজের কথা বল। মোট কথা, আমাকে টাকা দিতেই হবে, কোন কাজ দাও বা না-দাও।

—মাস গেলে ত্রিশটা টাকা দিতে পারি, তার বেশি নয়।

—তাই দিও।

—কিন্তু মনে রেখ, আমার এই চ্যারিটির মেয়াদ মাত্র একটি বছর, তার বেশি নয়।

—বেশ।

কথা ছিল, মাস শেষ হলে একদিন এসে ত্রিশটা টাকা নেবে আর চলে যাবে মন্দার। কিন্তু মন্দার দত্ত নিজের ইচ্ছায় একটা কাজ খুঁজে বের করেছে। কাজ করবার জন্য রোজই একবার এ-বাড়িতে আসে মন্দার। সন্দীপের চাকর মালী আর বাবুর্চিকে বকাবকি করে। সবারই কাজের ভুল ধরে। সবাইকে শাসায় —এবার ভুল করলে আর রক্ষে নেই। যে ভুল করবে, তাকে একেবারে ডিসমিস করে দেওয়া হবে। শাসানি শেষ হবার পর বেশ শান্ত হয়ে চা আর পাউরুটি খায় মন্দার। তারপর চলে যায়।

নিচের তলার ঘরে ও বারান্দায় মন্দার দত্তকে একদিন ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিনায়ক হালদার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি বোধহয় এবাড়ির নতুন কেয়ারটেকার?

মন্দার জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ, কেয়ারটেকার বলতে পারেন, আবার ডোন্ট-কেয়ারটেকারও বলতে পারেন।

খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল সন্দীপ, প্রথম যেদিন এক রবিবারের সকালবেলাতে, মন্দার দত্ত হন্তদন্ত হয়ে এই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। ধমক দিয়েছিল সন্দীপ।—তুমি এখানে এলে কেন? তোমাকে তো আমি ডাকিনি।

মন্দার—বিনায়কবাবু যদি এখানে আসতে পারেন, তবে আমিও কি আসতে পারি না? আমিই তো তোমার পুরনো বন্ধু, বিনায়কবাবু সেদিনের বন্ধু।

সন্দীপ—না, তুমি এখানে আসবে না।

মন্দার—বিনায়কবাবুর মতো আমিও কি একটু হুইস্কি পেতে পারি না। বিনায়কবাবুর মতো আমিও কি তোমাকে সম্মান করতে পারি না?

হেসে ফেলে সন্দীপ—তাহলে কী আর বলি, তা হলে একটু হুইস্কি খেয়েই যাও।

সন্দীপের আপত্তি এইভাবে টলিয়ে দিয়ে, এই ঘরের ভিতরে এসে বসবার, আর সন্দীপকে সম্মান করবার যে অধিকার নিজের চেষ্টায় তৈরি করে নিয়েছিল মন্দার, সে অধিকার আজও অটুট আছে। সন্দীপকে সম্মান করবার একটা

পদ্ধতিও নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে মন্দার। মন্দারকে লক্ষ্য করে যে-ভাষায় যত কৌতুক করুক না সন্দীপ, তার সে কৌতুকের মধ্যে তাচ্ছিল্যময় যত উল্লাস থাকুক না কেন, মন্দার শুধু হাসে। মন্দারের এই অ-মুখর হাসিটাই হলো সন্দীপের প্রতি মন্দারের খুশি-প্রাণের সম্মানময় অর্ঘ্য। মন্দারকে তুচ্ছ করে কৌতুক উপভোগ করবার অভ্যাসটা সন্দীপেরও একটা নেশা হয়ে উঠেছে, যেন সন্দীপের ব্যক্তিত্বেরই একটা নেশা। সে নেশাতে দুই চুমুক হুইস্কির নেশার চেয়ে বেশি মাদক আবেশ আছে।

সন্দীপ বলে—দেখছো বিনায়ক, মন্দারকে আজ হাসপাতালের মড়াঘরের একটা দারোয়ানের মতো দেখাচ্ছে কী না?

মন্দারের মুখের শান্ত হাসিটা থমথম করে।

বিনায়ক বলেন—হ্যাঁ, ঠিক, সেই রকমই দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু দাড়িটা কামিয়ে ফেললে…।

মন্দার বলে—দাড়ি কামাতে পয়সা লাগে।

সন্দীপ—শুনলে তো বিনায়ক, মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের যুক্তিটা?

মন্দার হাসে, শুধু হাসে। শান্ত নীরব হাসি। কিন্তু সন্দীপের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দটা যেন একটা নিগূঢ় তৃপ্তির ঝংকার।

সন্দীপের কোন কথার কিংবা কোন সঙ্কেতের অপেক্ষায় না থেকে, মন্দার হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরে রাখা বোতলটাকে কাছে টেনে নেয়। গেলাসে হুইস্কি ঢালে, এক চুমুকে খেয়ে ফেলে, ঢেঁকুর তোলে।

সন্দীপ বলে—আহা, কী নির্লোভ, কী লজ্জাশীল একটি সজ্জন এই মন্দার দত্ত। শুনছো বিনায়ক?

বিনায়ক—বল, বল।

সন্দীপ—এই বিশ্বে, এমন চীজটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

মন্দার দত্ত তার হাতের কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে আর হাসে।

সন্দীপ—ছেলেবেলায় গল্পের বই-এর ছবিতে হট্টিমাটিমটিম দেখেছিলাম। আমাদের মন্দার দত্ত হলেন একটি জ্যান্ত হাট্টিমাটিমটিম, যদিও চেহারাটা ভিন্ন রকমের।

মন্দার হাসে। সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আজ বেশ ভাল লাগছে।

সন্দীপ—কেন?

মন্দার—কেন আবার কী? তোমার সবই ভাল। তোমার বাবুর্চি, তোমার মালী, তোমার বেয়ারা, সবাই ভাল।

সন্দীপ—আমার নামটা করছো না যে? আমি বুঝি ভাল নই?

মন্দার—সেটা কি আর বলতে হবে? তোমার মতো মানুষ হয় না। এবার শুধু…।

সন্দীপ—এত লজ্জা করে হাসছো কেন ?

মন্দার—এবার শুধু তোমার মতো ভাল কেউ একজন এ-বাড়িতে চলে আসুক।

সন্দীপ—শুনলে তো বিনায়ক, কী কথা বলছে মন্দার ?

বিনায়ক—শুনেছি।

সন্দীপ—মন্দার এতদিনে এই প্রথম একটা ভাল কথা, মানুষের মতো কথা বললো।

টেলিফোনের শব্দ বেজে উঠেছে। রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কথা বলে সন্দীপ—কে ? দীপালি ? কী খবর ?···না, আজ নয়। কী বললে ? আশার পথ চেয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না ? তা তো লাগবেই না। কিন্তু আজ আমার অনেক কাজ আছে···হ্যাঁ, ওটাও কাজ, অস্বীকার করছি না।···না, কালও নয়। পরশু অর্থাৎ সোমবারে যাব···হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য।

পাইপের ধোঁয়া মুখ ভরে টেনে নিয়ে আর দুই চোখে একটা চকচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ধরে নিয়ে কথা বলেন বিনায়ক—দীপালি। এখন তবে হোয়ার ইজ সিপ্রা ?

সন্দীপ হাসে—যেখানে আছে, সেখানে আছে।

বিনায়ক—তার মানে বোধহয় এই যে···।

সন্দীপ—তার মানে যেখানে ছিল, সেখানে আছে। আমি আর কি করতে পারি বল ?

॥ সাত ॥

দীপালি সোমের জন্মদিন। টেবিলের উপর বিরাট আকারের একটি কেক। কেকের উপর রঙিন আইসিং-এর প্রলেপ যেন চমৎকার করে আঁকা একটি ছবি। সে ছবিতে হ্রদের নীল জলের উপর পঁচিশটা লাল পদ্ম ভাসছে। টেবিলের উপর পঁচিশটা ডালিয়ার পাশে পঁচিশটা মোমবাতি জ্বলছে।

দীপালির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কথা বলে সন্দীপ।—আমি মনে করেছিলাম, বড়জোর আঠারোটা মোমবাতি জ্বলবে, তার বেশি নয়, কোনমতেই নয়।

সন্দীপের পিঠে একটা চিমটি কেটে দীপালি হাসতে থাকে।—এ কথার মানে কী ? নিশ্চয় কোন অষ্টাদশীর জন্যে তোমার প্রাণটা আইটাই করছে।

সন্দীপ—একটুও না, কোনদিনও না, কখ্খনো না।

দীপালি—তবে একথা বললে কেন, উইকেড বয় ?

সন্দীপ—বুঝতেই তো পারছো, কেন বলেছি। দেড় বছর আগে তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, এ-মেয়ের বয়স আঠারোর বেশি হতে পারে না। দেড় বছর পরে দেখেও মনে হয়েছে—বয়স যা-ই হোক না কেন, চেহারাটা আঠারো।

দীপালি—একই কথা।

সন্দীপ—কার কথা ?

দীপালি—তোমার স্বপ্নের লোভটার কথা। ভাবছো, অষ্টাদশী খুব মিষ্টি। সুইট এইটটিন। আহা সুইট এইটটিন।

সন্দীপ—টোয়েন্টিফাইভ ইজ সুইটার।

যে দীপালির সঙ্গে আজ এখন এত অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছে সন্দীপ, দু'মাস আগে তার নামও জানতো না; যদিও দেড় বছর আগে তাকে শুধু চোখে দেখবার একটা ব্যাপার ঘটেছিল। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরবার পথে সন্দীপকে যখন পালাম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল, তখন এক বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে সন্দীপের কিছু বার্তালাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম মহাদেব সেন। মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছর মিলিটারীর জন্যে দু'লক্ষ তাঁবুর অর্ডার সাপ্লাই করে, এবং আরও পাঁচ-সাতটা কাজ-কারবার করে নিয়েই মহাদেব সেন সেই যে বিরাম গ্রহণ করলেন, আজও তিনি সেই বিরামের মধ্যে রয়েছেন।

মহাদেব সেন বলেছিলেন—আমরা যাচ্ছি শ্রীনগরে ছেলেকে দেখতে। ছেলে হলো আর্মি মেডিক্যাল-কোরের কর্নেল। প্রতি মাসে ফরোয়ার্ড এরিয়া থেকে মাত্র একদিনের জন্যে শ্রীনগরে আসবার অনুমতি পায়। সেইজন্যে আমরাও প্রতি মাসে দু'একদিনের জন্যে শ্রীনগরে যাই, ছেলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কলকাতায় আলিপুরে আমার একটা বাড়ি আছে বটে, তবে থেকেও লাভ নেই। আমরা এখন দিল্লিতেই থাকি।...আপনার ব্যাঙ্ককে বলে বাড়িটাকে বিক্রি করিয়ে দিতে পারবেন ?

ভদ্রলোক তখনি তাঁর পকেট থেকে বের করে তাঁর নামের যে কার্ড সন্দীপের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আলিপুরের বাড়ির নাম আর ঠিকানাও ছিল।

সন্দীপ—অ্যাঁ ? বাড়ির নাম এমসেন ? আমি এই বাড়ি দেখেছি। এতদিনে বুঝলাম, বাড়িটার নাম এমসেন কেন ?

মহাদেব সেন একটু হেসে নিলেন।—মিলিটারীর যত সাহেব অফিসার সবাই আমাকে এমসেন বলে ডাকতো। নামটা আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই নতুন বাড়িটাকেও এমসেন নাম দিয়ে দিলাম।

সন্দীপ— সুন্দর বাড়ি।

এমসেন—সুন্দর বাড়ি তো বটে, কিন্তু একেবারে খালি বাড়ি।

সন্দীপ—ভাড়া দিয়ে দিন না।

এমসেন—না। হয় বেচে দেব, নয় খালি পড়ে থাকবে।

শ্রীনগরের প্লেন ছাড়বার সময় যখন হয়ে এসেছে, ঠিক তখন এমসেন তাঁর আত্মপরিচয়ের পারিবারিক বিবরণ খুব তাড়াতাড়ি ও খুব সংক্ষেপ করে জানিয়ে দিলেন।—এই সব বাচ্চা-কাচ্চা আমার নাতি-নাতনী, আমার ছোট মেয়ের ছেলে-মেয়ে। আর ওই যে মেয়েটি এয়ার হস্টেসের সঙ্গে গল্প করছে, ওটি হলো আমার বড় মেয়ের মেয়ে।

যে-মেয়েকে সেদিন এয়ার-হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছিল সন্দীপ, সেই মেয়েই হলো আজকের এই দীপালি সোম। স্বামীর সঙ্গে বিয়ের বিচ্ছেদ হবার পর এমসেনের বড়মেয়ে যখন আবার বিয়ে করে নতুন স্বামীর ঘরে চলে গেলেন, তখন তিনি তাঁর দশ বছর বয়সের মেয়ে দীপালিকে তার দাদুর ঘরে রেখে দিয়ে গেলেন। দীপালি তাই দাদুর অজস্র আদরের আলো দিয়ে লালিত একটি দীপ। দাদু ডাকেন, দীপ। সে ডাক শুনে সন্দীপও দীপালিকে এখন 'দীপ' বলে ডাকে।

এমসেনের ছোট জামাইয়ের চাকরিটা হলো এক ব্রিটিশ জাহাজ-কোম্পানির চাকরি। এ বছর সিঙ্গাপুর, সে বছর আবাদান, পরের বছর কলম্বো ; চাকরিটা যেন অস্থিরতার বিশ্ব-পরিক্রমা। ছোটমেয়েকে তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয়। লেখাপড়ার স্থায়ী সুযোগের দরকারে তাঁর ছেলেমেয়েরা দাদুর কাছে স্থায়ী আশ্রয়ে থাকে। রব, রিটা, লোলা আর সোনা।

আজ থেকে দু'মাস আগের যে রাতে সন্দীপ রায়ের চকচকে ক্যাডিলাকের ভিতর থেকে সিপ্রা চৌধুরী শেষবারের মতো নেমে চলে গিয়েছিল, সেই রাতেই তো আলিপুরের 'এমসেন'-এর ব্যালকনিতে চাঁদবাতির জ্যোৎস্না দেখেও সন্দীপের মনে প্রশ্নটা চমকে উঠেছিল, সেই এমসেন কি সত্যিই সপরিবারে দিল্লি থেকে আবার আলিপুরে ফিরে এসেছেন ?

পরের দিনই সকালবেলা টেলিফোন করে জানতে পেরেছিল সন্দীপ, না, বিক্রি হয়ে যায়নি বাড়িটা। এমসেনই সপরিবারে ফিরে এসেছেন। আর সেই যে সেই সকালবেলাতে আলিপুরে গিয়ে এমসেনের সঙ্গে দেখা করে আর খুশি হয়ে চা খেয়েছিল সন্দীপ, তারপর আর বোধহয় ভেবে দেখবার মতো একটু সময়ও পায়নি যে, কিংবা ভেবে দেখবার ইচ্ছাও হয়নি যে, রাসেল স্ট্রীটের একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে ফুটপাথের উপর এখনও কেউ দাঁড়িয়ে থাকে কী থাকে না।

দীপালি সোমের সঙ্গে সন্দীপের এই দুই মাসের মেলামেশার জীবন যেন একটা উৎসবের জীবন। তার মধ্যে আবেশ আবেগ ও আকুলতার কী না আছে। ক্যাডিলাকের অক্লান্ত ছুটোছুটি তো আছেই ; গান আছে, ফুলে নিয়ে লোকালুকি আছে, তুলোর বল নিয়ে পিটাপিটির খেলাও আছে, আর ব্যালকনির উপরে চাঁদ-বাতির জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা জড়াজড়ির দৃশ্যও আছে। সামনের বাড়ির জানালা থেকে উঁকি-দেওয়া একটা মেয়েলী মুখের ছায়া চমকে ওঠে আর সরে যায়। দীপালী সোম বলে—দেখেছে তো বয়ে গেছে।

দাদু এমসেন বলেছেন—ওর নামটা যদিও দীপালি, ওকে আমি যদিও দীপ বলে ডাকি, ওর বিউটি যদিও সত্যিই একটা দীপই বটে, তবু ওকে আমার মাঝে-মাঝে পাগলি-ঝোরা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। ওর আনন্দটা বড়ই চঞ্চল। চাণক্যপুরীর রাস্তায় একবার ট্রাফিক-পুলিশের সিগন্যাল তুচ্ছ করে এত জোরে গাড়ি চালিয়েছিল যে, আর-একটু হলে…।

মাথা দুলিয়ে হেসে উঠেছে দীপালি—না সন্দীপ, আর-একটু হলেও কোন

অ্যাক্সিডেন্ট হতো না। দাদু যতই ভয় করুক, আর আমি যত জোরে গাড়ি চালাই না কেন, অ্যাক্সিডেন্ট আমার কোনদিন হয়নি, হয় না, হবেও না।

সন্দীপের মনে হয়েছে, এমসেনের এই বেশ-সুন্দর নাতনীর পাগলি-ঝোরা স্বভাবটা আরও সুন্দর। সত্যি, দীপালি সোমের প্রাণটা যেন ক্লান্তিহীন আবেগের ঝর্না, বেড়াতে বের হয়ে কোথাও পাঁচ মিনিটও থেমে থাকতে চায় না। এক-একদিন রেড রোডে রাত দশটার নীরবতার উপর যেন রাগ করে হেসে ওঠে দীপালি। মোটর গাড়িটার গায়ে আস্তে একটা চড় মেরে ছটফটিয়ে ওঠে।—এই মরুভূমির মধ্যে আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। চল, তোমার অরোরা কিংবা কলরডোর জ্যাজ শুনি।

দেখে খুশি হয়েছে সন্দীপ, পাঁচ মিনিট জ্যাজ শুনেই ছটফট করে উঠেছে দীপালি। সন্দীপের হাত ধরে টেনেছে—চল।

রাতের চৌরঙ্গীর পথে হাজার লোকের চোখের উপর দীপালির কোমরে হাত রেখে চলতে চলতে সন্দীপ যেন শুনতে পায়, বুকের ভিতরে অদ্ভুত এইরকম একটি সঙ্গিনীর জন্যেই তো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তোমার জীবনের উপোসী আশাটা। উপরে একেলে রুচির জলুস, আর ভিতরে সেকেলে রুচির অন্ধকার, এমন দো-আঁশলা প্রাণের মেয়ে নয় দীপালি।

দীপালি একবার নয়, অনেকবার বলেছে—আমার মনে কিন্তু একটা ভয় আছে, সন্দীপ।

—ভয়? সে কি? কিসের ভয়?

—ভয় এই যে, তুমি একদিন হয়তো চট্ করে বলে ফেলবে : চল, এবার একদিন ছাঁদনাতলায় দাঁড়াই।

—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কোনদিনও ওকথা বলবো না।

—তোমার সঙ্গে যেখানেই যাই আর যেখানেই দাঁড়াই, ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না।

দীপালির কথা শুনে সন্দীপের প্রাণ যেমন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে, তেমনই নির্ভয় আনন্দে ভরে গিয়েছে।

আলিপুরের বাড়ির লন ঘুরে-ফিরে সঙ্গিনী দীপালীর সঙ্গে সন্দীপের গল্প করবার ইচ্ছেটা এক-একদিন থামতেই চায় না। বিকেল থেকে শুরু হয় গল্প, আর রাত ন'টায় দাদু এমসেনের ডাক শুনে গল্পের আনন্দটা চমকে ওঠে। এমসেন ডাক দিয়েছেন—ভিতরে এসো, বৃষ্টি পড়ছে।

তাই তো, সত্যিই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ভিতরে এসে বসলেও গল্প করবার আবেগটা বসে পড়ে না। বাইরের বৃষ্টির মতো গল্প করবার মুখর আনন্দটাও ঝুরু-ঝুরু করে ঝরে পড়তে থাকে।

সন্দীপ বলে—দাদুর কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ক্লে-পিজিয়ন শুটিং-এ ফার্স্ট হয়েছিলে?

দীপালি—হ্যাঁ, তিনবার ফার্স্ট হয়েছি।

হাত দুটোকে হঠাৎ একটা রাইফেল তোলার ভঙ্গিতে তুলে ধরে, আর সন্দীপের বুকের দিকে তাক্ করে হাসতে থাকে দীপালি—এতদিন শুধু মাটির পায়রা বধ করেছি, এবার বালিগঞ্জের একটা জীবন্ত পায়রাকে বধ করবো।

সন্দীপ—সে পায়রা বেচারা তো বধ হয়েই গিয়েছে। আবার কেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আলিপুরের পায়রা কী এখনও বধ হয়নি?

পাগলি-ঝোরার চঞ্চল হর্ষের কলস্বর হঠাৎ যেন একটু নিবিড় হয়ে ছলছল করে, দীপালি বলে—সে কথা আর জিজ্ঞেস করছো কেন? সত্যি, আমি কোন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, একটা অচেনা মানুষকে একদিনেই এত ভাল লেগে যাবে।

বাড়িয়ে বলেনি, দীপালি। সেই প্রথম দিন, যেদিন এম্সেনের বাড়িতে এসে চা খেয়েছিল সন্দীপ, সেদিন দীপালি শুধু একবার সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই দাদুর চেয়ারের গা-ঘেঁষে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। দাদু যখন বললেন, এবার আমাদের দীপের একটা গান শোন সন্দীপ, শুধু তখন এক-বার চমকে উঠে আর হেসে হেসে, সন্দীপের মুখের দিকে আরও ভাল করে তাকিয়ে দাদুর কথার জবাব দিয়েছিল দীপালি।—উনি গান শুনতে ভালবাসেন কী না, জানি না।

সন্দীপ—খুব ভালবাসি।

কী সুন্দর স্বরে আর কী চমৎকার ভঙ্গিতে কথাটা বলেছে সন্দীপ। শুনে মনে হয়েছিল দীপালির, গানকে নয়, সন্দীপ যেন দীপালিকেই বলছে, খুব ভালবাসি।

একবার অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল দীপালির, এটা হয়তো দীপালির মনের একটা আশার কুহকের কথা। সন্দীপ রায় শুধু চা খেয়েই চলে যাবার জন্যে এসেছেন। শুধু দাদুর কথার মানরক্ষা করবার জন্যে গান শুনতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু দীপালি তার মনের এই মুহূর্তের মুগ্ধতার কাছে অস্বীকার করতে পারেনি যে, শুধু দাদুর ইচ্ছেটা নয়, দীপালিরও খুশি-মনের ইচ্ছেটাও সন্দীপ রায়কে গান শোনাতে চাইছে।

দীপালি হাসে—আমি কি এই চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গান গাইবো?

এম্সেন ব্যস্তভাবে বললেন—না না, তোমরা দু'জন এখন ওই ঘরে গিয়ে বসো।

দাদুর ব্যস্ততা ও আগ্রহের রকম দেখে দীপালির আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, দাদুর প্রাণটা নাতনীর প্রাণের আগেই সন্দীপকে পছন্দ করে ফেলেছে। কুঁড়ি ধরতে আর ফুল ফুটতে একটুও সময় নিল না, আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। কিন্তু একটুও খারাপ আশ্চর্য বলে তো মনে হচ্ছে না। কারোলবাগের 'হামেশা বাহার' নামে লেডিজ ক্লাবটা যেদিন একটু উদার হয়ে নারী-পুরুষের মিক্সড্ ক্লাব হয়ে গেল, আর পুরনো নিয়মটাকে শুধরে দিয়ে প্রস্তাব নিল যে, এবার থেকে বিবাহিত মেয়েরা তাদের স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে আসতে তো পারবেই এমন কী ইচ্ছে

করলে কুমারী মেয়েরা তাদের বয়-ফ্রেণ্ডকেও সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের আনন্দে সামিল হতে পারবে, সেদিন এমন কিছু খুশি হতে পারেনি দীপালি। বরং একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল যে, হিমাংশু মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভিতরে ঢুকলে সবাই মনে করবে যে, এই বুঝি মিস দীপালি সোমের ফ্রেণ্ড। হিমাংশুকে এড়িয়ে একা-একা ক্লাবে আসবার আশা কম। বড্ড ছিনেজোঁক স্বভাবের মানুষ এই হিমাংশু। ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে মথুরার গয়লানী সাজবে বলে মনে করেছিল দীপালি। হিমাংশুও অদ্ভুত একটা জেদ ধরে বসলো, সে মথুরার গয়লা সাজবে। দূর দূর, রাগ করে ফ্যান্সি ড্রেসের অনুষ্ঠানের দিনে ক্লাবেই যায়নি দীপালি। আর, অজিত খোসলার আশাও একটা বলিহারি জেদ। এক বছর ধরে অকারণে দৌড়াদৌড়ি করেছে অজিত। রোজই একবার এমসেনের কারোলবাগের বাড়িতে হাজিরা দিয়েছে। কারোলবাগের কাকও এত নিয়মিত সময়ে আর এত লোভী হয়ে কারও বাড়িতে আসে না। বাড়ির বাইরের ঘরে, যে-ঘরে টিউটরের কাছে বসে লেখাপড়া করে রব আর রিটা, সেই ঘরের ভিতরে একটা গদিহীন চেয়ারের উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করে দিয়েছে অজিত। দীপালি শুধু একবার এই ঘরের ভিতরে এসে অজিতের সামনে বড় জোর দু'-তিন মিনিট দাঁড়িয়েছে আর হেসে হেসে কথা বলেছে—ছবি আঁকতে অজন্তা যাচ্ছেন কবে?

অজিত হাসে—আগে আপনার ছবি আঁকবো, তারপর যাব।

দীপালি—কবে আঁকবেন বলে আশা করেন?

অজিত—আপনি যেদিন বলবেন।

দীপালি—তবে সেই আশাতেই থাকুন।

হঠাৎ কথা ফুরিয়ে দিয়ে আর হাসির ফোয়ারা উথলে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছে দীপালি। আর, অজিত খোসলা সেই হাসির ফোয়ারার শব্দ শুনে যেন ধন্য হয়ে চলে গিয়েছে। পরদিন আবার এসেছে।

ফ্লাইং-অফিসার কুশল সিং-এর প্রেমিকা মঙ্গলার কাছে অজিত খোসলার কথা বলতে গিয়ে বার বার হেসে ফেলেছিল দীপালি। মঙ্গলা বলেছিল—ওকে দৌড়তে দাও, তুমিও শুধু ওইরকম একটু হেসে ওকে আরও দৌড় করিয়ে হয়রান করে দাও। তারপর নিজেই সরে যাবে।

তাই হয়েছিল। এক বছর ধরে দৌড়াদৌড়ি করবার পর অজিত খোসলা আর আসেনি। ছবি আঁকতে অজন্তা চলে গেল। জানে না দীপালি, ফিরে আর দিল্লিতে কখনও এসেছিল কী না অজিত।

সন্দীপকে দেখে প্রথম দিনেই দীপালি সোমের মনে ফুলবনের হঠাৎ-উতলা বাতাসের মতো সাড়া জাগিয়ে যে ইচ্ছেটা দেখা দিয়েছিল, সে ইচ্ছে কোনদিনও আর কাউকে দেখে কখনও দীপালির মনে দেখা দেয়নি। তাই সন্দীপকে গান শোনাতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেনি। পর পর দুটি গান গেয়েছিল দীপালি। 'বাঁধিয়ে কী দিয়ে, রেখেছো হৃদি এ'; তারপর 'দিল মেরে দিওয়ানা'।

প্রথম দিনেই দীপালির গানের মধ্যে অকুণ্ঠ অভ্যর্থনার যে স্বাদ পেয়েছিল সন্দীপ, সে স্বাদ এই দুই মাসের মেলামেশার মধুরতায় আরও মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কেনই বা না হবে? দীপালির মুখের দিকে তাকিয়ে কোনদিনও সামান্য একটু গম্ভীরতার ছায়া দেখতে পায়নি সন্দীপ। কোনদিনও কোন আনমনা ভাবনার ছায়া দীপালির চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দেখেনি। দীপালির মনপ্রাণ যেন সর্বক্ষণ হাসছে। সন্দীপের সঙ্গিনী হয়ে ছুটোছুটি করবার এই জীবনের মধ্যেই দীপালি তার প্রাণের সবচেয়ে বড় আনন্দের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে।

দীপালির জন্মদিনের পরদিনের বিকেল-বেলাটা যে এত সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, ভাবতেই পারেনি দীপালি। বর্ষাকালের কলকাতার ভাগ্যে এরকম ঝলমলে বিকেল একটা দৃশ্যের মতো দৃশ্য বটে। বাইরে বের হবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল দীপালি। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ যেন মনের ভুলে বেশ একটু অদ্ভুত রকমের সাজ করে ফেলেছে। ক্রীম মাখানো ফাঁপানো চুলের স্তবক নয়, ডবল বেণী। ফুরফুরে স্বচ্ছ মসলিনের সেই জেব-উন্নিসা নয়, একটা লালপেড়ে ধনেখালি, আঁচলটা কোমরেতে এক পাক জড়ানো। গায়ে সেই ছোট রেশমী চোলির একফালি আবরণ নয়, একটা ব্লাউজ। কপালে কুমকুমের টিপ। দেখে সন্দেহ হতে পারে, দীপালি সোম বুঝি ইচ্ছে করে এরকম মূর্তিমতী আটপৌরেটি হয়ে কোন ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে গিয়ে চমক সৃষ্টি করবার মতলব ধরেছে।

সন্দীপ এসেই চমকে ওঠে—এ কী?

দীপালি হাসে—মন্দ কী?

সন্দীপ—মন্দ না হোক, ভালও নয়। এরকম সাজে দীপকে বেশ একটু নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে।

দীপালি বলে—যেমনই দেখাক, আজ এই রকমই সাজবার শখ হলো।

সন্দীপ—কিন্তু…।

দীপালি—কিন্তু আবার কী? অত খুঁটিয়ে চিন্তা করছো কেন? বাইরে গিয়ে এই বিকেলবেলার আলোতে ময়দানের কাছে একবার দাঁড়াই, তখন বলো, কেমন দেখাচ্ছে তোমার দীপালিকে।

সন্দীপের একটা হাত ধরে টান দিয়ে, আর কলকল হাসির ফোয়ারা উথলে দিয়ে কথা বলে দীপালি—না ময়দানে নয়, আজ তোমার সঙ্গে অনেক দূরে চলে যাব। চল, ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে যত দূর পারি চলে যাই। সূর্য ডুবলেই ফিরে আসবো।

হেসে ওঠে সন্দীপ, দীপালির কাঁধে হাত রাখে।—বাঃ, তোমার মুখ থেকে এ-কথা শোনবার জন্যেই তো কান পেতে রয়েছি।

বাড়িয়ে বলেনি সন্দীপ। সন্দীপের প্রাণটাই হেসে উঠেছে, যেন মেঘমুক্ত নীলাকাশের হাসি। দীপালির কলকল হাসির শব্দের মধ্যে পাগলি-ঝোরার প্রাণের এক ঝলক হর্ষের শব্দ শুনতে পেয়েছে সন্দীপ।

দীপালি বলে—চল।

সন্দীপ বলে—চল, আর দেরি করে লাভ নেই।

॥ আট ॥

ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশে একটা ধানক্ষেতের কাছে এসে থেমে পড়েছে সন্দীপের ক্যাডিলাক। এদিকে ধানক্ষেতের জলের মধ্যে নীলকলমী ফুটে রয়েছে। ওদিকে ধানক্ষেতের শেষ সীমাটা গাছপালা নিয়ে ডুবন্ত সূর্যের লাল আভার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সন্দীপের পাশে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে ডুবন্ত সূর্যের ছবি দেখছে দীপালি। বড়ই শান্ত আর বড়ই স্থির, দীপালির এই মূর্তি।

একটুও হাসছে না দীপালি, কোন কথাও বলছে না। আকাশের রঙিন আভা দীপালির মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু দীপালি তো এতক্ষণের মধ্যে একবারও সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করলো না, বল এবার কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? জিজ্ঞাসা করলে বেশ স্পষ্ট করেই বলে দিতে পারবে সন্দীপ, না, মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না।

দীপালি কি সত্যিই কিছু ভাবছে? না, শুধু মনে মনে ওর নিঃশ্বাসের শব্দগুলিকে শুনছে? ইচ্ছে হয় সন্দীপের, দীপালির এই শান্ত ও স্তব্ধ মূর্তির কাঁধটাকে আস্তে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, এদিকে এভাবে আর বেশি সময় নষ্ট করলে ওদিকে কলরডোর জ্যাজ ফুরিয়ে যাবে। ডুবন্ত সূর্যের ছবিটার মধ্যে কী এমন বিস্ময় আছে যে, ওরকম অপলক চোখে তাকিয়ে দেখতে হবে।

দেখতে পায় সন্দীপ, দীপালির এতক্ষণের শান্ত মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কেন? ভুরু দুটোই বা এমন করে কুঁচকে রয়েছে কেন? দুঃসহ অস্বস্তিটাকে আর সহ্য করতে না পেরে ডাক দেয় সন্দীপ—দীপ।

কী অদ্ভুত ব্যাপার। সাড়া দেয় না কেন দীপালি? ডুবন্ত সূর্যের রাঙা আলোর জাদুতে কি বোবা হয়ে গিয়েছে দীপালি? না, কান দুটোই বধির হয়ে গিয়েছে?

চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ—দীপ, শুনছো?

দীপালি—শুনছি, বল।

সন্দীপ—চল, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই।

দীপালি—সত্যিই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ইচ্ছে করছে, বসে পড়ি।

সন্দীপ—কোথায় বসবে? সড়কের এই ধুলোর উপর?

হাসতে চেষ্টা করে দীপালি—তা··· আজ না হয় ধুলোর উপর একটু বসলামই।

সন্দীপ—তোমার এই কিম্ভূত আটপৌরে সাজ দেখে আমার ঠিক এই ভয়ও হয়েছিল যে তুমি আজ একটা কিম্ভূত কাণ্ড না করে ছাড়বে না।

দীপালি—তবে চল, ফিরেই যাই।

সন্দীপের ক্যাডিলাক আবার শব্দ করে কলকাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে। দীপালি বলে—আজ কিন্তু আমি আর কোথাও যাব না। কলরডোর জ্যাজ না হয় আর একদিন শোনা যাবে, আজ থাকুক।

সন্দীপ—কেন?

দীপালি—আজ আর ইচ্ছে করছে না।

সন্দীপ—ইচ্ছেই বা করছে না কেন?

দীপালি—কিছু মনে করো না, আজ সত্যিই বেশ ক্লান্তি বোধ করছি।

চমকে ওঠে সন্দীপের বুকটা। দীপালির মুখে ক্লান্তির কথা। এ যে একটা মিথ্যে পৃথিবীর বাজে ঠাট্টার প্রতিধ্বনি। পাগলি-ঝোরার জল কি গতি হারিয়ে হঠাৎ একটা হ্রদ হয়ে গেল, কোন পদ্মফুল ফুটবে আশা করে?

আলিপুরের এমসেনের ফটকের কাছে এসেই থেমে যায় ক্যাডিলাক, ভিতরে আর ঢোকে না। নেমে যায় দীপালি, সন্দীপ কিন্তু ষ্টিয়ারিং চাকাতে হাত রেখে সীটের উপর বসেই থাকে।

দীপালি—এ কী? তুমি নামবে না? ভিতরে যাবে না?

সন্দীপ—তুমি আজ বড়ই ক্লান্তি বোধ করছো। তোমাকে আর বিরক্ত করা উচিত নয়।

দীপালি—ছি-ছি, তুমি খুবই ভুল বুঝেছ। তোমার কাছে বসে থাকতে তো ক্লান্তি নেই। তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে থাক, যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে বসিয়ে রাখ। আমার তাতে কোন ক্লান্তি হবে না, একটুও না।

গাড়ি থেকে নেমে আর দীপালির সঙ্গে হেঁটে বারান্দার উপরে উঠতেই থমকে দাঁড়ায় সন্দীপ।—আজ আর উপরে যাব না, দীপ, এখানেই বসি।

দীপালি—বেশ তো, এখানেই বসি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দার দেয়ালের গায়ের আলো নিবিয়ে দেয় দীপালি।

—এ কী করলে? চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।

দীপালি—মনে হচ্ছে, সামনের বাড়ির জানলাতে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে আর এদিকে তাকিয়ে আমাদের দু'জনকে দেখছে।

সন্দীপ—দেখুক না, তাতে আমাদের কিসের ক্ষতি?

দীপালি—না সন্দীপ, ওরকম করে কেউ আমাদের দু'জনকে দেখবে কেন? আমরা কি দুটো আশ্চর্য প্রাণী?

—তোমার ক্লান্তির রহস্যটা বোধহয় বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝলে?

—আমার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে তোমার আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

—না, অনেক তো হলো। আর কেন?

—কিন্তু এরকম ঘরকুনো হয়ে আর থিতিয়ে বসে থাকাই কি ভালবাসার এক-মাত্র নিয়ম ?

—না, তা নয়, কিন্তু সর্বক্ষণ ছুটোছুটি করাই কি একমাত্র নিয়ম ?

—বুঝতে পারছি না, দীপ ; তোমাকে আজ এরকম একটা তর্কের ভূতে ধরেছে কেন ? তুমি তো কোনদিনও এরকমের একটিও কথা বলনি।

—খুব সত্যি কথা, কোনদিনও বলিনি।

—বরং ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলে।

—বলেছিলাম।

—তবে আজ আবার হঠাৎ মিছিমিছি···।

—আজ হঠাৎ মনে হয়েছে যে···।

সন্দীপ বলে—বল, আজ হঠাৎ কী মনে হয়েছে ?

কথা বলতে গিয়ে দীপালির গলার স্বর যেন নিবিড় হয়ে ভরাট হ্রদের জলের মতো টলমল করে।

—মনে হয়েছে, তোমাকে আমি ঠকাচ্ছি।

সন্দীপ—তার মানে ?

দীপালি—তোমাকে আমি খুব বেশি ছুটোছুটি করিয়েছি। আর তুমিও অদ্ভুত, শুধু ছুটোছুটি করেই খুশি হয়েছো।

সন্দীপ—খুশি হওয়া উচিত, তাই খুশি হয়েছি। তোমারও খুশি থাকা উচিত।

দীপালি—না।

সন্দীপ—তবে কি ছাঁদনাতলায় যাওয়া উচিত ?

দীপালি—ওরকম তুচ্ছ করে কথাটা বলো না।

সন্দীপ—তুমিই একদিন ছাঁদনাতলাকে তুচ্ছ করে আর ঠাট্টা করে বলেছিলে যে, ওটা একটা ফাঁসিতলা।

দীপালি—বলেছিলাম, খুব ভুল কথা বলেছিলাম। তখন তো ধারণা করতে পারিনি যে, তোমার জন্যে আমার মনে অন্য রকমের একটা মায়া এসে আমাকে এত ভাবিয়ে তুলবে।

হেসে ফেলে সন্দীপ।—অন্য রকমের মায়া। কথাটা শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু···

—কিন্তু কী ?

—অন্য রকমের মায়াটা সাত তাড়াতাড়ি একটা বাঁধাবাঁধির ব্যাপার হয়ে উঠলে ভাল হয় না।

—খারাপই বা কী হয় ?

—সেটা তোমাকে আমি শতকথা বলেও বোধহয় বোঝাতে পারবো না।

—কেন পারবে না ?

—তোমার মতো মেয়ের মনেও একটা সেকেলে গোঁয়ার্তুমি লুকিয়ে আছে

বলে মনে হচ্ছে।

—সেকেলে ?

—হ্যাঁ।

—ভালবাসার মানুষটা যদি বিয়ে করতে চায়, তবেই কি সেটা একটা সেকেলেপনা হয়ে গেল ?

—আমি ঠিক ওকথা বলছি না।

—তবে কী বলছো ?

—আমি বলছি, একটু দেরি করা উচিত।

—দেরি করে লাভ কী ?

—লাভ আছে। দেরিটা হলো ভালবাসার পরীক্ষা।

—দুটো মাস তো পার হয়েছে। পরীক্ষার যা কিছু ছিল, তাও হয়ে গিয়েছে।

—আমি এখনও ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না দীপ, তুমি কী বলতে চাইছো।

—তুমি তোমার মার কাছে আমার কথা কোনদিন বলেছো ?

—না।

—এবার তবে বলে দাও।

—আরও দু'তিনটে মাস দেরি করলে কি ভাল হয় না ?

—আর দেরি করতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্বাস কর সন্দীপ, আমি বড্ড ক্লান্ত। আর ছুটোছুটি না করে তোমার বুকের উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

দীপালির শেষ কথাটা যেন ছোট একটা উচ্ছ্বাসের মত শব্দ তুলেই নীরব হয়ে গেল। হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো নাকি দীপালি ? কিংবা ঢোঁক গিলে একটা নিঃশ্বাসকে বুকের ভিতর আটকে রেখে দিল ? বারান্দায় অন্ধকার, তাই দেখতে পায় না সন্দীপ, ক্লে পিজিয়ন শুটিং-এ তিনবার ফার্স্ট হয়েছে যে মেয়ে, সে মেয়ের চোখের পাতা কেমন করে ভিজে যায়।

সন্দীপ—সত্যি যদি বুকের উপর শুয়ে পড়বার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে শুয়ে পড়লেই তো হয়। বাধা কোথায় ? অসুবিধেরই বা কী আছে।

দীপালি—ছি সন্দীপ, এরকম ভয়ানক কথা বলতে নেই। তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করে একথা বলছো। না, রাগ করো না সন্দীপ।

সন্দীপ বলে—আচ্ছা, আমি এখন চলি।

দীপালী—এসো। মা কী বললেন, সে কথা আমাকে কিন্তু কালই বলবে।

সন্দীপ—মা যদি বলেন, না, এখনই নয়। কিংবা কোনদিনও নয়, তবে ?

দীপালি—তবে আমি নিজেই তোমার মার কাছে যাব আর বলবো যে, আমি তো একটা রকেট নই মা, আমি মানুষেরই মেয়ে। একটা শূন্যের মধ্যে আর কত-কাল ছুটে বেড়াতে পারি, বলুন ?

সন্দীপ—আচ্ছা।

॥ নয় ॥

মৃদু ঝড়ের বাতাস হঠাৎ এক-একবার মত্ত হয়ে উঠছে। বাগানের শিরীষের মাথা থেকে শুকনো পাতার এক-একটা ঝটকা জানালা পার হয়ে ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে। সন্দীপের গেলাসের ভেতরেও কয়েকটা শুকনো পাতা ভাসছে। গেলাসের হুইস্কির এই অবস্থার চেহারাটা সন্দীপের চোখে বোধহয় পড়েনি। তাই গেলাসটাকে হাতে ধরেই বসে আছে। যে চিন্তার ঝঞ্ঝাট থেকে এইমাত্র মুক্ত হয়ে গিয়েছে সন্দীপের উদ্বিগ্ন মন, সে চিন্তার একটা আবছায়া এখনও মুখের আর চোখের উপর থমকে রয়েছে।

এই দশ দিনের মধ্যে আলিপুরের এমসেনের বাড়িতে আর যেতে পারেনি সন্দীপ। টেলিফোনেও দীপালিকে কোন কথা বলতে পারেনি। দীপালিও এই দশদিনের মধ্যে একবারও টেলিফোন করে সন্দীপকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। একটুও স্বস্তি বোধ করতে পারেনি সন্দীপ। সব সময় মনের মধ্যে একটা ভয় ছম-ছম করেছে, এই বুঝি দীপালির অদ্ভুত জিজ্ঞাসার কথাটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো। রাস্তার গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠতে হয়েছে, এই বুঝি এমসেনের বাড়ির গ্যারেজের সেই কড়া রঙের টুরার ছুটে এল।

দশদিন পর আজ এইমাত্র, এই পাঁচ মিনিট হলো, দীপালির জিজ্ঞাসার কথাটা টেলিফোনে বেজে উঠেছে।—কে ? সন্দীপ ?

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমি।

—তোমার কি অসুখ করেছে ? শরীর ভাল নয় ?

—অসুখ করেনি, শরীর ভাল আছে।

—কাজের চাপ বেড়েছে ?

—না।

—তবে এলে না কেন ? আসছো না কেন ?

—তুমি কি আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটা ছবি দেখতে যেতে পারবে ?

—না।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

—যেও।

—আর কি কিছু তোমার জিজ্ঞেস করবার আছে ?

—না।

—তবে আর··· ।

—তবে শোন, শুধু একটি কথা বলতে চাই।

—বল।

—আমি কোনদিন ভুলেও আপনার মার কাছে গিয়ে কোন কথা বলবো না।

—কী বললে ?

—আপনি এখন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, মিস্টার রায়। আপনার নাম

করে কোন কথা কারও কাছে বলতে, আমার নিজের কাছেও বলতে, আমার মনে একবিন্দু ইচ্ছেও আর নেই।

খট্ করে একটা শব্দ করে স্তব্ধ হয়ে গেল টেলিফোন। বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, দীপালির শেষ জিজ্ঞাসায় সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, রিসিভার নামিয়ে দিল দীপালি।

সন্দীপের এই দশদিনের ভয় আর অস্বস্তির তো সমাধি হয়ে গেল। তবু সন্দীপের চিন্তান্বিত মুখটা এখনও পরিচ্ছন্ন ও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। আলি-পুরের এমসেনের নাতনীর ভেল্‌কি দেখে আশ্চর্য হয়েছে সন্দীপ। কী ভয়ানক ভেল্‌কি। জেব-উন্নিসা মসলিন এক মুহূর্তের মধ্যে আটপৌরে ধনেখালি হয়ে গেল। সন্দীপের নিশ্চিন্ত প্রাণের বিশ্বাসটাকে হঠাৎ এভাবে অপমানিত করতে দীপালির একটুও বাধলো না। দীপালির ভেল্‌কি যেন একটা হিংস্র নখর, সন্দীপের জীবনে স্বপ্নটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে।

বিনায়ক যদি জিজ্ঞাসা করে, কী হলো, দীপালিকে বিয়ে করতে তোমার অনিচ্ছা কেন,—তবে জবাব দিতে পারবে সন্দীপ—না অনিচ্ছা নেই, তবে ভয় আছে।

ভয় এই যে, বিয়ে হয়ে যাবার পর দীপালির ভেল্‌কি আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে। ঘরের বাইরে বের হতেই চাইবে না। যদি নিতান্তই বের হতে চায়, তবে মাসি-পিসির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যেতে চাইবে না। সন্দীপের হাত ধরে আর হেসে-হেসে ঝলমলে বাইরের উৎফুল্ল আলো-ছায়ার কাছে ঘুরে বেড়াতে কোন আনন্দ পাবে না। মনে করবে, এসব হলো জীবনের যত পণ্ডশ্রম। শামুক যেমন ডোবার পাঁকটুকুর মধ্যে থেকেই সুখী, দীপালিও তেমনই ঘরকুনো আহ্লাদের একটা ডোবার মধ্যে থেকেই সুখী হয়ে যাবে। দীপালির ভাব-ভঙ্গি কথা ও ভাবার মধ্যে এরকমের একটা নিউরোসিসের লক্ষণ ধরা পড়ে গিয়েছে। এরকম মেয়ের সঙ্গে সন্দীপের বিয়ে হলে, সেটা নিতান্ত শরীরের বিয়ে ছাড়া আর কিছু হবে না, হতেও পারে না।

এমসেনের নাতনী বলেছেন যে, তাঁর আর ছুটোছুটি করতে ভাল লাগছে না। কিন্তু তিনি তো ভালই জানেন যে, সন্দীপ রায় ঘরকুনো জীবনকে ঘেন্না করে, ছুটোছুটি করতেই ভালবাসে। তবে তিনি আর কী করে, কেমন মন নিয়ে সন্দীপ রায়কে ভালবাসতে পারবেন? তিনি কি এমনই মহীয়সী যে, পাপকে ভালবাসবেন না, কিন্তু পাপীকে ভালবাসবেন? তোমার ছুটোছুটিকে ভাল লাগে না, কিন্তু তোমাকে ভাল লাগে। বাঃ, কী চমৎকার একটি মিথ্যেবাদী হেঁয়ালির কথা। জিজ্ঞাসা করি, সন্দীপ রায়ের প্রাণের স্বভাবটাকে না ভালবেসে সন্দীপ রায়কে ভালবাসতে পারা যাবে কী করে?

বিশ্বাস ছিল, দীপালি কখনও হেঁয়ালি হয়ে যাবে না। বিশ্বাস ছিল, বিয়ে হোক বা না হোক, দীপালি সোম চিরকাল সন্দীপ রায়ের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে,

সন্দীপের হাত ধরে চারদিকের সব সাধ ও সব আনন্দের কাছে ঘুরে বেড়াবে ! দীপালি হবে সন্দীপের তৃপ্তি ও গর্বের ছবি, আর সন্দীপ হবে দীপালির তৃপ্তি ও গর্বের ছবি। সন্দীপ রায়ের সে বিশ্বাস ওই মেয়েই তো মাতিয়ে তুলেছিল। তুমি মেয়েই না সেদিন ব্যালে দেখে বিহ্বল হয়ে হাজার লোকের চোখের সামনে, সন্দীপ রায়ের বুকের উপর তোমার মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়েছিলে ? সন্দীপ রায়ের সে বিশ্বাস তুমি কত সহজে ভেঙে দিলে। এটা যদি নিওরোসিস না হয়, তবে বলতে হয়, এটা সাপিনীর স্বভাব। আচমকা আর খুবই অকারণে তুমি সন্দীপ রায়ের নিশ্চিন্ত প্রাণটার উপর ছোবল দিয়েছো। তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না।

কই, বিনায়ক এখনও আসছে না কেন ? মন্দারই বা আসতে এত দেরি করছে কেন ?

এতক্ষণে চোখে পড়ে সন্দীপের, গেলাসের ভিতরে আবর্জনা ভাসছে, শিরীষের শুকনো পাতা। গেলাসটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে দরজার দিকে তাকায়।

বিনায়ক আর মন্দার, দু'জনে এক সঙ্গে হেঁটে আর হেসে-হেসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর রাখা গেলাসটাকে হাত বাড়িয়ে নেয় মন্দার। বিনায়ক তাঁর পাইপের মুখের ভিতর তামাক এঁটে ও টিপে দিয়ে সন্দীপের মুখের দিকে তাকান আর কথা বলেন।—আজ সন্দীপকে একটু অতিরিক্ত প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সন্দীপ—অপ্রসন্নতারই উল্টো-পিঠের নাম প্রসন্নতা। নয় কি ?

বিনায়ক—ওঃ ওঃ, তোমার কথার স্টান্ট বড় চমৎকার, বড়ই সুন্দর। এবং স্টান্ট হলেও কত লজিকাল। আমার জিজ্ঞাস্য, তোমার প্রসন্নতার উল্টো-পিঠে সত্যিই কি কোন অপ্রসন্নতা আছে ?

সন্দীপ—আছে।...এঃ, মন্দারের বকরাক্ষুসে কাণ্ডটা দেখলে না, বিনায়ক ?

বিনায়ক মুখ ঘুরিয়ে মন্দারের মুখের দিকে তাকান। সন্দীপ বলে—ওই গেলাসের মধ্যে এই রকম অনেকগুলো শুকনো শিরীষপাতা পড়েছিল। বকরাক্ষস এক চুমুকে হুইস্কির সঙ্গে পাতাগুলোকেও গিলে ফেলেছে।

মন্দার—আমি মনে করেছি, ওটা একটা স্টাইল।

সন্দীপ—হুইস্কির মধ্যে আবর্জনার মতো একগাদা শুকনো শিরীষপাতা ; এটা স্টাইল হয় কী করে ?

মন্দার—বড়লোকের স্টাইল ওই রকমই হয়।

বিনায়ক—যাক্, যা হবার ছিল তা হয়েই গেল। তুমি তোমার স্টাইলে আর একটু হুইস্কি খাও, মন্দার। এবার তুমি বল সন্দীপ, কী যেন বলছিলে ? হ্যাঁ, প্রসন্নবাবুর সঙ্গে তোমার কী বিষয়ে কী যেন মতভেদ আছে ?

সন্দীপ—মনে হচ্ছে, আজ বেশ তৈরি হয়ে এসেছো, বিনায়ক। কোথায় গিয়েছিলে যে এতটা রসস্থ হতে হলো ?

বিনায়ক—গুণাকর দত্তের নাম শুনেছো ? একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়, সেই গুণাকর দত্তের নাম কখনও শুনেছো ?

সন্দীপ—না।

বিনায়ক—না শোনবারই কথা। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগের ইঙ্গো-বার্মা শিপিং কোম্পানির প্রাক্তন ডিরেক্টর গুণাকর দত্ত আজ একজন অর্থবিদ্যা-মহার্ণব, রেসুড়ে জগতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

মন্দার—বুড়োটাকে আমি দেখেছি। আলখাল্লার মতো দেখতে মস্তবড় একটা পাঞ্জাবি আর ঢলঢলে পায়জামা পরে, আর বাঘছালের জুতো পায়ে দিয়ে পার্ক সার্কাসের বাজারে মুর্গী কিনতে আসে।

বিনায়ক—না, না। গুণাকর দত্তের চেহারাটা বাঘের মতো নয়; মুর্গীর মতোও নয়। বেশ সুন্দর চেহারা।

সন্দীপ—যা-ই হোক, তুমি গুণাকর দত্তের কথা বল।

বিনায়ক—তাহলে তো বলতে হয়, কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। শেয়ার-টেয়ার সব বেচে দিয়ে আর শেয়ার-বেচা টাকার প্রায় সবই ঘোড়ার নামে এবং আরও বিবিধ আনন্দের নামে ফুঁকে দিয়ে চমৎকার একটি নির্ধনপতি সদাগর হয়ে গেলেন গুণাকর দত্ত। সাতটি বছর, বাস্, তারই মধ্যে সবকিছু ফুস্।

হাসতে থাকে সন্দীপ।—বিনায়ক হালদারের প্রাণ আজ তুরীয়ানন্দের সাগরে ডুবে গিয়েছে।

বিনায়ক—ঠিক, খুব ঠিক। গুণাকর দত্তের অনুরোধের চাপে পড়ে জলীয় বস্তুটা খুব বেশি খেয়ে ফেলেছি। এর চেয়ে ভাল হতো, যদি সক্রেটিসের মতো এক গামলা হেমলক খেয়ে ফেলতাম।

মন্দারও হাসে।—আমলকীতে নেশা কাটে না, তেঁতুলে কাটে।

সন্দীপ—আর কাটে গবেট মন্দারের কাঁচা মাথাটাকে চিবিয়ে খেলে।

বিনায়ক—গুণাকর দত্ত কিন্তু সত্যিই একজন সুপারম্যান। যখন ধনপতি ছিলেন, তখন আমির আলি অ্যাভনিউ-এর যে বাড়ির যে ফ্ল্যাটে ছিলেন, আজও সেই বাড়ির সেই ফ্ল্যাটে আছেন। ঠাটবাট দেখলে কারও সামান্য একটু সন্দেহ করবারও সাধ্যি হবে না যে, উনি বস্তুত একজন শূন্যকুম্ভ। দশ বছর ধরে শুধু ধার-কর্জ করে যে এরকম একটা জমকালো জীবনের খরচ চালিয়ে দিতে পারা যায়, সেটা গুণাকর দত্তকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

মন্দার—কিন্তু কই, আমি তো চেয়ে চেয়েও পাঁচটা টাকা ধার পাই না।

বিনায়ক—তোমার কথা আলাদা। তুমি হলে একজন সাংঘাতিক মন্দার দত্ত। তুমি গুণাকর দত্ত নও। তুমি কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছ। তোমাকে চিনে নিতে আর বুঝে ফেলতে কারও ভুল হতে পারে না। যাই হোক, এবারে একটু কান লাগিয়ে আমার কথাটা শোন, সন্দীপ।

সন্দীপ—কান লাগিয়েই আছি, বল।

বিনায়ক—গুণাকর দত্ত একবার তোমার কাছে এসে বিশেষ দরকারের কিছু কথা বলতে চান। তুমি যদি আসতে বল, তবেই তিনি আসবেন। নচেৎ নয়।

সন্দীপ—না, এসব লোকের কোন বিশেষ দরকারের কথা শুনতে আমি রাজী নই। বিশেষ দরকার মানে তো ওই একটি দরকার, টাকা ধার পাওয়ার দরকার।

বিনায়ক—না, তিনি আমাকে বলেছেন এবং তোমাকেও বলতে বলেছেন যে, টাকা ধার চাইবার কোন ইচ্ছে নিয়ে নয়, তিনি অন্য কোন বিষয়ে, একেবারে ভিন্ন কোন বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমার মনে হয়, করেন কারেন্সি নিয়ে তিনি একটা সমস্যায় পড়েছেন।

সন্দীপ—বুঝেছি। না না, ওসব ব্যাপারে তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারবো না। কাজেই কোন আলোচনা করতে পারবো না।

বিনায়ক—উনি কিন্তু জানেন যে, তুমি এ-বিষয়ে অনেককে সাহায্য করেছো।

সন্দীপ—করেছি, বেশ করেছি। কিন্তু তাঁর মত একজন নির্ধনপতি সদাগরকে ও-বিষয়ে সাহায্য করবার কোন গরজ আমার নেই।

বিনায়ক—যাক, তাহলে গুণাকর প্রসঙ্গ একেবারে চুলোয় যাক। এখন বল, কী যেন তুমি বলতে চাইছিলে?

মন্দার—সন্দীপ বলছিল যে, এদিকে প্রসন্ন আর ওদিকে অপ্রসন্ন, মাঝখানে তাহলে কে আছে?

মন্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে সন্দীপ—ইনিও দেখছি চিদানন্দ সাগরে ভাসতে শুরু করেছেন।

বিনায়ক—আমারও কিন্তু একই প্রশ্ন, কে আছে?

সন্দীপ—তার মানে?

বিনায়ক—মানে হলো, কেউ কি এখনও আছে, না কেউই নেই?

সন্দীপের চোখের ভ্রূকুটি বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।—না, কেউ নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন?

বিনায়ক—কদিন আগে তোমাকে দেখলাম কি না, তখন রাত নটা হবে, তুমি একাই গাড়ি থেকে নামলে, আর জুলিয়াসের ফটো-স্টুডিওতে ঢুকলে।

সন্দীপ—হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছো। মনের ভুলে, বিশ্বাসের ভুলেও বটে, একজন ট্রেটরের ফটোর বিশ কপি প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম। জুলিয়াসকে বলে এলাম, আর প্রিন্ট করবার দরকার নেই।

বিনায়ক—ট্রেটর?

সন্দীপ—হ্যাঁ, তাকে ট্রেটর বলাই উচিত।

বিনায়ক—আমার কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে…।

সন্দীপ—যে মেয়ে দুমাস ধরে হাসাহাসি করে হঠাৎ একদিন গম্ভীর হয়ে যায়, তাকে তুমি কী বলবে?

—বলবো, তার মনের ভিতরে নতুন কিছু এসেছে।

সন্দীপ—যে মেয়ে দুমাস ধরে ছুটোছুটি করার পর হঠাৎ একদিন বলে ফেলবে, আর ভাল লাগছে না, বসে পড়তে ভাল লাগছে, তাকে তুমি কী বলবে?

বিনায়ক—বলতে তো ইচ্ছা করে যে, তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয় যে, এত সরল করে বলা যায়।

সন্দীপ—যে মেয়ে মসলিনের শাড়ি ছাড়া অন্য কোন শাড়ি ছোঁয় না, কাশ্মীরী সিল্ক যার খসখসে বলে মনে হয়, সে মেয়ে যদি হঠাৎ একদিন একটা আটপৌরে ধনেখালি পরে বসে, তবে তাকে তুমি কী বলবে?

—বলতে হয়, তার মনের মধ্যে একটা আটপৌরে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

—সে মেয়ে যদি হঠাৎ বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তাকে এই সন্দেহ করতে হয় না কি, যে···।

—সন্দেহ হয়, তার এখন গৃহিণী হবার সাধ হয়েছে, বাহিরিণী হয়ে থাকতে তার আর ভাল লাগছে না।

—কিন্তু তার স্বামী মশাইয়ের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

—তোমার মতো স্বামী হলে অবস্থাটা খুবই শোচনীয় হবে।

—সেইজন্যেই আমি সাবধান হয়েছি।

বিনায়ক—খুব ভালো করেছো।

সন্দীপ—তার ঘরকুনো আহ্লাদের দড়ি আমার জীবনটাকেও ফাঁসি দিয়ে ঘরের কোণে রেখে দেবে।

বিনায়ক—ঠিক সন্দেহ করেছো। তোমার হাত ধরে বাইরে বেড়াতে তার ভয়ানক লজ্জা হবে। বাবুর্চিকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই হেঁসেলে ঢুকবে। সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে শুরু করবে।

মন্দার বলে—একটু রাত করে বাড়ি ফিরলে মুখ শুঁকবে।

সন্দীপের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে—ওরকম একটি কট্টর গিন্নীপদার্থের মুখে মুখ রাখতে আমার গা ঘিনঘিন করবে। ওরকম মেয়েকে আমি ঘেন্না না করে পারি না।

বিনায়ক—কাজেই, যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। তুমি বেঁচে গিয়েছো, আর, সে মেয়েও বেঁচেছে।

মন্দার—কাজেই, তোমার যখন কোন সঙ্গিনী সত্যিই নেই, তখন আজ সন্ধ্যায় দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে একটা ভাল ছবি দেখে এসো।

সন্দীপ—অন্য দিন হলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আজ পারবো না। আজ আমাকে একটা নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতেই হবে। জয়াজী লিমিটেড তাদের একটা নতুন ফ্যাক্টরি চালু করবে। জয়াজীর সেক্রেটারি দু'বার ফোন করে বলেছেন—আপনাকে আসতেই হবে, না এলে খুব দুঃখিত হব।

মন্দার উঠে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে।—কাজেই দশটা টাকা দাও। আমরা দু'জনে আজ সন্ধ্যায় ছবি দেখবার সাধ মিটিয়ে নিই।

সন্দীপ—দিচ্ছি। ছবি দেখবার পর ট্যাক্সি করে বিনায়ককে বাড়িতে পৌঁছে দিও।

মন্দার—তাহলে আরও পাঁচটা টাকা দাও।

সন্দীপ—এই নাও।

॥ দশ ॥

হাইড রোডের পাশে বিরাট এক সেকেলে বাগানের আম জাম আর তেঁতুলের বড়-বড় পুরনো গাছের ভিড়ের কাছে যে প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মাথাভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অনেকের সন্দেহ হতো যে, এটা বোধহয় কোম্পানির আমলের কোন বাবু মহাশয়ের বাগানবাড়ির করুণ অবশেষ, আজ আর সেই বাড়িটার সেই চেহারার কোন চিহ্ন নেই। আজ সন্ধ্যায় সেখানে আলোর মালা জড়িয়ে ঝলমল করছে জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির বাড়ি। পুরনো আম জাম আর তেঁতুলের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে আজ ঘাস-মরা জমির উপর একটি রঙিন সামিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশটি টেবিল আর দুশো চেয়ার। টেবিলের উপর পানামোদের রুকারি সাজানো রয়েছে।

ফ্যাক্টরির সামনে একটি মেশিনের কাছে দাঁড়িয়ে বার্মিংহামের জনৈক মিস্টার ওয়েবস্টার অল্পকথার একটি বক্তৃতায় ফ্যাক্টরির উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানালেন। জনৈকা ভারতীয়া তরুণী নারকেল ফাটিয়ে মেশিনের গায়ে নারকেলের জল ঢেলে দিলেন। সুইচ টিপে দিলেন মিস্টার ওয়েবস্টার। সঙ্গে সঙ্গে গরগর করে মেশিনের আনন্দের শব্দ কাঁপতে শুরু করে দিল। ফ্যাক্টরির উদ্বোধন হয়ে গেল। চাকা লাগানো একটা চেয়ারের উপর বসে থেকেই হোস্ট জয়াজী তাঁর গেস্টদের ধন্যবাদ জানালেন। বেশ কষ্ট করে ধন্যবাদের বক্তৃতাটা পড়লেন জয়াজী, তাঁর জিভের জড়তা এখনও ভাল করে কাটেনি। ছ'মাস আগে পক্ষাঘাতের স্ট্রোক হয়ে বেচারা জয়াজী একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও হাঁটতে পারেন না, ভাল করে দাঁড়াতেও পারেন না, তাই চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে তাঁকে ঘোরা-ফেরা করতে হয়।

সামিয়ানার তলায় পানামোদের আসরের একটি প্রান্তে চাকা-লাগানো চেয়ারের উপর বসে রইলেন জয়াজী। দেখতে পায় সন্দীপ, জয়াজীর চাকা-লাগানো চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন যে ভদ্রলোক, তিনি যেন জয়াজীর প্রতিনিধি হয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করবার ভার নিয়েছেন। ভদ্রলোকের মাথাটার সবই সাদা, কাঁধটা বেশ ঝুঁকে রয়েছে, চুরুটধরা হাতটা মাঝে-মাঝে থরথর করে কেঁপে উঠছে। বেশ বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা যায় না, ভদ্রলোক কি বাঙালী, না অবাঙালী? সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা, কাঁধে একটি জরিদার সাদা চাদর, কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের হাসিটা একটুও সাদাটে নয়। বেশ উজ্জ্বল হাসি, লালচে হাসি মনে হয়। ভদ্রলোক এরই মধ্যে নিশ্চয় দু'চার পেগ পানীয় সেবন করে নিয়েছেন, নইলে, তাঁর মুখটা এত লালচে হয়ে উঠবে কেন? ভদ্রলোকের মুখে ভাষার শব্দ নেই

বললেই চলে, হাসির শব্দটাই বেশি। বুঝতে অসুবিধে নেই, এটা তাঁর জিভের কোন জড়তার ব্যাপার নয়; সেবনজাতীয় একটা বিহ্বলতার ব্যাপার।

কিন্তু আর-একজন যিনি তর্‌তর্‌ করে ঘুরে-ফিরে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি কে? যিনিই হোন, তিনিও বোধহয় এই আসরে আপ্যায়িকার কাজ করছেন। তিনি বোধহয় জয়াজীর কোন আত্মীয়া।

গত বছর কলকাতাতে লণ্ডনের এক ব্যালে-দল এসে অর্কিড-কুইন নামে যে রূপকথার নাটক নেচে দেখিয়েছিল, তার মধ্যে অর্কিড-কুইনের সাজ হাসি আর ভঙ্গি ছিল সবচেয়ে বেশি মনমাতানো দৃশ্য। দেখে কে না মুগ্ধ হয়েছিল? সন্দীপের মনে হয়, আপ্যায়িকা ওই তরুণী নিশ্চয় অর্কিড-কুইন ব্যালে দেখেছে। খুব ভাল করে দেখেছে নিশ্চয়। তা না হলে ঠিক সেই অর্কিড-কুইনের মতো সাজ হাসি আর ভঙ্গি নিয়ে নিজের চেহারাটাকে এত মাতিয়ে তুলতে পারতো না।

এই আসরে যেমন দেশী অতিথি, তেমনই বিদেশী অতিথি; যেমন পুরুষ অতিথি, তেমনই মহিলা অতিথিও আছেন। কিন্তু কেউ একজনও সন্দীপের পরিচিত নন। সন্দীপের টেবিলের তিন-দিকের তিনটি চেয়ারই শূন্য। এরকমের একলা বসে থাকতে যদিও সন্দীপের একটুও ভাল লাগে না, তবু সন্দীপের মনে কোন অস্বস্তি ছটফট করে না। সৌজন্যের খাতিরে আর দশটা মিনিট বসে থেকে, তারপর জয়াজীকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতে হবে, এই তো।

আপ্যায়িকা তরুণী এসে সন্দীপের পাশের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে। অতিথিদের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা বলছে তরুণী, সেটা ইংরেজী ভাষা। তারপরের টেবিলের কাছে গিয়ে যে-ভাষায় কথা বললো, সেটা উর্দু। কাছের আর-একটি টেবিলের কাছে গিয়ে যে-ভাষায় কথা বলে হেসে উঠলো তরুণী, তার অর্থটা না বুঝতে পারলেও এটুকু বুঝতে পারে সন্দীপ, ওটা ফরাসী ভাষা। ওই টেবিলের অতিথিরা বোধহয় ফরাসী কনস্যুলেটের লোক। গালের উপর হাতের একটি আঙুল ছুঁইয়ে রেখে আর মৃদু শ্রাগ করে কাঁধ দুটোকে একটু উথলে দিয়ে অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল তরুণী।

কোন সন্দেহ নেই, আপ্যায়নের আর্ট খুব ভাল আয়ত্ত করেছে এই তরুণী। সবারই মন যুগিয়ে হাসছে, কিন্তু কাউকে মন যোগাচ্ছে না। তরুণীর পরিচয় অনুমানেও কিছুই ধরা যাচ্ছে না। বাঙালী, না অবাঙালী? বিবাহিতা, না অবিবাহিতা? তবু কেন যেন মনে হয়, তরুণী বোধহয় তার মনটাকে গোপন সোনার কাঠির মতো এখনও তার বুকের কোটরে লুকিয়ে রেখেছে, কাউকেই স্পর্শ করতে দেয়নি।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যে-নারী তাঁর সুহাসিনী মূর্তি নিয়ে তরতরিয়ে হাঁটছে আর সব টেবিলকে লক্ষ্য করছে, সে নারী সন্দীপের টেবিলের কাছাকাছি এসেও লক্ষ্যহীন হয়ে গেল। আপ্যায়িকা তরুণী সন্দীপকে যেন দেখতেই পেল না। সন্দীপের চেহারার অহংকারটা একটু বিস্মিত হয়েছে, একটা খোঁচাও খেয়েছে

বোধহয়। আপ্যায়িকা মহাশয়া কি ইচ্ছে করেইলক্ষ্যহীন হয়ে সন্দীপের টেবিলটাকে দেখলো না, আর বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, সন্দীপের মতো রূপবানের কোন ধার সে ধারে না, এবং অনেক রূপবান তার দেখা আছে ?

যা-ই হোক, আর তো এখানে এভাবে চুপ করে বসে থাকবার কোন অর্থ হয় না। এখন চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু মনটা এভাবে অনেকক্ষণ ধরে উঠি-উঠি করেও যেন উঠে যেতে চাইছে না। যদি জানতে পারা যেতো, কে ওই তরুণী, যে এখন এই পানামোদের আসরের সব টেবিলকে হাসিয়ে আর খুশি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে এভাবে একটা অস্বস্তি নিয়ে থিতিয়ে থাকতে হতো না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায় ? জন্নাজীর জিভের জড়তার কাছে, কিংবা সাদামাথা ভদ্র-লোকের বিহ্বলতার কাছে এই জিজ্ঞাসার কথা বলে কোন লাভ নেই, বলা উচিতও নয়। বললে বেশ খারাপ শোনাতেও পারে। জিজ্ঞাসা করেও যদি জবাব না পাওয়া যায়, তবে সেটা আরও খারাপ ব্যাপার হবে।

কিন্তু না-জেনেও যে সত্যিই চলে যেতে ইচ্ছা করছে না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সন্দীপ, উঠি-উঠি করেও দেড়টি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উঠে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ট্রের উপর বোতল সাজিয়ে কতবারই তো বয় এল আর চলে গেল। বয় বলেছে, সাব, পেগ ? সন্দীপ বলেছে, না। সন্দীপ সেই প্রথম পেগের দু চুমুক স্বাদ পান করে নিয়ে পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটার পিপাসা মিটছে না, কে এই তরুণী ?

এরই মধ্যে অনেক টেবিলের উপর অনেক গেলাস গড়িয়ে পড়েছে। কারও কারও করধৃতকম্পিত-গেলাস ফস্‌কে পড়ে ভেঙেছে। এখনও ভাঙছে, ভাঙা গেলাসের ঝন্‌ঝনানি ক্রমেই বাড়ছে। অনেক টলমল চেহারা আসর ছেড়ে চলে গিয়েছে, চলে যাচ্ছে। অথচ, যার চেহারার মধ্যে একটুও টলমলানিপ্রবেশ করেনি, যার দুই চুমুকের নেশা দুই কাশিতেই ফুরিয়ে গিয়েছে, তারই মনের মধ্যে চলে যাবার কোন তাড়া নেই, তাগিদও নেই।

কিন্তু সন্দীপের বিকল ধ্যানের সব ক্লেশ বুঝি এবার ঝরে পড়ে যাবে। আপ্যায়িকা তরুণী হেসে হেসে সন্দীপের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। চোখে দেখেও আকস্মিক এই বিস্ময়ের দৃশ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারে না সন্দীপ। অবশেষে বিশ্বাস করতে হয়। সন্দীপের টেবিলের কাছে এসে একটি শূন্য চেয়ারের উপর বসে পড়েছে সেই তরুণী, নাম-না-জানা সেই প্রহেলিকা।

—আমি এষা দত্ত। আমি আপনাকে চিনি, যদিও আপনি আমাকে চেনেন না।

বহুদিনের অদেখার পর প্রিয়জনকে দেখে কথা বলতে গিয়ে যে-আবেগ গলার স্বরে উথলে ওঠে, এষা দত্তের সম্ভাষণের স্বরে যেন সেইরকম প্রীতিপুত আবেগ উথলে উঠেছে।

সন্দীপ—আমি অবশ্য আপনাকে চিনি না, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হচ্ছি যে, আপনি

আমাকে চেনেন।

এবা—আপনার কি মনে পড়ে যে, আপনি একদিন চক্রবর্তীর ছবির এগজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন?

—মনে পড়ে।

—আপনি চক্রবর্তীকে চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে?

—না। সত্যিই কোন চমৎকার কথা বলে থাকলে হয়তো মনে থাকতো।

—বলেছিলেন। সে কথাটা আমার মনের মধ্যে আজও গুন্‌গুন্ করে। আজও ভুলতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন—ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর তুলির আসল কাজ নয়, সার্থক কাজও নয়। আসল কাজ হলো, রূপের আবেগ ফুটিয়ে তোলা।

—হয়তো বলেছিলাম, মনে পড়ছে না। এবার আপনি বলুন তো, ওকথা আমি বলে থাকলে খুব ভুল কথা বলেছিলাম কী?

—আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি, আপনি কী নির্ভুল কথা বলেছিলেন। কতবার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনার কাছে গিয়ে আরও ভাল করে কথাটাকে শুনি, আরও ভাল করে বুঝে নিই।

—কিন্তু আমার নামও তো আপনার জানা নেই, আমার কাছে যেতেন কী করে?

—আপনি চলে যাবার পরে চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করে আপনার নাম-ধাম আর পরিচয় সবই জেনেছিলাম।

—তাই বলুন। রহস্যটা পরিষ্কার হলো।

—কিন্তু স্মৃতিটা বোধহয় এখনও পরিষ্কার হয়নি।

—কার স্মৃতি?

—আপনার, আমার কার?

—বুঝলাম না।

—আপনার কি মনে পড়েছে যে, সেদিন আপনার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আমি ছবি দেখছিলাম?

—আপনি? আপনি সেদিন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—না, হতে পারে না। আমার শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, চোখে খুব গাঢ়-আঁধারী একজোড়া গোগো, আর গায়ে বেশ গাঢ় নীলরঙের শাড়ি, এইরকম সাজে এক মহিলা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছবি দেখছিলেন।

—তার মানে, আমাকেই দেখেছিলেন।

—সে কী? আপনিই সেই নীলাম্বরা মহিলা?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনার স্মৃতিটা এখনও একেবারে পরিষ্কার হয়নি।

—কেন?

—আপনার কি মনে পড়ে যে, সেই নীলাম্বরা অনেকক্ষণ ধরে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল।

—না।

—ঠিকই, সামান্য মানুষের সামান্য প্রাণের কোন ব্যাপার আপনার মতো মানুষের চোখে পড়বে কেন?

—কিন্তু আপনিও তো কিছুক্ষণ আগে এখানে ওইরকম একটা ব্যাপার করে দেখালেন। আমার টেবিলের এত কাছে এসেও আমাকে দেখতেই পেলেন না।

—মনের ভুলে নয়, চোখের ভুলেও নয়, কোন মেজাজের ভুলেও নয়, আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে দেখতে পাইনি।

—অদ্ভুত ইচ্ছে।

—না, একটুও অদ্ভুত ইচ্ছে নয়। ছেলেমানুষের লোভের স্বভাব কখনও লক্ষ্য করেছেন?

—না।

—বাচ্চা ছেলে তার পাতের সবচেয়ে প্রিয় আর লোভনীয় খাবারটাকে রেখে দিয়ে অন্য সব হাবিজাবি খাবার আগে খেয়ে নেয়।

—তা জানি, দেখেছিও।

—আমিও তাই করেছি। যার সঙ্গে কথা বলতে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগবে, যাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে, তাকে ইচ্ছে করেই না-দেখার মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করছেন?

—বিশ্বাস করতে অবশ্য একটু···।

—বিশ্বাস করুন, সন্দীপবাবু।

অর্কিড-কুইনের চোখে গোগো নেই। সন্দীপের এখন ভাল করে আর স্পষ্ট করে দেখতে কোনই অসুবিধে নেই। এষা দত্তের দু'চোখের দুই কালো তারার উপর সত্যিই সুন্দর একটি আবেদনের আলো ঝিকমিক করছে।

এ কী? চমকে ওঠে সন্দীপের দুই চোখ। এষা দত্তের দুই চোখের দুই কোণ থেকে সত্যিই যে বড়-বড় দুটি জলের ফোঁটা ঝরে পড়লো। এষা দত্তের শরীরটাও বোধহয় অবশ হয়ে গিয়েছে। হাত তুলে চোখ দুটোকে মুছতেও পারছে না।

সন্দীপ—আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি, এষা। এতটা ভাবতে পারিনি।

এষা—ঠিকই, এতটা ভাবতে পারবেন কেন? একটা মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সর্বক্ষণ আপনার কথা ভাবছে অথচ আপনার কাছে কখনও আসছে না, এটা তো কেউ ভাবতে কিংবা বিশ্বাস করতে পারে না।

সন্দীপ—আমি কখনও ভাবতে পারিনি বটে, কিন্তু আজ আমি বিশ্বাস করছি। শোন এষা, আমি বিশ্বাস করছি।

এষা—আপনি জানেন না, আপনাকে শুধু একটু ভাল করে দেখবার জন্যে আমাকে কী নির্লজ্জ চক্রান্ত করতে হয়েছে।

সন্দীপের দুই চোখের উৎফুল্ল দৃষ্টিটা দীপ্ত হয়ে ওঠে—চক্রান্ত ?

এষা—হ্যাঁ, রীতিমত চক্রান্ত। ভাবনার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, শেষে একদিন মুখ খুলে বাবার কাছে তোমার কথাটা বলেই ফেললাম। আমার মনের আসল কথাটা অবিশ্যি নয়, তোমার সঙ্গে চেনাশোনার বন্ধ রাস্তাটা যাতে খুলে যায়, তারই জন্য একটা চেষ্টার কথা। বাবাকে বলেছিলাম, একদিন যেন তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করে আসেন। আর তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে এসে চা খেয়ে যেতে নেমন্তন্ন করেন। কিন্তু বাবার যা ভুলো মন···যাক্ সে কথা, আমি বেহায়ার মতো মুখ খুলে স্যারের সেক্রেটারি বলবন্তভাইকে ধরে বসলাম, জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধনের দিনে সন্ধ্যাবেলার পার্টিতে যেন তোমাকে নেমন্তন্ন করেন আর আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। তাই···।

লজ্জিত হয়ে হেসে ফেলে এষা।—আমার অনুরোধের কথা শুনে বলবন্তভাই অবিশ্যি একটু মুখ টিপে হেসেছিলেন, তবু আমি হাসিনি। কারও সন্দেহের কাছে একেবারে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে যেতে আমার ভাল লাগে না, বরং একটু ভয়ই করে। যাক্, আমার চক্রান্তের স্বপ্ন তো সফল হয়েছে। এখন তুমি যদি আমার হ্যাংলাপনা আর বেহায়াপনা ক্ষমা করে দাও, তবেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সন্দীপ—মনে হচ্ছে, জয়াজী পরিবারের সঙ্গে তোমার খুব মেলামেশা আছে।

এষা—হ্যাঁ, সেই কবে, প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি জয়াজীকে স্যার বলতে শিখেছিলাম, তাই অভ্যাসের নিয়মে আজও স্যার বলি। আমি স্যারের ভাইঝি মৃদুলার গভর্নেস ছিলাম। এই চাকরিটারই জন্যে জয়াজীকে স্যার বলতে হতো। স্যার একদিন বললেন, এষা অব তুমকো বোম্বাই যানা পড়েগা।

সন্দীপ—কেন ?

এষা—মৃদুলা ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসলো যে, সে কিছুতেই আর কলকাতায় থাকবে না। বোম্বাই তার ভাল লাগে, তাই বোম্বাইয়েই থাকবে। আমাকেও তাই মৃদুলার সঙ্গে বোম্বাইয়ে স্যারের বাড়ি জয়াজী ম্যানসনে চারটি বছর কাটিয়ে দিতে হয়েছিল।

সন্দীপ—চাকরিটা নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলে, না ওরাই—।

এষা—না, আমিই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

সন্দীপ—কেন ?

এষা—মৃদুলার যেমন বোম্বাই ভাল লাগে, আমারও তেমনই কলকাতা ভাল লাগে। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতে চলে এলাম। সে চাকরিতে কিন্তু কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। সত্যি কথা, বোম্বাইয়ের জীবনটাতেও কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। সকাল, বিকেল, দুপুর, সন্ধ্যা আর রাত, মাঝরাত হলেই বা কী আসে যায়, শুধু বেড়াও আর বেড়াও। এবেলা মালাবার হিল, তো ওবেলা জুহু। আজ কানহেরি, তো কাল এলিফ্যান্টা দ্বীপ। যেমন মৃদুলা, তেমনই তার দাদা চিরঞ্জীব,

তেমনই আবার চিরজীবের বন্ধুদল। সবাই যেন আমাদের উড়ন্ত প্রজাপতি। নাচ দেখা, গান শোনা, আর ছবি দেখা; পিকনিক, হিচহাইকিং আর প্লেজার ট্রিপ—রেস্টুরেন্ট বীয়ার-বার আর, বলতে লজ্জা করে, রাতের ক্লাবের স্ট্রিপটিজ, সব কিছুই যেন লুঠ করে প্রাণ ভরাবার আনন্দে ছুটোছুটি করা ওদের জীবনের একটা অভ্যেস।

সন্দীপ—অভ্যেসটা কি খুব খারাপ?

এষা—একটুও খারাপ নয়। আমারও একটুও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেজন্যে বোম্বাইয়ে পড়ে থাকবো কেন? কলকাতা কি একটা গোবি মরুভূমি?

সন্দীপ—আমি তা মনে করি না।

এষা—আমিও তা মনে করি না। চমৎকার আনন্দের আর আবেগের জীবন কলকাতাতেও আছে, ইচ্ছে থাকলে আর খুঁজলেই পাওয়া যায়।

অদূরে অলস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে বয়, তার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে এষা—ইধর আও।

বয় এসে বলে—ফরমাইয়ে।

এষা—ছুটো স্প্যানিশ-এর ছুটোই কি খরচ হয়ে গিয়েছে?

বয়—একঠো হ্যায়।

এষা—নিয়ে এস।

বয় আবার ফিরে এসে টেবিলের উপর একটা বোতল রাখে, ছিপি খোলে। এষা বলে—তুমি চলে যাও, বয়। এখানে তোমার আর কিছুই করতে হবে না। আমি আছি।

সন্দীপ—তোমার এত ব্যস্ত হবার কোন দরকার ছিল না।

এষা—ছিল। আমি যা বলছি, শোন। আমি যা করছি, দেখ। আজ আমি তোমার মনের ভিতরে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছি, আমার মনের আনন্দ আমি নিজের হাতে তোমার গেলাসে ঢেলে দেব।

সন্দীপ—তোমার গেলাস কই?

এষা—আমাকে ক্ষমা কর।

নিজের হাতেই বোতলটাকে কাত করে ধরে সন্দীপের গেলাসে স্প্যানিশ লাল মদের ছোট্ট একটি ঝরনা ঝরিয়ে দেয় এষা দত্ত। সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে আর নিবিড়-মৃদু স্বরে যেন চরম আত্মনিবেদনের একটি অঙ্গীকার গুঞ্জরিত করে শুনিয়ে দেয়—যখনই ইচ্ছে হবে, আমার কাছে চাইবে। আমি তোমাকে সব দেব। আজ শুধু আমার এই সামান্য উপহার নিয়ে খুশি হও। খাও, সন্দীপ।

গেলাস হাতে তুলে নিয়ে আর কথা বলতে গিয়ে সন্দীপেরও গলার স্বর নিবিড় হয়ে যায়।—আমার এখন আর বলতে একটুও কুণ্ঠা নেই এষা, তোমাকে ভালবাসতে আর কাছে পেতে ইচ্ছে করছে।

বুকের ভিতরে এরকমের তেষ্টার আবেগ জীবনে কোনদিনও অনুভব করেনি

সন্দীপ। চার চুমুকে গেলাস খালি করে দিয়ে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে এষার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি সুন্দর, এমন অনেক মেয়েকে চোখের কাছে আর বুকের কাছেও পেয়েছে সন্দীপ। চোখ-মুখ আর নাকের ধরন-গড়নের হিসেব ধরলে, তাদের অনেকের চেয়ে এষা দত্তকে কম সুন্দর বলে মনে করতে হবে। আর, যদি শরীরটার ধরন-গড়নের হিসাব করা হয়, তবে এই এষা দত্তকে একটা ছন্দিতা ললিতা বা কোমলতা বলে কেউ মনে করবে না। কিন্তু এষা দত্তের এই অনিখুঁত রূপের মধ্যেই এমন একটি নিখুঁত মনোহারিতার জাদু আছে, যা ওসব মেয়ের কারও রূপের মধ্যে ছিল না। মনে হয় সন্দীপের, এষা দত্তের এই শখের অকিড-কুইন মূর্তি যদি এই মুহূর্তে নিসাজ ও নিলাজ হয়ে যায়, তবে সেই জাদু আরও দুরন্ত হয়ে উঠবে। রূপ যা-ই হোক, এষা দত্তের রূপের আবেগ খুবই সুন্দর। এই সুন্দরতা তাদের কারও মধ্যে কখনও দেখতে পায়নি সন্দীপ। বিশ্বাস করতে তাই খুবই আশ্চর্য লাগে সন্দীপের, এষা দত্তের মতো নারী সন্দীপের জীবনের সহচরী, সন্দীপের সব আনন্দের নায়িকা হতে চায়, আর সেই ইচ্ছায় মাসের পর মাসের প্রতীক্ষা সহ্য করেছে।

এষা বলে—এই স্প্যানিশ মদের নাম জানো ?

সন্দীপ—না। আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না।

এষা—আমিও জানি না। কিন্তু নামটার অর্থ জেনে নিয়েছি।

সন্দীপ—অর্থটা কী ?

এষা—অর্থ হলো, আঙুরের যৌবন।

সন্দীপ—সুন্দর নাম! নামটা এষার যৌবন হলে আরও ভাল হতো।

এষা—হয়তো ভাল হতো।

সন্দীপ—তুমি তো বেশ ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পার। কোথায় শিখলে ?

এষা হাসে।—অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিতাম, ফ্রান্সের সরবোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় শিখেছি। কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করছো বলেই বলতে হচ্ছে, চন্দননগরে ছোটমামার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়বার সময় শিখেছি।

সন্দীপ—কিন্তু কই, আর একটু দাও। স্প্যানিশ মদিরা সত্যিই বেশ টেস্টফুল।

এষা—তোমার ড্রাইভার এসেছে ?

সন্দীপ—না। গাড়ি নিয়ে আমি একাই এসেছি।

এষা—তবে থাক, আর খেও না।

সন্দীপ—কিন্তু…।

এষা—এই বস্তুটি কলকাতাতে দুর্লভ। কিন্তু বলবন্তভাই খুবই যোগাড়ে লোক। কাকে যেন টেলিফোন করে নিয়ে কোথায় যেন গেলেন, আর দু ঘন্টার মধ্যে দুটি স্প্যানিশ নিয়ে ফিরে এলেন।

সন্দীপ—তবে দুর্লভের আর-এক গেলাস টেস্ট সুলভ হলে…।

এষা—না, থাক। যেটুকু খেয়েছো, তার চেয়ে বেশি এখানে আর খাওয়া

উচিত নয়।

সন্দীপ—কিন্তু বিশ্বাস কর এষা, তোমার ওই পেয়ার অব লিপস্, এই ঠোঁট দুটিকে চমৎকার দুটি তাহিতি ঠোঁট বলে মনে হয়।

এষা হাসে।—কোন তাহিতি সুন্দরীর সঙ্গে কোনদিন দেখা হয়েছিল নিশ্চয়?

সন্দীপ—হ্যাঁ, স্বপ্নে। এটা আমার স্বপ্নের অভিজ্ঞতার কথা, তাহিতি ঠোঁট বড়ই টেস্টফুল। মডার্নিস্ট হয়েও চক্রবর্তী অবিশ্যি তর্ক করে চেঁচায়, অজন্তা ঠোঁট, অজন্তা ঠোঁট। কিন্তু অজন্তা ঠোঁট আমার একটুও পছন্দ নয়। সেকেলে কিছুই আমার পছন্দ নয়।

এষা—এবার উঠতে হয়। আর এখানে দেরি করবার দরকার নেই।

সন্দীপ উঠে দাঁড়ায়—হ্যাঁ চল, এখানে আর কোন দরকার নেই।

চাকা লাগানো চেয়ার আর নেই, চলে গিয়েছেন জয়াজী। সাদামাথা সেই বৃদ্ধও নেই। পানামোদের আসরে তখন মাত্র দু'জন অবশিষ্ট অতিথি আছেন, আর কেউ নেই। তাঁরাও দুই চেয়ারের উপর নেতিয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে আছেন। প্রায়-নিস্তব্ধ আসরের প্রায়-নির্জন পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সন্দীপ রায় আর এষা দত্ত গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। এষা বলে—আমাকে এখন বাড়িতে পৌঁছে দিতে কি তোমার কোন অসুবিধে কিংবা··· ।

সন্দীপ—চুপ। চল। বল, কোথায় তোমার বাড়ি?

এষা—আমির আলি অ্যাভিনিউ।

ছুটে চলে সন্দীপের উৎফুল্ল ক্যাডিলাক। সন্দীপের পাশে যেন নিবিড় এক আবেশের সুখে বিভোর হয়ে আর নীরব হয়ে বসে থাকে এষা, সন্দীপের ভালবাসার অঙ্গীকার পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে যার এতদিনের আশা আর অপেক্ষা।

সন্দীপ বলে—আমি কবি নই, কবিতা করে মনের কথা বলতে পারি না। তবু বলতে ইচ্ছে করছে, আমরা দু'জন যেন দূর আকাশের একটা তারার দিকে ছুটে চলেছি।

এষা—হ্যাঁ, আমরা কোনদিনও থামবো না, ফিরোবো না, ক্লান্তও হব না।

সন্দীপ—আজই কে যেন আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কথা বলছিল।···হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বিনায়ক বলছিল, আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের গুণাকর দত্তের কথা।

এষা—আমার বাবা, গুণাকর দত্ত। তাঁকে তো তুমি আজ দেখেছো, স্যারের ইনভ্যালিড চেয়ারের কাছে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আজকের পার্টির গেস্টদের সঙ্গে কথা বলবার দায়িত্ব তো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনটা শিশুর মনের মতো এমনই সরল আর ভুলো যে, সে দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজেরই অবস্থা তরল করে তুললেন। স্যার বাধ্য হয়ে শেষে আমারই উপর সে দায়িত্ব তুলে দিলেন।

সন্দীপ—জয়াজীর সঙ্গে তোমার বাবার বোধহয় অনেকদিন থেকে একটা

জানা-শোনা সম্পর্ক আছে।

এষা—হ্যাঁ, মৃদুলার গভর্নেস এষা দত্তের বাবা গুণাকর দত্ত, এই পরিচয়ের সূত্রে স্যারের সঙ্গে বাবার একটু মেলামেশার সম্পর্ক হয়েছে। কিন্তু যিনি তাঁর আসল বন্ধু ও একমাত্র বন্ধু, তাঁর নাম বোধহয় তুমিও শুনেছো।

—শুনেছি বোধহয়। বোধহয় কেন, মনে হচ্ছে নিশ্চয় শুনেছি।

—বাবার বন্ধুর নাম, পিটার শ্যামলাল।

—অ্যাঁ? কয়লার রাজা বলে যাঁর একটা সুনাম আছে, সেই পিটার শ্যামলাল?

—হ্যাঁ, তাঁর ঘোড়ারও সুনাম আছে।

—থাকবারই কথা।

—তাজ মুল্‌কি বিক্রম শ্যামসন বীরবাহাদুর আর সোহরাব, নামগুলি তুমি শুনেছো নিশ্চয়।

—শুনেছি বোধহয়।

—এরা সত্যিই এক-একটি হিরো। পিটার শ্যামলালের এইসব রেসহর্সের নাম তুমি সিঙ্গাপুর আর কলম্বোতেও শুনতে পাবে। আমার বাবা এই পিটার শ্যামলালের সব কাজ-কারবারের একমাত্র অ্যাডভাইসর।

—বাঃ!

—আমার মনে অবিশ্যি একটা দুঃখ আছে, বাবা আমার চেয়ে তাঁর এই বন্ধুকেই বেশি ভালবাসেন।

সন্দীপ—না এষা, এরকমের দুঃখ-টুঃখ মনের মধ্যে পুষে রেখে কোন লাভ নেই। যে যেখানে যেমনটি আছেন, তিনি সেখানে তেমনটি হয়ে থাকুন, আমাদের সেজন্যে চিন্তিত হবার কোন মানে হয় না।

এষা বলে—এবার সত্যিই যে একটু থামতে হবে, সন্দীপ।

সন্দীপ—এই কি তোমাদের বাড়ি?

এষা—বাড়িটা আমাদের নয়। এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘর হলো তোমার এষার ঘর, যে-ঘরে আজ সারারাত জেগে বসে থাকবে তোমার এষা, মনে মনে একজনের সঙ্গে কথা বলবে, আর ঘুমোতেই পারবে না। আচ্ছা, আমি এখন নামি। আসি।

সন্দীপ ডাকে—এষা! নেমে যাবার আগে···।

এষা—বল।

সন্দীপ—ডাহিডি ঠোঁট?

এষা—হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছে।

॥ এগার ॥

কলকাতার মাঘ ফাল্গুন চৈত্র আর বৈশাখ—একের পর এক এসেছে আর চলে গিয়েছে। ময়দানের আকাশনিম বিলাতী শিরীষ আর মাদাগাস্কারী গুলমোরের ফুল ও পাতার শোভা বদলে গিয়েছে। কিন্তু এই চার মাসের মধ্যে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়ির সামনে একটি দৃশ্যের চেহারা একটুও বদলায়নি। সন্ধ্যা হলেই সন্দীপের ক্যাডিলাক ছুটে এসে এই বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। কোনদিন কিছুক্ষণ, কোনদিন অত্যন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে যায়। প্রতিবেশীদের চোখে এই বাঁধা-ধরা নিয়মিত দৃশ্যটা কোন কৌতূহল জাগিয়ে তোলে কি তোলে না, সেটা কারও চোখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। অন্যে পরে কা কথা, এই বাড়িরই তিন নম্বর ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় ঘরের খোলা দরজার কাছে একটি চেয়ারের উপর যাকে বসে থাকতে দেখা যায়, তাঁরও চোখে কি কোন কৌতূহল চঞ্চলিত হয়? একটুও না। কন্যা এষা দত্ত যখন সন্দীপের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলতে বলতে আর সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠে কিংবা নেমে চলে যায়, তখন পিতা গুণাকর দত্ত নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়তে থাকেন, চোখ তুলে একবার তাকানও না। ক'দিনই বা তাঁকে দেখতে পেয়েছে সন্দীপ? এই চার মাসের মধ্যে মাত্র পাঁচবার। এষা নিজেই বলেছে—বাবা রাত্রিবেলাতে এখানে থাকেন না। সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন সকালবেলা।

সন্দীপ—কোথায় যান? এতক্ষণ কোথায় থাকেন?

এষা—এই বাড়ির সাত নম্বরে যিনি থাকেন, তিনি একজন মিস্টার লাহিড়ী। তিনি লোকের কাছে রটিয়ে বেড়ান—মেয়ের ঘরের ভিতরে রাত্রিবেলা অদ্ভুত ও বেপরোয়া হাসাহাসির শব্দ বরদাস্ত করতে পারেন না বলেই, গুণাকর দত্ত সন্ধ্যে হতেই বাইরে চলে যান আর হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিংরুমে শুয়ে থাকেন। পাশের বাড়ির জয়ন্ত মল্লিককে যদি জিজ্ঞেসা কর, তবে তিনি বলবেন যে, মেয়েরই ইচ্ছায় ও হুকুমে বাবা গুণাকর দত্ত রাত্রিবেলাতে ঘরে থাকেন না। বড় হলের একটা জুয়ার ক্লাবে রাত কাটিয়ে সকালবেলা বাড়িতে ফিরে আসেন। আর, আমাকে যদি জিজ্ঞেসা কর, তবে আমি বলবো যে, পিটার শ্যামলালের ইচ্ছা ও অনুরোধের মানরক্ষা করবার জন্য তার বন্ধু গুণাকর দত্ত রোজই রাত্রিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাজ-কারবারের ভালমন্দ অবস্থার কথা আলোচনা করেন, পরামর্শ দেন, আর ডিনারের পর সেখানেই একটি ঘরের বিছানাতে শুয়ে বুড়ো মানুষটি রাত্রিবেলার বাকি কয়েকটা ঘণ্টা পার করে দেন।

সন্দীপ—আমাকে আর বেশি বলতে ও বোঝাতে হবে না, এষা। লাহিড়ী একটা নিরেট মিথ্যেবাদী আর জয়ন্ত মল্লিক একটা গবেট মিথ্যেবাদী। ওদের চা ইচ্ছে হয় তাই বলুক, আমাদের সেজন্য চিন্তিত হবার কোন মানে হয় না।

হেসে ফেলে এষা—যে যেখানে যেমনটি আছে সে সেখানে তেমনটি থাকুক।

তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই।

সন্দীপও হাসে।—হ্যাঁ, চিন্তা করে কোন লাভও নেই।

এই চার মাসের মধ্যে সন্দীপের জীবনের রূপ একটুও বদলায়নি। কিন্তু ভাবনার স্বভাবটা বদলেছে। আনন্দের ছুটোছুটির কোন প্রোগ্রামের জন্য সন্দীপকে কিছুই আর ভাবতে হয় না। সন্দীপের ভাবনাটা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করে, আজ সন্ধ্যায় সন্দীপের জীবনের আবেগটাকে এষা তার নিজেরই ইচ্ছা আর উৎসাহের দুরন্ত টানে টেনে নিয়ে কোথাও কোন আনন্দের কাছে নিশ্চয় পৌঁছে দেবে। নিশ্চিন্ত হয়েছে সন্দীপ।

বিনায়ক বলেছে—এটা তোমার সৌভাগ্য, সন্দীপ। দেশী ফিলসফির কথাও এই যে, প্রকৃতিই কাজ করেন এবং পুরুষ তাঁকে অনুসরণ করে চলেন। বিনায়কের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছে সন্দীপ।—যা-ই বল বিনায়ক, দেশী ফিলসফির যত বাজে কথার মধ্যে এটা কিন্তু একটা ভাল কথা।

সন্দীপ তো এত জেনেও কোনদিন জানতে পারেনি যে, এই কলকাতাতে ওরকম চমৎকার একটা ক্লাব আছে। এষারই ইচ্ছায় কথায় ও আগ্রহে একদিন সেই ক্লাবে গিয়ে আলো-ঝলমল সুইমিং-পুলে সাঁতার দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছে সন্দীপ, সে আনন্দ আগে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এষার সাঁতারের কাছে কোথায় লাগে রাজহংসীর সাঁতার? ছোট্ট একটি বিকিনি পরে সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এষা, একটানা দশ মিনিট ধরে সাঁতার কাটলো। এষার চমৎকার ব্রেস্টস্ট্রোক সুইমিং-পুলের জল উথলে দিয়ে যেন সন্দীপের চোখের আর বুকের তৃপ্তিটাকেই উথলে দিয়েছে।

এষা বলেছে—আমার কোন সমস্যা নেই সন্দীপ। ঘর নামে কোন ভয় আমার প্রাণে নেই।

সন্দীপ—কী বললে? ঘর-বাঁধা জীবনকে তোমার ভয় করে না?

কলকল করে হেসে ওঠে এষা।—ঘর আমাকে বাঁধতে পারে না, পারবেও না। আমিই ঘরকে বাঁধতে পারি।

সন্দীপ—ঠিক বুঝলাম না।

এষা—ঘরের বাইরে আমি তোমাকে যে আনন্দ দিতে পারি, ঘরের ভিতরেও সে আনন্দ দিতে পারি। আমার কাছে দুই-ই সমান।

এষার মুখের এই কথা শোনবার পর দশটা দিনও পার হয়নি, একদিন সন্দীপের প্রাণটা এই বিশ্বাসে ভরাট হয়ে গেল যে, ঘরের জীবনকে আনন্দ-উতলা করে তুলতে জানে এষা। মিথ্যে বলেনি এষা, বাড়িয়েও বলেনি।

সে ঘর হলো আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘর। সেই ঘরের ভিতরে একটি উৎসবের উচ্ছ্বসিত মধুরতার মধ্যে ডুবে গিয়ে সন্দীপের প্রাণটা যেন নতুন একটি বিশ্বাসের মুক্তা পেয়ে গেল। না, এষার মতো মেয়ে ঘরবাসিনী হতে চাইলেও ভয় করবার কিছু নেই। তাকে

সন্দীপের জীবনের সাধ আশা আর আনন্দ একটুও ব্যথিত হবে না।

চার-পাঁচটা বোতল থেকে চার-পাঁচ রকমের পানীয় ঢেলে কাচের জারের বুকটা পরিপূর্ণ করে দিয়ে হাসতে থাকে এষা।—তোমার চেনা ওই অরোরা আর কলরডোর বার-এ কী-ই বা পাওয়া যায়? কী-ই বা ওরা জানে? একঘেয়ে বাজের যত সাদামাটা ড্রিংক ছাড়া কী-ই বা ওরা দিতে পারে? আমি যা দিচ্ছি সেটা একবার খেয়ে দেখ। তারপর বলো, কেমন স্বাদ আর কেমন লাগলো।

সন্দীপ—এটা তুমি কী তৈরি করলে?

এষা—এটাকে বলা চলে, প্যারাডাইস ককটেল। অ্যাপ্রিকট ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে ড্রাই জিন, তার উপর একটু লেমন জুস ঢেলেছি। কিন্তু আমার নিজের রুচির ফর্মুলা একটু অন্য রকমের। আমার প্যারাডাইস ককটেলে কিছু ক্রীম দিতে হয়। তাই দিয়েছি। খেয়ে দেখ, তার পর বলবে কেমন লাগলো।

তিন-চার চুমুকের টানে যতখানি পারা যায় খেয়ে নিয়ে সন্দীপ হাসতে থাকে।—ভাল, কিন্তু বড়ই লঘু।

এষা—হ্যাঁ, এটা মেয়েদেরই রোচে ভাল। আমার মনে হয়, তোমার দরকার মার্টিনি কিংবা দু'নম্বরের শেরি টুইস্ট। যা-ই হোক, সে না হয় আর-একদিন হবে, আজ শুধু এই ···।

সন্দীপ—আমার বিশ্বাস, এই লঘু প্যারাডাইস বার চারেক পেটে পড়লে বেশ গুরুতর হয়ে উঠবে।

এষা—হোক না।

সন্দীপ—তুমি দেখছি, এক চুমুকের টানেই গেলাস খালি করে দিচ্ছ।

এষা—এই রকমই আমার অভ্যেস। গেলাস হাতে নিলে আমি আর বেশি টিকুতে পারি না। আর এরকম করে এত দূরে বসে থাকতেও পারি না।

নিজের চেয়ার ছেড়ে সন্দীপের চেয়ারের কাছে এসে আর চেয়ারের কাঁধটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এষা।

কী যেন ভাবছে এষা। শরীরটা হঠাৎ এক-একবার দুলে উঠছে। হয় মনের ভিতরে একটা নতুন ইচ্ছার দোলা, নয় লঘু প্যারাডাইসের আবেশ। এষার দু'পায়ের পাতা যেন কার্পেটের উপর একটা ছন্দ দুলিয়ে আর বুলিয়ে দিচ্ছে।

সন্দীপ—এ কী হচ্ছে, এষা? এরই মধ্যে আর এতটুকুতে তোমার স্টেপ যে টলতে শুরু করেছে।

এষা—আমার স্টেপ কখনো টলে না সন্দীপ। এতটুকুতে না, অতটুকুতেও না।

সন্দীপ—তবে?

এষা—তবে বলতে হয়···কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কথা দিচ্ছি তোমাকে, ভাল ফ্লোর যদি কখনও পাই, তবে আমার স্টেপের কাজ তোমাকে তখন দেখিয়ে দেব।

সন্দীপের চোখে-মুখে যেন চকিত বিস্ময়ের শিহর ছড়িয়ে পড়ে। বাকে

যেমন মন-মাতানো সাজ আর তাদের অর্কিড-কুইন বলে মনে হয়েছিল, তার শরীরটা যে সত্যিই গুণের আর কাজের একটি সোনার খনি।

এক হাতে এষার কোমর জড়িয়ে ধরে সন্দীপ।—তুমি আমাকে আশ্চর্য করে দিলে, এষা। যত দিন যাচ্ছে, আমি ততই বেশি আশ্চর্য হচ্ছি।

এষাও সন্দীপের গলা জড়িয়ে ধরে।—আমি গর্ব করছি না, তবু বলবো, কী জানে আর কতটুকুই বা জানে ওরা?

সন্দীপ—কারা? কাদের কথা বলছো?

এষা—ওই, তোমাদের সেই রাতের ক্লাবের মেয়েগুলো, যে ক্লাবের তুমি একজন হাওটা ভক্ত। একটা বাজে বলরুমের যত ভাড়া-করা বাজে নাচনী। নাচের কী আর কতটুকুই বা ওরা জানে? আহা, মিসেস খাম্বাটা নামে সেই ধুমসি, কী নাচই নাচলেন। যেমন কিম্ভূত বডি-সোয়ে, তেমনই কিম্ভূত ফুটওয়ার্ক। এটুকু শিক্ষা নেই যে, ওয়ালজে ন্যাচারাল টার্ন থেকে রিভার্স টার্নে যেতে হলে ওরকম বকের মত শুধু স্টেপ তুললে আর ফেললেই হয় না। মাপ মতো এগুতে আর পিছোতে হয়।

এমন করে কোনদিনও এত মুক্তকণ্ঠ হয়ে নিজের গুণের পরিচয় প্রকাশ করেনি এষা। আজ বোধহয় ইচ্ছে করেই সন্দীপের প্রাণটাকে শত রকমের বিচিত্র বিস্ময়ে ভরে দেবার জন্য এক-একটি বিরাট পর্দা সরিয়ে দিয়ে সন্দীপকে এক-একটি নতুন আকাশের জ্যোৎস্না দেখিয়ে দিচ্ছে, সন্দীপও দেখে দেখে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে।

অপলক চোখে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। এষার চোখে ছোট্ট একটি ভ্রূকুটি, বুঝতে অসুবিধে নেই সন্দীপের, ওটা নিবিড় এক অভিমানের ভ্রূকুটি। কিন্তু কেন? কী ভাবছে এষা। এষা বলে—তুমিই বা আমার কী আর কতটুকু জেনেছো? কতটুকু চিনেছো?

স্বীকার করে সন্দীপ—না, চিনতে পারিনি। কিন্তু আজ বলতে পারি, চিনেছি।

সন্দীপের গলা ছেড়ে দিয়ে সরে যায়, আবার নিজের চেয়ারের কাছে গিয়ে টেবিলের একটা ট্রের ঢাকা সরিয়ে সন্দীপের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

সন্দীপ—খাবারও আনিয়ে রেখেছো?

এষা—না আনিয়ে উপায় কী? রোজারিও'র কিচেনের প্যাটি তোমার খুব পছন্দ, তাই আনিয়েছি। নইলে আমি নিজের হাতেই···আমি বলবো, কী আর কতটুকুই বা জানে তোমার রোজারিও? ওরা কি পারবে, তোমার জন্যে রোস্ট ডাক আ'লোরাঁজ তৈরি করে দিতে? জানে কি ওরা, ফ্রেঞ্চ চীজ স্যুপ তৈরি করতে হলে তিন কাপ চীজের সঙ্গে অন্তত দু'চামচ শেরি আর চার কাপ চিকেন স্টক মেশাতে হয়?

প্যারাডাইস ককটেলের জাগ সন্দীপের হাতের কাছে এগিয়ে দেয় এষা—খাও, খেয়ে ফেল। আর আমাকে দশ মিনিটের জন্য ক্ষমা কর, আমি আসছি।

দশ মিনিটও লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যে প্যারাডাইস ককটেলের শেষের

কৌটাটাকেও খেয়ে নিয়ে শূন্য জাগের দিকে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। জাগের কাচ ঝিকঝিক করে হাসছে। সেই হাসির মধ্যে যেন সন্দীপের একটা স্বপ্ন হাসছে। সেই স্বপ্নের মধ্যে যার মুখটা হাসছে, সেটা এষারই মুখ।

—এই যে আমি। তোমার এষা। চিনতে পারছো তো?

দশ মিনিট শেষ হবার আগেই অদৃশ্য অন্তরাল থেকে যেন একটি অনাবরণ কুহকের ছবি হয়ে আবার ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে এষা। যে শাড়ি গায়ে জড়িয়েছে, সেটা একটা সিল্কের নেট বলে মনে হয়। স্বচ্ছ শাড়িটাকে একটা বস্ত্র বলেই মনে হয় না। ওটা আবরণ নয়, আবরণের একটা মায়া।

চেয়ারে বসে না এষা। টেবিলের কাছে এসে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা হেলিয়ে আর মাথার ফাঁপানো চুলের স্তবকটাকে একটু দুলিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে।—বল এবার, আমার এই লং-মোবাইল হেয়ার-ডু তোমার দেখতে ভাল লাগছে কি লাগছে না? এরকম পিন-কার্ল রিপ্‌ল তোমার পছন্দ হয় কি না?

সন্দীপ—একথা কেন আর জিজ্ঞাসা করছো?

এষা—সাজতে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু সেজন্য আমি খুব বেশি মাথা ঘামাই না। মাসে একশো টাকাও লাগে না। সামান্যকিছু পাস্তুরাইজড কেস ক্রীম, একশিশি অল-টোন শ্যাম্পু, এক শিশি স্কিনটনিক লোশন, আর একটি মাত্র নন-স্মীয়ার লিপস্টিক হলেই চলে যায়। চোখের জন্য মাসকারা পেন্সিল বড় একটা ছুঁই না, দরকারও হয় না।

সন্দীপের চোখের কাছে নিজের চোখ দুটোকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে এষা।—ভাল করে দেখে নাও, একায় টাকা দিয়ে কেনা নকল আইল্যাশ নয়।

নিজের ছবি উন্মোচিত করে দেখাবার একটা নেশায় পেয়েছে এষাকে। সে আজ এই মুহূর্তে সন্দীপকে বোধহয় একটি পরম বিস্ময়ের সত্য বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, পৃথিবীতে যত আলো রং আর স্বাদুতা আছে, সবই এষার মন-প্রাণ ও শরীরের মধ্যে আছে। সন্দীপ একেবারে মুগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এষার এই নেশার আবেগ থামবে না।

দেখতে পায় এষা, সন্দীপের চোখে চরম ব্যাকুলতার ছবিটি এইবার ফুটে উঠেছে। এষা বলে—বলতে পার, কেন আমি এখন এরকম একটা হালকা সাজ করেছি?···বলতে পারলে না। তবে শোন···।

সন্দীপ—বল।

এষা—তোমার কোলে বসতে হবে, তাই এরকম সাজ।···অ্যাঁ, এত আস্তে আস্তে কী বলছো তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

সন্দীপ—না, কিছু বলছি না। শুধু ভাবছি একটা কথা। শুধু মনে পড়ছে, ড্রাইডেনের কবিতার কয়েকটা কথা। হে প্রিয়া, আমাকে তোমার ওই দুই ঠোঁটের উপর চিরকাল পড়ে থাকতে দাও; তোমার দুই ঠোঁটের স্বাদের কাছে দেবতাদের সুধারসও বিস্বাদ।

সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়ায় এষা।—তোমার সেকেলে ড্রাইভের কী আর কতটুকুই বা বুঝেছেন ?

মন-পছন্দীয়ার লিপস্টিক দিয়ে রাঙানো এষা দত্তের ছুটি চমৎকার ভাহিতি ঠোঁট তখনি সন্দীপের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে বিচিত্র কারুকলার দুরন্ত-মধুর স্বাদ ঝরিয়ে দিতে থাকে। দেখে খুশি হয় এষা, সে স্বাদের প্লাবনে সন্দীপের মুগ্ধ হৃৎপিণ্ডটা ভেসে যেতে চাইছে।

সে রাতে সন্দীপের ক্যাডিলাক সকাল পর্যন্ত রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইলো। আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের শিমুলের মাথার উপরে যখন অনেক রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন এষার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাডিলাকের কাছে এসে দাঁড়ায় সন্দীপ। রাতজাগা অলস ও অচল গাড়িটা আবার সচল হয়ে ছুটতে থাকে।

॥ বার ॥

রূপের আর গুণের যত রকমের সুন্দরতা আছে, তা থেকে তিল তিল করে নিয়ে একসঙ্গে করলে তিলোত্তমা হয়। এরকম একটা কল্পনার কথা শুনতে পাওয়া যায়। এষাকে তবে কী বলতে হয় ? তিলোত্তমা ?

সন্দীপ রায়ের মনটা অনেকবার এরকমের প্রশ্ন করে এষার কথা ভেবেছে আর হেসেছে। হাসিটা আস্তিকেলে গল্পের কল্পনার কথাটাকে ঠাট্টা করেছে বটে, কিন্তু সন্দীপের মনটাকে নয়। সন্দীপের মন কাল্পনিক গ্যাসের বেলুন নয়। যুক্তিতে না মানলে কিছুই মানে না সন্দীপ। যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে এষাকেও বিচার না করে পারেনি সন্দীপ। এর আগে অনেক আশা করে যাদের খুব কাছে গিয়ে খুব ভাল করে দেখতে পাওয়া গেল, তাদের প্রাণবস্তুর আর জীবনটার ষোল-আনার মধ্যে চার-আনা আলো, বারো-আনা অন্ধকার। যাকে একটু উজ্জ্বল বলে মনে হলো, তারও আলো পাঁচ-ছয় আনার বেশি নয়। এষার তুলনায় তারা কিছুই নয়। তুলনা করলে বলতে হয়, বিজলী বাতির আলোর কাছে মেটেপিদিমের আলো। যা চেয়েছিল ও আশা করেছিল সন্দীপ, তার সবই এষার আছে। যা আশা করতে পারেনি সন্দীপ, যে আনন্দ স্বপ্নেও জানা ছিল না, তাও যেন এষার হাতে মালা হয়ে দুলছে। চাইলেই পাওয়া যায়। না চাইলেও পাওয়া যায়। এষার কথা ভাবতে গিয়ে কল্পনার ভাবাটা যদি একটু বাড়াবাড়ি করে, তবে করুক না। কল্পনা তো কোন মিথ্যেকে লুকিয়ে রেখে কথা বলছে না।

সন্দীপের জীবনে এষা দত্ত একটি বিস্ময়কর প্রাপ্তি। যেন সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের আকস্মিক উপহার। যদি সন্দীপ সেদিন ভুল করে কিংবা কুঁড়েমি করে জয়াজী লিমিটেডের নতুন ফ্যাক্টরির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হতো, তবে সন্দীপের জীবনটা আজও বোধহয় কোন একটা পুরো পুরনো মিথ্যা কিংবা আধখানা নতুন কোন মিথ্যার সঙ্গে ছুটোছুটি করে শুধু হয়রান হতো। এষাকে পাওয়া যেত না। সে বঞ্চনার চেয়েও একটি আরও অদ্ভুত বঞ্চনা এই হতো যে, জীবনে কোনদিনও

জানতে পারতো না সন্দীপ, কী তৃপ্তি থেকে জীবনটা বাকন্ত হলো।

আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর রাস্তায় শিমুল নতুন ফুলে রঙিন হয়ে উঠেছে। সন্দীপের জীবন যে নতুন আহ্বানের সঙ্কেত পেয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে, সেটাও কম রঙিন নয়। প্রতি সন্ধ্যায় আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর এই বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একটি ঘরে এষা দত্ত যে অভ্যর্থনার নায়িকা হয়ে সন্দীপের অপেক্ষায় থাকে, সে অভ্যর্থনা বসন্তোৎসবের চেয়ে কম রঙিন নয়। এই উৎসবের আবীর গুলাল কুঙ্কুম আর রংঝারি, সবই হলো এষা। ভালবাসার অতিথিকে শত তৃপ্তি দিয়ে অভিষিক্ত করতে এষার কোন কুণ্ঠা নেই।

হেসে হেসে জুহুর সমুদ্রস্নানের গল্প করতে করতে এষা একদিন হঠাৎ বলে ওঠে—সব পরীক্ষাই তো দিলাম, এবার··· ।

সন্দীপ—অ্যাঁ ? কী বললে ? থামলে কেন ?

এষা—না, যতটুকু বলেছি ততটুকুই বলেছি। এর বেশি বলবো না।

সন্দীপ—তবে কী করে বুঝবো যে, তুমি কী বলতে চাইছো ?

এষা—কেন ? যতটুকু বললাম, তাতে কি কিছু বোঝা যায় না ?

সন্দীপ—সত্যিই বুঝতে পারছি না। কিসের পরীক্ষা কবে কোথায় দিলে ?

সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে এষার দুই চোখের সুস্থির দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা প্রশ্নের বিস্ময় জলজল করছে। কথাটার অর্থ একটুও কেন বুঝতে পারলো না সন্দীপ, বোধহয় এই নীরব প্রশ্নটারই বিস্ময়।

পরমুহূর্তে হাতের রুমাল তুলে মুখ-চাপা দিয়ে হেসে ওঠে এষা।—আমি কিন্তু বুঝেছি, তুমি কেন বুঝতে পারছো না।

সন্দীপ—তাহলে তুমিই বল, কী বুঝেছো।

এষা—তোমার বোধহয় মনে হয়েছে যে, আমি বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

সন্দীপ—না না, কথ্খনো না।

এষার দুই চোখের দৃষ্টি আরও জলজল করে।—আমি সেরকম মেয়ে নই সন্দীপ, যারা বিয়ের শর্তে ভালবাসে।

সন্দীপ—আমি জানি, আমি জানি।

এষার দুই উজ্জ্বল চোখ আরও প্রখর হয়ে হাসে।—যাকে আমি ভালবাসলাম সে যদি আমার সঙ্গে চিরকাল থাকে, তবেই আমার সব-পাওয়া হয়ে গেল ; বিয়ে হোক বা না হোক।

সন্দীপ—আমিও তাই বিশ্বাস করি, এষা। বিয়েটা ভালবাসার শর্ত হবে কেন ? বিয়ে তো ভালবাসার শেষ নয়, বিয়ের পরেও ভালবাসা থাকে। ভালবাসা তার নিজের জোরেই বেঁচে থাকে, বিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে না। কাজেই···

এষা—কাজেই আমরা বেশ আছি, খুব ভাল আছি।

সন্দীপ—আমি একথা বলি না যে, বিয়ের কোন দরকারই নেই। বিয়ে যদি

হয় তো হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ে কী ভালবাসার একটা···। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।—আমি শুধু সেকেলে শাস্ত্রী পণ্ডিতকে নয়, একালের বড় বড় মাথাওয়ালা চিন্তাবিদকেও জিজ্ঞাসা করতে চাই, হ্যাঁ মশাই, বিয়েটা কি প্রেমের সায়েন্টিফিক রেজাল্ট, অথবা একটা অবধারিত অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণাম?

এষা—মনে হচ্ছে তোমার গেলাস খালি হয়ে গিয়েছে?

সন্দীপ—হ্যাঁ।

এষা—তাই বল।

সন্দীপ—অ্যাঁ? আমার বেশ নেশা হয়েছে বলে সন্দেহ করছো?

এষা—না না, বিশ্বাসের কথাটাকে খুব জোর দিয়ে বললে অনেক সময় ওরকম শোনায়।

হাসতে থাকে সন্দীপ।—না, তাহলে আর জোর দিয়ে কোন কথা বলবো না। বরং তুমি বেশ একটু জোর দিয়ে···। এষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সন্দীপ। —সেদিনের মতো বেশ শক্ত করে একটু···।

এষা—আমার একটা অনুরোধের কথা শুনবে?

সন্দীপ—নিশ্চয় শুনবো, বল।

এষা—আজ আমাকে মাপ কর। ছেড়ে দাও। শান্ত হয়ে বসো।

সন্দীপ—বেশ তো, ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু···তুমি যেন আনমনা হয়ে অন্য কোন কথা ভাবছো।

এষা—ভাবতে বাধ্য হচ্ছি সন্দীপ। কত চেষ্টা করলাম, না আর ভাববো না; তবু ভাবনাটা যেন জোর করে মনের মধ্যে ঢুকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

সন্দীপ—কিসের ভাবনা?

এষা—স্যারের ভাইঝি মৃদুলা কলকাতাতে এসেছে। আমাকে দেখেই আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, অব তুমকো নেহি ছোড়েঙ্গে।

সন্দীপ—এর মানে?

এষা—এর মানে, মৃদুলা এখন ওর বাবার সঙ্গে টোকিওতে যাবে আর সেখানেই থাকবে। মৃদুলা বলেছে, এষাদিকেও যেতে হবে, ওর সঙ্গে থাকতে হবে, মাস্ট্ মাস্ট্ মাস্ট্। তুমি তো জান না সন্দীপ, মৃদুলা ওর বাবার কত আদরের মেয়ে। মৃদুলা যদি ওর বাবাকে ধরে বসে যে, এষাদিকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিতে হবে, তবে রাজী হতে এক মুহূর্তও দেরি করবেন না মৃদুলার বাবা।

সন্দীপ—এসব কী অদ্ভুত কথা বলছো এষা। কোথাকার কে এক মৃদুলা···পাঁচ হাজার টাকা মাইনে···টোকিও। এসব শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

এষা—আমারও কি শুনতে ভাল লেগেছে? একটুও না।

সন্দীপ—তুমি আপত্তি করে, শুধু স্পষ্ট করে একটা 'না' বলে দিয়ে ওরকম অদ্ভুত অনুরোধের মুখ বন্ধ করে দিলেই পারতে।

এষা—আমি আপত্তি করেছি। স্পষ্ট করে 'না' বলে দিয়েছি। তবু···

সন্দীপ—তবু আবার কী ?

এষা—চৌকিওর জন্তে আমার প্রাণ কাঁদে না, পাঁচহাজার টাকা মাইনের জন্তেও না। কিন্তু মৃদুলা খুব দুঃখ পাবে, শুধু এই কথা ভেবে আমাকে খুবই কষ্ট পেতে হচ্ছে। ভেবেছিলাম, তোমাকে এসব কিছুই বলবো না। তবু বলে ফেললাম।

সন্দীপ—আমাকে না বললেই ভাল করতে।

এষা—ঠিকই বলেছো। কিন্তু এসব কথা নিয়ে তোমার তো ভাবনা করবার কিছু নেই।

সন্দীপ—ঠিক, আমার ভাবনা করবার কিছু নেই, শুধু শুনতে ভাল লাগে না, এইমাত্র।

এষা আবার আনমনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এষার পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলে সন্দীপ।—মৃদুলার কথা ভেবে তোমারও তো এত দুঃখ বোধ করবার কিছু নেই। তুমি মৃদুলার কথা ভুলে যাও।···আচ্ছা, আমি এখন তবে চলি।

এষার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবার পর বাড়িতে ফিরে এসেও সন্দীপের মনটা সারাক্ষণ অদ্ভুত এক অস্বস্তির পীড়ন সহ্য করতে থাকে। মৃদুলার আবদেরে অনুরোধ যেন সন্দীপের জীবনের সৌভাগ্যটাকে ছিঁড়েফুঁড়ে নষ্ট করে দেবার একটা চক্রান্তের দাবি। রাতের ঘুমটাও বার বার তিনবার ভেঙেছে। বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, অস্বস্তিটা স্বপ্নের মধ্যেও ঢুকেছে। মাঝে মাঝে এই অস্বস্তির জ্বালা এত তীব্র হয়েছে যে, এষার ইচ্ছাটাকেও সন্দেহ করে ফেলেছে সন্দীপ। এষা অবিশ্যি বলছে যে, মৃদুলাকে খুব স্পষ্ট করে 'না' বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি সেকথা বলেছে এষা ? এষার চৌকিও চলে যাওয়া যে সন্দীপের ভালবাসার সর্বনাশ, এই সহজ-সরল বাস্তব সত্যটি কি এষার বুঝতে কোন অসুবিধে আছে, একটুও না। হতে পারে, অসম্ভব নয়, সন্দীপকে আপাতত একটা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার জন্তে এষা একটা বানানো কথা বলেছে, মৃদুলাকে 'না' বলে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে মৃদুলাকে হয়তো 'হ্যাঁ' বলে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে এষা। কিন্তু এষার বুদ্ধিটাকে এরকম ভয়ানক একটা দু'মুখো সাপ বলে বিশ্বাস করতে পারে না সন্দীপ। না, না, সন্দেহ নয়। সন্দেহ করবার কিছু নেই। শুধু এষাকে ভুল বোঝবার ভয় থেকে রক্ষা পেতে চায় সন্দীপ। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তবু অস্বস্তির ভার একটুও হাল্কা হয় না কেন ? এই অস্বস্তির ভার অনেক হাল্কা হয়ে যেতো, যদি শুধু এটুকু জানতে পারা যেতো যে, এষা যা বলেছে সেটা এষার জীবনের কোন ভ্রান্তির ভাষা নয় ; সত্যিই মৃদুলা নামে একটা উৎপাত এষাকে চৌকিওতে নিয়ে যাবার জন্ত টানাটানি শুরু করেছে।

তাই আর দেরি করে না সন্দীপ। পরদিন ব্যাঙ্কে যাবার আগেই সন্দীপের ক্যাডিলাক ছুটে গিয়ে জয়াজীর বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়।

জয়াজী তাঁর অফিস-ঘরে চাকা-লাগানো চেয়ারের উপর বসে আছেন। সন্দীপকে দেখতে পেয়ে বেশ খুশি হয়ে কথা বলেন জয়াজী—এসো, তোমার কথা

আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। মনে পড়বেই তো, মাধববাবু আমার কারবারের কাজে কত সাহায্যই না করতেন ; সে-সব কথা তো ভুলে যাইনি। হ্যাঁ, যদি ব্রেনে প্যারালিসিস হতো, তবে সবই ভুলে যেতে হতো।

জিভে জড়তা থাকলেও খুব উৎফুল্ল হয়ে কথা বললেন জয়াজী।

সন্দীপ—মনে হয়, আপনি এখন বেশ সুস্থ আছেন।

জয়াজী—মোটামুটি।

সন্দীপ—আপনার ভাইঝি মৃদুলা বুঝি টোকিও যাচ্ছে ?

জয়াজী—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি কি মৃদুলাকে চেন ?

সন্দীপ—না, আমি এষাকে চিনি। তার কাছ থেকে শুনলাম যে…।

জয়াজী—বুঝেছি, এষাও তোমাকে চেনে।

সন্দীপ—মৃদুলা বোধহয় এষাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে চাইছে।

জয়াজী—জানি না ; এরকম কোন চমৎকার খবর আমার কানে আসেনি।… হ্যাঁ, এষা কি তোমার কোন আত্মীয়া ?

সন্দীপ—না।

জয়াজী—বুঝেছি, বুঝেছি। তোমার বোধহয় জানতে ইচ্ছে হয়েছে, এষাও টোকিওতে যাবে কি যাবে না ?

সন্দীপ—হ্যাঁ।

জয়াজী—হ্যাঁ, ঠিকই, এই বয়সে জানতে-টানতে খুব ইচ্ছে হয়।

সন্দীপ—আমি এখন তবে চলি।

জয়াজী—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে আবার এসো।

সন্দীপের নিঃশ্বাসের বাতাসে এখন আর কোন যন্ত্রণা নেই। মিথ্যে অস্বস্তির গুমোট ভেঙে গেল। নিজেরই কাছে নিজেকে বেশ লজ্জিত বোধ করে সন্দীপ। এষাকে ভুল বোঝবার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ক্লান্ত হয়নি এষা। এষার প্রাণে, এষার ভালবাসার প্রাণেও সেই ওদের ভীরু প্রাণের হঠাৎ-বাতিকের মতো অদ্ভুত কোন ক্লান্তি দেখা দেয়নি।

কিন্তু কী ভয়ানক আশ্চর্য, অস্বস্তিটা তবু সরে যেতে চাইছে না। জয়াজী যদিও কিছু বলতে পারলেন না, তবু বিশ্বাস করতে হয় যে, মৃদুলা সত্যিই এষাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে চাইছে। মৃদুলার অনুরোধটা যদি খুব কাঁদাকাটি শুরু করে দেয়, তবে এষা কি শেষ পর্যন্ত টোকিওতে না-যাওয়ার ইচ্ছাটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে ? টোকিওতে কবে যাবে মৃদুলা ? যাবার দিন কি ঠিক হয়ে গিয়েছে ? না যাওয়া পর্যন্ত সন্দীপকে এই অস্বস্তির পীড়ন সহ্য করতে হবে। সব সময় মনটা কিম্ভুত একটা ভয় পুষে রাখবে, এই বুঝি মৃদুলার জন্যে এষার মমতা উথলে উঠলো, তারপর ঢেউয়ের মতো দুলতে শুরু করলো, আর সেই ঢেউয়ের উপর দিয়ে মৃদুলার সঙ্গে তার গভর্নেস এষা দত্তকেও নিয়ে জাহাজটা চলে গেল। সে দুর্ভাগ্য কেমন করে সহ্য করবে সন্দীপ ? মনে হয়, মৃদুলা নিশ্চয় আজ আবার

টেলিফোনে এষাকে ডেকেছে। আর এষাও সেই ডাক শুনেই ছুটেছে; মৃদুলার কাছে গিয়ে বলেছে—আমি তোমার সঙ্গে না গেলে কি চলবেই না, মৃদুলা?

এটা তো এষার মনের একটা ভয়ানক দুর্বলতার ভাষা? এষা নিজেও বুঝতে পারছে না যে, মৃদুলার অনুরোধের কাছে কত তাড়াতাড়ি নেতিয়ে পড়ছে এষার অনিচ্ছার শক্তিটা।

আজ সন্ধ্যায় আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুতেই দেখতে পায় সন্দীপ, সড়কের শিমুল গাছের একটা ডাল ভেঙে গিয়ে ঝুলছে। ভাঙা ডালের সব ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেন পুড়ে গিয়েছে। সত্যিই কি এটা একটা দুর্লক্ষণ?

উপরতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই বাড়ির দারোয়ান সেলাম করে সন্দীপের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দেয়। এষা লিখে রেখে গিয়েছে এই চিঠি—এইমাত্র মৃদুলা ফোন করে ডাকলো। তাই যাচ্ছি। তুমি রাগ করো না। কাল সন্ধ্যায় তুমি তো আসছোই, আবার দেখা তো হবেই।

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই বুঝতে পারে সন্দীপ, এখনই গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়া উচিত নয়। জীবনে কোনদিন কোন শেরিতে কিংবা হুইস্কিতে সন্দীপের হাত দুটোকে এত অবশ করে দিতে পারেনি। এষার মমতা-ভীরু মন মৃদুলার অনুরোধের কাছে যে বিকিয়ে যেতে পারে, তারই সঙ্কেত শিমুল গাছের ভাঙা ডালের সঙ্গে ঝুলছে।

জানে না, বুঝতেও পারে না সন্দীপ, গাড়িতে সীটের উপরে এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে কতখানি সময় ফুরিয়ে গেল। সন্দীপকে এভাবে বসে থাকতে দেখে কেউ আশ্চর্য হয়েছে কি হয়নি, তাও বুঝতে কিংবা দেখতে পায়নি সন্দীপ।

না, আর এই অস্বস্তি সহ্য করবার কোন অর্থ হয় না। এরকম হারাই-হারাই-সদা-ভয়-হয় অবস্থা কবিতার মধ্যেই থাকুক, মানুষের জীবনে থাকতে পারে না। আর দেরি না করে চরম নিষ্পত্তি করে ফেলাই উচিত।

দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে সন্দীপ, ট্যাক্সি থেকে এষা নামছে। হেসে হেসে হাত তুলে সন্দীপকে ইশারা করছে—এসো।

আজ সন্ধ্যায় দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের সেই ঘরে শেরির গেলাসে চুমুক দিয়ে সন্দীপ স্পষ্ট ভাষায় চরম নিষ্পত্তির কথাটাই বলে ফেলে—এবার তুমি তৈরি হয়ে থাকো, এষা। আর আমি তোমাকে এখানে পড়ে থাকতে দেব না।

চমকে ওঠে এষা—কী বললে, ঠিক বুঝলাম না।

সন্দীপ—আমার ইচ্ছা, আমাদের বিয়েটা এবার হয়ে যাক, আর দেরি করবার কোন মানে হয় না।

এষা—বিয়ে?

সন্দীপ—হ্যাঁ, আমি জানি তুমি বলবে যে, বিয়ে হলেই বা কি আর না হলেই বা কি? না, আমি আর একথা শুনতে চাই না, যদিও খুব সঙ্গত কথা।

এষা—বেশ তো, বিয়ে হবে, বিয়ে হোক। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করবার কি কোনও দরকার আছে ?

সন্দীপ—আছে।

এষা—কেন ?

সন্দীপ—আমার জীবনে তুমি তো একটা বন্ধন নও। বন্ধন হতেও পারবে না, হবেও না। এটা যখন বুঝতে পেরেই গিয়েছি, তখন আর দেরি করবো কেন ?

এষা—বেশ, তোমার ইচ্ছে হলে আমার তো কোন অনিচ্ছে হতে পারে না।

সন্দীপ—তবে শোন, আজ এখনই তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার কাছেই থাকবে। আমি সাত দিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবো।

এষা—এবার আমার একটা অনুরোধের কথা শুনবে ?

সন্দীপ—বল।

এষা—আমি তোমার সঙ্গে এখনই তোমার বাড়িতে যাব। তোমার কাছে অনেকক্ষণ থাকবো। কিন্তু রাত্রিতে আমাকে এ-বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে যেও, সন্দীপ, প্লীজ।

সন্দীপ—বেশ, কিন্তু আমার আরও একটা অনুরোধ আছে। তুমি এই ক'দিন কোন সকাল দুপুর কিংবা বিকেলে আমাকে সঙ্গে না নিয়ে এ-বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না, মৃদুলা ডাকলেও যাবে না।

হেসে ফেলে এষা—বেশ তো, এটা আমার পক্ষে একটুও কঠিন কথা নয়।

সন্দীপ—তবে চল।

ঘর থেকে বের হয়ে এষার হাতটা এক হাতে বেশ শক্ত করে ধরে রেখেই গাড়িতে ওঠে সন্দীপ।

॥ তের ॥

থেকেও নেই, এই অবস্থা যেমন একটা অদ্ভুত নাস্তিত্ব, তেমনই নেই তবু আছেন, এই অবস্থাও একটা অদ্ভুত অস্তিত্ব। বালিগঞ্জের রায়ভবন, এত বড় একটি তিনতলা বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরে যিনি থাকেন, চারুশীলা রায়, তিনি এই রকমই একটি অদ্ভুত অস্তিত্ব। প্রতিবেশীদের অনেকে ভুলেই গিয়েছেন যে, চারুশীলা রায় আজও এই বাড়িতে আছেন। ন'মাসে ছ'মাসে কচিৎ কখনও তাঁকে বাইরে বের হতে দেখা যায়, তখন প্রতিবেশীদের সবারই মনে পড়ে, হ্যাঁ, মাধব রায়ের স্ত্রী এখনও এই বাড়িতে আছেন।

বছর দু'য়েক আগে অ্যাটর্নি নরেশবাবুর স্ত্রী, তাঁর ছোটমেয়ে সুমিত্রার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসে যখন এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন বেশ চমকে উঠেছিলেন।—এ কী চারুদি! আপনি এই ছোট্ট ঘরে থাকেন।

চারুশীলা হেসে হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমি এই আকাশ-ঘরে থাকি।

ঠিক কথা, চারুশীলার জীবনটা যেন শূন্যতার আকাশের মধ্যে এক টুকরো ঠাঁই

খুঁজে নিয়েছে। তেতলার বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ফুল-চাতালের উপর কাঠের একটি ছোট কেবিন-ঘর, যে ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মাধব রায় রোজই ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখতেন। আজ সেই ঘরের মেঝের উপর চারুশীলার ছোট একটি বিছানা আর ছোট একটি ডেস্কের উপর মাধব রায়ের খুব ছোট একটি মার্বেল মূর্তি। সন্ধ্যা হলে যখন তাঁর এই আকাশ ঘরে আলো জ্বালেন চারুশীলা, তখন পালিশ-করা বিকানীর মার্বেলের মাধব রায়ের চোখ দুটো চিকচিক করে। চারুশীলা বলে ফেলেন—তুমি হাসছো, না কাঁদছো, বুঝতে পারছি না।

দমদমের হেমলতাকে তাঁর চারুদি যে-কথা বলেছিলেন, সেটা চারুদির জীবনের একটা করুণ সত্য : আমি আর গান গাইতে পারি না হেম। মাধব রায়ের মৃত্যুর পর একদিনও গান গাইতে পারেননি চারুশীলা। তিনি আছেন বটে, তাঁর গলার গান মরে গিয়েছে। মাঝে কয়েকটা দিন তাঁর মনটা অশান্ত হয়ে খুব ছটফট করেছিল। নিঃশ্বাসটা যেন বার বার আর্তনাদ করেছে—স্বপ্ন ব্যর্থ হলো, স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছেন, পাশের বাড়ির জানালার কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে একটা পাখিকে দেখবার চেষ্টা করছে। একটা ঘুঘু পাখি, ফরফর করে উড়ে উড়ে গাছের এই ডাল ছেড়ে ওই ডালে বসছে। বুঝতে অসুবিধে নেই, মেয়েটি একটি নতুন-বউ। চারুশীলার মনটা বলে উঠেছে, স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। আর-একটি বাড়ির জানলার গরাদ ধরে নাচানাচি করছে একটা এক-বছর বয়সের বাচ্চা। চরুশীলার নিঃশ্বাসটা ডুকরে উঠেছে, স্বপ্ন ব্যর্থ হলো।

না, আর জানালার কাছে এসে কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন না চারুশীলা। আর মনটাও কয়েকদিনের মধ্যে নিজেই শান্ত হয়ে গিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু নেই। শূন্য, সবই শূন্য।

অনেকদিন পর আবার চমকে উঠেছেন চারুশীলা। ঘুমটা ধড়ফড়িয়ে ভেঙে গিয়েছে। জেগে উঠেই বিকানীর মার্বলের মাধব রায়ের দিকে তাকিয়েছেন আর কথাও বলে ফেলেছেন—কেন ডাকলে ?

স্মৃতির ভাষা আর স্বপ্নেতে শোনা একটা ডাক। ডেকেছেন মাধব রায়। কোনদিন কোন স্বপ্নেতে সে মানুষটা এমন করে তাঁকে কখনও ডাকেনি। খুব আস্তে কথা বলা যাঁর অভ্যাস, সেই মাধব রায় কত জোরে চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছেন—চল চারু, একটু তাড়াতাড়ি কর, নইলে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাবে। চল, এখান থেকে বের হয়ে সোজা হাঁটা দিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরটা একবার দেখে নিয়ে, লেক হয়ে, তারপর রাসবিহারীতে এসে, সম্ভব হলে মহানির্বাণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়ে, তারপর গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে কিছু সাদা পদ্ম, না পাই কিছু শালুকই না হয় কিনে নিয়ে এলাম!

আজ বিকেলে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চারুশীলা।

কখন সন্ধ্যা হয়েছে, কখন বিশুর-মা এসে ঘরের আলো জেলে দিয়ে গিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেননি। স্বপ্নেতে মাধব রায় এসে ডাক দিয়েছেন বলেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন চারুশীলা। বারান্দার জাফরির জালের ভিতর দিয়ে টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না এসে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিন তার হাত থেকে ফসকে গিয়ে অনেকগুলো সাদা শালুক মেঝের উপর পড়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল, শালুকগুলি যেন টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না।

আজ অনেকদিন পরে শুকনো চোখ দুটো আবার এমন করে ভিজে গেল কেন? একলা প্রাণটা তাই একটু রাগ করেই জিজ্ঞেস করতে চায়, আর কেন ডাকো?

সে বসন্ত সে বরষা, সে আনন্দ সে ভরসা,
আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পাবে নাকো।

আজকের সন্ধ্যার বাতাসের ভাবটাও বেশ উতলা। তাই বারান্দার ওদিকের একটা টবের বুকের ছোট্ট তুলসী গাছটা মাথা দুলিয়ে কাঁপছে। আস্তে আস্তে হেঁটে তুলসীটার কাছে এসে দাঁড়াতেই চারুশীলার শূন্য প্রাণের অভিমান আরও উতলা হয়ে ওঠে। তাই আর নীরব হয়ে থাকতে না পেরে বলেই ফেলেন; কবিতার কথাগুলি তাঁর গলার স্বরে বেশ উতলা হয়ে বেজে ওঠে:

আর কেন ডাকো?
এখন কিসের দাবি? হারায়ে গিয়েছে চাবি
ভেঙে গেছে বীণা বাঁশি, আর হবে নাকো।

না, মনটাকে আর এভাবে কাঁদিয়ে কোন লাভ নেই। মাঝে-মাঝে এরকম এক-একটা ডাক শুনতে পেলেই তো হলো। হোক না স্বপ্ন; সে মানুষটার সঙ্গে এই বাড়ির এই সিঁড়ি ধরে নেমে গিয়ে, সোজা হাঁটা দিয়ে, বুদ্ধ মন্দিরটা একবার দেখে নিয়ে, লেক হয়ে আবার রাসবিহারীতে ফিরে আসা যাবে। গড়িয়াহাট মার্কেটের সাদা শালুকও কিনতে পারা যাবে। না, সবই হারিয়ে যায়নি। তার পায়ের শব্দ তো এ-বাড়িরই বাতাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠলেন চারুশীলা। মনে হয় দোতলার বড় ঘরের ভিতর থেকে শব্দটা ছিটকে বের হয়ে সন্ধ্যাবেলার বাতাসটাকে যেন ক্ষেপা-কুকুরের মত কামড়ে দিয়ে আবার চুপ হয়ে গিয়েছে। কিসের শব্দ? এরকম ভয়ানক একটা বিশ্রী শব্দ দোতলার বড়ঘরের ভিতরেই বা বেজে উঠবে কেন? বড়ঘর যে একটি জাগ্রত স্মৃতি-ঘর। মাধব রায় তাঁর শখ আর মায়া দিয়ে যে-রকম ক'রে সাজিয়েছিলেন, আজও ঠিক সেরকমেরই সেজে রয়েছে এই বড়ঘর। সেই সব সোফা, সেই মেহগনির টেবিল। চার দেয়ালের গায়ে সেই চারটি বড় বড় রঙিন ছবি—গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার, নীলাচলের সমুদ্র, কৈলাস ও মানস আর শিলং-এর পাইনবন ও ঝর্না।

একগাদা কাচের বাসন একসঙ্গে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে যেরকম শব্দ হয়, এই শব্দও তেমনই একটা বিকট ঝনঝনানি। কই, বিশুর-মা এখনই গিয়ে জেনে আসুক, এ কিসের শব্দ।

শুধু পাঁচটা মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর অপেক্ষা করতে হয়। বিশুর-মা আসতেই জিজ্ঞাসা করেন চারুশীলা—কোথায় ছিলে ?

বিশুর-মা—এখানেই ছিলুম, মা।

—বিশ্রী একটা শব্দ হলো, শুনেছো ?

—শুনেছি।

—জেনেছো, কিসের শব্দ ?

—জেনেছি। বাবুর্চিকে শুধোলুম, কিসের শব্দ হলো গা ? বাবুর্চি বলে, টেবিল থেকে কাচের গেলাস বোতল জগটগ সব হঠাৎ পড়ে গিয়েছে, তাই শব্দ হয়েছে।

—ঘরের ভিতর কারা ঢুকেছে ? বলতে পারো ?

—হ্যাঁ মা, পারি। বাবুর্চি যা বললে, তাই বলতে পারি।

—বল।

—আমাদের সাহেব আর একজন লেডি সাহেব।

—তুমি এখনই একবার বাইরে যাও, বিশুর-মা। একটা ট্যাক্সি ডেকে আন।

—কেন মা ?

—আমি এখনি হাওড়া স্টেশনে যাব।

—কেন মা ? কোথায় যাবেন আপনি ?

—যেখানেই যাই, আর এখানে ফিরে আসবো না।

—এ কী বলছেন মা, শুনে যে আমার ভয় করছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

হেসে ফেলেন চারুশীলা।—কোন ভয় নেই। তুমি যাও, ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসো, একটুও দেরি করো না।

পাঁচটা মিনিটও সময় লাগে না। আকাশ-ঘরের ডেস্কের উপর থেকে মাধব রায়ের ছোট্ট মার্বেল মূর্তিটাকে কাগজে জড়িয়ে হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন চারুশীলা। গেটের কাছে গিয়ে থামলেন ও দাঁড়িয়ে রইলেন।

ট্যাক্সি আসে। পিছনের কোন আলো আর কোন ছায়ার দিকে একটিবারও মুখ ফিরিয়ে তাকালেন না চারুশীলা। চলে গেলেন।

স্টার্ট দিতে গিয়ে ট্যাক্সির ইঞ্জিন খুব জোরে শব্দ করে উঠতেই খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে সন্দীপ রায়ের সান্ধ্য আনন্দের শান্তিটা। এ সময়ে কে এল ? কোন্ নির্বোধ ?

নতুন গেলাস হাতে নিয়ে জানালার কাছে এসে দেখতে পায় সন্দীপ, না কেউ আসেনি। কেউ গেল বোধহয়।

—কে চলে গেল কার্তিক ? ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে সন্দীপ।

বাবুর্চি জবাব দেয়।—মা চলে গেলেন।

—কোথায় গেল ?

—ঝি বলছে, তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার সোফার উপর এষার পাশে বসে পড়ে সন্দীপ।—মাতৃদেবী বেশ একটা ড্রামাটিক কাণ্ড করলেন।

এষা—কী ব্যাপার?

সন্দীপ—তিনি হাওড়া স্টেশনে চলে গেলেন। খুব সম্ভব তিনি কোন্নগরে তাঁর উকীল ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেলেন। তার মানে এই বাড়ি ছেড়ে দিলেন।

এষা—কেন?

সন্দীপ—বেশ বুদ্ধি রাখেন, তাই এই কাণ্ডটা করলেন। যেন আমি আর কোনদিনও তাঁকে একটা কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেবার কোন সুযোগ না পাই।

এষা—কিসের কর্ত্তব্যের কথা?

সন্দীপ—ক'দিন আগে আমি তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলাম: আর দেরি না করে তুমি এবার বাড়িটাকে আমার নামে গিফ্‌ট করে দাও। তিনি শুধু একটি কথা বললেন: না। অথচ…।

এষা—কী?

সন্দীপ—অথচ সকলের কাছে এমন একটা ভাব দেখান যে, বাড়িটার জন্যে তাঁর মনে কোন মায়া নেই। শুধু মাধব রায়ের স্মৃতিটুকুর জন্য যা-কিছু মায়া। তাই ইচ্ছে করে তিনতলাতে ছোট একটা কাঠের ঘরে থাকেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলেই উদাস হাসি হেসে অদ্ভুত একটা কথা বলেন: এই আকাশ-ঘরে থাকতে আমার ভাল লাগে। আমি দেখে সত্যিই বেশ আশ্চর্য হয়েছি, বৈরাগ্যের বুলি কী ভয়ানক চালাক হতে পারে।

এষা—তুমিই বা এমন অনুরোধ করতে গেলে কেন? কী দরকার ছিল? তিনি গত হলে এ-বাড়ির স্বত্ব তো তোমারই হয়ে যাবে।

সন্দীপ—হবে; যদি তিনি সুস্থচিত্তে গত হয়ে যান তবে। এ ধরনের সেকেলে মানুষের মতিগতির কোন স্থিরতা নেই। পুণ্যি বাতিকের ঝোঁকে হয়তো হঠাৎ একদিন কোথাকার কোন্ এক গরু-হাসপাতালের নামে বাড়িটাকে গিফ্‌ট করে ফেলবেন। কিন্তু দেখলে তো এষা। সেকেলে মানুষের মেজাজটা বোভাইন হলেও বুদ্ধিটা কত চাণক্যাইট।

আবার উঠে গিয়ে আর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে ডাকতে থাকে সন্দীপ—ফটিক! ফটিক! একটা ঝাঁটা আর ঝুড়ি নিয়ে শিগগির এখানে একবার এসো। মেঝের উপর ছড়ানো এইসব ভাঙা কাচের সব টুকরো এখনি সরিয়ে নিয়ে যাও।

সন্দীপের সান্ধ্য জীবনের সাধ ইচ্ছা আর চেষ্টা এখন আর যাযাবরের মতো ছুটোছুটি করে না। এমন কি, আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কোন বাড়ির দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে দরজার কলিংবেলের বোতাম টিপতে হয় না। এষা দত্তের ঘরের উৎসব ঠাঁই-বদল করে সন্দীপেরই বাড়ির এই বড়ঘরের ভিতরে চলে এসেছে। সন্দীপকে বের হতে হয় না। রোজ সন্ধ্যায় যথাসময়ে

যেমন আদেশ করেছেন সাহেব, ড্রাইভার বাবুলাল তেমনই সন্দীপের চকচকে ক্যাডিলাককে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে লেডি সাহেব এষা দত্তের বাড়ির কাছে হাজির করে আর লেডি সাহেবকে তুলে নিয়ে চলে আসে।

তারপর যখন রাত নিবিড় হয়, যখন শুনতে পাওয়া যায়, টালিগঞ্জের পুলিশ ব্যারাকের বিউগলের ঘুমকাতুরে স্বর বাতাসে এলিয়ে পড়ে ফুরিয়ে গেল, তখন এষা দত্ত তার এলিয়ে পড়া মাথাটাকে সন্দীপের বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়, আর উঠে দাঁড়ায়—এবার যেতে হয়।

ড্রাইভার বাবুলাল বার বার কাশতে থাকে, এষা দত্ত আবার ক্যাডিলাকের ভিতরে উঠে বসে। লেডিসাহেবকে আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসে ক্যাডিলাক। কাশি থামিয়ে বাড়ি চলে যায় বাবুলাল।

এই নিয়মটা সন্দীপের ইচ্ছার সৃষ্টি হলেও এষাও খুশি হয়ে বলেছে—এই ভাল। তোমার ওরকম ছুটোছুটির কষ্ট আমার চোখে আর একটুও সহ্য হচ্ছে না। আমার কাছে তোমার আর ছুটে আসতে হবে না, আমিই তোমার কাছে যাব। তোমার গাড়িটা ভাল বটে, তোমার হাতে গাড়িটা চলেও ভাল, তবু বিশ্বেস নেই। তোমার আনমনা হাতটা সামান্য একটু কেঁপে উঠলে গাড়িটা যে কী ভয়ানক কাণ্ড করে ফেলবে, ভাবতে আমার বুক কাঁপে। না সন্দীপ, এই ভাল, আমিই আসবো।

আজ নিয়ে পর পর চারটি সন্ধ্যা ও রাত রায়-ভবনের এই বড়ঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ থেকেও সন্দীপের মনের সব অস্বস্তি শান্ত করে দিতে পারেনি এষা। কারণ মৃদুলা এখনও টোকিও চলে যায়নি। এই চারদিনের মধ্যে অন্তত সাতবার এষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সন্দীপ: আর তো মাত্র ক'টা দিন বাকি। আমি এরই যে-কোন একটি দিনে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলবো। কিন্তু তুমি কি তোমার বাবাকে কথাটা একবার বলে নেবে না?

এষা—বলবো।

সন্দীপ—না, আর বলবো বলবো করো না। বলে দাও।

অন্যদিনের মতো আজও রাতটা যথাসময়ে নিবিড় হয়ে উঠেছে। রাস্তার নীরবতার মধ্যে শুধু বুড়ো রাত-ভিখারীটার গলার স্বর কঁকিয়ে কঁকিয়ে ঘুরছে। সন্দীপ বলে—কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দের মধ্যে একটা মিউজিক আছে। নয় কি? তোমার কী মনে হয়?

এষা—তোমার যা মনে হয়, তাই। আমার তো ভিন্ন করে একটা মন নেই।

সন্দীপ—যে যা বলে বলুক, আমি বলবো শাঁকের শব্দের মধ্যে ওরকম মিউজিক নেই। একটুও না।

এষা—লোকে কিন্তু মনে করে যে, শাঁকের শব্দ খুব পয়া, খুব শুভ।

হেসে ফেলে সন্দীপ—আমি মনে করি কাচের গেলাস ভাঙবার শব্দ আরও পয়া, আরও শুভ। একটা সুলক্ষণ।

যেন একটা চকিত বিদ্যুতের আভা এষা দত্তের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

সন্দীপের একটা হাত শক্ত করে ধরে আর বুকের কাছে টেনে নিয়ে কথা বলে এষা—হ্যাঁ শুভ, নিশ্চয় শুভ। তোমার কথাতে একটুও ভুল নেই, সন্দীপ। এতক্ষণ তোমাকে কথাটা বলিনি, বলতে পারিনি, তাই এখন বলছি। কাল সকাল ন'টার সময় শুভ কাজটার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাবাকেও বলা হয়ে গিয়েছে। বাবার অনুমতিও পাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সব অস্বস্তির অবসান। সন্দীপের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—এষা, তুমি সত্যিই একটি বিস্ময়। কি আশ্চর্য, কাল সকাল ন'টায়?

এষা—হ্যাঁ, সন্দীপ। রেজিস্ট্রার বিনয়বাবুকে জানিয়ে রাখা হয়েছে। তোমার পক্ষে আর আমার পক্ষে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরও বলে রাখা হয়েছে। আমি শুধু বলবন্তভাইকে ফোন করে একটু বলে দিয়েছিলাম। শোনা মাত্র বলবন্তভাই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

হেসে ফেলে সন্দীপ।—আমার কিন্তু একটা বিশ্রী অসুবিধে আছে। আমার ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়।

এষাও হাসে—আন্দাজ ক'টার সময় তোমার ঘুম ভাঙে।

সন্দীপ—আটটার আগে নয়।

এষা—আমি সকাল ছ'টায় তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেব।

সন্দীপ—সে কী? সেটা আবার কী করে সম্ভব হবে?

সন্দীপের কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দেয় এষা—আমি তো আজ এখানে তোমার কাছেই থাকবো।

সন্দীপ—বাড়ি যাবে না?

এষা—না।

সন্দীপ—এঃ, আমার প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল।

এষা—তোমার প্ল্যান? সেটা আবার কী?

সন্দীপ—তোমাকে চমকে দেবার প্ল্যান। আমি মতলব এঁটেছিলাম, আজ তোমাকে কিছুতেই বাড়ি যেতে দেব না। আজও না, কালও না, কোনোদিনও না। কিন্তু তুমিও কি ভেবে রেখেছিলে যে তুমি আজ রাতে বাড়ি যাবে না?

এষা—না। তোমার কথা শুনে মনটা এত নিশ্চিন্ত আর এত খুশি হয়ে গেল যে, এক মুহূর্তের মধ্যে একটা সাধের স্বপ্ন দেখে ফেললাম। সকাল ছ'টায় আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব, নিজের হাতে মনের মতো করে সাজাবো। তারপর এখান থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সে-বাড়িতে একবার যাব। দশ মিনিটের মধ্যে আমি সেজে নিয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে রেজিস্ট্রার বিনয়বাবুর অফিসে পৌঁছে যাব। তারপর সন্দীপ···তারপর আমি তোমার স্ত্রী। এবার তুমি বল, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল, যেন আমার প্রাণটা শুনতে পায়।

এবার মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে সন্দীপ, এষা দত্তের ভালবাসার বিপুল মমতায় বিহ্বল ও বিস্মিত সন্দীপ, প্রীত ও

কৃতার্থ সন্দীপ।—তারপর, আমি তোমার স্বামী।

॥ চৌদ্দ ॥

বালিগঞ্জের রায়ভবনের বড়ঘরের ভিতরে সেই সন্ধ্যায় কাচের গেলাস চূর্ণ হওয়ার যে শব্দটাকে শাঁকের শব্দের চেয়েও শুভাবহ সুলক্ষণ বলে মনে করেছিল সন্দীপ, সেই শব্দটা এখন এই বড়ঘরের ভিতরে প্রতি সপ্তাহের অন্তত একটি সন্ধ্যার নিয়মিত শুভ উৎসব হয়ে উঠেছে। কোনদিন একটু কম, কোনদিন একটু বেশি, বিহ্বল ও বিবশ অনেক হাতের ঠেলা লেগে কাচের গেলাস জাগ আর জার টেবিল থেকে পড়ে যাচ্ছে আর ভাঙছে।

সন্দীপ রায়ের এই বিবাহিত ঘরোয়া জীবনের সান্ধ্য আসরে যাঁরা নিয়মিত উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন সেই ক'জন ভদ্রলোক, যাঁরা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের দিন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মিল এজেন্ট সুরজিৎ সামন্ত, মেজর পৃথ্বীরাজ, কুমার সুরঞ্জন, শেয়ার ডীলার অনিমেষ ঘোষ আর জয়াজী স্যারের সেক্রেটারি সেই বলবন্তভাই। সন্দীপেরই মতো এক-একটি সুখী চেহারা; বয়সে কেউ ত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ। বিনায়ক হালদারও আসেন, কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণ থেকেই চলে যান। কিন্তু যার উপস্থিতি একেবারেই পছন্দ করে না সন্দীপ, সেই লোকটি কালো রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আর উৎফুল্ল হয়ে সন্দীপের এই ঘরোয়া সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হতে কখনও ভুলে যায় না। সন্দীপ শেষে বলতে বাধ্য হয়েছে।—তুমি এত রেগুলার না হলেও তো পার, মন্দার।

মন্দার—কেন সন্দীপ, আমি কোন্ অপরাধ করলাম? আমি না হয় এটিকেট জানি না, ইংরেজী বলতে-কইতে পারি না, কিন্তু কাউকে তো বিরক্ত করি না।

মন্দারের কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারে না সন্দীপ। দেখেছে সন্দীপ, মন্দারকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন আরও খুশি হয়। মন্দার ঘরে ঢুকলেই হাসি-খুশির একটা সাড়া পড়ে যায়। সবাই ডাকে—মন্দার এখানে বসো। মন্দার, প্লীজ টেক ইওর সীট হিয়ার। মন্দারবাবু আইয়ে, হামারে নজদিগ বৈঠিয়ে।

মন্দারকে দেখে আর মন্দারের চালচলন আর কথাবার্তার রকম-সকম দেখে এরা যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়, কিন্তু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। একদিন আসরের গল্প আলাপের উজ্জ্বল হর্ষের মধ্যে মন্দারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ উদাত্ত হয়ে বেজে উঠলো।—মিসেস রায়ের বোধহয় একটু বরফ চাই।

চমকে ওঠে এরা—হ্যাঁ, চাই বৈকি। কিন্তু আপনি উঠছেন কেন? আপনি বসুন, মন্দারবাবু।

কিন্তু এবার আপত্তি মাঠে মারা গেল। মন্দার উঠে এসে টেবিলের জাগের ভিতর থেকে বরফের একটা বড় চাকলা তুলে নেয়। কালো রুমাল দিয়ে বরফের চাকলাটাকে জড়িয়ে ধরে মেঝের উপর ধোবিয়া আছাড়ের ভঙ্গিতে ঠুকে-ঠুকে গুঁড়ো করে ফেলে। একটা ছোট জারের মধ্যে সেই বরফ গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে এবার

হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। মন্দারের ব্যস্ততার রকম-সকম দেখে এষা হেসে হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায়।

হেসে ফেলে সন্দীপও—মন্দার একটু বেশি ক্লাউনিশ।

এষা বলে—বেশ মজার মানুষ।

প্রতি সপ্তাহের এই ধরনের এক-একটি উৎসব নিতান্ত অকারণ উল্লাসের ব্যাপার নয়। কারণ থাকে। এক-একটা শুভ ঘটনার স্মৃতিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এক-এক সন্ধ্যার উৎসব আহ্বান করা হয়। আহ্বান করবার নায়িকা স্বয়ং এষা রায়। কোন্ সপ্তাহের কোন্ দিনে কী কারণে আনন্দ করা হবে, এষাই বলে দেয়। প্রথম দিনের সান্ধ্য সমাবেশের উপলক্ষ ছিল, সন্দীপ রায় ও এষা রায়ের বিবাহিত জীবনের শুভারম্ভ। শুভ ঘটনার মাসগুলিকে তো একসঙ্গে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। ওই তারিখগুলিকে নয়, বারগুলি স্মরণ করতে হয়। স্মরণ করেছে এষা, চক্রবর্তীর এগজিবিশনে যেদিন প্রথম সন্দীপকে দেখতে পেয়েছিল এষা, সেদিন ছিল সোমবার, জয়ান্তী লিমিটেডের ফ্যাক্টরি উদ্বোধনের দিনে পানামোদের আসরে সন্দীপের সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল এষা, সেদিন ছিল বুধবার। এষার জন্মদিন শুক্রবার। সন্দীপের জন্মদিন রবিবার। এই রকম ও এইভাবে এক-একটি শুভবার কোন একটি সপ্তাহে উদ্‌যাপিত হয়। সেই শুভবারে ব্যাঙ্ক থেকে সন্দীপকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। এষার কাছ থেকে শুনে নিতে আর জেনে নিতে হয়, আর বাবুর্চি ও বেয়ারাকে বলে দিতে হয়, আজ কী কী বস্তু কতটা করে কিনে নিয়ে আসতে ও রেডি করে রাখতে হবে।

এষা যেদিন বলে ফটিককে পাঠালে হবে না, তুমি নিজেই যাও, সেদিন সন্দীপকেই মার্কেটে গিয়ে এষার পছন্দের শেরি ও জিন কিনে আনতে হয়।

ব্যাঙ্কের সবাই জেনেছে, সাহেব বিয়ে করেছেন। তাই একদিন সকালবেলা একটা দরখাস্ত হাতে নিয়ে ব্যাঙ্কের ক্লার্ক তমোনাশ এসে এই বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়েছে। দরখাস্তের বক্তব্য—ব্যাঙ্কের কর্মী আমরা সবাই আপনার শুভজীবন কামনা করে একটু আনন্দ করতে চাই। আশা করি, আপনি এজন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করবেন।

বাড়ির বেয়ারা সেই দরখাস্ত হাতে নিয়ে সন্দীপের কাছে পৌঁছে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। দরখাস্ত পড়ে হেসে ফেলে সন্দীপ।

এষা—কী ব্যাপার?

সন্দীপ—আমার ব্যাঙ্কের লোকেরা আমার বিয়ে হয়েছে শুনে আনন্দ করবার জন্য কিছু খেতে চাইছে। সেইজন্য ওদের কিছু টাকা চাই।

এষা—দিয়ে দাও।

দরখাস্তের উপর মঞ্জুরী টাকার অঙ্কটা লিখে দিয়ে আর সই করে বেয়ারাকে ডাক দেয় সন্দীপ—নিয়ে যাও।

এষা—কত টাকা দিলে?

সন্দীপ—একশো টাকা।

এষা হাসে—বাঃ।

সন্দীপ—তুমি কী বল? আর একটু কম করে দেব?

এষা আবার হাসে।—তোমার ইচ্ছে।

দরখাস্তটা বেয়ারার হাতে না দিয়ে আবার কলম চালিয়ে একশো টাকার অঙ্কটাকে কেটে নতুন একটা ক্ষীণতর অঙ্ক বসিয়ে দেয় সন্দীপ।—নিয়ে যাও।

দরখাস্ত হাতে নিয়ে বেয়ারা চলে যেতেই প্রশ্ন করে এষা,—কত দিলে?

সন্দীপ—একার।

সন্দীপের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে এষা এইবার বেশ অদ্ভুত স্বরে হেসে ফেলে।—বাঃ।

সন্দীপও হাসে।—এ মাসে কত টাকার কাচের গেলাস আর জাগ ভেঙেছে বলতে পার?

এষা—না।

সন্দীপ—ফটিক বললে, দেড়শো টাকার।

এষা—বেশ তো? মন্দ কি? শখের জন্যে মানুষ কত দেড়শো টাকা গুঁড়ো করে দেয় তা কি জান না?

সন্দীপ—আমি যে তা জানি, সেটা তুমিও জান।

এষা—আমি তো শুধু জানি যে, তুমি আমার জন্যে এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই হাজার টাকা খরচ করেছো। একটা লিকলিকে চেন-নেকলেস, তার লকেটে এইটুকু এক-টুকরো হীরে, ব্যস্।

সন্দীপ—এটা আবার কী রকমের কথা বললে, এষা? এই যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা-না-একটা আনন্দের জন্যে এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি…?

এষা—সেটা তো আমার জন্যে তুমি খরচ করছো না।

সন্দীপ—কী বললে?

এষা—তোমার জীবনের, তোমার ঘরের সুখের জন্য তুমি টাকা খরচ করছো, আমার জন্যে নয়।

সন্দীপ—তোমার কথাগুলি আরও হেঁয়ালি হয়ে গেল।

এষা—একটুও হেঁয়ালি হয়ে যায়নি। তুমি বাইরে ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলে, আমি তোমাকে সেই মিথ্যে হয়রানি থেকে রক্ষা করে তোমার জীবনকে একটি সুখের ঘর পাইয়ে দিয়েছি। তুমি যে-রকম সুখের ঘর চেয়েছিলে, ঠিক সেই রকম সুখের ঘর।

সন্দীপ—যা-ই হোক, আমার মনে হয় যে, আমার সুখের ঘরের এই সব খরচ একটু কমিয়ে ফেললে ভাল হয়, তাতে আমার সুখের কিছু কমতি হবে না।

এষা—খরচ যখন কমবার হবে, তখন নিজেই কমে যাবে। কিন্তু সেজন্য তুমি কোন চেষ্টা করো না, সন্দীপ। তাতে ফল ভাল হবে না।

চমকে ওঠে সন্দীপ। এ কি সত্যিই এষা কথা বলছে? না, দ্বিতীয় কোন ভেলকির ওরেক্‌ল্‌ কথা বলছে? বুঝতে পারা যায় না, এষার ভাষাটা হেঁয়ালি, না, কথা বলবার এই নতুন ভঙ্গিটা হেঁয়ালি? এষার গলার স্বরও যে বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

সবকিছুই কত তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সন্দীপের সাধ-অসাধ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে একটু ভ্রূক্ষেপও না করে সব বদলে যাচ্ছে। স্কচ-হুইস্কির স্বাদটাও অন্যরকমের হয়ে গিয়েছে, সেই ঝাঁজ আর পাওয়া যায় না। দু'চুমুক খেলেই ঢেকুর তুলতে হয়। যেন ঝাল-মেশানো ডাবের জলের ঢেকুর। কবে আর নিজের হাতে শেরি-টুইস্ট তৈরি করে খাওয়াবে এষা? অনেকদিন তো পার হয়ে গেল। কত সহজে আর কত শিগগির এষা তার এই সেদিনের সেই ব্যাকুল শপথের কথাটা ভুলে গিয়েছে।

বাইরে বেড়াতে যাবার সেই ব্যস্ততা ও তাড়া আজ আর নেই। কচিৎ কখনও এষা যদি হেসে-হেসে হঠাৎ বলে ফেলে যে, আজ একটা খুব বাজে ছবি দেখতে ইচ্ছে করছে সন্দীপ, তবে এষার সঙ্গী হয়ে বাইরে বের হবার জন্য অবশ্য একটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। পুরনো আনন্দের স্বাদটা বুকের ভিতরে আবার একটু ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে।

একদিন হঠাৎ এইরকমই ভঙ্গিতে হেসে-হেসে গলার চেন-নেকলেসের হীরের লকেটকে দুই আঙুলের টিপের মধ্যে ধরে আর বেশ জোরে এক-একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে থাকে এষা।—আজ ইচ্ছে করছে, খুব বাজে একটা…।

সন্দীপ—কিন্তু ও কী করছো? লকেটটা যে ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

এষা—যাবে তো যাবে। তোমার আড়াই হাজার টাকার ক্ষতি হবে, তার বেশি তো নয়।

এটাই বা কী কম হেঁয়ালির কথা। সন্দীপের আড়াই হাজার টাকার ক্ষতিটা যেন নিতান্ত তুচ্ছ একটা ক্ষতি, বটগাছের একটা পাতা ধুলোর উপর পড়ে গেলে গাছটার যেমনতর ক্ষতি হয়ে থাকে।

কিন্তু এষার গলার ওই নেকলেসের হীরের দামটাকে সামান্য একটা বটপাতা বলে মনে করলেও তো এষার মনে রাখা উচিত যে, ওটা বটপাতা নয়, ওটা সন্দীপের ভালবাসার প্রতীক, স্ত্রী এষার গলাতে স্বামী সন্দীপের প্রথম উপহার।

সন্দীপ—কী যেন বললে তুমি?

এষা—আজ বিকেলে একটা বাজে জায়গাতে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

সন্দীপ—বল, কোথায় যেতে চাও?

এষা—ঢাকুরিয়া লেক।

সন্দীপ—আমি তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে একটু আগেই…।

এষা—না না, তোমাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না। তোমার আজ আমার সঙ্গে বেড়াতে বের না হলেও চলবে। তুমি আজ অন্য একটা গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কে

যাও, ক্যাডিলাক থাকুক।

এর পর পুরো একটি মাসের মধ্যে কোন একটি দিনও এষার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য সন্দীপকে ব্যস্ত হতে হয়নি। ক্যাডিলাক আছে, বাবুলাল ড্রাইভার আছে, এষার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটার জন্য সন্দীপের সঙ্গ তার দরকার হয়নি। এষা একাই বের হয়েছে আর ফিরে এসেছে।

বড়ঘরের টেবিলের কাছে একটি কাচের গেলাস হাতে নিয়ে একলা বসে থাকে সন্দীপ, আর খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার চৈত্র সন্ধ্যার উতলা বাতাস ঘরের ভিতরে ঢুকে ছুটোপুটি করে। তখনও সন্দীপের মনের ভিতরে কোন প্রশ্ন খুব বেশি ছুটোপুটি করে না। শুধু মনে হয়, এষা সত্যিই একটি অদ্ভুত···চমৎকার···দুরন্ত হেঁয়ালি।

মনে হয়, তাই ভয় হয় সন্দীপের, এষা যদি কোনদিন বাইরে বেড়াতে যাবার আগে হঠাৎ বলে ফেলে, আজ তুমিও চল—তবে কি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে সন্দীপ? বোধহয় পারবে না। যদি জোর করে নিজেকে ব্যস্ত করিয়ে নিয়ে এষার সঙ্গে বেড়াতে বের হয় সন্দীপ, তবেই বা কী হবে? সেই দুরন্ত আনন্দের স্বাদটা কি আবার সন্দীপের রক্ত ও নিঃশ্বাসের মধ্যে তেমন করে মেতে উঠতে পারবে? পারবে না। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করে আর মুখ খুলে এষাকে বলে দিতেও পারা যাবে না। বললে, খুব ভুল বুঝবে এষা। হয়তো একটা সন্দেহই করে বসবে যে, এষার জন্যে সন্দীপের প্রাণের ভিতরে সেই ভালবাসা বুঝি আর নেই।

একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছিল এষা, বড়ঘরের ভিতরে এষার জীবনের স্মৃতি-পুলকিত সান্ধ্য আমোদের হর্ষ যখন কমে যাবার হবে, তখন নিজেই কমে যাবে। ঠিকই কমে গিয়েছে। যেদিন ঢাকুরিয়ার লেকে বেড়িয়ে আসবার জন্যে একাই বের হয়ে গেল এষা, তারপর এই তো পুরো তিনটি মাস পার হয়ে গেল, কিন্তু কই, বড়ঘরের ভিতরে অতিথিদের আমোদিত সমাবেশ তো আর হয়নি। বাবুর্চি ফটিকও কোনদিন অভিযোগ করে ভাঙা ক্রকারির কোন হিসাব দাখিল করেনি।

এরই মধ্যে এষা একদিন হেসে হেসে বলে ফেলেছে।—তুমি কি একটা ব্যবস্থা করে দেবে না, আমার যে বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

সন্দীপ ঠাট্টা করে হাসে।—এত দূরে বসে কথা বললে তো অসুবিধে হবেই।

চেয়ার থেকে উঠে সন্দীপের কাছে এসে একই সোফার উপর বসে আর সন্দীপের হাতের উপর হাত রাখে এষা—ঠাট্টা করে কথাটা বললে কেন, সন্দীপ? এটা তো তোমার দাবির কথা।

সন্দীপের বুকের বাতাস যেন পুরনো সৌরভে ভরে গিয়ে নিবিড় হয়ে যায়। এ তো কোন হেঁয়ালি নয়, সেই এষাই কথা বলছে। এষার হাতটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে এষার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। দেখতে পায় সন্দীপ, ঠিকই তো, কোন ভুল নেই, নবশ্রীরার লিপস্টিকের রঙিন প্রলেপ নিয়ে সেই তাহিতি ঠোঁট সেই রকমই ফুল্ল হয়ে ফুটে রয়েছে।

সন্দীপ বলে—আমি থাকতে তোমার কোন অসুবিধে কেন হবে, এষা ?

এষা—দুঃখের কথা, তুমি থাকতেও আমার অনেক অসুবিধে হচ্ছে। তুমি তোমার ব্যাঙ্কে আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দাও, যেন আমি অন্তত এক লাখ পর্যন্ত ওভারড্র করতে পারি।

সন্দীপ—বেশ তো, তাই হবে। আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এষা—আরও একটি কাজ কর। তুমি তোমার ব্যাঙ্কের তরফে চিঠি লিখে দোকানগুলোকে জানিয়ে দাও যে, আমার সই-করা স্লিপ পেলেই যেন আমার দরকারের জিনিসগুলি পাঠিয়ে দেয়।

সন্দীপ—দোকানগুলোর নাম-ঠিকানা একটা কগজে লিখে আমাকে দিও।

এষা—লিখেছি, কাগজটা তোমার ডায়েরীর মধ্যে রেখে দিয়েছি।

সন্দীপ—বেশ করেছো। আজকালের মধ্যেই দোকানগুলোকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব।

এষা হাসে—আজ-কালের আজটা কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে। বল, কালকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেবে!

সত্যিই এখন রাত দশটা। ভাষার ভুলটা বুঝতে পেরেছে সন্দীপ। ঠিকই, আজ নয়, কালই সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু আজকাল রাত দশটার সময় এষাকে এমন করে এত কাছে কবেই বা পাওয়া যায় ? খুব কম। সে তো আজ প্রায় এক মাস আগের একটি রাতের কথা। ঘুমের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল নিশির ডাক শুনতে পেয়ে জেগে উঠতে হয়েছিল। এষার ঘরের বন্ধ দরজার উপর বার বার হাত ঠুকে সন্দীপের ব্যাকুল ইচ্ছেটা বার বার মাথা ঠুকেছিল। এষা তারপর দরজা খুলে দিল। কিন্তু কী অদ্ভুত একটা কথা কত সহজে বলে দিল এষা আর কোনদিনও আমার ঘরের বন্ধ দরজার উপর এরকমের হামলা করবে না। যখন তখন তোমার ইচ্ছে হলেই কিছু হবে না। আমার ইচ্ছে হলে তবেই হবে।

আজ এখন তো ঘুমিয়ে পড়েনি এষা, যদিও রাত দশটা বেজে গিয়েছে। এষার জাগা প্রাণটা সন্দীপের কত কাছে সন্দীপের সঙ্গে হাতে-হাতে বাঁধা হয়ে সোফার উপর বসে আছে।

এষা—মনে হচ্ছে, আজ তুমি আমার হাতটাকে এখন ছেড়ে দিতে পারবে না।

সন্দীপ—না। এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে।

এষা—থাকবো।

এরপর, এই রাত ফুরিয়ে গিয়ে যখন ভোর হয়ে যায়, আর অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে সন্দীপের ঘুম ভেঙে যায়, তখন বুঝতে পারে সন্দীপ, শব্দটা পাখির ডাকের শব্দ নয়, ক্যাডিলাকের ইঞ্জিনের শব্দ। কী আশ্চর্য, আজ এই ভোরবেলাতেই কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে এষা ?

এরপর আরও কত রাত এল আর ফুরিয়ে গেল, কিন্তু এষাকে কোন রাতেও তো ঠিক এমন করে এত কাছে আর পাওয়া গেল না। ভাবতে বেশ আশ্চর্য লাগে

সন্দীপের, এষার ভালবাসার ইচ্ছেটা যেন ঢেউয়ের বুকে চাঁদের ছবি। এই ভেসে উঠছে, এই ডুবে যাচ্ছে। কখন যে কাছে এসে বসবে আর হাতের উপর হাত রাখবে, কোন ঠিক নেই। আবার কখন যে সরে যাবে, কোন ঠিক নেই। বুঝতেও দেয় না, কখন সরে গেল। এষাকে একদিন আর-একবার একটু ঠাট্টা করে আর হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করলে হয়—কী গো সুনয়না, তোমার কি কখনও নয়নে পড়ে না যে, এই ঘরের এই সোফার উপর এক ব্যক্তি তোমারই আশায় রাত দশটা পর্যন্ত বসে আছে আর হাই তুলছে?

এক মাসের মধ্যে কত দিন আর কত রাত তো পার হয়ে গেল, কিন্তু ওরকম একটা সামান্য ঠাট্টার কথাও এষাকে কখনও বলতে পারেনি সন্দীপ। কেন পারেনি? বুঝতে পেরেছে সন্দীপ, বড় বেশি ভালবেসে ফেললে মানুষের মন এই রকমই নরম হয়ে যায়। ভয় হয়, এরকম নিরীহ ঠাট্টার কথা শুনেও হয়তো খুব দুঃখ পাবে এষা।

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তুমি কি বালুচর শাড়ি দিয়ে ঘরের যত দরজা ও জানালার পর্দা তৈরি করবে? একদিনে একসঙ্গে সাতটা বালুচর শাড়ি কিনে ফেললে কেন? আজই ব্যাংকের কাছে শাড়ির দোকানের বিল এসেছে, বিলের টাকাও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু একবার এষাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে সাতটা বালুচর কেন?

একথাও এষাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি সন্দীপ। জুয়েলার ঠাকুরদাসেরও একটা বিল এসেছে। গ্রেগরির ওয়াইন-স্টোরের বিল এসেছে। কোন সন্দেহ নেই আরও বিল আসবে, আসতেই থাকবে।

কিন্তু একটা বিল দেখে সন্দীপের চোখের বিস্ময় যেন বুকের ভিতরে গিয়ে থমথম করে। এ কী ব্যাপার! এষার প্রাণটা যেন ফল্গুর অন্তঃশীলা ধারার মতো একটা কাণ্ড করে বসে আছে। এই বিলটা হলো জেণ্টস্ ড্রেসের একটা বিল। বিল পাঠিয়েছে ড্রেসমেকার 'চ্যাম্পিয়ান'। বিলের মধ্যে কোট শার্ট আর ট্রাউজার আছে, আদ্দির আর সিল্কের পাঞ্জাবিও আছে। এষার ভুলো মনের তুফানী কাণ্ড দেখে যা মনে হয়েছিল, তা তো সত্য নয়। যার কাছে আসতে ভুলে যায় এষা, তাকে ভুলে থাকতে পারেনি। তারই জন্য উপহার যোগাড় করে রেখেছে। তবু জিজ্ঞাসা করতে হবে এষাকে: তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে, এই মাসের একুশে হলো আমার জন্মদিনের তারিখ?

কিন্তু কী অদ্ভুত এষার ভুলো মনের কাণ্ড? একুশে তারিখ এসেছে; সকাল থেকে সন্ধ্যা, তারপর রাত দশটা পর্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষাও করেছে সন্দীপ। কিন্তু কোথায় এষা, আর কোথায়ই বা এষার উপহার? বড়ঘরের টেবিলের উপর শেরীর একটি বোতল আর দুটি গেলাস রেখে ফিরে-আসা ক্যাডিলাকের হর্নের আর ফিরে-আসা এষার হাসির শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে বসে থেকে সন্দীপের নিশ্চল শরীরটাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের রোদে তিন ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করলেও বোধহয় মানুষের শরীর এত ক্লান্ত হয় না। আর, দু'মিনিটের স্বপ্নটাও যেন একটা

ঝরে-যাওয়া শোভার ভয়ানক বিশ্রী ছবি। আলমোড়াতে এক ঘন্টার শিলাবৃষ্টিতে হোটেলের অত বড় ফুলবাগানটার সেই শ্মশানদশার ছবি। ফুল নেই, পাতা নেই, দাঁড়িয়ে আছে শুধু যত নেড়া কাঠির ঝোপ।

।। পনের ।।

চমকে দেবার মতো আর আশ্চর্য হবার মতো ঘটনার নতুন দৃশ্য প্রায় রোজই দেখতে হচ্ছে। বালিগঞ্জের রায়ভবন যেন এক অন্তহীন নাটকের স্টেজ। সন্দীপের মনে হয়েছে, হ্যাঁ, স্টেজই বটে। সবচেয়ে মজার কথা, এই নাটকে সবাই আছে, শুধু নেই এক সন্দীপ রায়। বাবুর্চি বেয়ারা ড্রাইভার চাকর আর মালী, ওরাও আজকাল যেন শুধু এক দিদি-সাহেবকে দেখতে পায় আর বার বার সেলাম করে। এষাকে দেখতে পেলে সবাই যেন ক্রীতদাসের মতো এক-একটি বিনীত ভঙ্গির মূর্তি হয়ে যায়। এষার ডাক শুনতে পেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। সেদিন গ্যারেজের কাছে অচেনা একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দীপকে তেমন কিছু আশ্চর্য হতে না হলেও ভাবতে হয়েছে, কী চায় লোকটা, গ্যারেজের কাছেই বা দাঁড়িয়ে আছে কেন? লাল জ্যাকেট আর সাদা প্যাণ্ট, মাথায় সাদা টুপি, কে এই লোকটা?

বুঝতে দেরি হয়নি সন্দীপের, অচেনা কেউ নয়, খুব চেনা। লোকটা হলো ড্রাইভার বাবুলাল। বাবুলালকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারা গেল, নীল রঙের উর্দি দিদি-সাহেবের পছন্দ নয়, তাই বাবুলালের নতুন রঙের উর্দি হয়েছে।

বারান্দার সিঁড়িতে পাথুরে সিংহটার কেশরের উপর বেশ শ্যাওলা জমেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন সিংহটার ঘাড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে আর ঘষে ঘষে শেওলা তুলতে অনেক চেষ্টা করেছে সন্দীপ। কিন্তু তুলতে পারা গেল না। কেশরের খাঁজে খাঁজে শ্যাওলা জমেছে; সহজে সরবে কেন?

বিকেলের সব আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি, সন্ধে হতে একটু দেরি আছে। তাই সিংহের ঘাড়ে একটা পা রেখে আর সিগারেট মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। কিন্তু একটা নতুন দৃশ্য দেখে চমকে উঠতে হয়।

ট্যাক্সি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। বেশ ঘষা-মাজা পরিচ্ছন্ন চেহারা। গায়ের পোশাকটা নিতান্ত প্লাস-টু বটে; শুধু শার্ট আর ট্রাউজার, গরমের দেশে যেটা খুব বেশি চক্ষুশূল নয়; কিন্তু বিকেলের রোদে ভদ্রলোকের পোশাক যেরকম চিকচিক করছে, তা দেখে ধারণা করতে হয় যে, পোশাকের কাপড়টা সিল্কের ড্রিল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ক্রীম রঙের শার্ট আর বাদামী রঙের ট্রাউজার। ছোট-বড় অনেকগুলো প্যাকেট দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর বুকের উপর চেপে রেখে ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন।

কিন্তু আর অনুমান করবার দরকার হয় না। সন্দীপের মুখের সিগারেটের আগুনটা যেন আশ্চর্য হয়ে আর চমকে চমকে জ্বলতে থাকে। চিনতে আর বুঝতে

পেয়েছে সন্দীপ, মন্দার এসেছে।

সন্দীপের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় মন্দার।—বেচারা সিংহটাকে ওরকম করে মাড়াচ্ছো কেন ?

সন্দীপ—তবে কি তোমাকে মাড়াবো ?

মন্দার হাসে—আমাকে মাড়িয়ে তোমার আর কী লাভ হবে ?

সন্দীপ—কিন্তু তোমার এ দশা কেন ?

মন্দার—খারাপ দশা বলছো ? না, একটুও না। আমি তা মনে করি না। আমি খুব ভাল আছি। আমার এখন বেস্পতির দশা।

সন্দীপ—আমি জিজ্ঞেস করছি, এসব কী ? কিসের বোঝা ?

মন্দার—এসব এষা রায়ের ফরমাশি জিনিসের বোঝা।

সন্দীপ—কিন্তু এসব বোঝা তোমার বইতে হচ্ছে কেন ?

মন্দার—এষা রায়ের ইচ্ছে আর আমারও ইচ্ছে। তিনি নিজের মুখে বলেছেন, তাই তাঁর ফরমাশ খাটছি।

সন্দীপ—তাতে তোমার কী লাভ হচ্ছে ?

মন্দার—বাঃ, লাভ নয় ? অনেক লাভ। দু'দশ টাকা যখনই চাইছি, তখনই তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। না চাইতেও দিয়েছেন। তিনি তোমার মতো কিপটে মানুষ নন। তিনি এখন বাড়িতে নেই বোধহয় ?

বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে চলে যায় মন্দার। বাড়ির ভিতরে কোথায় কোন্ ঘরের ভিতরে জিনিসগুলি রাখতে হবে, সবই নিশ্চয় মন্দারের জানা আছে। মন্দারের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে এখন বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই যে, ফরমাশ খাটবার জন্য এ বাড়িতে আনাগোনা করা এখন মন্দারের জীবনের একটা স্বচ্ছন্দ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। গৃহবলিভুক্ পায়রার মতো এই মন্দার এখন এষার বকশিশভুক্ একটি প্রাণী।

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই বাড়ির ভিতর থেকে ফিরে আসে মন্দার। সন্দীপ বলে—কিন্তু, এষার কাছ থেকে এরকম পোশাক-টোশাক চাইতে তোমার একটুও লজ্জা হলো না কেন, মন্দার ?

মন্দার—বিশ্বাস কর, আমি চাইনি। উনি নিজের ইচ্ছেতে দয়া করে দিয়েছেন। নইলে আমার কোন দরকার ছিল না। আমাকে তো একটা বাঁধিপোতার গামছাতে মানিয়ে যায়।

সন্দীপ হেসে ফেলে—কিন্তু তুমি কি সেটা বিশ্বাস কর ?

মন্দার—করি বৈকি। আমি আগে যখন গণেশদার ব্যায়ামাগারে একসাইজ করতাম, তখন আমার এমনই অভাব ছিল যে, একটা শালুর জাঙিয়াও কিনতে পারিনি। অগত্যা বাঁধিপোতার গামছা পরেই প্যারালাল বারে পীকক হতাম, রিং-এ টি হতাম। ব্যায়ামাগারের একটা পুরনো ফটোতে তুমি দেখতে পাবে, জাঙিয়া-পরা জনদের মধ্যে শুধু আমি একা গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছি।

চলে যায় মন্দার। সন্দীপ আবার সিগারেট ধরায়। যাক্, এতদিনে আর এতক্ষণে একটা অদ্ভুত রহস্যের ঘোর কেটে গেল; 'ড্রেসমেকার চ্যাম্পিয়নে'র সেই বিলের রহস্য। বিলে লেখা পোশাকের ফর্দটা ছিল মন্দারের জন্য এষার খুশি-মনের যত বকশিশ-সামগ্রীর ফর্দ।

কোন সন্দেহ নেই, মন্দার দত্ত একটি বাঁধিপোতা গামছা ছাড়া আর-কিছু নয়। এষা সেই গামছা দিয়ে পা মুছে নিচ্ছে। তবু এষাকে একটু বলে দেওয়া উচিত যে, এরকম অদ্ভুত মানুষকে দিয়ে ফাই-ফরমাশ না খাটানোই ভাল। অভাবী ইডিয়টিক মানুষ, ভুল করে কিংবা বোকামি করে কখন্ যে কী ক্ষতি করে ফেলবে, তার কোন ঠিক নেই।

বলি-বলি করেও কথাটা এষাকে কোনদিন বলতে পারে না সন্দীপ, যদিও পুরো একটা মাস পার হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যে অন্তত সাতবার এষার সঙ্গে সন্দীপের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে। গাড়ির কথা, নতুন কার্পেটের কথা, জল বাতাস আর হিট ও হিউমিডিটির কথাও অনেক হয়েছে। কিন্তু ওই সামান্য কথাটা এষাকে বলে দেওয়া আর সম্ভব হয়নি। বললে হয়তো খুবই ভুল বুঝে ফেলবে এষা। হয়তো মনে করে বসবে যে, তার একটা সামান্য দয়া-দাক্ষিণ্যের ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করে সন্দীপ একটি নিরেট সেকেলে স্বামীর মতো স্ত্রীর উপর ওভার লর্ডগিরি করতে চাইছে। মুখে হয়তো কিছু বলবে না, কিন্তু মনে-মনে অসন্তুষ্ট হবে। আর এষার সেই চাপা অসন্তোষের চাপে বেচারা মন্দারের সব বকশিশের আশা থেঁতলে যাবে।

ক'দিন পরে একদিন ব্যাংক থেকে বাড়ি ফিরে এসেই মনে হয় সন্দীপের, আজ বোধহয় বড়ঘরের ভিতরে বড় রকমের কোন ব্যাপার হবে। বাবুর্চি ফটিক টাটকা ন্যাপকিন কোমরে জড়িয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। শব্দ শুনে বোঝা যায়, বড়ঘরের ভিতরে চেয়ার-টেবিল সাজানো হচ্ছে। মস্ত বড় একটা ফুলদান আর ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বেয়ারা বড়ঘরের ভিতরে ঢুকছে।

করিডরের এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে এষা। বালুচর শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ে মেঝের গা বুলিয়ে চলছে। এষার পায়ের ভেলভেটের চটি মেঝের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে। শব্দ না করলেও বোঝা যায়, বালুচরের আঁচল আর ভেলভেটের চটি আজ বেশ উতলা হয়েছে।

সন্দীপকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে এষা—তোমার আর একজন যে বন্ধু আছেন, যার নাম বিনায়ক, ইচ্ছে হয় তো তাঁকে একবার ফোন করে বলে দিতে পার যে, আজ সন্ধ্যা সাতটায় এখানে যেন আসেন।

সন্দীপ—কেন?

এষা—বিশেষ ব্যাপার আছে।

সন্দীপ—কী?

এষা—খুব ঘটা করে নয়, ছোট্ট করে একটা 'অ্যাজ ইউ লাইক' হবে। যাক্,

যা তোমাকে বলবার ছিল, বলে দিলাম, তুমি দয়া করে গেস্টদের আসবার একটু আগেই এস।

সন্দীপ—আর কিছুই কি বলবার নেই?

এষা—না; তোমাকে বলবার মতো আর কী কথা থাকতে পারে, ভেবে পাচ্ছি না।

সন্দীপ—আমাকে একটু বলবে তো, আজকের আনন্দের উপলক্ষটা কী?

এষার রঙিন ঠোঁট কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে।—সত্যিই শুনতে চাও?

সন্দীপ—অবশ্যই চাই।

এষা—তবে শোন। এষা এতদিনে তার মনের মতো আর প্রাণের মতো মানুষ পেয়েছে—এই হলো উপলক্ষ।

সন্দীপের দুই চোখে, বুকের ভিতরেও একটা রঙিন বিস্ময়ের আবেগ কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। অন্য কেউ নয়, সত্যিই যে সেই এষা কথা বলছে। সন্দীপের মন-প্রাণ রূপ-গুণ আর রক্তমাংসের সবচেয়ে বড় গর্বটাকে অভিনন্দিত করে কথা বলছে এষা। এষার একটা হাত বুকের উপর তুলে নিয়ে সন্দীপের এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করছে যে···কিন্তু কোথায় এষা?

ব্যস্ত হয়ে চলে যাচ্ছে এষা। যেতে যেতে একটা দুঃসহ অভিযোগের কথা বলছে।—ওঃ, এই অবেলায় গায়ে গরম জল ঢেলে আবার চান করতে হবে। এতবড় একটা একেলে মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘরে স্টিম-বাথের একটা সরঞ্জাম রাখতে পারেননি।

শুধু আজ নয়, এই ক'মাসের মধ্যে এষা অনেকবার এভাবে আর প্রায় এই-রকমের ভাষায় সন্দীপের একেলে অভিরুচির প্রাণটাকে যেন কঠিন একটা ঠাট্টার টোকা দিয়ে কথা বলেছে। বোধহয় বুঝিয়ে দিতে চায় এষা, সন্দীপ রায়ের একেলে অভিরুচির অহংকারটা এষার কাছে যেন একটা ঘুণধরা আবর্জনা। সন্দীপের জীবনটা নতুন আনন্দের চেষ্টায় দুরন্ত হয়ে কতদূরেই বা এগিয়ে যেতে পেরেছে? রঙিন পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা লিলি পণ্ড পর্যন্ত, এই তো! কিন্তু এষার জীবনের চেষ্টা যে অনেক-অনেক দূর এগিয়ে যেয়ে মুক্ত মত্ত ও দুরন্ত একটা পাহাড়ী ঝর্নার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। অস্বীকার করে না সন্দীপ। তাই এষার ঠাট্টার টোকায় সন্দীপের মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা চঞ্চল হয়ে ওঠে না, উঠতে পারে না।

নতুন করে কিছু আর ভাববার দরকার নেই। এষাকেও কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই, কোন লাভও নেই। মোটামুটি একটা নীরব অস্তিত্ব হয়ে পড়ে থাকাই যে এখন সন্দীপের পক্ষে একটা নিরুদ্বেগ শান্তির জীবন, এ সত্যটাকে মনেপ্রাণে মোটামুটি বুঝেই ফেলেছে সন্দীপ।

ঠিকই, আজ সন্দীপের না জানলেও চলতো, কেন আর কিসের জন্য বড়ঘরের ভিতরে আজ বিশেষ উৎসবের দরকার হয়েছে। সাতটা বাজবার পনেরো মিনিট

আগেই সন্দীপ এসে বড়ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। বিনায়ক এলেন সাতটার দশ মিনিট আগে।

হেসে ডাক দেয় সন্দীপ—এসো বিনায়ক, ভিতরে গিয়ে বসো।

সাতটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে একসঙ্গে উপস্থিত হলেন পৃথ্বীরাজ, সুরঞ্জন, সুরজিৎ, অনিমেষ আর বলবন্তভাই।

—ওয়েলকাম। সন্দীপের মুখের হাসিটা উচ্ছ্বসিত হয়ে আগন্তুক অতিথিদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানায়।

আগন্তুক অতিথিরা ভিতরে চলে যেতেই হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ, সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকি। আজ বোধহয় মন্দার আর আসবে না।

সন্দীপের মনের মধ্যে অনুমানের ভাষাটা ফুরিয়ে যেতে না যেতেই দেখতে পায় সন্দীপ, মন্দার এসে গিয়েছে। কিন্তু…এ কী, মন্দারের এ কী রকমের অদ্ভুত সাজ। সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফরাসডাঙা ধুতি, মন্দার যেন কোম্পানির আমলের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙালীবাবুর মূর্তি।

মন্দারের চেহারাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। সন্দীপের চোখের তারা দুটো যেন জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু হেসে ফেলে সন্দীপ। —আজ এরকম অপরূপ সাজে সাজবার ইচ্ছে হলো কেন, মন্দার?

মন্দারও হাসতে থাকে।—আমার নিজের ইচ্ছেতে নয়, সন্দীপ। মিসেস রায়ের ইচ্ছেতে। উনি যেমনটি বলে দিয়েছেন, আমি ঠিক তেমনটি সেজেছি।

সন্দীপ—যাও, ভিতরে গিয়ে বসো।

সাতটা বাজতে এক মিনিট বাকি। এইবার সে-ই এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়, যে আজ বড়ঘরের বিশেষ উৎসবের অধীশ্বরী, এষা। আজ এষার গায়ের শাড়ি আর চোলির আবরণ প্রকারে যেমন খুব রঙিন, আকারে তেমনই খুব সামান্য। এই ছোট্ট চোলি আর একটুখানি শাড়ি যেন ফুলের গায়ের উপর রঙিন পরাগের দুটি ছোপ। সন্দীপের বুকের ভিতরে সব প্রশ্নের সমাধি তো হয়েই গিয়েছে, তবু সমাধিটাই যেন কেঁপে ওঠে। বিস্ময়ের কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বের হয়ে শুধু সামান্য একটা শব্দ করে ফেলে—এ কী! অদ্ভুত সাজ।

এষা হাসে—এই তো…'ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক'।

সন্দীপও হাসে।—ভাল, মনে হচ্ছে…অ্যাজ ইউ লাইক করতে গিয়ে শেষে একটা স্ট্রিপ-টিজ করে ফেলবে।

সন্দীপের হাতের উপর মৃদু-লঘু একটা টোকা দিয়ে হেসে ওঠে এষা—ফেললামই বা; তাতে তোমার তো কোন ক্ষতি নেই। চল, ভিতরে যাই।

এষার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে, হেসে হেসে অদ্ভুত এক খুশির আবেগ উচ্ছলিত করে বড়ঘরের ভিতরে ঢুকে গেস্টদের সহাস্য মূর্তিগুলোর দিকে তাকায় সন্দীপ। গেস্টরা হাত তুলে খুশির সংকেত জানায়—ওয়েলকাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, সামান্য একটা কথা বলতে গিয়ে ওরা ওরকম অদ্ভুত স্বরে হেসে উঠলো কেন? ওরা কি

কাগজের হংসমিথুন দেখে চমৎকার কৌতুকের হাসি হাসছে ?

ভোভার লেনের হরিপদ প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে অদ্ভুতরকমের ঘুড়ি উড়িয়ে খুব আমোদ জমিয়ে তোলে। উড়ছে ঘুড়ি, কাগজের হংসমিথুন; হরিপদর হাতের নাটাইয়ের এক-একটা অদ্ভুত টানের কায়দাতে কতরকমই না ঢঙ দেখিয়ে ঢলাঢলি করছে কাগজের হংস ও হংসী। হংসী তার গলা দিয়ে হংসের গলাটি জড়িয়ে ধরছে। হাততালি দিয়ে হেসে উঠছে রাস্তার ভিড়। ঠিকই, কৌতুকেরই দৃশ্য বটে।

বিনায়কের পাশের চেয়ারে বসে আর শেরির গেলাস হাতে নিয়ে দেখতে থাকে সন্দীপ, এবার হাতের গেলাসটাই যেন মাতাল হয়ে বার বার এবার মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যে দু'বার গেলাস খালি করে ফেলেছে এবা। এবার চোখ-মুখ বিহ্বল হয়ে কী চমৎকার হাসি হাসছে।

লেডি অব দি লেক। লেডি অব দি লেক। হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছে শেরির নেশার আমেজে আমোদিত অতিথিরা। জানতো না সন্দীপ, কোনদিন জানবার সুযোগও হয়নি যে, এবার আবার এরকম একটা উপাধি আছে।

কিন্তু বিনায়ক জানে বোধহয়, তা না হলে এরকম অদ্ভুতভাবে কেশে-কেশে ধোঁয়া ছাড়বে কেন বিনায়ক ?

সন্দীপ বলে—কী বিনায়ক, তুমি দেখছি কথাটা শুনে একেবারে আশ্চর্য হয়ে কেশেই ফেললে।

বিনায়ক—না, একটুও আশ্চর্য হইনি। কথাটা আমি তো নতুন শুনছি না। এর আগে দুবার শুনেছি। একদিন সকালবেলা, একদিন সন্ধ্যেবেলা। লেকের জলে নৌকা বাইছেন এবা রায়, আর ওঁরা সবাই লেকের ধারে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আর হেসে হেসে চিৎকার করছেন, লেডি অব দি লেক। লেডি অব দি লেক।

চেঁচিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন পৃথ্বীরাজ—লাফ্ অ্যাজ ইউ লাইক।

মত্ত হাসির হল্লা জেগে ওঠে। সবাই হাসছে, নানারকম সুরে ও স্বরে; যেন বিকট এক অপার্থিব জগতের যত হাস্যরবের মিশ্র কাওয়ালী।

সুরজিৎ সামন্ত গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—ডান্স্ অ্যাজ ইউ লাইক।

মেঝের উপর ঘুরে ঘুরে আর হেলে-দুলে একপাক নেচে নিয়ে আবার চেয়ারের উপর বসে পড়লেন সামন্ত।

হাত থেকে গেলাস পড়ে যাচ্ছে। হাতের ঠেলা লেগে কাচের জার উল্টে যাচ্ছে, পড়ছে আর ভাঙছে, ঝন্ ঝন্ ঝন্। এই অবিরল তরলতার আবর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও বা শক্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়ায় শুধু একজন, মন্দার দত্ত। এবার বকশিশভুক প্রাণী সেই মন্দার দত্ত হঠাৎ যেন একটি কঠোর প্রভুত্বের কলোসাস হয়ে উঠেছে। এবার টেবিলের চারদিকে আস্তে-

আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে মন্দার। তাই এষাকে শুভেচ্ছা জানাবার আবেগময় চেষ্টাগুলি এষার টেবিল থেকে একটু তফাতে থেকে কলরব করছে, এষার টেবিলের কাছে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে পারছে না। মন্দারের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে ওঠে সুরঞ্জন—থ্যাংক ইউ বডিগার্ড।

হ্যাঁ, বডিগার্ডই বটে। মন্দার দত্তের চরিত্রটা তো সন্দীপের অজানা নয়, নিজের ইচ্ছেতে একটা পছন্দমতো কর্তব্য তৈরি করে নেওয়া তো মন্দারের পুরনো অভ্যেস। এই মন্দারই নিজের ইচ্ছেতে বাবুর্চি ও বেয়ারাকে ধমক-ধামক করে এ-বাড়ির কেয়ারটেকারের একটা কর্তব্য তৈরি করে নিয়েছিল।।

কিন্তু বডিগার্ডের একটা অদ্ভুত সাহসের কাণ্ড দেখে চমকে ওঠে সন্দীপ। সত্যিই যে এষার বডিকে গার্ড করছে মন্দার। এরই মধ্যে দু'বার এষার হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে মন্দার। টলতে টলতে তিনবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এষা, বোধহয় নাচতে চায় এষা। কিন্তু তিনবারই হাত তুলে এষার ঘাড়টা একটু চেপে দিয়ে এষাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। দেখলে সন্দেহ হয়, এষার ঘাড়ে হাত রাখবার এই দুঃসাহসের কর্তব্যটাও নিজের বুদ্ধিতে তৈরি করে নিয়েছে মন্দার।

ভ্রূকুটি সামলাতে গিয়ে সন্দীপের কপালটা কুঁচকে যায়। হাত তুলে আর তুড়ি বাজিয়ে ইশারা করে ডাকতেই সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়ায় মন্দার।—বল।

সন্দীপ—তুমি ওসব কী খবরদারি করছো? ম্যানার্স ভুলে যাচ্ছ কেন?

মন্দার—উনি বলেছেন বলেই খবরদারি করছি।

সন্দীপ—উনি বলেছেন?

মন্দার—হ্যাঁ।

সন্দীপ—কী বলেছেন?

মন্দার—বলেছেন, তুমি আজ আমার কাছে কাছে থাকবে, মন্দার। বেশি বাড়াবাড়ির কোন ব্যাপার দেখলে তুমি সামলাবে।

সন্দীপ—যাও।

বিনায়কের পাইপ-ধরা মুখটা বড় বেশি ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করেছে, বড় বেশি গাঢ় ধোঁয়া। সন্দীপের চোখের সামনের বাতাসটা যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই আসরের মানুষগুলিকে এক-একটা বিকট ছায়াজীবের মতো দেখায়।

সন্দীপ—তুমি আজ খুব কড়া টোব্যাকোর ধোঁয়া ছাড়ছো, বিনায়ক।

বিনায়ক—না, না, কড়া টোব্যাকো নয়। আমি আজও আমার পছন্দের সেই জলকানো ব্র্যাণ্ড, সেই নিতান্ত মাইল্ড টোব্যাকো কিনেছি, যেটা আমি বরাবর খেয়ে আসছি।

বিনায়কের মাইল্ড তামাকের ধোঁয়াতেই সন্দীপের চোখে বেশ জ্বালা ধরেছে। কটকট করছে চোখ দুটো। তবু দুই চোখের ভুরু টান করে দেখতে থাকে সন্দীপ, ছায়াজীবগুলো একের পর এক এষাকে গুডনাইট জানিয়ে চলে যেতে শুরু করেছে।

আর, চেয়ার থেকে উঠেই একটা হাত বাড়িয়ে ডাক দিয়েছে এষা—বন্দার।

কী অদ্ভুত জলন্ত দৃশ্য। কোন মেঘ ধোঁয়া ছায়া কিংবা আবছায়া দিয়ে ঢাকা দৃশ্য নয়। স্তব্ধ হয়ে বসে দেখতে থাকে সন্দীপ, এক হাতে এষার একটা হাত, আরেক হাতে এষার বিলোল কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে এষাকে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এষার এক অদ্ভুত বডিগার্ড। এষার পা দুটো টলছে।

বিনায়কের টোব্যাকোর সব ধোঁয়া যখন সরে যায়, সন্দীপের চোখের সামনের বাতাসটা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে সন্দীপ, দু'ঘণ্টার মত্ততার আসর এখন একেবারে স্তব্ধ ও শূন্য। যেন জগৎ-ছাড়া একটা স্তব্ধতা ও শূন্যতার এককোণে বসে আছে সন্দীপ। না, পাশের চেয়ারে বিনায়কও নেই। কে জানে কখন কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে বিনায়ক।

সামান্য দু'চার চুমুক শেরি কতটুকুই বা নেশা ধরিয়ে দিতে পারে? কিছুই না। না, নেশার ঘোরে নয়, বিশ্রী রকমের একটা তন্দ্রার ঘোরে সন্দীপের সারা শরীর অলস হয়ে ঢুলছে; মাথাটা বার বার ঝুঁকে পড়ছে; চোখ দুটোতে তাকিয়ে থাকবার জোর আর নেই। তন্দ্রাটাও যেন ঝন্‌ঝন্ শব্দের ঘোর, মাথার উপর আছড়ে পড়ছে, ভাঙছে আর গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে এক-একটা কাচের গেলাস। দাঁতে দাঁত ঘষে আর দু'চোখের বড়-বড় পাতাগুলোকে বড়-বড় কাঁটার মতো খাড়া করে কথা বলছে এষা—আমি তো তোমার একেলে অভিরুচির পেট বেশ ভাল ক'রে ভরে দিয়েছি; তবে আর তোমার কী বলবার আছে?

—আছে; একশো'বার আছে।

—না, নেই।

এবার এক ধমকেই তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। বুঝতে পারে সন্দীপ, মাথার ভিতরটা কটকট করে জ্বলছে, তাই তন্দ্রাটা উত্তপ্ত হয়ে ও আরাম না পেয়ে বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাঃ, খুব চমৎকার অবস্থা! আজ তন্দ্রাতে এষার ধমক শুনতে হলো, কাল স্বপ্নেতে আর পরশু হয়তো মূর্ছার মধ্যে এষার ধমক শুনতে হবে।

আজকের এই বিচিত্র অ্যাজ-ইউ-লাইক উৎসবের আসরে এষার সঙ্গে সন্দীপকে হেসে-হেসে ঢুকতে দেখে বিনায়কও মুখ টিপে হেসেছে আর বলেছে—আজ তোমাকে বিশেষ রকমের আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে, তোমার লাইফের একটা হাইপার-রোমান্টিক ব্যাপার আজ হয়ে গিয়েছে কিংবা হবে। তখন বলতে পারেনি সন্দীপ, হ্যাঁ তাই বটে। মাটিতে সাঁতার কেটে পাগল যে-রকমের হাইপার-রোমান্টিক আনন্দ পায়, আমিও সেইরকম আনন্দ পেয়েছি।

বাবুর্চি ফটিক দু'বার দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে চলে গেল। হাত-ঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সন্দীপ। যেন নিদারুণ এক সংকল্পের দুটি কঠোর চক্ষু হিসেব করে বুঝে নিচ্ছে; আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে দুঃসহ একটা ধৈর্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছে। না, এখন নয়। রাত্তি আরও গভীর হোক।

ধৈর্য ধরে বসে থাকতে গিয়ে আবার তন্দ্রার মতো একটা আবেশ এসে চোখ দুটোকে জড়িয়ে ধরে, যদিও মাথার ভিতরে কটকটে জ্বালাটা একটুও শান্ত হয়নি। সন্দীপের একটা হাত হিংস্র জন্তুর থাবার মতো ভঙ্গিতে কপালটাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে।

একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে সন্দীপ, মুখ তুলে আর চোখ খুলে বড়ঘরের দরজার দিকে তাকায়। কিসের শব্দ? গাড়ির শব্দ নাকি? ক্যাডিলাক কি কাউকে নিয়ে বাইরে চলে গেল? শব্দটা যেন সন্দীপের তন্দ্রাটাকে মাড়িয়ে দিয়ে আর ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সন্দীপের বুকের ভিতরে ধৈর্যধরা অপেক্ষার নিঃশ্বাসটা যেন ফুঁসে উঠে শব্দ করে—রাত কত হলো?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় সন্দীপ। রাত দুটো। না আর অপেক্ষা নয়। আর ধৈর্য নয়। আর সহ্য করা উচিত নয়। এই মুহূর্তে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক্। সে নিষ্পত্তির জন্যে যদি মেয়েমানুষটার গলা টিপে ধরতে হয়, জিভ উপড়ে ফেলতে হয়, লোহার রডের এক আঘাতে তাহিতি ঠোঁট থেঁতলে দিতে হয়…।

এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে এষার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় সন্দীপ। দরজার গায়ে লাথি মেরে চেঁচিয়ে ওঠে।—খোলো।

খুলে যায় দরজা। ঘরের ভিতরের নিবিড়-নীল কুহেলিকার মতো আলোটার এক ঝলক আভা খোলা দরজা দিয়ে করিডরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে। ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে সেইখানে এসে দাঁড়ায় নিশীথ-সুখের একটি আলোড়িত মূর্তি, এষা। এষার ঢিলে পায়জামা যেমন শিথিল, তেমনই শিথিল এষার গায়ের ঢিলে জ্যাকেট। জ্যাকেটের তিন বোতাম-ঘরের দুটিই খোলা, বেল্ট আলগা হয়ে ঝুলছে। এলোমেলো চুলের একটা ছন্নছাড়া কার্ল কপালের উপর ছেঁড়া দড়ির মতো ঝুলছে, এষার মাথাটা যেন এইমাত্র একটা ঝড় সহ্য করেছে। আর তাহিতি ঠোঁটের উপর দিয়ে নিশ্চয় একটা প্লাবন বয়ে গিয়েছে, নইলে নন-স্মীয়ার লিপস্টিকের রং এমন করে গলে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে কেন?

—ঘরের ভিতর কে? চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ; আহত বাঘের হৃদ্‌পিণ্ড থেকে আক্রোশের একটা গর্জন উথলে উঠেছে।

—চেঁচাবে না, আস্তে কথা বল।—খুব শান্ত, খুব মৃদু, নিষ্কম্প স্বর।

শিউরে ওঠে সন্দীপ। সন্দীপের কণ্ঠনালীর উপর যেন ভয়ানক শক্ত একটা লাঠির বাড়ি পড়েছে, ভাষা থেঁতলে গিয়েছে, স্বর ছিঁড়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এষা—কী বলছিলে, বল।

সন্দীপ—তোমার ঘরে কে?

এষা—কেউ নেই।

সন্দীপ—আছে।

এষা—এখন নেই। এতক্ষণ ছিল।

সন্দীপ—কে ছিল ?

এষা—মন্দার ছিল।

সন্দীপের চোখের তারা একবার শিউরে উঠেই কুঁচকে যায়। বুকের উপর হাতুড়ি পড়ছে ; ফুসফুসটা তাই চুপসে গিয়েছে। আর টিপটিপ করে না বুকটা।

এষার শান্ত চোখের দুই ভুরু প্রজাপতির পাখার মত দুলতে থাকে।—এই সামান্য একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এরকম একটা অসময়ে তেড়ে এলে কেন ?

সন্দীপ—কী বললে ? সামান্য কথা ?

এষা—হ্যাঁ। দেখতে পাওনি, মন্দার যে এইমাত্র চলে গেল ?

সন্দীপ—না।

এষা—কেন ? বাবুর্চি ফটিক দেখেছে, বেয়ারা অনাদি দেখেছে, মন্দার চলে গেল। গাড়ির শব্দ শুনে মালী জেগে উঠেছে আর গেট খুলে দিয়ে দেখেছে, মন্দার চলে গেল। ওরা তো রোজই দেখছে। তবে তুমি কেন কিছুই দেখতে পেলে না ?

সন্দীপ—কার হুকুমে রোজ গাড়ি ক'রে মন্দারকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয় ?

এষা—আমার হুকুমে।

সন্দীপ—গাড়িটা তোমার নয়।

এষা—তোমারও নয়। ওটা চারুশীলা রায়ের গাড়ি।

সন্দীপ—মন্দার তো একটা জানোয়ার।

এষা—খাঁটি জানোয়ার, মেকি মানুষ নয়।

সন্দীপ—তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে এখনি চলে যাও।

এষা—এটা চারুশীলা রায়ের বাড়ি, তোমার বাড়ি নয়। তোমার কথায় আমি এ-বাড়ি ছাড়তে পারি না।

সন্দীপ—আমি তোমাকে ডিভোর্স করবো।

এষা—খুব ভাল কথা।

সন্দীপ—তাহলে চলে যাও।

এষা—না, আদালত যতদিন না ডিভোর্স মঞ্জুর করে, ততদিন আমি এখান থেকে নড়বো না।

সন্দীপ—কেন ?

এষা—আমার ইচ্ছা। কিংবা দশ লাখ টাকা দাও, এখুনি চলে যাচ্ছি। নইলে যাব না।

সন্দীপ—আমি তাহলে…।

সন্দীপের দুই চোখের তারা, দুটো ঠাণ্ডা অঙ্গারের কুচি, হঠাৎ দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে।—আমি তাহলে তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবো।

এষা—পৃথ্বীরাজ তাহলে এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে। সুরঞ্জন এক গুলিতে তোমার বুক ফুটো ক'রে দেবে। আর অনিমেষ তোমার…।

সন্দীপ—ওরা তো চোরাই সোনার কারবারী, যত স্মাগলার!

এষা—তুমিও তো করেন কারেজির স্বাগলার।

না, আর এষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না সন্দীপ। একবার করিডরের ওদিকে, একবার সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে শুধু ছটফট করে। যেন মাথা ঠুকবার জন্তে এই পৃথিবীর সীমার বাইরে কোন পাষাণের কাছে ছুটে যেতে চাইছে। থরথর করে কাঁপতে থাকে সন্দীপ, যেন প্রচণ্ড বেগের একটা ঝড় এসে সন্দীপকে ঠেলছে। চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপ।—আমি তাহলে আত্মহত্যা করবো।

হেসে ফেলে এষা। ইস্পাতের বাঁশীর শিসের মতো কী তীব্র সেই হাসির শব্দ।—তোমার কী আত্মা আছে যে, আত্মহত্যা করবে? বাজে কথা, মিথ্যে কথা, বাচ্চা ছেলের আবদেরে বায়নার কথা। ভাল চাও তো চুপ ক'রে চলে যাও, আর ভাল ছেলেটির মতো চুপ করে ঘুমিয়ে থাকো।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে, আর খোলা দরজা আবার বন্ধ করে দেয় এষা। ব্যস্ত হয়ে নয়, শব্দ করে নয়, দরজার কপাট দুটো যেন স্টেজের দু'-পাশের দুটি কাটা পর্দার মতো আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জুড়ে গেল।

কিন্তু বেশ শব্দ করে বেজে ওঠে সন্দীপের ঘরের টেবিলের একটা দেরাজ। দৌড়ে এসে ক্ষিপ্র হাতের এক টানে দেরাজ খুলে রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছে সন্দীপ।

চেয়ারের উপর একেবারে ধীর-স্থির পাথুরে মূর্তির মতো বসে থাকে সন্দীপ। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়, লাথি মেরে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আবার ছটফট করে, সরে গিয়ে রঙিন ভেলভেট দিয়ে মোড়া ছোট সোফাটার কাঁধ এক হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু চোখের সামনে ওই মিররের ঝকঝকে চেহারাটাকে সহ্য করতে পারে না। ঘর ছেড়ে আবার করিডরের উপর এসে দাঁড়ায়। না, এখানে নয়। রঙিন মোজেয়িকের উপর যেন এক থল হাসির পালিশ চিকচিক করছে। না, এখানে নয়। সরে যায় সন্দীপ। দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যায়। সন্দীপের দু'পায়ের দুপদাপ শব্দটা মত্ত হয়ে তেতলার করিডর ও বারান্দার উপর ঘুরতে থাকে।

ছোট একটা ঘর, সে ঘরের দরজাটা তালাবন্ধ নয়, একটা কপাট খুলেই রয়েছে। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। ঠিক জায়গা। বুকটাকে চোখে পড়বে না, কিছুই চোখে পড়বে না, তাই ছটফটও করতে হবে না।

কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে সন্দীপের বুক। অন্ধকারের মধ্যে মেঝের ওপর ছোট একটা বিছানাকে মাড়িয়ে ফেলেছে সন্দীপ। ভূতুড়ে ঘর, কী ভয়ানক ভূতুড়ে ঘর। এটা তো সেই আকাশ-ঘর। মানুষ নেই তবু তার বিছানাটা পড়ে আছে। শূন্ত ঘরের ভিতরে এই জমাট অন্ধকারটা যেন একটা জমাট অভিশাপ, এখনই চেঁচিয়ে একটা বিকট হাসি হেসে কথা বলে ফেলবে, তুমি এখানে কেন?

এক লাফে ঘরের দরজা পার হয়ে আর ছুটে গিয়ে, বারান্দার একেবারে শেষ

প্রান্তে এসে হাঁপ ছাড়ে সন্দীপ।

চুপ করে, একটা নিস্ফল আবছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে সন্দীপ। সত্যিই তো, হত্যা করবার জন্যে এতক্ষণ ধরে এত ছুটোছুটি করে আত্মাটাকে খোঁজা হলো। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। মিথ্যে হয়রান হতে হলো।

অবশ হাত, ক্লান্ত হাত, হাতের কব্জিতেও কোন জোর নেই। কপাল বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। রক্তের শিরাগুলির ভিতরে হিম ঢুকেছে। রিভলবারটা বোধহয় ঝুপ করে হাত থেকে খসে পড়বে।

আকাশে তারা নেই। গাছের মাথা নড়ে না, বাতাসের সাড়া নেই। তবু একটা ঘুম-ভাঙা কাক যেন ডাক ছাড়তে না পেরে কঁকিয়ে উঠছে।

না, আর এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না। রাত বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। সিঁড়ি ধরে এক-পা দু'পা করে আস্তে-আস্তে নেমে যায় সন্দীপ। নিজের ঘরে ঢুকে দেরাজের ভিতরে রিভলবার রেখে দিয়ে, রঙিন ভেল-ভেটে মোড়া সোফার উপর বসে পড়ে আর অবশ শরীরটাকে এলিয়ে দেয়।

॥ ষোল ॥

মিষ্টি হাসির শব্দটা সেতারের তারের ঝঙ্কারের মতো বেজে উঠেছে। সন্দীপের ঘুম ভেঙে যায়, চোখ মেলে তাকায়। দেখতে পায় সন্দীপ, এষা হাসছে। এষার গায়ের ফিরোজা-নীল শিফনের শাড়িটাও হাসছে। এষার হাতে একটা খবরের কাগজ দুলছে।

সন্দীপের কাঁধ ছুঁয়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে, হাসির সেতার আবার বেজে ওঠে।—আমি ভাবছি, এরকম একটি সুন্দর মানুষের এত স্টাউট একটি শরীরের ভিতরে কী হাড়গোড় নেই? থাকলে এরকম করে কেন্নোর মতো গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকতে পারবে কেন?

সন্দীপ—কী হলো?

এষা—ওঠো, সোজা হয়ে বসো।

হেসে ফেলে সন্দীপ। ঘাড় টান করে আর সোজা হয়ে বসে।

এষা—সোফা থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

গা-মোড়া দিয়ে আর হাই তুলে নিয়ে হাসতে থাকে সন্দীপ। সোফা থেকে নেমে দাঁড়ায়।

এষা—ছি ছি, কী কাণ্ড! বাচ্চা ছেলেও ভুল করে এভাবে একটা সোফার উপর শুয়ে থাকতে আর ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

সন্দীপ—ক'টা বেজেছে?

এষা—ন'টা বেজে গিয়েছে।

সন্দীপ—এঃ। তাহলে তো সত্যিই বেশ নিবিড় একটা ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছি।

এষা—আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রাত্তিরটার উপর রাগ করে সকাল ন'টা

পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলে ?

সন্দীপ—না না, রাতটার উপর রাগ করবো কেন। এমন কিছু অগ্নিকাণ্ড করেনি তো রাতটা যে, রাগ করতে হবে।

এষা—সত্যি করে বল।

সন্দীপ—তুমি সত্যি করে বল তো, তুমি কি বালুচরের উপর রাগ করে শিফন পরেছো ?

এবার হাসিটা ভোরের পাখির কাকলির মত বেজে ওঠে—না, তা কেন হবে ?

সন্দীপ—তবে ? ওরকম কথার কি কোন মানে হয় ?

এষা—তবে আর আমাকে অবাক করে দিও না। মুখ ধুয়ে নাও, চা খেয়ে নাও। সাজ-টাজ সেরে তৈরি হয়ে নাও। ফটিককে বলে দিয়েছি, এখনি তোমার ব্রেকফাস্ট এখানে দিয়ে যাবে।

ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায় এষা। মুখ ফিরিয়ে কথা বলে।—আজ আমি এবেলা কোথাও যাব না। তুমিই আজ ক্যাডিলাক নিয়ে বেরু হবে।

সন্দীপ—কেন বল তো ?

এষা—আমি ফোনে মুরারিবাবুকে বলে দিয়েছি, তুমি আজ ব্যাঙ্কে যাবে না।

সন্দীপ—কেন বল তো ?

এষা—বলছি, তুমি তৈরি হয়ে এসো তো। আমি ড্রইংরুমে আছি।

সন্দীপের তৈরি হতে আর ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। এরই মধ্যে নিচতলার ড্রইংরুম থেকে দু'বার রিং করেছে এষা—একটু তাড়াতাড়ি কর, আর দেরি করো না।

সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইটা হাতে তুলে নিতেই আবার শুনতে হয়, রিং করছে এষা।—তোমার চেক-বইটা সঙ্গে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি কর।

চলতে চলতে সিগারেট ধরিয়ে আর তাড়াতাড়ি হেঁটে নিচতলার ড্রইংরুমের দরজার কাছে সন্দীপ এসে পৌছতেই এষা বলে—তাড়াতাড়ি করতে বলছি এই কারণে যে, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার সময় হলো আটটা থেকে দশটা।

সন্দীপ—কে ভদ্রলোক ?

এষা—বলছি। চল গাড়িতে বসো, তারপর সবই বুঝিয়ে বলছি।

ক্যাডিলাকের চকচকে বডি হাসছে। দেখতে পেয়ে, সন্দীপের খুশি চোখের তারা দুটো যেন হেসে-হেসে চিকচিক করে। গাড়িতে উঠে দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইলটাকে জড়িয়ে ধরে সন্দীপ।—বল।

এষা।—শোন।

হাতের খবর-কাগজটা সন্দীপের চোখের সামনে স্টিয়ারিং হুইলটারই উপর রেখে দিয়ে, লাল-পেন্সিলের একটা দাগ সন্দীপকে দেখিয়ে দেয় এষা।—বিজ্ঞাপনটা একবার পড়ে নাও।

চার লাইনের একটা বিজ্ঞাপন। রিচি রোডের একটা নতুন বাড়ির একটা

ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে হলে ল্যাণ্ডলর্ডের সঙ্গে সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যে দেখা করে কথা বলতে হবে।

সন্দীপ—পড়লাম।

এষা—তুমি এখনই গিয়ে এই ফ্ল্যাট ভাড়া করে কেন। যদি সেলামী চায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেলামীর টাকাও দিয়ে দিও।

সন্দীপ—কিন্তু কেন বল তো? কিসের জন্যে?

এষা—মন্দারের জন্যে। হাওড়ার একটা এঁদো গলিতে মন্দারকে আর পড়ে থাকতে দেওয়া চলে না, উচিতও নয়।

সন্দীপ—তাই বল।

গাড়ি স্টার্ট করে সন্দীপ। এষা বলে—তারপর মন্দারের জন্যে কিছু ফার্নিচার কিনে ফেলবে, একটা লোকের দরকার আর কম্ফোর্টের জন্য যা দরকার। দেখবে, ফার্নিচারের সবই যেন বার্মা সেগুনের হয়।

সন্দীপ—আচ্ছা।

চলতে থাকে গাড়ি। এষা বলে—মন্দারের জন্যে একটা রেনকোট কিনবে। দেখবে, জিনিসটা দেখতে ভাল হয় আর মজবুতও হয়।

সন্দীপ—আচ্ছা।

অনেকদিন পর আবার সন্দীপের জীবনে ছুটোছুটি করবার একটা তাগিদ এসেছে, একেবারে নতুন তাগিদ। কিন্তু ক্যাডিলাক কেন যেন ঠিক সেই স্পীড আর নিতে পারছে না, যদিও খুব স্পীড নিয়ে সন্দীপের হাতের এক-একটা সিগারেট তিন-চার টানেই জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এষার ইচ্ছা আর অনুরোধের তিনটি কাজ শেষ করতে তিন ঘণ্টাও সময় লাগে না। তারপর? এষা তো আর কোথাও যাবার কথা বলেনি। তারপর কোথায় যাবে সন্দীপ?

বেলা একটা বেজেছে। নতুন-কেনা রেন-কোটের মস্ত বড় প্যাকেটটা হাতে নিয়ে চৌরঙ্গির একটি শোভাময় বিরাট বিপণির বাইরের সিঁড়ির শেষ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে সন্দীপ, কোথায় যাওয়া যায়? যাওয়ার মতো জায়গা এই পৃথিবীতে কোথাও নেই, এ তো হতে পারে না। কিন্তু কোথায়?

হ্যাঁ আছে। আবার বিপণির ভিতরে গিয়ে বিপণির সার্ভিস কাউণ্টারের টেলিফোনে কথা বলে সন্দীপ।—বিনায়ক, এক মিনিটও কালক্ষেপ না করে আর ট্যাক্সি করে চলে এস। আমার বর্তমান ঠিকানা, কলরডো বারের যে-কোন একটি কেবিন। বীয়ারের সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে একটু তর্পণ করবো। চলে এসো।

এরপর আর কতটুকুই বা সময় লাগে? মাত্র আধ ঘণ্টা। কলরডোর দোতলায় বারের একটি কেবিনের নিভৃতে সন্দীপ আর বিনায়কের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে দুই গেলাসের হুইস্কি মেশানো বীয়ারের বুদ্বুদ শিউরে শিউরে ফেটে যেতে থাকে।

বিনায়ক বলেন—না, এই জীবনটা কিছুই নাঃ, একটা ইঃ, উঃ আর আঃ।

সন্দীপ—এটা তো সিনিকের কথা। যে মানুষ জীবনে ভাল কিছুই পেল না, ভাল কিছুই দেখতেও পেল না, আর যার সব আশা বিফল হয়ে গেল, এরকম একটা পরাজিত মানুষের কথা।

বিনায়ক—আমিও তো তাই বলছি। আমি বলছি, এটা হলো ব্যাঙ্কের মুরারিবাবুর জীবনের কথা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব আশা করেছিলেন যে, সুন্দরী ছোট-শালীটিকে বিয়ে করবেন। কিন্তু আশা বিফলে গেল। ছোট-শালী জনৈক ছোকরা ডাক্তারকে বিয়ে করে ফেলেছে। মুরারিবাবু এখন বলছেন, তীর্থে যাব, সংসারকে বিষ বলে মনে হচ্ছে।

সন্দীপ—আমি বলতে চাই, জীবনে সে-ই হলো সত্যিকারের জয়ী মানুষ, যার ভালবাসা জয়ী হয়েছে।

বিনায়ক—ওঃ, কী সুন্দর কথা! তুমি সত্যিই কত চমৎকার করে খুব অল্প কথায় বড়-বড় কঠিন আইডিয়ার কথা কত সহজে বলে দিতে পার! আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে শুনি।…কিন্তু, এ যে তোমার নিজেরই কথা বলে ফেলেছো সন্দীপ। তুমি কি মনে কর যে, আমি সেটা বুঝতে পারি না? আমি কি এতই বোকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল?

সন্দীপ—আমার বলতে কোন কুণ্ঠা নেই, এবার ভালবাসা আমাকে সত্যিই আশ্চর্য করে দিয়েছে।

বিনায়ক—আশ্চর্য হবারই কথা। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, সে ভালবাসার তুলনা নেই। তবু যদি তুলনা করে বলতে হয়, তবে…না, সোনার মতো ভালবাসা বলবো না, কারণ সোনাতেও দাগ পড়ে। বলবো, হীরের মতো ভালবাসা, কোন দাগ পড়ে না।

সন্দীপ—আমি তোমার মতো অত কাব্যি করে কথা বলতে পারি না। তবু বলবো, এবার মনের ভিতরে যেন একটা আলো আছে।

বিনায়ক—আছে নিশ্চয়।

সন্দীপ—সেকেলে মেয়েরা যেমন পিদিম জেলে স্বামীর মঙ্গলের ব্রত করতো, এবার ভালবাসাও তেমনই…যাকে বলে…।

বিনায়ক—যাকে বলে, সেকেলে পিদিমের আলোর মতো জলছে আর স্বামীর মঙ্গলকামনা করছে।

সন্দীপ—হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছে বিনায়ক। আমি বুঝতেই পারিনি যে, এবার প্রাণের ভিতরটা একেবারে…যাকে বলে…একটা স্বামী-জ্ঞান স্বামী-ধ্যান সেকেলে মেয়ে।

বিনায়ক—তুমি যে আগে কিছু বুঝতে পারনি, সেটা আমি খুবই বুঝতে পেরে-ছিলাম। ভাবতে গিয়ে খুব রাগ হতো যে, তুমি কেন কিছুই বুঝতে পারছো না?

সন্দীপ—যাক্, সব ভালো যার শেষ ভালো।